সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে

সমগ্র সৃষ্টিসমূহের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার নাম এবং
পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান পবিত্র কা'বা শরীফ
الله
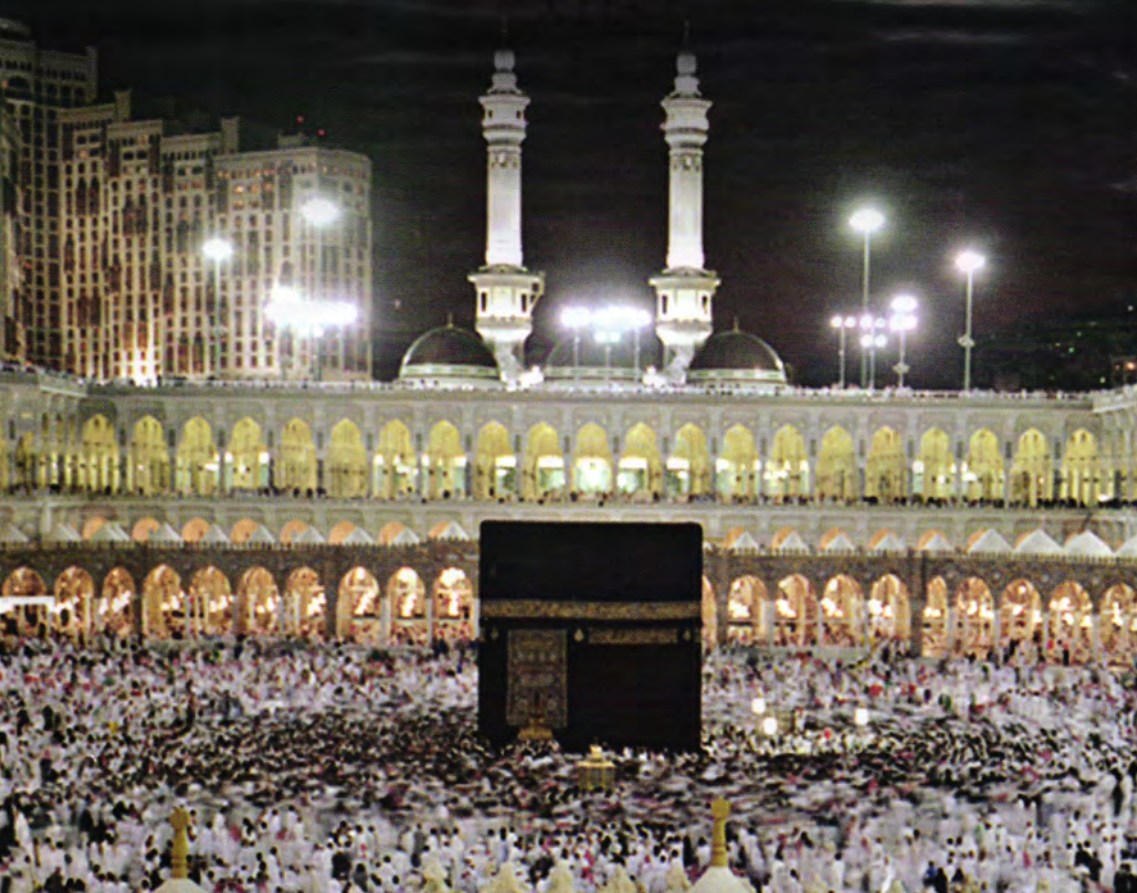
وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ
(হে নবী) আমিতো আপনাকে সৃষ্টিকূলের জন্যে রহমত
বানিয়েই পাঠিয়েছি। সূরা আল আম্বিয়া - ১০৭

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে। *সূরা আল আহযাব - ২১*

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর
(প্রতিষ্ঠিত) রয়েছেন । সূরা আল ক্বলাম - ৪

ہونہ یہ پھول، توبلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

"না হতো এই 'গোলাপ' যদি, বুলবুলি না গাইতো গান, ফুল কুঁড়িদের হাস্যকালের হাসতো না এই গুলিস্তান।" (কবি 'গোলাপ' বলতে নবী করীম (সা:)কে বুঝিয়েছেন)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
হে আমাদের মালিক, আমাদের এই কাজ আপনি কবুল করুন; আপনি নিশ্চয়ই সকলকিছু শুনতে পান এবং সকলকিছু জানেন ।
সূরা আল বাক্বারা- ১২৭

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○

হে আমার মালিক, তাঁদের (পিতা-মাতার) প্রতি ঠিক সেভাবেই আপনি দয়া করুন, যেমনি করে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।

- সূরা বনী ইসরাঈল-২৪

উৎসর্গ

আমার গর্ভধারিণী মমতাময়ী মা মরহুমা বেগম গুলনাহার ইউসুফ সাঈদী ও পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানিত আব্বা মাওলানা ইউসুফ সাঈদী (রাহঃ) এর আত্মার মাগফিরাত কামনায়...

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

মাসজিদে নববী
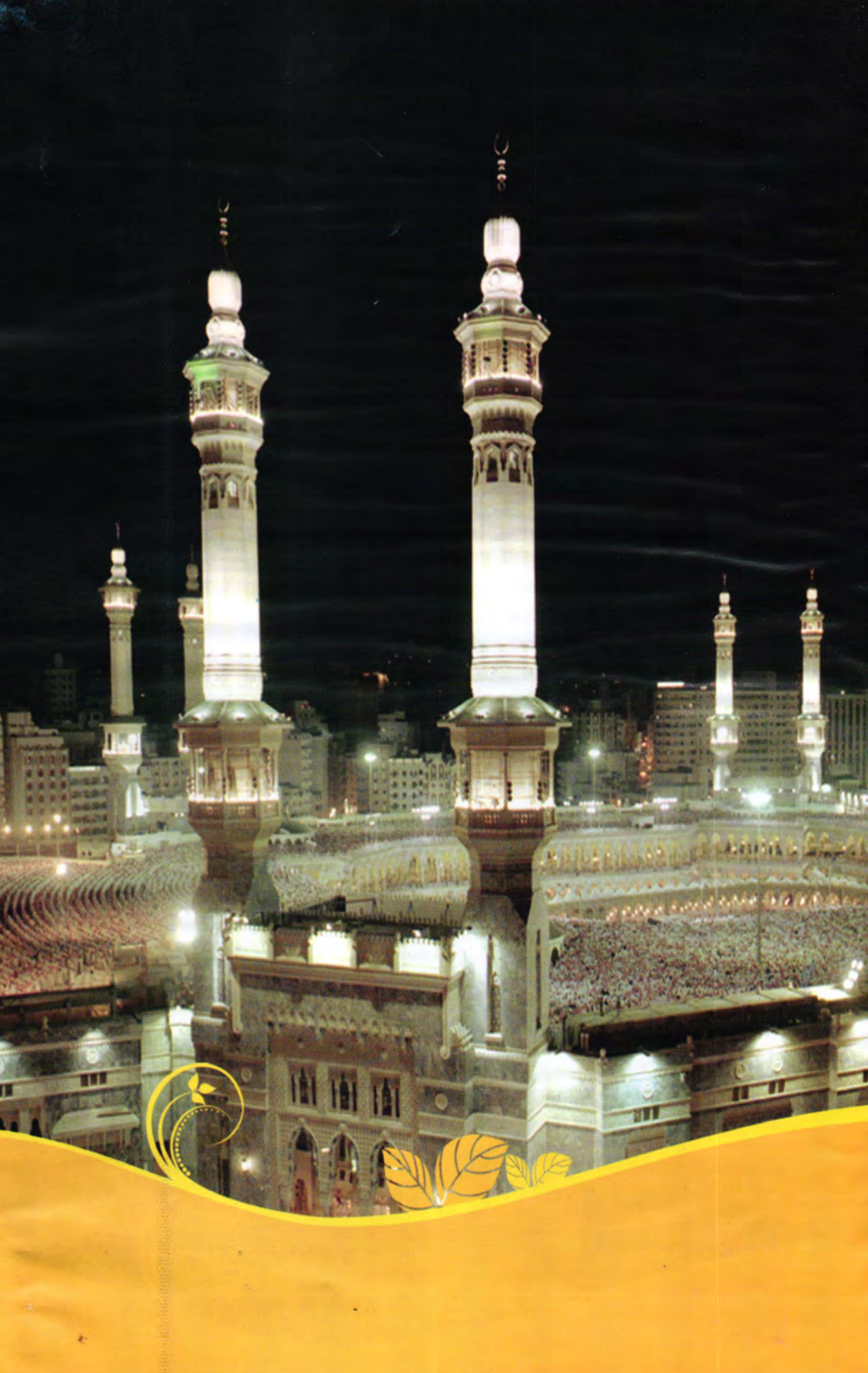
সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১১ ২৭৬ ৪৭৯

সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
রাফীক বিন সাঈদী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

অনুলেখক
আব্দুস সালাম মিতুল

গ্রন্থসত্ত্ব
তাসনুভা তামান্না সাঈদী, ইশরাত লুবায়না সাঈদী, মাহদী হোসাইন সাঈদী, মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ সাঈদী, মানাযীর মাহীর সাঈদী, নাযিল ইউসুফ সাঈদী, হুমায়রা মাহ্‌রীন সাঈদী, সাবিহা বিনতে নাসিম সাঈদী।

গ্রাফিক্স ডিজাইন
ডিজাইন ওয়ান লিঃ
৮৭ পুরানা পল্টন, পল্টন টাওয়ার (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০। মোবাইল: ০১৬১১৭৫০৫২-২১-২২

ডিজাইন ও প্রিন্টিং ব্যবস্থাপনায়
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট
চাষীকল্যাণ ভবন, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৫৯২৫, ৮৩১৮৬৫৬

প্রকাশকাল
তৃতীয় প্রকাশ মার্চ ২০১৪

বর্ণ বিন্যাস
নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২, (৩য় তলা) সোনালীবাগ
বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭৩৩-০১৫২১০

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৫০০ টাকা

Price : 500 TK. BD.
20 Pound UK. 30 US Dollar

Seerat-E-Saiyedul Mursaleen
Moulana Delawar Hossain Sayedee

Published by Rafeeq Bin Sayedee
Managing Director Global
Publishing Network
Mobile: 01711 276 479

আমার কৈফিয়ত

بسم الله الرحمن الرحيم

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

"আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনান এবং (সে অনুযায়ী) তিনি তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন, (সর্বোপরি) তিনি তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, অথচ এরা সবাই ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো"- সূরা আলে ইমরান- ১৬৪

কৈফিয়তের সূচনায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শোকর গুজার করছি, যিনি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা:)কে মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁরই উম্মাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম নবী করীম (সা:) এর প্রতি যাঁর মাধ্যমে আমরা ইসলামের ন্যায় একটি অভ্রান্ত ও ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা লাভ করেছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বিগত অর্ধ শতাব্দীব্যাপী দেশ-বিদেশে পবিত্র কুরআনের তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল ও ওয়াজ মাহফিলসহ অগণিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন-হাদীস, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করে জাতি-ধর্ম, দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণকে ইসলামের সর্বাঙ্গীন সত্য-সুন্দর ও মহামুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। অধ্যয়ন ও লেখনী আমার আব্বার অবসরের প্রধান সঙ্গী। আমি কখনো তাঁকে সময়ের একটি মুহূর্তও অপ্রয়োজনে ব্যয় করতে দেখিনি। সময় পেলেই দেখেছি তাঁকে কাগজের বুকে কলমের আঁচড় দিতে অথবা পড়াশোনার মাঝে ডুবে থাকতে। এভাবেই পবিত্র কুরআনের তাফসীরসহ ইসলামের নানা দিক সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৭১ টি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর সবগুলোই আমরা জ্ঞান পিপাসু পাঠক মহলের হাতে গ্রন্থাকারে তুলে দিতে পেরেছি- আলহাম্‌দুল্লিাহ্।

কুরআন-হাদীস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভ্রমণ কাহিনীসহ সমকালীন নানা প্রেক্ষাপটে আব্বা লিখেছেন কিন্তু এরপরেও একটি বিষয় সম্পর্কে প্রায়ই তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, "মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ অধম গোলামকে দিয়ে তাঁর অসংখ্য বান্দাদের দ্বীনী কথা শোনালেন,

কিছু লেখারও সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু আমার লেখার জগতে বড় একটি শূন্যতা এ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে যা সময়ের অভাবে ও ব্যস্ততার কারণে আজও পূরণ হলো না। আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় হাবীব, যাঁকে তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাদান করেছেন, তাঁর সম্পর্কে গতানুগতিক কিছু নয়, একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর সীরাত মুবারকের ওপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে চাই- যা পাঠক-পাঠিকা মাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হবে এবং নবী করীম (সা:) এর আনুগত্যের মাঝেই পৃথিবী ও আখিরাতে শান্তি এবং মুক্তি নিহিত এ উপলব্ধিবোধ সৃষ্টি হবে"। এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আব্বা আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতেন, "পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য এমন কোনো ভাষা নেই যে ভাষায় বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা:) এর জীবনী রচিত হয়নি। যে সকল মনীষীরা তাঁর জীবনী লিখে ধন্য হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালার করুণা লাভের সুযোগ পেয়েছেন সেই তালিকার সর্বশেষ নামটি যেনো আমার হয়"।

আমার আব্বা সকল ব্যস্ততার মাঝেও নবী করীম (সা:) এর পবিত্র সীরাত সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী এ গ্রন্থটি রচনার কাজে হাত দেন। লেখা ও গ্রন্থ প্রকাশের কাজে আমাদের ভাই আব্দুস সালাম মিতুলের সকল ভার নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে তিনি তাঁকে সাথেই রাখতেন। আমি এবং আমার তিন সহোদর আলহাজ্ব শামীম সাঈদী, আলহাজ্ব মাসুদ সাঈদী ও আলহাজ্ব নাসিম সাঈদী আব্বার গ্রন্থ সম্পর্কিত সকল বিষয় মিতুল ভাইয়ের কাছ থেকেই জেনে নিয়ে সকল প্রয়োজনে আমরা চার ভাই তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেই। আব্বার এই গ্রন্থটির ব্যাপারেও তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম কাজ প্রায় শেষ। তবে আব্বা আদেশ দিয়েছেন, তিনি এ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে যা কিছুই আলোচনা করেছেন, তার মধ্য থেকে নবী করীম (সা:) সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ একত্রিত করে গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা যেন গ্রন্থাবদ্ধ করি।

শতাব্দীর নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস ও জঘন্য মিথ্যাচার, আমার আব্বাকে আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তাড়িত হয়ে সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাবন্দী করা হলো। অন্ধকার কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বন্দী করা হলো পবিত্র কুরআনের শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহর ভুবনমোহন কণ্ঠ। সেই সাথে নির্দোষ মানুষটির কাঁধে তুলে দেয়া হলো মামলার পাহাড়। যুদ্ধাপরাধ নয়– পবিত্র কুরআনের প্রচার ও জনপ্রিয়তাই যাঁর একমাত্র অপরাধ। 'সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন' পূর্ণ অবয়বে আব্বা নিজ হাতে সমাপ্ত করার সুযোগ পেলেন না। আক্ষেপের বিষয় হলো গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আব্বা যতটা সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যে আঙ্গিকে গ্রন্থ সজ্জিত করেন ততটা সুসজ্জিত করে পাঠক মহলের হাতে আমরা তুলে দিতে পারলাম না। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে যিনি এ গ্রন্থটি রচনা করলেন গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ হবার পরে সর্বপ্রথম তাঁর হাতে আমরা এ গ্রন্থটি তুলে দিতে পারলাম না বলে হৃদয়ে রক্তক্ষরণের এ যন্ত্রণা আমরা কার কাছে প্রকাশ করবো। আমরা সকলের কাছে আমার আব্বার দীর্ঘ হায়াত, সুস্থ জীবন এবং কারামুক্তির জন্য দোয়া কামনা করছি। তিনি যেন পুনরায় মানুষের কাছে কুরআনের অমীয় বাণী পৌছাতে পারেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে তাঁকে যেন সে সুযোগ দান করেন।

কারাগারে আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেই আব্বা প্রায়শ:ই নবী করীম (সা:) এর সীরাত ভিত্তিক রচিত এই গ্রন্থটি সম্পর্কে জানতে চান। আমরা চার ভাই প্রায়ই মিতুল ভাইকে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে তাগিদ দিতে থাকি। গ্রন্থটির অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখেই আব্বার ইচ্ছানুযায়ী এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হলো। ইন্‌শাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থটি পূর্ণতা লাভ করবে। এ গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যিনি যে পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে এর সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন- আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখকের কৈফিয়ত

সকল প্রশংসা সমগ্র সৃষ্টিসমূহের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের চলার পথও প্রদর্শন করেছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম মানবতার সেই মহান মুক্তিদুতের প্রতি, আল্লাহ তা'য়ালা যাঁকে সমগ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী এবং হিদায়াতের উৎস হিসেবে একমাত্র তাঁকেই নির্বাচিত করেছেন।

'সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন' আব্বার ভক্তদের হাতে পৌছাতে দেরী কেনো হলো এ কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক কারণেই না ফেরার দেশে চলে যাওয়া একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "আব্বা, হ্যাঁ- আমিও আপনাকে আব্বা বলেই সম্বোধন করলাম। যদিও আমাদের সকলের ছোট ভাই আব্দুস সালাম মিতুল আপনাকে আব্বা বলে সম্বোধন করে এ কারণে তাকে তিরস্কার করে আপনাকে পা দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিলাম। এ কথা শোনার সাথে সাথে আমার ভাই চিৎকার করে কেঁদে উঠে আমাকে বলেছিলো, ভাইয়া আপনি তওবা করুন। আল্লাহর এই বান্দা সম্পর্কে যা বলেছেন আল্লাহ তা বরদাসত্ করবেন না। সত্যই আল্লাহ বরদাসত্ করেননি। আপনার মতো নির্দোষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে মুখে অপবিত্র কথা উচ্চারণ করার পর বেশি দেরি হয়নি। মাত্র একমাসের মধ্যেই আমার পায়ে মরণব্যাধী ক্যান্সার দেখা দেয়। জীবনের শেষ আকাংখা ছিলো আপনার পবিত্র পা দু'টো জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবো, কিন্তু সে সুযোগ বোধহয় আমি আর পাবো না। তবে আমার ছোট ভাই আমাকে জানালো, 'আব্বার কাছে ক্ষমা চাইতে হয় না, এমনিতেই তিনি ক্ষমা করে দেন'। আমার জন্যে দোয়া করবেন।"

আমার সহোদর মরহুম মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ আল্লামা সাঈদী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে ইন্তেকালের দুইদিন পূর্বে যে পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যেই উল্লেখিত কথাগুলো আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। কারাপ্রাচীরের বাধার কারণে সে পত্র আমি আজো আব্বার হাতে পৌছাতে পারিনি। আমরা ৯ ভাই ১ বোন, আমি সকলের ছোট, কিশোর বয়সেই পিতাকে হারিয়েছি। আমার আপন সহোদর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৮ জন। মিয়াভাই ছিলেন ঢাকা মেডিকেলের প্যাথিলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং খুলনা হিরাজ বিশ্বাস সাহেবের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে সুত্রে আত্মীয়তা বাংলাদেশের সুপরিচিত দুইজন নারীর একজন পর্যন্ত পৌছে যায়। আর সেই সুত্রেই আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভারত বান্ধব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত। আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানায় আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিলে আমাকে নিয়ে যান উত্তর বঙ্গের খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা খোদা বখস্ খাঁন (রাহঃ)। আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কুরআনের তাফসীর আমাকে কুরআনের পথে নিয়ে এলো। পরিণতিতে আমাকে পৈতৃক সম্পদসহ জাগতিক অনেক কিছুই হারাতে হলো।

আল্লামা সাঈদী সন্তানের মর্যাদায় পরম স্নেহে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর লেখালেখির দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পন করলেন। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত বুকটা আমার ভরে গেলো এবং আমি তাঁকে 'আব্বা' বলেই সম্বোধন করি এবং তিনিও পরম মমতায় আমার আব্বা ডাকের সাড়া দেন। তিনি বলেন আর আমি লিখি এবং এভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হবার পরে তিনি সংযোজন- বিয়োজন করেন তারপর তা পুস্তকাকারে ছাপা হয়।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমার আরেক ভাই মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান, আমার ঢাকার বাসায় তিনি যখন জীবনের প্রথম এলেন তখন আমি তিন সন্তানের পিতা। কখনোই তিনি আমার সন্তানদের দেখেননি। তাঁকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে বিস্মিত হলেও পরক্ষণেই আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে আল্লামা সাঈদীর কাছে নিয়ে চলো, আমি তাঁর হাতে হাত রেখে তওবা পড়বো'। আমি তাঁকে জানালাম, 'জীবনের প্রথম আপনি আপনার ছোট ভাইয়ের সন্তানদের দেখছেন, কিছু দিন আমার বাসায় থেকে যান। তাছাড়া আব্বা (আল্লামা সাঈদী) বর্তমানে খুলনায় আছেন।

দুইদিন পরেই আসবেন তখন আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো'। দেখলাম আমার ভাইয়ের চোখ দু'টো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার হাত দিয়ে সাঈদী সাহেবের পবিত্র হাত অনেকবার স্পর্শ করেছো। আমি তোমার হাতে হাত রেখেই তওবা পড়ি'। তাঁর মনের অবস্থা অনুভব করে আমি রাজী হলাম, কিন্তু তখনো আমি জানি না আমার ভাইয়ের তাকদীরের অদৃশ্য পৃষ্ঠায় কি লেখা রয়েছে। পরের দিন আমার ভাই বুকে হাত দিয়ে আমার বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। দ্রুত তাঁকে আমি ঢাকা- সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে আব্বাকে মোবাইলে সংবাদ জানিয়ে দোয়ার আবেদন করলাম, তিনি জানালেন আগামী কালই তিনি ঢাকা আসছেন। কিন্তু ততক্ষণে সবশেষ, আমার ভাই আমার হাতের ওপর মাথা রেখে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আল্লামা সাঈদীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ তাঁর হলো না।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ আমার আরেক ভাই। আমার সম্মুখে তিনি আল্লামা সাঈদী সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন। গত মার্চ মাসে পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত দেশবাসীর কাছে দোয়ার আবেদন করেছেন। আমি সাথে সাথে তাঁকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু চিকিৎসকরা আমাকে জানিয়ে দিলো, আর ১০/১২ দিন জীবিত থাকতে পারে, বিদেশে নিয়ে লাভ হবে না। তবুও আমি বিদেশে নেয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। ২০/০৩/২০১১ তারিখে তিনি আমাকে দিয়ে আল্লামা সাঈদীর উদ্দেশ্যে পত্র লেখালেন। রোগাক্লান্ত কণ্ঠে তিনি বারবার আমাকে অনুরোধ করলেন, 'তুমি আব্বার কাছে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো'। ২২/০৩/২০১১ তারিখ দিনগত রাত তিনটা ৪৪ মিনিটে তিনি আমার কোলের ওপর মাথা রেখেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করলেন। শতাব্দীর জঘন্য মিথ্যাচারে জড়িয়ে আব্বাকে কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী রাখা হয়েছে। আমার ভাই তাঁর সাক্ষাৎ পাননি। এরপর চলতি বছরেই নিকটাত্মীয়দের মধ্যে আরো তিনজন ইন্তেকাল করলেন। শোক আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো।

সর্বোপরি আব্বার অভাব আমাকে এক মহাশূন্যতায় নিক্ষেপ করেছে। আমি কাকে আব্বা বলে ডাকবো আর কে আমার আব্বা ডাকের মমতাভরে সাড়া দিবেন! কে আমাকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখবেন! বাসায় আমার সন্তানরা দাদার জন্যে কাঁদে, আমার ভাই রাফীক সাঈদী, শামীম সাঈদী, মাসুদ সাঈদী ও নাসিম সাঈদীর কাছে ফোন করলেই কান্না অথবা বিষন্ন কণ্ঠ শুনতে পাই। ইতোমধ্যে দাদী (আল্লামা সাঈদীর মা) ইন্তেকাল করলেন। নতুন কোনো বই ছাপা হলে আমি যখন বইটি এনে আব্বার হাতে তুলে দিতাম, বইটি তিনি হাতে নিয়েই বলতেন, 'সর্বপ্রথমে আমি বইটি আমার দোয়ার পাওয়ার হাউজকে' দেখিয়ে আনি'। আব্বা তাঁর মমতাময়ী মা'কে দোয়ার পাওয়ার হাউজ বলে সম্বোধন করতেন। এখন আমি 'সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন' গ্রন্থটি ছাপিয়ে কার হাতে তুলে দিবো? যে দুইজন সম্মানিত মানুষের হাতে সর্বপ্রথমে বইটি তুলে দেই তাঁদের একজন কল্পিত অভিযোগে পাষাণ কারাগারে বন্দী আরেকজন তাঁরই গর্ভধারিণী মা মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে।

এসব নানাবিধ কারণে আমি বইটির কাজ করতে পারিনি। মক্কায় পবিত্র কা'বা শরীফের দরোজা (মুলতাজিম) ধরে আব্বা আর আমি পবিত্র কুরআনের তাফসীর লেখা যেনো শেষ করতে পারি, এ আবেদন মহান মালিকের কাছে জানিয়েছিলাম। আব্বার অনুপস্থিতির কারণে ঐ মহান কাজটিও এগিয়ে নিতে পারছি না। অবশেষে অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখেই 'সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ছাপাতে হলো। আব্বা বিগত ৪০ বছরব্যাপী যে আলোচনা করেছেন আমরা তা অনুসন্ধান করছি। নবী করীম (সা:) সম্পর্কে যা কিছু পাবো তা দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজন করবো ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থের কোথাও যে কোনো ধরনের ভুল যদি থেকে থাকে তাহলে এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার- অবশ্যই আব্বার নয়। কারণ পাণ্ডুলিপি ছাপার পূর্বে তিনি শেষ বারের মতো দেখার সুযোগ পাননি। ভুল-ভ্রান্তি কারো চোখে ধরা পড়লে তা প্রকাশকের ঠিকানায় জানানোর অনুরোধ করছি এবং সেই সাথে সকলের কাছে আব্বার মুক্তি, সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াতের জন্য দোয়া ভিক্ষা চাইছি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের প্রতি তাঁর অসীম রহমত নাযিল করুন।

আব্দুস সালাম মিতুল
mitul.global@gmail.com

আলোচিত বিষয়সমূহ	যে পৃষ্ঠায় পাবেন

আলোচিত বিষয়সমূহ	যে পৃষ্ঠায় পাবেন

আলোচিত বিষয়সমূহ	যে পৃষ্ঠায় পাবেন

মাসজিদে নববীর চত্বরে বিদ্যুৎচালিত বিশাল আকৃতির ছাতা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং হাদীসে মহান নবী-রাসূল সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের পূর্বে মানুষকে সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলো, আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার মাধ্যম কি? মানুষ হিসেবে আমাদের যে জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান কি আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করে?

এই প্রশ্নের সঠিক এবং একমাত্র জবাব হলো, না। মানুষের জ্ঞান অসীম নয় বরং সসীম এবং এ সসীম জ্ঞান মানুষকে সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান মানুষকে অনিবার্যভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে। মানুষের দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শ্রবণশক্তি, অনুভবশক্তি, উপলব্ধিবোধ, চিন্তাশক্তি, বাকশক্তি, দৈহিকশক্তি তথা সকল শক্তিই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন মানুষ রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়, এক পর্যায়ে মানুষ দেখে দু'পাশের রেল লাইন যেন এক হয়ে গিয়েছে। রেল লাইন আর দু'টো নেই একত্রে মিশে গেছে। আকাশের প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় আকাশ অনেক দূরে গিয়ে পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে গেছে। বিশাল জলধী সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় শুধু পানি আর পানি। ওপার দেখা যায় না। ওপারে যে বৃক্ষ-তরুলতার অস্তিত্ব রয়েছে, জনপদ রয়েছে, দৃষ্টিশক্তি তা দর্শন করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং মানুষের দৃষ্টিশক্তি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়।

মানুষের শ্রবণশক্তির অবস্থা আরো শোচনীয়। একত্রে পাঁচজন মানুষ যদি কোনো শব্দ শোনে, পাঁচজন পাঁচ ধরনের মন্তব্য করে। প্রকৃত যে কিসের শব্দ তা আড়াল থেকে অনুভব করা বড় কঠিন। মানুষের শ্রবণ শক্তিও মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। মানুষের ত্বক যা দিয়ে মানুষ স্পর্শ অনুভব করে, ত্বকও মানুষকে প্রকৃত সত্য অবগত করতে ব্যর্থ হয়। আড়াল থেকে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ স্পর্শ করলে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় চোখে না দেখে বলতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) এর যুগের একটি ঘটনা, হযরত যাহের (রাঃ) নামক একজন বেদুঈন সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সাঃ) কে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তিনি মাঝে মধ্যেই রাসূল (সাঃ) এর জন্য উপহার সামগ্রী প্রেরণ করতেন। একদিন তিনি তাঁর এলাকা থেকে পণ্যসামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে মদীনা শহরের বাজারে এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করছেন, এমন সময় নবী করীম (সাঃ) তাঁর পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে নিজের বুকের মাঝে জাপটে ধরলেন। হযরত যাহের (রাঃ) দেখতে পাননি কে তাঁকে জাপটে ধরেছে। তিনি একটু কঠিন স্বরেই বললেন, 'এই কে? ছেড়ে দাও বলছি'। তারপর দেখলেন যাঁর স্পর্শ পেলে সমগ্র জগৎ ধন্য হয়, সেই তাঁরই পবিত্র দু'টো বাহু তাঁর মতো মানুষকে নিজ বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছেন। তখন তিনি নিজের শরীরটা আরো ঘনিষ্ঠভাবে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র দেহ মুবারকের সাথে মিশিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কৌতুক করে লোকজনকে বললেন, 'তোমরা কি কেউ এই গোলামটি কিনবে?'

হযরত যাহের (রাঃ) কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার মতো মূল্যহীন গোলামকে যে কিনবে সেই ঠগবে'।

নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে তোমার মূল্য কিন্তু অনেক বেশি'। (সীরাত উন্ নবী)

হযরত যাহের (রাঃ) যদি অনুভব করতে পারতেন যে, তাঁকে যিনি অনুগ্রহ করে জড়িয়ে ধরেছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার হাবীব। তাহলে তিনি অমন করে, 'এই কে, ছেড়ে দাও বলছি' বলতেন না। অর্থাৎ দেখা গেল, মানুষের অনুভব শক্তি তথা ত্বক মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত মহান নবী-রাসূল ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ মানব জাতির সম্মুখে উন্মুক্ত নেই। ঠিক এ কারণেই মহান মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে সর্বপ্রথমে যাঁকে প্রেরণ করলেন তাঁকে নবুয়্যাত দান করেই প্রেরণ করলেন এবং যেখানে

পাঠালেন সেখানে যে সকল বস্তু রয়েছে তার নাম ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কিত জ্ঞানও তাঁকে দান করলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে—

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا—

আল্লাহ্ তা'য়ালা অত:পর (তাঁর খলীফা) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। (সূরা আল বাকারা-৩১)

পৃথিবীতে আগমন করে তিনি কিভাবে কোন্ বিধান অনুসরণে জীবন পরিচালিত করে শান্তি, কল্যাণ, সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করবেন সে দিকনির্দেশনাও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এভাবে দিয়ে দিলেন—

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيعاًج فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ—

আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে অবশ্যই সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) হিদায়াত আসবে, অত:পর যে আমার (সেই) বিধান মেনে চলবে তার কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো প্রকার উৎকণ্ঠিতও হতে হবে না। (সূরা আল বাকারা-৩৮)

সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রথম মানুষটিকে জানিয়ে দিলেন তাঁর পক্ষ থেকে তিনি জীবন বিধান সম্পর্কিত হিদায়াত প্রেরণ করবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে তিনি পৃথকভাবে হিদায়াত প্রেরণ করবেন এটি তাঁর নিয়ম নয় এবং বিষয়টি যৌক্তিকও নয়। এ জন্যে মানব জাতির মধ্য থেকেই নবী-রাসূল নির্বাচিত করেন তথা নবুয়্যাত- রিসালাত দান করে তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে নবুয়্যাত ও রিসালাত কি জিনিস এবং এ দু'টো জিনিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। এ দুটো জিনিসের দায়িত্ব কর্তব্যই বা কি এবং সম্মান-মর্যাদাই বা কি। এ বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার এই আয়াতের বক্তব্য জানতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন—

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ أُوتُوْهُ مِنم بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَام بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِه ط وَاللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ—

(এক সময়) সকল মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভূক্ত ছিলো (পরে এরা নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো)। তখন আল্লাহ তা'য়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর অপরাধিদের জন্যে শাস্তির সতর্ককারী হিসাবে নবীদের পাঠালেন, তিনি সত্যসহ গ্রন্থও অবতীর্ণ করলেন, যেনো তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করে; তাদের কাছে সুস্পষ্ট হিদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক (বিদ্রোহ ও) বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে মতবিরোধ করেছে, অতপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতোপূর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো; আল্লাহ যাকে চান তাকে সঠিক পথ দেখান। (সূরা বাকারাহ-২১৩)

তাফসীরকারগণ পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত সম্পর্কে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন; মানুষ সৃষ্টির শুরুতে সত্য পথ অনুসরণ করে চলছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তারা দলাদলি সৃষ্টি করে বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই মানব সভ্যতায় এক বিশৃংখল অবস্থার উদ্ভব হয়। এই মতভেদের কারণেই মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে ছিটকে পড়ে, ক্রমশঃ সত্য তিরোহিত হয়ে যায়। মানুষ ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে থাকে।

সত্য তিরোহিত হবার কারণে মানুষের মধ্যে চরম হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, মানুষ আত্মস্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা সত্য অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে। বিশৃংখলতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথ পরিহার করে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানান, মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন, যারা সত্য গ্রহণ না করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে থাকে তাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী– রাসূলের কাছে এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেন, যে কিতাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিহিত রয়েছে। মানুষ যে সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে, পরস্পরে দলাদলি করছে, যে বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য করছে, এ সকল কিছুর সমাধান এই কিতাবে রয়েছে। এই কিতাব সকল সমস্যার সমাধানকারী এবং মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনকারী। এই কিতাব ব্যতীত অন্য কোথাও সত্যের সামান্য চিহ্ন মাত্র নেই। সব সমস্যার সমাধান করার জন্যই এই কিতাব মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে মানুষের কাছে সত্য প্রেরণ করার পরে এবং তাদের সামনে মহাসত্য উদ্ভাসিত হবার পরেও এই মানুষ মতভেদে নিমজ্জিত এবং সত্যের বাহকদের প্রতি অবাঞ্ছিত আচরণে লিপ্ত ছিল। আর এ কারণেই সত্যের প্রতি যারা অনুরাগী, তারাই কেবল আল্লাহ

তা'য়ালার অনুগ্রহে সত্য গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। কারণ, কোনো মানুষের যদি সত্য গ্রহণ করার মন-মানসিকতা আদৌ না থাকে, সত্য গ্রহণ করতে সে যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে তার পক্ষে সত্য পথের পথিক হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহান আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তিকেই সত্য গ্রহণে সহযোগিতা করেন, যারা সত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যারা মিথ্যা বা বিশৃংখলা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে আগ্রহী, তাদেরকেই আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে থাকেন।

সূরা আল বাকারার উক্ত আয়াত থেকে আমরা নবী-রাসূল প্রেরণের পটভূমি জানতে পারি, সেই সাথে আমরা জানতে পারলাম মানুষ শুরুতে সত্য পথের পথিক ছিল। পরবর্তীতে তারা কেনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সেটাও জানা গেল এবং কোন্ শ্রেণীর মানুষের হিদায়াত নছীব হয়, কারা সত্য পথের পথিক হতে সক্ষম তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকে জানতে পারলাম।

এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ) এর মধ্যে সময়ের দশটি অধ্যায়ের ব্যবধান রয়েছে। প্রথমে মানুষ সত্য পথের পথিক ছিল। পরবর্তীতে তাদের ভেতরে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর তারপরই মহান আল্লাহ্ হযরত নূহ (আঃ) ও অন্যান্য নবী প্রেরণ করেন'।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো অজুহাত প্রদর্শন করা। মহান আল্লাহ্ মানুষকে যখন তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তখন তো মানুষ এই অজুহাত দাঁড় করবে, 'হে আল্লাহ! আমরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইনি। এ কারণে আমরা ভুল পথের পথিক ছিলাম'। এ ধরণের নানা যুক্তি আল্লাহর সামনে তারা পেশ করবে। সুতরাং মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী প্রেরণ করে তাদের কাছে সত্য প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌم بَعْدَ الرُّسُلِ ط
وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا–

রাসূলরা (ছিলো জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্ তা'য়ালার ওপর মানব জাতির কেনো অজুহাত দাঁড় করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ্ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিছা-১৬৫)

এই পৃথিবীতে নবী–রাসূলগণ আগমন করেন সকল মানুষের মুক্তিদাতা (The Salvationist) হিসেবে। তাঁরা সাথে করে জ্ঞানভান্ডার নিয়ে আসেন। মানুষকে তাঁরা

মূর্খতার অন্ধকার হতে মহাসত্যের দিকে নিয়ে আসেন এবং আলোর পথের পথিক করেন। বস্তুত মহাসত্যের ধর্মই হলো, তাঁর অনুসারীকে অন্ধকার হতে আলোর জগতে আনয়ন করা। মহাসত্যের বাহক হযরত মূসা (আ:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِلا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ ط إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ–

আমি মূসাকে অবশ্যই নিদর্শনসমূহ দিয়ে (তার জাতির কাছে) পাঠিয়েছি, আমি আদেশ দিয়েছিলাম, তুমি বের করে নিয়ে এসো তোমার জাতিকে (মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (মহাসত্যের) আলোতে এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা স্মরণ করাও; যারা একান্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তাদের জন্যে এ (ঘটনার) মাঝে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ইবরাহীম-৫)

নবুয়্যাত এবং রিসালাত চেষ্টা-সাধনা করে লাভ করার কোনো জিনিস নয়। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এটা একটি শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে এই নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাকে যোগ্য বিবেচনা করেছেন তাঁকেই তিনি নবুয়্যাত দান করেছেন। পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্ব বলতে যা বুঝে, অর্থাৎ যত কঠিন দায়িত্ব এই পৃথিবীতে থাকতে পারে, এর মধ্যে নবুয়্যাতের দায়িত্ব হলো সবচেয়ে কঠিন। সাধারণ কোনো মানুষ এই দায়িত্ব এবং এর পরিধি সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারে না।

যে কোনো মানুষের পক্ষে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে মহান আল্লাহ্ এই দায়িত্ব যার ওপরে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে তাঁর মাতৃগর্ভ থেকেই উপযুক্ত করে গড়েছিলেন। এই দায়িত্ব যে কত কঠিন নবী করীম (সা:) কে মহান আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً–

অচিরেই আমি আপনার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ বাণী সদৃশ) কিছু রাখতে যাচ্ছি। (সূরা মুয্যাম্মিল-৫)

দায়িত্ব যিনি অর্পণ করেন সেই আল্লাহ্ই বলেছেন, এই দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। উল্লেখিত আয়াতে এই দুর্বহ দায়িত্বের কথা তিনি তাঁর নবীকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। নবুয়্যাত এবং রেসালাত চেষ্টা-সাধনা করে লাভ করার কোনো জিনিস নয়। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে এটা একটি শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে এই নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ যাকে যোগ্য বিবেচনা করেছেন তাঁকেই তিনি নবুয়্যাত দান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ–

আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর অনুগ্রহে বিশেষভাবে বেছে নেন; আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা-১০৫)

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ–

(রাসূল পাঠানো) এটা আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তা'য়ালা মহা অনুগ্রহশীল। (সূরা আল জুমুয়া-৪)

নবুয়্যাত এবং রিসালাত বংশগতভাবে বা উত্তরাধিকার সূত্রেও লাভ করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে পছন্দ করেছেন, তাঁকেই তিনি নবী বা রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلآئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌم بَصِيْرٌ–

আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর ওহী বহন করার জন্যে) ফিরিশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর (তিনি এটা করেন) অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। (সূরা হজ্জ্ব-৭৫)

মহান আল্লাহর বাছাই নীতি সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানে ঘোষণা করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَّآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ–

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্ব করার জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান-৩৩)

মহান আল্লাহর দেয়া এই নবুয়্যাতের দায়িত্ব যেমন কঠিন তেমনি এই দায়িত্ব যিনি লাভ করেছিলেন তাঁর সম্মান-মর্যাদা পৃথিবীতে সকলের তুলনায় সর্বোচ্চে। নবী করীম (সা:)-এর বিরোধিরা যতগুলো কারণে তাঁর বিরোধিতা করতো তাঁর মধ্যে এটাও একটি কারণ ছিল যে, এই দায়িত্ব লাভ করা অত্যন্ত সম্মান-মর্যাদার ব্যাপার। এই দায়িত্ব লাভ করবে সমকালীন দেশ-সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ। আব্দুল্লাহর ইয়াতিম সন্তান মুহাম্মাদ (সা:) এই দায়িত্ব কিছুতেই লাভ করতে পারে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়েও তারা বিরোধিতা করতো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের চিন্তা চেতনা এবং পছন্দ অনুসারে তাঁর নবুয়্যাত-রিসালাত বন্টন করেন না। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি বলেন–

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ط

আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর নবুয়্যাত তিনি কোথায় রাখবেন। (সূরা আনয়াম-১২৪)

এই পৃথিবীতে বিশাল ক্ষমতা লাভ করা, বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া বা বংশের দিক দিয়ে উচ্চ বংশীয় হওয়া, আর নবুয়্যাত বা রিসালাত পাওয়া এক কথা নয়। এ সবের সাথে নবী বা রাসূল নির্বাচিত হওয়ার দূরতম সম্পর্কও নেই। রিসালাত লাভ করা বা নবুয়্যাত লাভ করার জন্য যে চরিত্র বা গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল, এসব গুণাবলীর মধ্যে ধন-ঐশ্বর্য থাকতে হবে এমন কোনো শর্ত কখনোই ছিল না। নবুয়্যাত বা রিসালাত একান্তভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান বিশেষ। তিনি এ জন্য যাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁকেই তিনি তা অর্পণ করেছিলেন।

মানুষের কামনা-বাসনা বা চাহিদা অনুযায়ী নবী বা রাসূল নির্বাচিত করা হয়নি। নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে ইসলাম বিরোধিরা দাবী করতো, নবী হলে হতে পারে মক্কার ঐশ্বর্যশালী নেতৃবৃন্দ বা তায়েফের ধনাঢ্য নেতারা। অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিল, নবী হবার গুণাবলীর মধ্য এটাও অনিবার্যভাবে অন্যতম গুণাবলী যে, তাদেরকে ধনাঢ্য এবং সমাজের নেতা হতে হবে। মহান আল্লাহর নীতি তাদের ধারণার বিপরীত। নবুয়্যাত বা রিসালাতের সাথে ধন-ঐশ্বর্য, রাজত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের আদৌ কোনো সাদৃশ্য নেই। এদু'টো দিকের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিরাজমান।

নবুয়্যাত বা রিসালাত আধুনিক যুগের পীরবাদ বা মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের মত বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত বা বন্টিত হয়নি। এই মহানিয়ামত উত্তরাধিকার সূত্রেও লাভ করা যায়নি। নবীর সন্তান শুধু এ কারণে নবী হতে পারেননি যে, তিনি নবীর সন্তান। নবীর সন্তান হলেও তিনি নবী হতে পারেন না। হযরত নূহ (আঃ) এর সন্তান নবী হতে পারেনি। কারণ তার মধ্যে সে গুণাবলী ছিল না। দু'তিনজন নবীর সন্তান নবী হয়েছেন, কেননা তাদের মধ্যে নবী হবার অনুরূপ গুণাবলী বর্তমান ছিল এবং তদানীন্তন যুগেরও দাবী ছিল একজন নবী বর্তমান থাকা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সে প্রয়োজন পূরণের জন্য কোনো কোনো নবীর সন্তানকেও নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

যে সকল নবীর সন্তানকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সে সন্তান কোন্ ধরণের গুণাবলী সম্বলিত ছিলেন, তা আমরা তাদের জীবনের দিকে তাকালেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। কিশোর সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে নিয়ে গেলেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) একজন নবীর মতই আচরণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর এলাকার জন্য একজন নবীর প্রয়োজনও ছিল।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার নীতি হলো, তিনি নবুয়্যাত এবং রিসালাত এমন কোনো ব্যক্তিকে দান করেননি, যে ব্যক্তির মধ্যে মুমিনসুলভ গুণাবলী ছিল না। অর্থাৎ কোনো কাফির ব্যক্তিকে তিনি নবুয়্যাত এবং রিসালাত দান করেননি। কিন্তু তিনি ধন ঐশ্বর্য কাফিরকেও দান করেন আবার মুমিনকেও দান করেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা বা বাদশাহীও তিনি কোনো কাফির বা তাঁর কোনো অবাধ্য বান্দাহকে দান করে থাকেন। কিন্তু নবুয়্যাত এবং রিসালাত সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। নবুয়্যাত এবং রিসালাতের যখন প্রয়োজন ছিল তখন তিনি তা দান করেছেন এমন এক ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তদানীন্তন পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেছেন এবং সকল মানুষের তুলনায় সকল দিক দিয়ে সর্বোত্তম ছিলেন।

হযরত মূসা (আ:) কে যখন মহান আল্লাহ নবী হিসেবে নির্বাচিত করলেন, তখন ফিরাউন দম্ভভরে তার জাতিকে বলেছিল–

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِى ج أَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ ط أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هذَا الَّذِى هُوَ مَهِيْنٌ لا وَلاَ يَكَادُ يُبِيْنُ–

(একদিন) ফিরাউন তার জাতিকে ডাকলো এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো), মিসরের রাজত্ব আমার জন্যে নয়? এ নদীগুলো কি আমার (প্রাসাদের) নীচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না? আমি কি সে ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) নীচু (জাতের লোক) এবং সে তো (নিজের) কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না'। (সূরা যুখরুফ-৫১-৫২)

ফিরাউন তার এই কথা দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে প্রমাণ দিতে চেয়েছে। সে বলেছে, সমস্ত বাদশাহী আমার এবং সকল কিছুই আমার অধীন। আমি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। আমি ধনাঢ্য রাজবংশের সম্মানিত সন্তান। আর মূসার বংশ রাজবংশ নয়, আমার থেকে নীচ। সে বাগ্মী নয় এবং নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলায় সক্ষম নয়। সুতরাং সে ব্যক্তি কিছুতেই আমার চেয়ে উচ্চ হতে পারে না। হযরত মূসা (আ:) যখন তাঁর ওপরে অর্পিত নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন শুরু করেছিলেন তখন ফিরাউন এসব কথা বলেছিল। অর্থাৎ তাঁর ধারণা ছিল, নবী হবে কোনো অসীম ক্ষমতাশালী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি।

হযরত ইবরাহীম (আ:) এর সময়ে নমরুদও এই ক্ষমতার বড়াই করেছিল। সে বলেছিল, আমি ইচ্ছা করলে কাউকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি এবং ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে কাউকে জীবিত ছেড়ে দিতে পারি। অর্থাৎ সে তার রাষ্ট্র ক্ষমতার গর্ব করেছিল। সকল ক্ষমতা যখন তারই হাতে তাহলে তো তারই নবী হবার কথা। তা না

হয়ে তারই অনুগত এক কর্মচারীর সন্তান যার কোনো ধন সম্পদ নেই, সে হবে নবী এটা কি করে গ্রহণ করা যায়?

নবুয়্যাত এবং রিসালাতের প্রয়োজন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ মহান আল্লাহর যে নীতি ছিল, তাহলো তিনি কোনো মহিলাকে এই কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেননি। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে কঠিন ত্যাগ তিতীক্ষা ও সংগ্রাম করতে হয় তা সৃষ্টিগতভাবে নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের শারীরিক গঠন এই দায়িত্ব পালনের উপযোগী নয়। এই কারণে তাদেরকে নবী বা রাসূল নির্বাচিত করা হয়নি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى ط

(হে মুহাম্মাদ স.) আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছিলাম, তারা সকলেই (আপনার মতো পুরুষ) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী প্রেরণ করতাম। (সূরা ইউসুফ–১০৯)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ لا

(হে নবী,) আমি আপনার পূর্বেও (এ) মানুষদের মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি, যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি। অতএব যদি তোমরা না জানো তাহলে কিতাবধারীদের জিজ্ঞেস করো। (সূরা নাহ্ল–৪৩)

নবুয়্যাত এবং রিসালাতের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিশাল বিস্তীর্ণ। এর সামনে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর আন্দোলন একান্তই ভিত্তিগত এবং মৌলিক এবং একান্তভাবেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান গ্রহণের, আল্লাহর দাসত্ব বরণের, আলমে আখিরাতের ওপরে ঐকান্তিক দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের। এর আহ্বান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করার এবং এই পৃথিবীর জীবনের তুলনায় পরকালের জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার।

সুতরাং পৃথিবীর কোনো ক্ষমতাশালী শাসক বা বাদশাহকে নবী-রাসূল হতে হবে বিষয়টি এমন ছিলো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে তা করতে পারতেন। যেমন করেছিলেন হযরত দাউদ ও তাঁর সন্তান হযরত সুলাইমান (আ:) কে। তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীও ছিলেন এবং বাদশাহও ছিলেন। নবী করীম (সা:) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই নবী

করীম (সাঃ) রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছিলেন। এই রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমেই তিনি আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত বিধান পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন।

কেনো নবুয়্যাতের প্রয়োজন?

পৃথিবীর একজন বিজ্ঞানী একটি জটিল যন্ত্র প্রস্তুত করলেন। তারপর তা বিশ্ব বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারজাত করলেন। অসংখ্য মানুষ তা ক্রয় করে বাড়িতে এনে দেখলো এই যন্ত্রের ভেতরে (Operating Guide) অপারেটিং গাইড নেই। যে বিজ্ঞানী উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন তিনি কাউকেই উক্ত যন্ত্র পরিচালনা করা শিখাননি বা যন্ত্রের সাথে কোনো Operating Guide দেননি। তখন বাধ্য হয়েই ক্রেতা সাধারণ যে কোম্পানীর কাছ থেকে যন্ত্র ক্রয় করেছে সে কোম্পানীর কাছে ধর্ণা দেবে। কোম্পানী ধর্ণা দেবে যন্ত্রের প্রস্তুত কর্তার কাছে। অর্থাৎ যন্ত্রের আবিষ্কারকের দায়িত্ব হলো Operating Guide যন্ত্রের সাথে দিয়ে দেয়া।

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানুষ প্রেরণ করেছেন। এই মানুষকে সহজ সরল ও সত্য পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর। মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ط

আল্লাহ তা'য়ালার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে (অন্য পথের) মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-৯)

কেননা মহান আল্লাহ হলেন মানুষের রব বা প্রতিপালক। মানুষের জীবনের যতগুলো দিক রয়েছে, সকল দিকের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার। পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা এবং চলার বহু ধরনের পথ অবলম্বন করা সম্ভব এবং বাস্ত বে তার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ সকল পথের সবগুলো পথ কোনক্রমেই সত্য বা সহজ-সরল হতে পারে না। পারে মাত্র একটি পথ। আর একমাত্র সঠিক এবং সহজ সরল ও নির্ভুল জীবন দর্শন তাই হতে পারে যা সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, সত্য পথ কোনটি তা অনুসন্ধান করে বের করা।

এই বিষয়টি মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাঁর জীবন ধারণের জন্য এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রয়োজন হবে, মহান আল্লাহ তাকে প্রেরণের পূর্বেই এখানে প্রস্তুত করে রেখেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তু মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য। কিন্তু এসব বস্তু মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার, তা পূরণ করতে পারে না। এই জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি মানুষের পূরণ না হয় তাহলে মানুষের সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বে মানুষের জীবন ধারণের জন্য সকল কিছুর আয়োজন করে রেখেছেন, সেই আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন যে জীবন ব্যবস্থার, সেই জীবন ব্যবস্থা দান করবেন না এটা কিভাবে চিন্তা করা যায়? কোনো বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এটা তো কল্পনাও করতে পারেন না। মহান আল্লাহ মানুষের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর নবুয়্যাত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

এখন কোনো মানুষ যদি গোটা নবুয়্যাত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে আগ্রহী হয় তা সে হতে পারে এবং সে স্বাধীনতা তার রয়েছে। সেই সাথে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চায়, নবুয়্যাত ব্যবস্থা অস্বীকার করার পরে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আর কি ব্যবস্থা করেছেন, তা দয়া করে জানিয়ে দিতে হবে। তিনি হয়ত এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন, সত্য পথ অনুসন্ধান করার জন্যই তো মহান আল্লাহ তাঁর সেরা সৃষ্টি এই মানুষকে জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি দান করেছেন।

আমরা আবারো তাকে বিনয়ের সাথে জানাতে চাই, সত্য সহজ সরল পথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার প্রমাণ হলো, মানুষ ইতোমধ্যেই তার চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে বহু পথ ও মত আবিষ্কার করেছে। তারপরেও মানুষ আল্লাহর প্রতি এ অভিযোগ করতে পারে না যে, তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেননি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের জন্য সকল কিছুর ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে করেছেন, কিন্তু আমরা কোন্ জীবন দর্শন অনুসরণ করবো তা তিনি আমাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করেননি। এই অভিযোগ মহান আল্লাহর প্রতি করার কোনো অবকাশ তিনি মানুষের জন্য রাখেননি।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টির পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা তার জন্মের সাথে সাথেই করেছেন। কেবল মাত্র ব্যতিক্রম হলো মানুষ। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি জ্ঞান এবং স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করা, যে সৃষ্টি তার নিজের খেয়াল খুশী অনুসারে নির্ভুল অথবা ভুল যে কোনো পথ গ্রহণ করতে পারে। জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। মানুষের এই স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য মানুষকে জ্ঞান নামক হাতিয়ার দান করা হয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধি এবং চিন্তার জগৎ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

মানুষের মধ্যে ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণের শক্তি দান করা হয়েছে। মানুষ যেন তার ভেতরের এবং এই পৃথিবীর বস্তু নিচয় ব্যবহার করতে পারে এমন শক্তি ও জ্ঞান দান করা হয়েছে। সেই সাথে তার মনের জগতে এবং তার দেহের বাইরের জগতে এমন সব বস্তু রাখা হয়েছে, এসব কিছু তার সত্য পথ গ্রহণের ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারে

আবার ভুল পথ গ্রহণের ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী এবং বস্তুর ন্যায় মানুষকে জন্মগতভাবে জীবন ব্যবস্থা অবলম্বনকারী হিসেবে সৃষ্টি করে দিলে সৃষ্টির সকল কিছুই অর্থহীন হয়ে যেত।

অন্যান্য বস্তুর মতো মানুষের যদি স্বাধীন ক্ষমতা না থাকতো, তাহলে মানুষের পক্ষে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। এ কারণে মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে জীবন ব্যবস্থা অনুসরণকারী হিসেবে সৃষ্টি না করে এমন স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষের জন্য সত্য পথ প্রদর্শনকারীর প্রয়োজন হয়। এখানেই প্রয়োজন হয় নবুয়্যাত এবং রিসালাতের। এই জিনিস মানুষ গ্রহণ করে সত্য পথও অবলম্বন করতে পারে এবং তার স্বাধীনতাও বজায় থাকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রতি এতই অনুগ্রহশীল যে, তিনি পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্যও পথ নির্দেশ দান করেছেন।

মানুষ মরুপথে চলবে, সে যেন পথ হারিয়ে না ফেলে এ জন্য আকাশে তারকা সৃষ্টি করে তাকে পথের সন্ধান দান করেছেন। মরুপথে এবং পানি পথে মানুষ দিক ঠিক রাখে আকাশের তারকা দেখে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁর মহান অনুগ্রহের কথা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পাহাড়ী এলাকা দিয়ে মানুষ পথ চলবে সে কারণে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর জন্য পাহাড়ী এলাকায় চলার পথ সৃষ্টি করেছেন। মরুপ্রান্তরে মানুষ যেন পানির তৃষ্ণায় ইন্তেকাল না করে, একারণে মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে জলাশয় সৃষ্টি করেছেন। এমন ধরনের কতিপয় গাছ সৃষ্টি করেছেন যে গাছের ভেতর থেকে মানুষ পানি লাভ করতে পারে।

মরুভূমিতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর জন্য নানা ধরনের খাদ্য মওজুদ রেখেছেন। পাহাড়ে ঝর্ণা সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহর পানির অভাব দূর করেছেন। এতসব ব্যবস্থা যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য করেছেন সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহর জন্য পৃথিবীতে কোনো জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণ করবেন না, এটা কি মেনে নেয়া যায়? বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে বা সাগর বক্ষে তাঁর বান্দাহ যেন পথ হারিয়ে না যায়, এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা আকাশে তারকা প্রজ্জ্বলিত করেছেন, অথচ এই পৃথিবী নামক অন্ধকার গ্রহে তিনি মহাসত্যের তারকা প্রজ্জ্বলিত করবেন না এটা কি সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে?

মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি বস্তু এবং প্রাণীর আকৃতি দান করেছেন এবং সকল বস্তুকে তিনিই পথ প্রদর্শন করে থাকেন। পথ প্রদর্শনের এই দায়িত্ব একান্তভাবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের ক্ষমতায় রেখেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু এবং প্রাণীকে তার অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে পথ প্রদর্শন করছেন। মহান

আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বব্যাপী পথ নির্দেশকের মর্যাদার অপরিহার্য দাবী হলো এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের পথ প্রদর্শনের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না, যে পদ্ধতি পশু পাখির জন্য নির্ধারিত। যে পদ্ধতি প্রাণী জগতের জন্য উপযোগী সে পদ্ধতি তিনি মানুষের জন্য অবলম্বন করেননি। তিনি মানুষের জন্য উপযোগী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এই মানুষের ভেতর থেকেই একজনকে নবী বা রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁর মাধ্যমে পথ নির্দেশ দান করেন।

নবী এবং রাসূল মানুষের জ্ঞান বিবেক এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা শুধু এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু আছে তার স্রষ্টাই নন, তিনি সকলকিছুর পথ প্রদর্শক এবং করুণাময় শিক্ষকও বটে। তিনিই সকল সৃষ্টিকে শিক্ষা দান করে থাকেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরে মানব শিশুকে অনুগ্রহ করে তিনিই শিক্ষা দান করেন, 'তোমার গর্ভধারিণীর বুকে আমি তোমার উপযোগী খাদ্য বহু পূর্বে প্রস্তুত করে রেখেছি। ওখানে মুখ দিয়ে চুষতে থাকো। উপাদেয় খাদ্য তুমি লাভ করবে'। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই শিক্ষাদান এবং পথ প্রদর্শন করেন।

নবুয়্যাত সম্পর্কিত জ্ঞান

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এ মানুষকে দিয়েই মানুষের বংশধারা বৃদ্ধি করছেন। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করছেন আবার যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করছেন। কাউকে আবার তিনি বন্ধ্যা বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ لا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا ج وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط إِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ–

আকাশমন্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র কন্যা (উভয়টাই) দান করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন; নি:সন্দেহে তিনি বেশি জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশি রাখেন। (সূরা আশ শূরা-৪৯-৫০)

এই মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসেন যখন সে মানুষের কোনো চেতনাই থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِّنم بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا لا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন এক অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা (তার) কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। (সূরা আন নাহল-৭৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোনো চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিস দান করেছি। তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি। তার শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি দান করেছি। নাক দান করেছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি দান করেছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সকলকিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সৃষ্টির সকল কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি। মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তা দান করেছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোনো কোনো যোগ্যতা কারো মধ্যে বেশি দান করেছি। আবার তা কারো মধ্যে কম দান করেছি। এভাবে ভারসাম্য রক্ষা না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হতো না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না এবং মানুষের যোগ্যতার কোনো মূল্যায়ন হতো না।

যে জিনিসের প্রয়োজন যতবেশি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন কম, সুতরাং আল্লাহ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতিয় মানুষের সংখ্যা তিনি ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ এই ধরণের মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। সুতরাং এ ধরণের দুর্লভ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই উপকৃত হতে থাকে। আবার এ মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন্ স্তরে পৌঁছে দেন তা দেখুন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ قف وَمِنْكُم مَّن يُّرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ তা'য়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দিবেন। তোমাদের কোনো ব্যক্তি (এমনও হবে যে, সে) বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে, এতে করে (কৈশোরের এবং যৌবনে কোনো বিষয়ে) জানার পর সে (পুনরায়) অজ্ঞ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান। (সূরা আন্ নাহল-৭০)

এটাই হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থা। অথচ এই মানুষকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানা ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা মানব জাতিকে দান করেছেন।

কিন্তু এসবের তুলনায় মানুষের যেটা বড় প্রয়োজন, তাহলো মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে হবে যিনি মানুষকে মহান আল্লাহর পথ প্রদর্শন করবেন। পৃথিবীর যে কোনো ধরণের বা যে কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে তাদের যোগ্যতা যেন আল্লাহ তা'য়ালার দেখানো বা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী পথে প্রকাশ হয়, সে পথ দেখানোর জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন। পৃথিবীর খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের কাজ হলো তারা পৃথিবীর ভেতরে কি কি বস্তু আছে এবং কোনটির গুণাবলী, উপকারিতা কি এবং কোনটি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারে লাভ ক্ষতি কি ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে অবগত করা।

কিন্তু সেই সাথে পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি এই মানব জাতিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিবেন, এই পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য কি। কেনো তাকে অন্য সৃষ্টি হতে পৃথক করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষকে কোন্ শক্তির দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ কার আইন-কানুন মেনে চলবে। যিনি পৃথিবীতে মানুষকে এত কিছু দান করেছেন, সেই দানকারীর ইচ্ছা কি। তিনি মানুষের কাছে কি চান। মানুষের জীবনের প্রকৃত সাফল্য কোন্ পথে আসতে পারে। ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবেন এমন ধরণের একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের এই প্রয়োজন কি পূরণ করেছেন? মানুষের শরীর চুলকানের জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের হাতে নখ দান করেছেন, এই নখ দিয়ে মানুষ অসংখ্য প্রয়োজন পূরণ করে, বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। এতটা ক্ষুদ্র বিষয় যিনি উপেক্ষা করেননি, সেই আল্লাহ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে কি করে উপেক্ষা করতে পারেন? আল্লাহ তা'য়ালা যেমন প্রতিটি কর্ম এবং

জ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য যোগ্যতা ও গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এমন মানুষও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যাদের ভেতরে আল্লাহকে চেনা-জানার সবচেয়ে উন্নত যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছিলেন। উন্নত চরিত্রের এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। এই শ্রেণীর মানুষ যারা এসেছিলেন তাঁরাই হলেন নবী-রাসূল।

পৃথিবীতে মানুষ পরিণত বয়সে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছে, জন্মগতভাবে বা শৈশবকাল থেকেই তাদের মধ্যে ভিন্ন একটি প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়েছে বা হয়। দশটি শিশুর মধ্যে যে শিশুটি পৃথিবী বিখ্যাত কবি হিসেবে বয়সকালে আত্মপ্রকাশ করবে, সেই শিশুটি আর নয়টি শিশুর থেকে ভিন্ন প্রকৃতি ও অভ্যাস নিয়ে বড় হতে থাকে। নবীদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি। তাঁরা জন্মগতভাবেই এই পৃথিবীতে ভিন্ন প্রকৃতি ও অভ্যাস নিয়ে আগমন করেন। একজন স্বভাব কবির কবিতা শুনে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই ব্যক্তি কাব্য ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য মানুষ চেষ্টা করেও তার মতো একছত্র কবিতা লিখতে পারবে না।

সুতরাং কোন্ মানুষ বয়সকালে কি ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন হবে শিশুকাল হতেই তার ভেতরে সে যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ, ব্যবহার কথাবার্তায় মানুষ অনুমান করতে পারে, আজকের এই শিশু বড় হয়ে একদিন বিখ্যাত একজন হবে। তাদের কার্যাবলীর দ্বারা মানুষ সহজেই তাকে চিনে নেয়। কারণ এ সকল মানুষ তাদের কাজের মাধ্যমে এমন অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ মানব সমাজে পেশ করেন যে, এ সকল কাজ অন্যদের দ্বারা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা নেই।

মহান আল্লাহ যে নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেন, তাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। তাদের চিন্তার জগতে এমন সব কথা এবং চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়, যা অন্য কোনো মানুষের কখনো হয় না। তিনি এমন সব কথা বলেন, অন্য মানুষ সে কথা সম্পর্কে কখনো কল্পনা করেনি। তিনি এমন বিষয় বর্ণনা করেন, যে বিষয় সম্পর্কে পৃথিবীর অন্য মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টি এমন সুক্ষ্ম বিষয়ের ভেতরে সহজেই প্রবেশ করে, যে বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যুগের পর যুগ ধরে গবেষণা করেও সমাধানে পৌঁছতে পারেননি। সাধারণ মানুষ তাঁর মতো কথা এবং কর্ম করতে ইচ্ছা করলেও পারে না।

নবীর চরিত্র ও প্রকৃতি এতই পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন যে, তিনি প্রতিটি ব্যাপারেই ভদ্রজনোচিত ও সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি কখনো ভুল কথা বলেন না।

দৃষ্টিকটু কোনো কর্ম করেন না। মানুষকে তিনি সব সময় উত্তম কথা ও কর্ম করতে আদেশ দান করেন। তিনি মানুষকে যা করতে আদেশ দান করেন প্রথমে তা নিজে করেন। তিনি মুখে যা বলেন তাঁর কাজের সাথে মিল থাকে। তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করবেন।

তিনি অন্যের ভালো করতে গিয়ে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেন। কিন্তু নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করতে গিয়ে অন্যের সামান্য ক্ষতি করেন না। তাঁর সমগ্র জীবন প্রস্তুত হয় সত্যতা, ভদ্রতা, মনের পরিচ্ছন্নতা, উত্তম চিন্তা ও উন্নত পর্যায়ের মানবতার আদর্শে। শতকোটি চোখ দিয়ে অনুসন্ধান করলেও নবীর চরিত্রে সামান্যতম দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং তিনি যা বলেন, যা করেন মানুষের উচিত তা গ্রহণ করা এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। কারণ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, নানা ধরণের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, সৃষ্টি জগতের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে নবী এবং রাসূলের প্রতিটি কথা ও কর্ম সত্য বলে প্রমাণিত।

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহ যাকে দায়িত্ব দান করেছিলেন, আল্লাহর বিধান মানুষের মধ্যে প্রচার করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে যাদেরকে মনোনীত করা হয়েছিলো, তাঁরাই ছিলেন নবী-রাসূল। এই দায়িত্বের অপর নামই হলো নবুয়্যাত বা রিসালাত। এই ধারা মহান আল্লাহ শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত শেষ হয়েছে। কারণ, তাঁর নবুয়্যাত বিশ্বজনীন এবং তিনি হলেন বিশ্বনবী, সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁকেই মহান আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদার সোপানে উপনীত করেছেন। এ কারণে তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আদর্শই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর অতুলনীয় আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত পৃথিবী ও আখিরাতে কোনো মানুষই মুক্তি পাবে না।

কেনো নবী-রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে?

নবী-রাসূলের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে শারীরিকভাবে থাকতেই হবে এ প্রশ্নের গুরুত্ব নেই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবী-রাসূলগণ যে শিক্ষা দান করেছেন, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে বিধান তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা বর্তমানে মওজুদ আছে কিনা। এই বিষয়টির ওপরে মানব জাতিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বর্তমানে নবীর আগমন আর ঘটবে না। কেননা নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়্যাতী ধারার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। তাঁর আনিত বিধান বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

তাঁর সমগ্র জীবনকাল এবং সকল কার্য্যাবলী মানুষের সামনে অবস্থান করছে। তাঁর আনিত বিধান এবং তাঁর কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। সুতরাং তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর আনুগত্য করা তথা তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাঁকে নবী বলে স্বীকৃতি দেয়ার পর তাঁকে অনুসরণ না করা বা তাঁর আদর্শ গ্রহণ না করা মানব বুদ্ধির বিরোধী কাজ। কারণ তাঁকে নবী বলে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থই হলো আমরা একথার স্বীকৃতি দিলাম যে, তিনি যা কিছুই বলেছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বলেছেন, তিনি যা করেছেন তা মহান আল্লাহর ইশারায় করেছেন।

এই অবস্থায় তাঁর কোনো কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, মহান স্রষ্টা আল্লাহর কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করা। নবীর কোনো কাজকে অপছন্দ করার অর্থই হলো মহান আল্লাহর নির্দেশকে অপছন্দ করা। নবীর কোনো কাজের সমালোচনা করার স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা। সুতরাং বুঝা গেল, নবী সম্পর্কে মনের গহিনে সামান্য প্রশ্ন সৃষ্টি করার অর্থই হলো স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি করা।

সুতরাং নবীকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরে কোনো ধরণের প্রশ্ন ব্যতীতই নবীর সকল নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করা এবং তা অনুসরণ করা। নবীর কোনো কথা বা নির্দেশ যদি আমাদের উপলব্ধিতে না আসে তার মানে এই নয় যে, নবীর কথা ভুল। বরং ভুল আমাদের উপলব্ধির জগতে। আমরা জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে নবীর কথা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। মনে রাখতে হবে, নবীর প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যেই মানব জাতির উন্নতি নিহিত রয়েছে। নবীর কথার প্রকৃত তাৎপর্য যদি আমাদের বোধগম্য না হয়, তবুও তা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। বরং এটা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

নবী কক্ষনো ভুল কথা বলেন না। কেউ যদি ধারণা করে যে, নবী মাঝে মধ্যে ভুল কথা বলেন এবং ভুল করে থাকেন, তাহলে তা হবে এক মারাত্মক অপরাধ। কারণ নবী আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হন এবং তাঁর নির্দেশেই কথা বলেন। আমাদের ভেতরেই ভুল রয়েছে বলে আমরা নবীর কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি না। নবীর যে কথা বা কাজ অনুধাবন করতে পারি না সেটা আমরা অনুসরণ করবো না, এমন কোনো সুযোগ মুসলমানদের জন্য অবশিষ্ট নেই। যিনি যতবড় আলেমই হন না কেনো, তাঁর কোনো কথা বা কাজের অনুসরণ করতে হলে, তাঁর নির্দেশের সাথে বা কাজের সাথে নবীর কথার বা কাজের সাদৃশ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে তবেই তা অনুসরণ করতে হবে।

একটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে, যে ব্যক্তি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ নয়, সে কম্পিউটারের জটিল বিষয় বুঝতে পারবে না। কিন্তু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের কথা যদি সে একারণে গ্রহণ না করে যে, কম্পিউটার তার বোধগম্য হচ্ছে না। তাহলে তার জন্য এটা হবে বোকামীর পরিচয়। পৃথিবীর প্রতিটি কাজের জন্যই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। কোনো কাজের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার পরে তার কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনো অবকাশ থাকে না।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি কাজে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। পৃথিবীর সকল কাজ প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে না। কোনো ব্যক্তি কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তা আমাদের যাচাই করে তার ওপরে নির্ভর করতে হয়। এরপর সেই ব্যক্তির কাজে হস্তক্ষেপ করা বা তাকে বারবার উত্যক্ত করা যে, 'আমাকে প্রথমে এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে, নতুবা আমি তোমার কোনো কাজ বা কথা গ্রহণ করবো না'। এমন কথা যারা বলবে তাদেরকে মূর্খ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায় এবং সে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগীকে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করে আর রোগী যদি ডাক্তারের কাছে আবদার জানায়, 'আপনি এই ওষুধ কেনো ব্যবহার করতে বললেন আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন'। ডাক্তার তখন বাধ্য হয়েই রোগীকে তার চেম্বার থেকে বের করে দেবেন। রোগ নিরাময়ের জন্যে ডাক্তারের নির্দেশ অনুসরণ করা প্রয়োজন, বিশেষ ওষুধ ডাক্তার কেনো নির্বাচিত করলেন তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া রোগীর জন্যে বোকামী বৈ আর কিছুই নয়।

আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদেরকে ঐটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, কোন্ কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে জীবন পরিচালনার পদ্ধতি কি, তা আমরা জানি না। জানার কোনো মাধ্যমও আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এটা আমরা জানতে ইচ্ছুক। সুতরাং এটা জানার জন্যই আমাদের প্রয়োজন নবীকে অনুসন্ধান করা। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। আমাদেরকে জানতে হবে, নবুয়্যাতের ধারা কোত্থেকে শুরু হয়ে কোন্ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এই জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে বা এই জ্ঞানের ভেতরে যদি কোনো ভ্রান্তি থাকে তাহলে আমরা যে ভুল পথে পরিচালিত হবো এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হযরত মুহাম্মাদ (সা:) যে শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না, তাঁর আনিত জীবন বিধানই যে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে, এই জ্ঞান মানুষের জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বচ্ছ থাকতে হবে। নবী করীম (সা:) এবং তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের

সাথে যে কাজের কোনোই সম্পর্ক ছিল না, সে কাজের বাইরের অবয়ব যতই সুন্দর হোকনা কেনো, তা গ্রহণ করা যাবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোনো নবী এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করে কারো কবরের কাছে গিয়ে কোনো কিছুর জন্য কখনো ধর্ণা দেননি। সুতরাং এই কাজ আমাদের জন্য করার কোনো অবকাশ নেই। ঈমান রাখতে হবে যে, মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ করার মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি কোনো মাধ্যম ব্যতীতই তাঁর বান্দার আবেদন শোনেন, সে বান্দাহ যত বড় পাপীষ্ঠই হোক না কেনো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَمَّن يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ ط أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

তিনি (শ্রেষ্ঠ) যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরূপায় হয়ে) সে তাঁকেই ডাকতে থাকে, তখন তার বিপদ-আপদ তিনি দূরীভূত করে দেন এবং তিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তা'য়ালার সাথে আর কোনো মা'বুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরা আন নামল-৬২)

নবী-রাসূলকে কেনো বিশ্বাস করতে হবে?

জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির বিচারে যখন একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃত সত্য জানার কোনো মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। প্রকৃত সত্য অবগত হবার একমাত্র মাধ্যম হলো নবী-রাসূল। আমরা এ কথাও জানি যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল মানুষের জন্য সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন, তখন একথাও আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়, নবীর ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর যে কোনো আদেশ পালন করা, তাঁর প্রদর্শিত পথ যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নবীর বিধান বর্তমান অবিকৃত উপস্থিত থাকার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করে অন্য কোনো মানুষের আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে সে যে পথভ্রষ্ট হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের ভেতর থেকেই আরেকজন মানুষ যদি মানুষকে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো, তাহলে নবী প্রেরণের তো কোনো প্রয়োজনই হতো না। জীবন ব্যবস্থা প্রদানের কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন।

একশ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে যারা নবুয়্যাত এবং রিসালাতের বিশ্বজনীন ধারণাকে স্বীকৃতি দেয় না। তাদের ধারণা হলো, নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে বটে, তাঁর আনিত আদর্শও ছিল অদ্ভুত সুন্দর কিন্তু তা ছিল তাঁর যুগের উপযোগী। নবীর আদর্শ সার্বজনীন নয়। বর্তমানে চলার জন্য আদর্শ রচনা করতে হবে বা নবীর আদর্শে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন একটি আদর্শ দাঁড় করিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। এদের জ্ঞানের দৈন্যতা দেখলে এদের ওপর করুণা হয়। আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দাবী করে নবীকে অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ আমাদের জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আমরা সত্য পথের সন্ধান করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর মানুষ মারাত্মক ভ্রমে নিমজ্জিত। এরা বুঝতে চায় না যে, জ্যামিতিতে একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা মাত্র একটিই হয়। এছাড়া যত রেখা অঙ্কন করা হবে তা সরল রেখা হবে না। সুতরাং নবীদের আনীত পথই হলো সহজ-সরল পথ। এই পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথ সহজ-সরল হয় না, হতে পারে না। সুতরাং মানুষ যদি নবীর আনিত সহজ-সরল পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে, ব্যক্তি তা করতে পারে। এ স্বাধীনতা তার রয়েছে। কিন্তু এই পথ মানব মনের চাহিদা অনুসারে তাকে শান্তি দিতে পারবে না।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। পৃথিবীর দু'একটি দেশে যেখানে নবীর আনিত আদর্শের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রাংশ বাস্তবায়িত রয়েছে, আর যেখানে সামান্যতমও নেই, এই দুই স্থানের অপরাধের পার্থক্য দেখলেই অনুধাবন করা যায় নবীর আনিত আদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। মানুষ মুখে স্বীকৃতি না দিলেও তার মনের চাহিদা এবং বিবেকের দাবী হলো, সে সত্য সহজ-সরল পথে চলতে আগ্রহী। যে পথে কোনো কন্টক নেই, কোনো বাধা নেই, কোনো ধরনের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষ পার্থিব স্বার্থে এবং অহমিকা বশতঃ সেই পথেই চলতে গিয়ে ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

মানুষ দেখেও শিখে না। প্রাণী জগতের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে দেখতে পায়, একটি ইতর প্রাণীও তার গন্তব্যে পৌছার জন্য সহজ সরল পথ অনুসরণ করে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা এই মানুষ বড়ই বিচিত্র। এরা সহজ সরল পথ দেখলে চিন্তা করে এই পথে চলতে গেলে পার্থিব স্বার্থে আঘাত আসবে এবং আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। সুতরাং আমরা নিজেরাও এই পথে চলবো না অন্য কাউকেই এই পথে চলতে দেব না। আল্লাহ তা'য়ালার কোনো নেক বান্দাহ যখন এদেরকে সহজ সরল পথের দিকে সহানুভূতির সাথে আহ্বান জানায় তখন সে ঘাড় বাঁকা করে থাকে। নিজের আবিষ্কার করা ভুল পথের ওপরেই সে দৃঢ় থাকে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, নবীকে অস্বীকার করে বা তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তি বা জাতি সহজ সরল পথ লাভ করতে পারে না এবং মানুষ তার

কাংখিত শান্তিও লাভ করতে পারে না। নবীকে ত্যাগ করেও কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পৃথিবী এবং আলমে আখেরাতে শান্তি লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই নবীর ওপর ঈমান এনে নবীকে অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ মানুষের সামনে উন্মুক্ত নেই।

কোনো ব্যক্তি বা জাতি সহজ-সরল পথ অবলম্বন করতে চায় অথচ সে ব্যক্তি বা জাতি একজন নবীর মতো সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সত্তার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, সেই ব্যক্তির বা জাতির যে বুদ্ধির বৈকল্য ঘটেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটলে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সত্য বিমুখ হওয়া সম্ভব নয়। তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির দৈন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, তার মনের জগতে অহংকার নামক নিকৃষ্ট স্বভাব বাসা বাঁধতে পারে, অথবা সে স্বয়ং বাঁকা স্বভাবের হতে পারে, যে কারণে তার মন মানসিকতা সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না।

এ সকল কারণেই সে তার পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে তারই অন্ধ অনুসরণ করে। সমাজে বা বংশে শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে তা অনুসরণ করে। পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে এবং দেশ ও সমাজে কয়েক শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে, এ সবের বিরুদ্ধে সে কথা শুনতে চায় না। এমন ব্যক্তি ধারণা করতে পারে, পৃথিবীতে আমি যা খুশী তাই করবো, যেভাবে খুশী জীবন যাপন করবো, আমি নবীকে অনুসরণ করলে আমার সে স্বাধীনতা থাকবে না। সুতরাং আমি নবীকে অনুসরণ করবো না।

নবীকে অনুসরণ না করার ওপরে উল্লেখিত কারণগুলো যদি কোনো ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেই জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে কোনক্রমেই সহজ-সরল পথে চলা সম্ভব হবে না। ধর্মের নামে সে ব্যক্তি যতই পীরের দরবারে পড়ে থাক না কেনো, মাজারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে ব্যক্তি যদি নিজেকে রক্তাক্তও করে, তবুও তার পক্ষে আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হবে না। নবীর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে সত্য লাভ করা সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে, নবুয়্যাত বা রিসালাত দাবী করে বা চেষ্টা-সাধনা করে লাভ করার কোনো জিনিস নয়। এ সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম দিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং যিনি নবী প্রেরণ করেছেন, তিনিই আদেশ দিয়েছেন নবীর আনুগত্য করার জন্য বা নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। নবীর প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য না করে, সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিদ্রোহী এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

সাধারণ মানুষ যে দেশের নাগরিক এবং যে সরকারের প্রজা, সেই সরকারের নিযুক্ত প্রশাসকের আনুগত্য করতে হবে, এটা করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেউ সরকারকে মানবে আর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসককে মানবে না, বিষয়টি পরস্পর বিরোধী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সকল সৃষ্টির বাদশাহ। তাঁর সৃষ্টি মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য তিনি যাকে খুশী নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি যাকেই নিযুক্ত করেছিলেন, যার আনুগত্য করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আনুগত্য করা সকল মানুষের জন্য অবধারিত কর্তব্য।

নিজেকে সকলের আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র নবীর আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। মানুষ যদি তা না করে তাহলে সে নিজেকে কিছুতেই আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম হিসেবে পরিচয় দিতে পারে না। একজন মানুষ স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বীকার করবে অথচ তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলকে স্বীকার করবে না, এমন হতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

নবুয়্যাত-রিসালাতের সূচনা

মহান আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করে এখানে মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন। প্রথম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল হযরত আদম (আ:) কে। প্রথম সৃষ্টি মানুষ হযরত আদম (আ:) কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে নবুয়্যাত দান করা হয়েছিল এবং তিনি নবী-রাসূল ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর থেকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা শুরু করেন বা নবুয়্যাতের সূচনা হয়েছিল হযরত আদম (আ:) থেকেই। এই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) পর্যন্ত এসে। নবী করীম (সা:) এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যে বা যারা নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করবে, তাদের উক্ত দাবী অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ:) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর থেকে আরেকজন মানুষ সৃষ্টি করলেন, যার নাম হযরত হাওয়া (আ:)। তাঁকে হযরত আদম (আ:) এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত করা হলো। সূচনায় তাদেরকে জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছিল এই পৃথিবীর জন্য। সুতরাং তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। এরপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বংশধারা চালু করলেন। হযরত আদম (আ:) এর সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করতে থাকলো।

মানব বংশের যাত্রা শুরু হলো। এই দু'জন মানুষ থেকে ক্রমশঃ মানব জাতির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। কত বছরের ব্যবধানে মানব বংশ বৃদ্ধি লাভ করে বর্তমান অবস্থায়

উপনীত হয়েছে, তার সঠিক হিসাব মহান আল্লাহই অবগত আছেন। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে যত সংখ্যক মানুষ আছে এবং অতীতকালে যারা ছিল, সকলেই ঐ হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ:) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সকল জাতির ধর্মীয় বর্ণনা এবং ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই মানব জাতি হযরত আদম (আ:) এর বংশধর। তাঁর থেকেই মানব জাতির বংশধারার অবতারণা হয়েছে। ডারউইনের থিয়রী অর্থাৎ The theory of evolution বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান এ পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হতে পারেনি। বিজ্ঞান এ কথাও বলতে সক্ষম হয়নি যে, এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল।

বরং অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা হলো, প্রথমে একজোড়া মানুষ থেকেই মানব বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পৃথিবীতে পূর্বে যত মানুষ ছিল এবং বর্তমানে যত মানুষ আছে, আগামীতে যত মানুষ আসবে, তা সবই হযরত আদম এবং হযরত হাওয়া (আ:) এরই বংশধর। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি Certificate দিচ্ছে তা আমাদের আলোচনা বা অনুসরণ করার বিষয় নয়। মহান আল্লাহ কি বলছেন সেটাই বিশ্বাস এবং অনুসরণ করা মূখ্য বিষয়।

পবিত্র কুরআনে এই মানব জাতিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদম সন্তান হিসেবে আহ্বান করেছেন। হযরত আদম (আ:) কে দায়িত্ব দেয়া হয়, তিনি যেন তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেন। তাদেরকে তিনি যেন সর্ব প্রথমে এ কথা শিক্ষা দেন, এই পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সকল কিছুর স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি অসীম ক্ষমতাবান। কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তাঁর আদেশ মাত্র তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

কোনো কিছু ধ্বংস করতে ইচ্ছা করলে সেটাও তাঁর আদেশ মাত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকল কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কারো আইন মানতে বাধ্য নন, সে প্রয়োজনও তাঁর নেই। সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁর আইন মানতে বাধ্য। তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহী করতে হয় না, বরং সকল সৃষ্টিকে তাঁরই কাছে জবাবদিহী করতে হয় এবং হবে। তিনি চিরঞ্জীব এবং সকল ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত।

তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন গ্রহণ করা যাবে না বা অনুসরণ করা যাবে না। তাঁর ইবাদাত ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না। তাঁর কাছেই কেবল সাহায্য চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। তাঁর সামনেই মাথানত করতে

হবে, অন্য কারো কাছে বা সামনে মাথানত করা যাবে না। কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। নিজের খায়েস বা অন্য কারো মর্জি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা যাবে না। জীবনের সকল কাজের জবাব আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দিতে হবে। তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করলে তিনি পুরস্কার দান করবেন আর তাঁর আদেশ অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত আদম (আ:) তাঁর সন্তানদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি দল আদি পিতার শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে থাকলো। আরেকটি দল আদি পিতার শিক্ষা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গেল। তাদের ভেতরে কেউ আকাশের চন্দ্র সূর্যকে মহাশক্তিমান কল্পনা করে তার পূজা করতে থাকলো। কেউ ধারণা করলো বৃক্ষ তরু-লতাই হলো সর্বশক্তিমান। সুতরাং বৃক্ষ তরু-লতা পূজিত হতে থাকলো। কেউ পূজা করতে থাকলো নদী সাগর ইত্যাদীকে। কেউ মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে থাকলো। কেউ আগুনের কুণ্ড নির্মাণ করে তার পূজা করা শুরু করলো।

ইতোমধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে আদম সন্তান ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হলো। তারা তাদের ধর্ম হিসেবেও নানা ধরনের কল্পিত মতবাদ আবিষ্কার করলো। মানুষের নানা শ্রেণী, বর্ণ ও ভাষা হবার কারণে নিত্য নতুন প্রথার সৃষ্টি হলো। এভাবে মানুষ নানা বস্তুর পূজারী হবার ফলে মহান আল্লাহকে ভুলে গেল। হযরত আদম (আ:) যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, মানুষ কালক্রমে তা ভুলে গিয়েছিল। পরিণতি যা হবার ছিল তাই হলো। যাবতীয় দুষ্কৃতি সমাজ জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সমাজের প্রতিটি স্তরে পুঞ্জিভূতাকারে অপকর্ম জমা হলো। এমন অনেক রীতি নীতিকে বিসর্জন দেয়া হলো, যা ছিল প্রকৃতই কল্যাণকর। আবার এমন অনেক রীতি পদ্ধতিকে একান্তই অনুসরণীয় করা হলো, যা মানব জাতির জন্য একান্তই ক্ষতিকর। পথ প্রদর্শকের অভাবে শত সহস্র ভ্রান্ত পথ ও মতের সৃষ্টি হলো। তারা সবাই দাবী করতে থাকলো, তাদের পথই একমাত্র অভ্রান্ত এবং অন্যদের পথ ও মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এভাবে শুরু হলো দলাদলি। পরিণতিতে দাঙ্গা সৃষ্টি ও রক্তপাত হতে থাকলো।

পবিত্র কুরআন ও গবেষণালব্ধ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ইসলামের সূচনা হযরত আদম (আ:) থেকে হয়েছিল। ইসলামের শত্রুরা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান মুসলিম সমাজে এ কথা প্রচলিত করে দিয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা:) ই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পবিত্র কুরআন-হাদীস এর বিপরীত কথা বলে। পৃথিবীতে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর আদর্শই ছিল ইসলাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্বাচিত নেতা।

প্রত্যেক নবীই ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। সর্বকালে সব দেশে মানব জাতির একমাত্র আদর্শ ছিল ইসলাম।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যারা অনভিজ্ঞ এবং কুরআন বাদ দিয়ে যারা ইতিহাস রচনা করেছে, তারা উল্লেখ করেছে যে, 'অংশীদারিত্বের অন্ধকারময় জগতে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের গর্ভধারিণী মাতা হলো অংশীদারিত্ব। তারপর ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে শিরকের বা অংশীদারিত্বের অন্ধকার দূরিভূত হয়ে তাওহীদের তথা একত্ববাদের সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষের মধ্যে তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে'।

ডারউইন তার The theory of evolution-এর মাধ্যমে মানুষকে যে নাস্তিক্যবাদের দিকে আহ্বান জানিয়েছে, ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখিত কথাটিও সেদিকেই মানব জাতিকে নিয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চায়, আদম হাওয়া কল্পিত বিষয়। মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে পানির পোকা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারপর তারা বন্যদের মত জীবন যাপন করতে থাকে। মানব প্রকৃতি বড় দুর্বল। চরম অসহায় অবস্থায় পড়লে মানুষ একটা শক্তিকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায়। সুতরাং অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়ে মানুষ নানা ধরনের কল্পিত শক্তি আবিষ্কার করে। আর কল্পিত শক্তির নামই হলো স্রষ্টা। প্রকৃত স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই।

মানুষ কখনো চন্দ্র-সূর্যকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। তখন থেকেই তাদের পূজা শুরু হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বস্তুকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ তাদের পূজা করেছে আর এভাবেই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এসব কিছু থেকে আরেকদল মানুষ আবিষ্কার করেছে এমন এক শক্তিকে, যাকে দেখা যায় না এবং অনুভবও করা যায় না। তার নাম দিয়েছে 'আল্লাহ' (নাউযুবিল্লাহ)। এভাবেই একত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে কিছু ব্যক্তি এই একত্ববাদের সাথে নতুন কিছু জুড়ে দিয়ে মানুষকে তার অনুসারী বানিয়েছে।

এক শ্রেণীর মানুষ নামের বিভ্রান্ত কিছু লোক উল্লেখিত কথাগুলোর জন্ম দিয়েছে, যেসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, কোনো অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানব জাতির যাত্রা শুরু হয়নি। পৃথিবীতে একজন মহামানব প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সম্মানিত নবী-রাসূল এবং বিজ্ঞানী। এক আলোকিত উজ্জ্বল অবস্থা থেকে মানব জাতির সূচনা হয়েছিল এবং তারা যাত্রা শুরু করেছিল। তাঁরা সবাই ছিল এক অভ্রান্ত পথের যাত্রী। তাদের ভেতরে কোনো ধরণের দুষ্কৃতি বা দলাদলি ছিল না। ইতিহাসের ধারাপরিক্রমায় এই মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে ছিটকে পড়ে। তারপর তাদের

ভেতরে নানা মত ও পথের আবিষ্কার হয়। যারা এই নানা ধরনের মত ও পথের আবিষ্কারক ছিল, তারা যে প্রকৃত সত্য জানতো না এমন নয়। সত্য জানার পরেও এক শ্রেণীর মানুষ নিজের বৈধ অধিকারের সীমা অতিক্রম করে পার্থিব সুবিধা লাভের জন্যই এই ধরনের বাতিল ভ্রান্ত পথের ও মতের জন্ম দিয়েছিল। তারা নিজেদের ভেতরে অন্যায় অত্যাচার আর সীমা লংঘনের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিল। তাদেরকে এ সকল অপরাধ থেকে মুক্ত করে পুনরায় আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া সহজ-সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী প্রেরণ করতে থাকেন।

এ সকল নবীগণ পৃথিবীতে আগমন করে কিছু অনুসারী তৈরী করবেন তারপর একটি নতুন আদর্শের মাধ্যমে নিজের নামের অনুকরণে একটি ধর্মমত সৃষ্টি করবেন, ব্যাপার কিন্তু এমন ছিল না। মহান আল্লাহ এসব নবী-রাসূলকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, হযরত আদম (আ:) এর মাধ্যমে যে সত্য মানব জাতির জন্য দান করা হয়েছিল, সে সত্য মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। নবীগণ এসে সেই সত্য উদ্ধার করে মানুষকে পুনরায় সেই সত্যের অনুসারী তৈরী করবেন। সেই সত্য মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন, তা পরিষ্কার করে বর্ণনা করবেন। তারপর তাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করবেন।

নবী-রাসূলের সর্বপ্রধান কর্তব্য

পৃথিবীতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয় পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে পৃথিবীর মানুষকে সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে তাঁরই গোলামীর দিকে আহ্বান করা। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই সকল শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁকেই প্রতিপালক হিসেবে মান্য করা, একমাত্র তাঁকেই নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই হলো মানুষের কর্তব্য, এই কর্তব্য পালনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করাই হলো পৃথিবীতে নবী-রাসূলের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বই সকল নবী-রাসূল পালন করেছেন।

প্রত্যেক নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে তাঁরা শিক্ষা দেন, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। নবী-রাসূল তাঁর অনুসারীকে মূর্তি পূজা এবং শিরক থেকে হেফাজত করেন। সমাজে প্রচলিত মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। তাঁর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং আল্লাহর আইন প্রচলিত করে তা মেনে চলার জন্য উপদেশ দেন।

পৃথিবীর এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। প্রত্যেক নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্রভেদে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন-কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নবীগণ তাদের জাতির ভেতরে যেসব মূর্খতা অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং অনাচার প্রচলিত ছিল, সেগুলোর মূল উৎপাটনের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। যে সব ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা জাতিকে গ্রাস করেছিল, তা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

জ্ঞান- বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাতি যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন নবীগণ তাদেরকে আইন-কানুন দান করেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সাথে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও আইন-কানুনও ব্যাপকভাবে দান করেছেন। মোট কথা নবী-রাসূল মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। নবী করীম (সা:) ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বেও মানুষকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নবী করীম (সা:) এর এই কাজ কোনো নতুন কাজ নয়। এ কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বললেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই দাসত্ব করো। (সূরা আম্বিয়া-২৫)

পৃথিবীতে যারা নিজেদেরকে মনিব মনে করে সাধারণ মানুষকে নিজেদের দাস বানিয়ে রেখেছে, নিজেদের তৈরী আদর্শ, মতবাদ, আইন-কানুনের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছে, তাদেরকে যেন সাধারণ মানুষ অস্বীকার করে এই অনুপ্রেরণা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংগ্রাম মুখর করে গড়ে তোলাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْاالطَّاغُوْتَ ج

আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (তাদের কাছে সে বলতে পারে,) তোমরা এক আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করো এবং তাঁর প্রতি বিদ্রোহী শক্তিসমূহকে বর্জন করো। (সূরা আন্ নাহল-৩৬)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান রচনা করেছেন নবী-রাসূল তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করেন নবীগণ এবং এটাই মহান আল্লাহর নিয়ম।

তাঁর নিয়মের অধীনেই তাঁর আইন-কানুন মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ম হলো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই একজনকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে জীবন বিধান প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা তাদের সমগ্র জীবনব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করে যান। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁরা ভুলে যান না কোন্ দায়িত্বসহ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা:) কে আহ্বান করে বলেছেন–

يَآ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ط

হে রাসূল! যা কিছু আপনার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি (অন্যের কাছে) পৌঁছে দিন, যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি তো (মানুষদের কাছে) তাঁর বার্তা পৌঁছে দিলেন না! (সূরা আল মায়েদাহ-৬৭)

নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐ পথের দিকেই আহ্বান জানাবেন, যে পথকে আল্লাহ তা'য়ালা সিরাতুল মুস্তাকিম নামে অভিহিত করেছেন। এই পথের পরিচয় নবীগণ মানুষকে জানাবেন, এ পথে চলতে সাহায্য করবেন, মানুষ যেন এ পথে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে সেভাবে তিনি সহযোগিতা করবেন। সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিচয় জানে না। সত্য মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা বোঝে না। কোনটি কল্যাণের আর কোনটি অকল্যাণের পথ তা মানুষ জানে না। মানুষকে এসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান করবেন নবীগণ। মানুষ যেন নির্ভুলভাবে সহজ সরল পথে চলতে পারে এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবীদের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওহী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ لا

(এ কুরআন এমন) এক গ্রন্থ যা আমি আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (মহাসত্যের) আলোতে বের করে আনতে পারেন, তাঁর পথে- যিনি মহাপরাক্রমশালী ও যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। (সূরা ইবরাহীম-১)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ নবী ও ওহী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। নবী করীম (সা:) কে প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَآ أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰه بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

হে নবী! আমি আপনাকে (হিদায়াতের) সাক্ষী (করে) পাঠিয়েছি, (আপনাকে) বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনি হচ্ছেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও (হিদায়াতের) সুস্পষ্ট প্রদীপ। (সূরা আল আহযাব-৪৫-৪৬)

নবী দায়িত্ব লাভের পরে মানুষকে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দিবেন। যারা নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছে, তাদেরকে তিনি পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং যারা ইসলামের বিরোধিতা করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে তিনি পরকালে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবেন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার আদেশেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবেন। তিনি নবুয়্যাতের আলো দিয়ে মূর্খতার সকল অন্ধকার দূরীভূত করবেন। মূর্খতার অন্ধকার বিদায় করে তাওহীদের জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করবেন। তাঁরাই হবেন একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা। মহান আল্লাহ তাদেরকে যেমন উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন তেমনিভাবে তাঁরা হলেন পবিত্র। সুতরাং তাঁরাই হলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ নেতা। প্রশ্নাতীতভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে। এই নেতৃত্ব মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবহিত করবেন। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে- এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার দায়িত্ব নবী-রাসূলগণ পালন করেছেন।

আদালতে আখেরাতে বিচারের পরে যে সকল মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰى إِذَا جَاؤُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط

যেসব লোক কুফুরী করেছে তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেয়ে) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফিরিশতারা) ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতো? (সূরা যুমার-৭১)

মানুষের সকল কাজের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে, এ কথা মানুষকে জানানোর দায়িত্ব নবী-রাসূলের। কারণ আদালতে আখেরাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে প্রশ্ন করবেন–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط

(আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় (বলো,) তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন এমন) সব রাসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরন্তু) যারা তোমাদের ভয় দেখাতো যে, তোমাদের আজকের এ দিনের সম্মুখীন হতে হবে? (সূরা আনয়াম-১৩০)

নবীগণ মানুষকে তাঁর আসল গন্তব্যের দিকে অগ্রসর করাবেন। মানুষকে জানাবেন, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়, পরকালের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন এবং সে জীবন হলো অনন্তকালের। সুতরাং ঐ অনন্তকালে যেন তোমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারো, সে পাথেয় এই পৃথিবী থেকেই তোমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ নবী-রাসূল মানুষকে জড়বাদ আর নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদ থেকে সরিয়ে নৈতিকতাবাদীতে পরিণত করবেন আর এটাই ছিলো নবী-রাসূলের সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

পৃথিবীতে নবী-রাসূলের অবস্থা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক এবং বন্ধু, এর পরেই নবীদের স্থান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার পরেই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু পৃথিবীতে আগমনকারী নবী-রাসূল। তাঁরা যখন দেখেন মানুষ সত্য পথ ত্যাগ করে ভুল পথে চলছে এবং পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন। মানব দরদী হিসেবে তাঁরা মানুষকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে থাকেন। মানুষ তাদের এই পরম বন্ধুর সাথে বড় বিচিত্র আচরণ করে। নবী-রাসূল যখন মানুষের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা শুরু করেন, তখন এই মানুষ তাদের কথা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদেরকে বিদ্রুপ, কারাগারে নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন, দেশ থেকে বহিষ্কার এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যাও করেছে। এরপরেও তাঁরা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বিরত হননি।

নবী-রাসূলের ইন্তেকালের পরে তাদের প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শে তাঁরই অনুসারীগণ সামান্য স্বার্থের কারণে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল সে কিতাবের ভেতরে পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুসারীগণ নিজেদের মনগড়া কথা সেই কিতাবে নবীর কথা বলে লিপিবদ্ধ করেছে। আল্লাহর

ইবাদাত করার বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে। কেউ কেউ স্বয়ং নবীর কবরের পূজা করা আরম্ভ করেছে। অনেকে এমন মন্তব্য করেছে যে, স্বয়ং আল্লাহ নবীর রূপ ধারণ করে আমাদের মাঝে অবতার (Incarnation of a human body) হিসেবে আগমন করেছিলেন।

অনেকে নিজেদের নবীকে স্বয়ং আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করেছে। নবী এবং তাঁর মায়ের কল্পিত মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেছে। আফসোস! যারা এসেছিলেন পৃথিবী থেকে মূর্তি উৎখাত করতে, আর তাদের ইন্তেকালের পরে তাঁর অনুসারীরা তাদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেছে। এমনভাবে তারা তাদের নবীর শিক্ষা এবং জীবন বিকৃত করেছে, ঐ নবীর শিক্ষা যে কি ছিল বর্তমানে তা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। নবীর প্রকৃত জীবন যে কেমন ছিল তাও জানার কোনো উপায় তারা রাখেনি। একমাত্র নবী করীম (সাঃ) এর আনিত জীবন বিধান বা তাঁরই শিক্ষা মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম রহমতে অবিকৃত রয়েছে এবং তিনি তাঁর শেষ নবীর শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত স্বয়ং সংরক্ষণ করবেন।

মানুষের প্রতি নবী-রাসূলের আহ্বান

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সংশোধন করার জন্য যে সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে একই দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রত্যেক নবীই বলেছেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই'। আমরা দেখি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ মানুষকে নিজ দলে আকৃষ্ট করার জন্য মুখরোচক কথাবার্তা বলে জনগণকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। অথবা সাময়িক কোনো সমস্যার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু নবী-রাসূলের কর্মপদ্ধতি এমন ছিলো না, তাঁরা দেশের কোনো সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন করেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে মানুষের সামনে অবতীর্ণ হননি। কৃত্রিম কোনো বিষয় তাঁর জাতির সম্মুখে বড় করে দেখাননি। তাঁরা প্রথমেই বলেছেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই'। এ কথা শোনার সাথে সাথে নবীর পরিবার, সমাজ, দেশবাসী কেনো তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। 'ইলাহ' শব্দ দিয়ে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন যে, নবীদেরকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। প্রত্যেক নবীর প্রতিই নির্যাতন করা হয়েছে শুধুমাত্র এই 'ইলাহ্' বলার কারণে। আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে 'ইলাহ্' শব্দ দ্বারা আসলে কি বুঝায়।

যে শক্তি এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের, ভেতরের সকল প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন, আরবী ভাষায় সেই শক্তিকে 'ইলাহ' বলে। মানুষের সকল প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন, সমাজ, পরিবার, দেশ পরিচালনার জন্য যিনি আইন দান করেন এবং যার আইনই একমাত্র চলতে পারে তিনিই হলেন 'ইলাহ্'। যে কোনো প্রয়োজনে মানুষ যাঁর মুখাপেক্ষী হয়, যিনি মানুষকে সাহায্য করবেন এবং মানুষ যাঁর কাছে সাহায্য চাইবে তিনিই 'ইলাহ্'। সুতরাং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, শোষক-শাসক যখন বুঝেছে, নবীর এ কথা গ্রহণ করলে নিজের কর্তৃত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না, সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ত্যাগ করতে হবে, তখনই তারা নবীর সাথে তথা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি শত্রুতা করেছে এবং বর্তমানেও করছে-আগামীতেও করবে।

ইতিহাস কথা বলে, প্রত্যেক নবীর সাথেই তৎকালিন সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ও দেশের শাসক শ্রেণীর সাথে 'ইলাহ' সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে। পবিত্র কুরআন বিবৃত এ সকল কাহিনী অন্য কোনো পৃথিবীর নয় বরং যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে, মানুষের সাথে যে পৃথিবী সম্পর্কিত সেই পৃথিবীরই ঘটনা এবং এ সকল ঘটনা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। নবী-রাসূল যে দেশে এবং জাতির মধ্যে আগমন করেছেন তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা নানা ধরণের সমস্যা ছিল। এসব উপস্থিত সমস্যা সমাধানেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবী-রাসূলগণ এ ধরনের সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র একটি সমস্যা সামনে রেখেছেন এবং সে সমস্যা 'ইলাহ্' কেন্দ্রিক।

তাঁরা অন্য কোন সমস্যা জাতির সামনে তুলে না ধরে প্রধান সমস্যা অর্থাৎ কৃত্রিম 'ইলাহ্'-সমূহের দাসত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে 'ইলাহ' হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। নবী করীম (সা:) প্রথমে এভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'হে মানুষ! বলো আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে'।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় পৃথিবীতে সমস্যার সৃষ্টি তখনই হয়, যখন মানুষ একমাত্র আল্লাহকে রব ও ইলাহ্ হিসেবে মানে না। এর পরিবর্তে নিজেকে, সমাজপতি, প্রচলিত প্রথা, নিজ পরিবার, সমাজের আইন, দেশের শাসক, দেশের নানা ধরণের নীতি, দৃষ্টির সামনের সাময়িক স্বার্থ, ধর্মনেতা তথা প্রকৃত রব ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে নিজের মাবুদ বা ইলাহ তথা রব হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে, তখনই দেশে, সমাজে, ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে নানা ধরণের সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে। এ কারণে নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী ইসলামী নেতৃত্ব দেশের, সমাজের সকল সমস্যা উপেক্ষা করে প্রধান সমস্যার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবী-রাসূলগণ জানতেন সকল সমস্যার স্রষ্টা হলো মাত্র একটি। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান হলে অন্য সমস্যাসমূহ এমনিতেই বিলীন হবে। এই সমস্যার সমাধানের ওপর জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। এ কারণে তাঁরা তাদের সমগ্র জীবন এই সমস্যা সমাধানের জন্যই ব্যয় করেছেন। হযরত ঈসা (আ:) যখন বনী ইসরাঈলদের কাছে আগমন করেছিলেন তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন–

وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ-إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এই) নিদর্শন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা আমার এবং তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁর দাসত্ব করো আর এটাই হলো একমাত্র সহজ সরল পথ। (সূরা ইমরাণ-৫০-৫১)

হযরত ঈসা (আ:) তাঁর জাতিকে কোন্ কথার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন মহান আল্লাহ নবী করীম (সা) কে ওহীর মাধ্যমে শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনিও মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাকেই রব হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। মহান আল্লাহর উলুহিয়াত এবং রবুবিয়াতই হলো প্রধান বিষয়। মানুষ মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ-রোজা ও হজ্জ আদায় করছে, কিন্তু সে ব্যক্তি মানুষের বানানো আদর্শ অনুসারে দেশের অর্থনৈকিত সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করছে। সে এমন রাজনীতি করছে, যে রাজনীতি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এর পরিষ্কার অর্থ হলো তারা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে সে নামাজ-রোজা ও হজ্জ আদায় করছে। কিন্তু সে আল্লাহর রবুবিয়াত এবং উলুহিয়াত গ্রহণ করতে রাজী নয়। আল্লাহকে সে আইন ও বিধান দাতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নয়। Law Giver হিসেবে সে পৃথিবীর এক শ্রেণীর দার্শনিককে গ্রহণ করছে। এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে দাবী করার অবকাশ আল্লাহর বিধানে উপস্থিত নেই।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াত থেকে আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পৃথিবীর অন্যান্য নবী-রাসূলের মতই হযরত ঈসা (আ:) এর দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তিনটি। তিনিও এই তিনটি বিষয়ের দিকে তাঁর জাতিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর আহ্বানের প্রথম কথা ছিল, সকল ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ। অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব Sovereignty, Supreme Authority, Supreme Power যা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এ কারণে দাসত্ব তাঁরই জন্য নিবেদিত। তাঁরই দাসত্ব করতে

হবে। তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানব জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হবে এই কথাটির ওপরে।

তাঁর আহ্বানের দ্বিতীয় কথা ছিল, সার্বভৌম Sovereignty ক্ষমতাসম্পন্ন অধিপতির Viceroy প্রতিনিধি হিসেবে আমার আদেশ মেনে চলতে হবে, আমার আনুগত্য করতে হবে। আমাকেই একমাত্র নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

হযরত ঈসা (আ:) এর আহ্বানের তৃতীয় কথা ছিল, পৃথিবীতে মানব জীবনের বৈধ ও অবৈধের সীমারেখা মহান আল্লাহর আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। অর্থাৎ কোনটি হালাল ও হারাম তা আল্লাহর বিধান জানিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'য়ালার আইনের মোকাবেলায় পৃথিবীর অন্যান্য সকল আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ Law Giver হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। কোন্ কাজ মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় এ নির্দেশ দেয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

এক শ্রেণীর তথাকথিত চিন্তাবিদ মনে করেন, প্রত্যেক নবী-রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাঁরা সবাই একই উদ্দেশ্যে আগমন করেননি। যারা এ কথা বলেন, হয় তাদের কুরআন বুঝার ক্ষমতা নেই অথবা তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এ কথা বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সকল নবীর আহ্বান ছিল এক ও অভিন্ন। গোটা সৃষ্টি জগতের সকল ক্ষমতার অধিকারী যিনি সেই Supreme authority-এর কাছ থেকে নিয়োগ পত্র নিয়ে যিনিই তাঁর প্রজাদের কাছে আগমন করবেন, তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যে, তিনি প্রজাদেরকে বিদ্রোহ করা এবং স্বায়ত্ব শাসন পরিচালনা হতেও বিরত্ রাখবেন।

আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় অন্যদের আইন বাতিল বলে ঘোষণা দিয়ে এ আইন গ্রহণ করলে কি পুরস্কার লাভ করা যাবে এ সম্পর্কে তিনি সুসংবাদ দিবেন। আর যারা আল্লাহর আইন গ্রহণ করবে না, তাদেরকে তিনি ভয়ংকর শাস্তির কথা শোনাবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌم بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا–

রাসূলরা (ছিলো জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্ তা'য়ালার ওপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই) আল্লাহ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা-১৬৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাঁর নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষের সামনে যেন তাঁরা আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। আল্লাহর দাসত্ব কেনো করতে হবে তা তাঁরা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালার আদালতে এ সকল মানুষ যখন উপস্থিত হবে তখন তাঁরা যেন এ কথা বলতে না পারে, আমাদের কাছে এমন কোনো ব্যক্তি আসেনি বা আমাদের কাছে এমন কোনো মাধ্যম ছিল না যার মাধ্যমে আমরা আপনার বিধান সম্পর্কে জানতে পারতাম। আমরা আপনার বিধান সম্পর্কে জানতে পারলে অবশ্যই আপনার আইন অনুসরণ করতাম।

এসব অজুহাত যেন মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার সামনে তুলতে না পারে, এ কারণেই মহান আল্লাহ প্রতিটি জনপদে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ মহাসত্যের আহ্বায়ক, সেই সাথে তাঁরা মানুষের আনুগত্য লাভের অধিকারী। তাদের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ط

আমি যখনই কোনো (জনপদে) কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, তাঁকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী (সেখানে) তাঁর (শর্তহীন) আনুগত্য করা হবে। (সূরা নিসা-৬৪)

নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে- এতেই মানুষের দায়িত্ব শেষ হয় না। নবীকে বিশ্বাস করবে সেই সাথে মানুষ অন্য কারো আইন মেনে চলবে বা নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করবে, এটা সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেননি। বরং নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো জীবন যাপনের জন্য যে বিধান তিনি নিয়ে আসেন, পৃথিবীর সকল বিধান বর্জন করে কেবলমাত্র সেই বিধান অনুসারেই জীবন যাপন করতে হবে। আর এটাই হলো নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রকৃত অর্থ।

নবী-রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের আরো একটি দায়িত্ব হলো, তাঁরা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পৃথিবীর সকল বিধানের ওপরে বিজয়ী করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ, আইন-কানুনের মোকাবেলায় ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহর দেয়া আদর্শ রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশ বা পৃথিবী শাসন করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

هُوَ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ–

তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও সঠিক জীবন বিধান সহকারে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন সে এই জীবন ব্যবস্থাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে, মুশরিকরা এ বিজয়কে যতো দু:সহই মনে করুক না কেনো। (সূরা আত্ তাওবা-৩৩)

আরবী দ্বীন শব্দ সম্পর্কে সীরাতে সরওয়ারে আলমে বর্ণনা করা হয়েছে, 'দ্বীন শব্দটিকে আরবী ভাষায় এমন জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ ও অনুসরণযোগ্য বলে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে হয়'।

পৃথিবীর সকল বিধান থাকবে আল্লাহর বিধানের অধীনে। আল্লাহর আইন প্রচলিত কোনো বিধানের অধীনে থাকবে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে আগমন করেনি। অন্য কোন বিধানের অধীনে আল্লাহর আইন সামান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে অবস্থান করবে, এ উদ্দেশ্যেও আল্লাহর বিধান আগমন করেনি। পৃথিবীর সকল ধরনের মতবাদ মতাদর্শ আল্লাহ তা'য়ালার আইনের অনুগ্রহ কুড়িয়ে টিকে থাকার হলে টিকে থাকবে আর না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালার আইন যিনি নিয়ে আসেন, তিনি পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহ তথা অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালীর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। নবী-রাসূল নিজের বাদশাহ মহান আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে চান। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় পৃথিবীতে অন্য কোনো বিধান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এমন ধরনের কোনো বিধানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে না। নবী-রাসূলের আহ্বানের এটাই হলো মূল কথা।

নবী-রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ যখনই মহান আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় ভিন্ন বিধানকে প্রাধান্য দিয়েছে, তখনই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টার হিদায়াত ও পথনির্দেশ অমান্য করে ভিন্ন বিধানের ভিত্তিতে নিজেদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত করেছে তখনই প্রকৃত বিপর্যয় এবং অশান্তি অনাচার দেখা দিয়েছে। অত্যাচার, শোষণ, জুলুম, প্রতারণা ও বঞ্চনার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষের আর্তনাদ মহান আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করার ফলে তাঁরা সার্বিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছেন। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত জুলুমমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সার্বিক বিপর্যয় রোধ করেছেন।

নবী-রাসূল পৃথিবীর কোনো নেতার নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য বা কোনো শাসকের অধীনে অবস্থান করার জন্য আগমন করেন না এবং এ অবস্থা তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতের

মর্যাদার পরিপন্থী। তাঁরা আগমন করেন মানুষের শাসক হিসেবে। সকল শ্রেণীর মানুষ নবীর আনুগত্য করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সমাজ ও দেশ পরিচালনা করবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা আগমন করেন। পৃথিবীর মানুষ বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, ফলশ্রুতিতে দেখা দিবে ভাঙ্গন ও ধ্বংস। এ অবস্থায় মানুষ যেনো এ অজুহাত দেখাতে না পারে যে, এ সকল কর্মকাণ্ড করলে যে শাস্তি নেমে আসবে এ কথা আমরা জানতাম না। যদি জানতাম তাহলে এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতাম। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيْبَهُم مُّصِيْبَةٌم بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ–

এমন যেনো না হয়, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালে না কেনো? তাহলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুবর্তন করতাম এবং আমরা (সবাই) ঈমানদারও হয়ে যেতাম! (সূরা কাসাস-৪৭)

কোনো জনপদের অধিবাসীর কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিধান অবিকৃত ছিলো এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমও বর্তমান ছিলো ততক্ষণ সে জাতির জন্য নবীর প্রয়োজন হয়নি। উক্ত বিধান যখন বিকৃত হয়েছে তখনই হিদায়াতকারীর প্রয়োজন হয়েছে এবং মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে হিদায়াতকারী প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে তা প্রচারিত হচ্ছে, এ অবস্থায় পৃথিবীর কোনো মানব সম্প্রদায়ের পক্ষে এ অজুহাত প্রদর্শন করা সম্ভব নয় যে, 'প্রকৃত সত্য আমাদের জানা ছিল না, মুক্তির সঠিক পথ কোনটি আমরা জানতাম না বলেই ভ্রান্ত পথে চলেছি, আল্লাহর দাসত্বের সঠিক মাধ্যম ও পদ্ধতি আমরা জানতাম না।

এ কারণে আমরা আমাদেরই অনুরূপ আরেক মানুষের কাছ থেকে সকল সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেছি'। বর্তমানে মানুষের পক্ষে এই অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে না। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধান ইনশাআল্লাহ অবিকৃত থাকবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সৃষ্টির শুরুতেই মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা দান করেছিলেন। মানুষ এর ভেতরে হীন স্বার্থের কারণে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নানা ধরনের মত-পথ আবিষ্কার করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الإِسْلاَمُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنم بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًام بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

নি:সন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর; যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯)

সমগ্র পৃথিবীতে নবী-রাসূল যেখানে যে ভাষায় আগমন করেছেন এবং তাঁদের প্রতি যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা ছিল ইসলাম। তাদের সকল শিক্ষাই ছিল নবী করীম (সা:) এর শিক্ষার অনুরূপ ইসলামী শিক্ষা। এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বিকৃত করে এর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে মানব গোষ্ঠীর ভেতরে যে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রসার ঘটানো হয়েছে, এর আসল কারণ এটাই ছিল যে, মানুষ তাদের বৈধ অধিকারের সীমারেখা লংঘন করে পার্থিব স্বার্থ সংক্রান্ত কিছু অবৈধ সুযোগ সুবিধা কামনা করছিল। এ কারণে তারা ইসলামী শিক্ষায় বিশ্বাস ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُوْنَع

(কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (দ্বীনের) বিষয় টুকরো টুকরো করে ফেললো (অথচ এদের সবার জানা উচিত, এরা আজ যতো মতবিরোধই করুক না কেনো), সর্বশেষে সবাইকে (এক হয়ে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া-৯৩)

নবুয়্যাত লাভের পূর্বে নবী-রাসূলের মন-মানসিকতা

কেউ কেউ অনুমান করেন নবী-রাসূলগণ নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বেও তেমনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যেমন জ্ঞান তাদের ছিল নবুয়্যাত লাভ করার পরে। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল। যে সকল নবী-রাসূল সম্পর্কে আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি, তাদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা যে নবী হবেন এই কথাটিও তাঁদের জানা ছিলো না। নবী করীম (সা:)ও জানতেন না তিনি নবী হবেন। শিশুকাল থেকেই তিনি মূর্তির প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণ তাঁকে কখনো মূর্তির সামনে নিতে পারেনি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি পরম সত্তার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং অনুধাবন করেছেন, দৃষ্টির সম্মুখের মানুষগুলো যাদের সামনে মাথানত করে মনের আকাংখা পেশ করছে, বিপদে

যাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। বরং সে মূর্তিই আরেকজন মহাক্ষমতাশালীর অধীন।

মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ) ছিলেন যাবতীয় পাপ ও পংকিলতার বহু উর্ধ্বে। পবিত্র কুরআন থেকে যেমন সূরা শুরার ৫২ নং আয়াত, সূরা কাসাসের ৮৬ নং আয়াত ও সূরা দুহার ৭ নং আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকেই আমরা জানতে পারি, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণের পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন সে জ্ঞান ছিলো সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষেরই অনুরূপ। সমাজের সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল এবং নবী-রাসূল ছিলেন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন–

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ ط

নিঃসন্দেহে তাঁরা (নবী-রাসূল) আমার কাছে বিশেষ বাছাই- পছন্দ করা সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য। (সূরা ছোয়াদ-৪৭)

নবুয়্যাত লাভের পূর্বে সাধারণের থেকে তাদের জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্মে অন্য মানুষের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও তাদের কাজের ধরন এবং মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ছিল সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের থেকে পৃথক। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং ওহী সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না বলেই ধারণা হয়। একদিকে এ কথার সাক্ষ্য পবিত্র কুরআন দেয় অপর দিকে সাক্ষ্য দেয় স্বয়ং নবীর অবস্থা। কেননা, ওহী সম্পর্কে যদি তাদের পূর্ণ জ্ঞান পূর্ব থেকেই থাকতো, তাহলে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়তেন না।

পক্ষান্তরে ওহী অবতীর্ণের পূর্বে তাদের মনে এবং চিন্তার জগতে যে সকল চিন্তার উদয় হতো, সে চিন্তার ভিত্তি মিথ্যার উপরে ছিলো না। প্রকৃত সত্যের দিকেই তাদের চিন্তা ধাবিত হতো। তাঁদের চোখ যা দেখতো, ঘুমের অবচেতন জগতে যে দৃশ্য এসে চোখের সামনে ধরা দিত তা ছিল বাস্তব। মহান আল্লাহ ওহীর জ্ঞান দিয়ে তাদের সামনে মহাসত্যের এক আশ্চর্য পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করে দিতেন। তাদের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হতো।

অর্থাৎ নবীগণ ওহীজ্ঞানের পূর্বে পরিচালিত হতেন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক হিদায়াতের দ্বারা। তাদের বুদ্ধির জগৎ মহান আল্লাহ এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা অনায়াসে বুঝে নিয়ে সেভাবে জীবন পরিচালিত করতেন। ইউরোপের মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না যে, কোনো একজন নবীও তাদের জীবনকালে মুহূর্তের জন্য কোনো মূর্তির সামনে মাথানত করেছেন।

কেনো করেননি? কারণ তাদের বুদ্ধিই বলে দিত পৃথিবীর অন্যান্য জড়পদার্থের মতই এসব মূর্তিও জড়পদার্থ। এসবের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নেই। সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাদের দৃষ্টি সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই নিপতিত হতো এবং তাদের মন বলে উঠতো, এসবের পেছনে একজন মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতা কার্যকর রয়েছে। সৃষ্টির কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। সাধারণ কোনো মানুষের মনে এ ধরনের চিন্তার উদয় না হলেও নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনে নবীদের মনে হতো। যারা উচ্চ পর্যায়ের সাধক ছিলেন বা সৃষ্টি জগৎ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সৃষ্টির সন্ধান করতে যেয়ে স্রষ্টার সন্ধান করতেন তাদের মনেও উল্লেখিত চিন্তার উদয় হতো।

এ কারণেই চিন্তাশীলগণ কুরআনের আলোকে বলেছেন, নবীদের নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনের চিন্তাধারা উচ্চ পর্যায়ের মানুষের চিন্তাধারার মতই ছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আহ্বান করেছেন, তোমরা যে পৃথিবীতে বাস করছো, তোমরা যে দেহ নিয়ে চলাফেরা করো, দৈনন্দিন জীবনে তোমরা যে সামগ্রী ব্যবহার করো, স্ত্রীর গর্ভে যা নিক্ষিপ্ত হয় এসব নিয়ে তোমরা কেনো চিন্তা-গবেষণা করো না?

এ সব নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলেই তোমরা অনুধাবন করতে পারবে, তোমাদের প্রকৃত স্রষ্টা কে। তোমরা অনুভব করতে পারবে, তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। মহান আল্লাহ যাকে নবী হিসেবে তাঁর বান্দাদের সামনে প্রেরণ করবেন, তাদের মনে এ সকল চিন্তার উদয় হতো এবং তারা মহাসত্য অনুধাবন করতেন। প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ চিন্তা-গবেষণা এবং সহজাত জ্ঞানের প্রয়োগ করে নবীগণ চলতেন। বিভিন্ন নবীর নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আমাদের সামনে সে সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনে দেখা যায়, সে সমাজে প্রচলিত কোনো একটি প্রথার সাথে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি বা ক্ষণিকের জন্যও তা গ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুহূর্তের জন্যও অংশীদারিত্ব মেনে নেননি। যে বিশ্বাসের বেষ্টনে তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন মাতৃগর্ভ থেকে এই বিশাল পৃথিবীতে এসে চৈতন্য উদয়ের পরে তিনি ঐ সকল বিশ্বাস নিজের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্য স্থান দেননি।

যে পরিবারে এবং পরিবেশে তিনি শিশুকাল থেকে চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, অবাক করার বিষয় হলো সে পরিবার এবং পরিবেশের সামান্য ছোঁয়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারলো না। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের জীবনে আর তাঁর জীবনে কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে আদর্শ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, সে আদর্শে যে বিকৃত করা হয়েছিল এবং ঘৃণিত নতুন প্রথার আমদানী করে তা অনুসরণ করা হতো, ক্ষণিকের জন্য তিনি তা মেনে নেননি। প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদানকৃত পশুর গোস্ত তিনি ভক্ষণ করেননি। বন্যার পানির ন্যায় যে

সমাজে মদ প্রবাহিত হতো, সে মদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। নারী ভোগের প্রতিটি দ্বার যেখানে ছিল উন্মুক্ত, তিনি সে দ্বারের দিকে অবচেতন মনেও কখনো নিজের পদদ্বয় দূরে থাক- মুহূর্তের জন্য স্বীয় মনকে অগ্রসর করাননি।

তাঁর গোত্র কুরাইশ গোত্র সে সমাজে আভিজাত্যের অহঙ্কারে এক বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাঁরা দাবী করতো সকল মানুষের মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হজ্জের সময়ে অন্যদের মতো তাদেরকে আরাফাতে যাওয়া আসা করতে হবে না। তাদের দাবী ছিল, কুরাইশরা শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কা'বার বাইরে গিয়ে সাধারণ হাজ্জীদের মতো আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, এটা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরা এটা জানতো যে, মক্কা থেকে হজ্জের সময় আরাফাতে গমন করা ইবাদাতের অংশ। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই ইবাদাতকে সংকীর্ণ করেছিল।

মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যারা কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে বা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তাঁরাও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সূত্রে মর্যাদার দাবী উত্থাপন করে কুরাইশদের অনুকরণে হজ্জের ইবাদাতে সংকীর্ণতা এনেছিল। তাঁরাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আরেকটি প্রথা তাঁরা প্রবর্তিত করেছিল, কা'বা এলাকার বাইরে থেকে যারা আসবে তাঁরা তাদের সাথে নিয়ে আসা খাদ্য গ্রহণ এবং পোষাক পরিধান করতে পারবে না। কা'বার সেবক কুরাইশরা যে খাদ্য সরবরাহ করবে তা গ্রহণ এবং যে পোষাক সরবরাহ করবে তা পরিধান করতে হবে। সরবরাহ করতে অক্ষম হলে উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করতে হবে। সে সমাজের মানুষ এ সকল বাতিল প্রথা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে অনুসরণ করতো।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরাইশদের এ সব প্রথা কখনো গ্রহণ করেননি। নবুয়্যাত লাভের পূর্বে কুরাইশদের প্রবর্তিত প্রথা নিষ্ঠুর পায়ে দলিত মথিত করে তিনি আরাফাতে গমন করতেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পদ্ধতিতে হজ্জ আদায় করেছেন, তিনি সে পদ্ধতি তথা আল্লাহ তা'য়ালার শিখানো নিয়মে হজ্জ সমাপন করেছেন। অর্থাৎ তদানীন্তন পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় অনাচার থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর দৃষ্টির সামনে বিরাজিত সমস্যা সমাধানের চিন্তায় নিজেকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলেন। প্রায়ই তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন। যে সকল সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তায় অস্থির থাকতেন, এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে দান করবেন। সুতরাং ওহী নাজিলের সময় যতো এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক

গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হতো তিনি তা বাস্তবে দেখছেন।

পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদীসে হযরত আয়িশা (রা:) এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা-গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা। তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা (রা:) স্বয়ং দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কখনো কয়েকদিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন।

হযরত আয়িশা (রা:) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ যে সময় তাঁকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুয়্যাতের একটি অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময় মহান আল্লাহ্ তাকে নির্জন বাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হতো। একাকী কোনো নির্জন স্থান সে সময় তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুয়্যাতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোনো নির্জন উপত্যকায় বা নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময় তিনি কোনো জড়পদার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ'!

সালামের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে তিনি সচকিত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। গবেষকদের ধারণা, ওহী এবং হযরত জিবরাঈল (আ:) কে যেন নবী করীম (সা:) ধারণ করতে পারেন এ কারণেই নবুয়্যাতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ্ এ অবস্থা সৃষ্টি করে তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

হাদীসে দেখা যায়, যে সময় তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার সময় কা'বাঘরে এসে তিনি সাত বার বা ততোধিক বার তওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময় তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখতেন তা শুধু মাত্র সে সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরনের স্বপ্ন নবুয়্যাত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন।

হাদীসে কুদসী নামে যে হাদীসসমূহ রয়েছে তা অনেকই এ পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়াও তাঁর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার উদয় করে দেয়া হতো। এরপর এক রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। রমজানের সেই মহান রাত বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকলো।

সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সা:) বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ:) এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখণ্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ:) আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে।

তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে পূর্বের অনুরূপ বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন, 'পড়ুন আপনার রব-এর নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে অবগত ছিলো না'। নবী করীম (সা:) বলেন, 'তিনি যা পড়লেন আমিও তাঁকে তা পরে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো ক্ষণপূর্বে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে'।

ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল (আ:) যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভূমিকা। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর নবী করীম (সা:) সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ (সা:)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল'!

এ কণ্ঠ শ্রবণ করে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাঈল (আ:) একজন অপূর্ব সৌম্যদর্শন আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দু'টো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি পুনরায় বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সা:)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!'

নবী করীম (সা:) হযরত জিবরাঈল (আ:) এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাঁকে দেখতে পেলেন। সমগ্র আকাশ জুড়েই জিবরাঈল (আ:) কে নবী করীম (সা:) বিরাজ

করতে দেখলেন। তিনি অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলেন। তিনি তাঁর কদম মোবারক কোনো দিকেই সরাতে পারছিলেন না। তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোনো দৃশ্য দেখলেন না। তারপর তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও'!

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হে খাদিজা! আমার এ কি হলো'! তারপর তিনি সকল ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে'।

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে কিছুতেই অসম্মানিত করবেন না এবং আপনার যশ ও খ্যাতির যথোচিত প্রসার না ঘটিয়ে আপনাকে তুলেও নিবে না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার হক আদায়কারী, সর্বদা সত্যবাদী, পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, অনাথ অক্ষম ইয়াতিম বিধবা প্রতিবন্ধীদের ভার বহনকারী, অভাবগ্রস্ত বেকারদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে সদাসচেষ্ট, অতিথিদের প্রতি যত্নবান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় দুঃস্থ মানুষের নিকটতম বন্ধু ও সাহায্যকারী'।

মানবতার চরোমৎকর্ষের যে মূল সাতটি গুণ মহান আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যে দান করেছেন তা হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) অল্প কথায় প্রকাশ করলেন। এরপরে হযরত খাদিজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। এ লোকটি ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা (রাঃ) এর চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারী হয়েছিলেন। তিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় ইন্জিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সকল ঘটনা জানালেন। তিনিও নবী করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করে ঘটনা জেনে নিলেন।

সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুয়্যাত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম'!

তাঁর এসব কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) জানতে চাইলেন, 'আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে'?

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল জানালো, 'অবশ্যই! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো'।

ওহীর সূচনায় নবী করীম (সাঃ) ও হযরত খাদিজা (রাঃ) এর এ সব ঘটনা অকাট্য এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর আগমনের মুহূর্তকাল পূর্বেও নবী করীম (সাঃ) কল্পনাও করেননি তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী পদের জন্য আকাংখা পোষণ করা তো অনেক পরের বিষয়, তাঁকে নিয়ে এমন ঘটনা ঘটবে এ ধরনের চিন্তাও তাঁর মনে কখনো জাগেনি। জিবরাঈল (আঃ) এর আগমন তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক বিষয়। এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঘটলে সে মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হতো, নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যেও তাই হয়েছে। তাঁর এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন।

এ কারণেই দেখা যায় তিনি যখন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন, তখন মক্কার লোকজন তাকে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করলেও এ কথা তাঁকে তারা বলেনি, 'আপনি বহুদিন থেকে নবী হবার চেষ্টা-সাধনা করছেন এবং একদিন আপনি এমন একটা কিছু দাবী করবেন এটা আমরা জানতাম'।

কিন্তু ইতিহাস বলে, তাঁরা এ ধরণের কোনো প্রশ্ন কখনো করেনি। না করার কারণ হলো, তাদের সামনে বিশ্বনবীর সমগ্র জীবনকাল ছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁরা তাঁকে দেখছিল। নবী করীম (সাঃ) এর ভেতরে তাঁরা এমন কোনো কিছু দেখেনি, যার কারণে তাদের কাছেও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবুয়্যাত ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। ফলে তারা তাঁকে নানা প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করলেও ঐ প্রশ্ন কখনো করেনি।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তখন একমাত্র নবী করীম (সাঃ) ই ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। এ কারণেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য মনে করেননি, তাঁর মতো সৎ এবং পবিত্র মানুষের একটা কিছু হওয়া উচিত। নবী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর মধ্যে সাধারণ কোনো নেতা হবার প্রবণতাও ছিল না। তারপর তাঁর ওপরে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তিনি এই গুরু দায়িত্বের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সাধারণ কয়েকজন মানুষের ওপরে নয়, বিশেষ কোনো দেশ বা এলাকা অথবা শুধু মক্কার দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়নি। তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে বিশ্বনবী, বিশ্বনেতা। তিনি শুধু সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য নির্বাচিত হলেন না, সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য নির্বাচিত

হলেন। এ যে কত বড় দায়িত্ব তা আমরা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারি না। এই দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও তিনি অস্থির ছিলেন।

নবী করীম (সা:) এর ক্ষেত্রেই যখন তাঁকে সেই শিশুকালে জানতে দেয়া হয়নি যে, তিনি নবী হতে যাচ্ছেন তখন অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে তো জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। তবে এই পৃথিবীতে যাদেরকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাঁরা সবাই যে তৎকালিন সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। তারপর ওহী অবতীর্ণ হবার পরে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তই তাদের অতিবাহিত হয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায়।

নবুয়্যাত জীবনে সকল নবী-রাসূলই ওহীভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা জীবন পরিচালনা করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায়কেও আহ্বান জানিয়েছেন যেনো তারা তাঁকেই অনুসরণ করে। নবী করীম (সা:) নবুয়্যাত জীবনে যা কিছুই করেছেন এবং বলেছেন তা সবই ছিলো ওহীভিত্তিক। এ কারণেই তাঁর নবুয়্যাত জীবনের সকল কিছুই সমগ্র মানবতার জন্যে একমাত্র অনুসরণীয় অনুপম আদর্শ।

নবী-রাসূলের নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য ও মানবিক সত্তা

আমরা পবিত্র কুরআন থেকে জানতে পারি, নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতেন। ওহীর আগমন তাদের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে বিশাল শক্তিতে পরিণত করতো। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ক যেসব সত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতো, আল্লাহ তা'য়ালার ওহী সেগুলো সত্য হবার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতো। পরম সত্যের সাথে নবীদেরকে চাক্ষুষ পরিচয় করে দেয়া হত, নবীগণ সেসব বিষয়ে মানুষের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করতেন।

পবিত্র কুরআন বারবার মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছে, তোমরা চিন্তা-গবেষণা করো, দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো। নবী-রাসূল নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে তাই করতেন। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করলে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা এভাবে চিন্তা-গবেষণা করেই পরম সত্তার সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হবার কারণে তারা প্রকৃত সত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন এবং মানুষকেও সেদিকেই আহ্বান করেছেন।

ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তাদেরকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছিল যে, যে জ্ঞান শুধু তাদের জন্যই মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নবী-রাসূলকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, অদৃশ্য

জগতের যতটুকু জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন ছিল আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অদৃশ্য জগতের জ্ঞান নবীকে ততটুকুই দান করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনার মুকাবেলায় তাদের মতামত সঠিক নয়।

কুরআন দাবী করছে, নবীদেরকে অদৃশ্য জগতের এমন জ্ঞান ভাণ্ডার দান করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে জ্ঞান লাভ করার কোনো উপায়ই নেই। পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ইউসুফের ৮৬ নং আয়াত থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন-

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ-

সে (আরো) বললো, আমি আমার (অসহনীয়) যন্ত্রণা, আমার দুশ্চিন্তা(-জনিত অভিযোগ) আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই নিবেদন করি এবং আমি নিজে আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে (তাঁর কথাবার্তা) যতোটুকু জানি, তোমরা তা জানো না। (সূরা ইউসুফ-৮৬)

অদৃশ্য জগতের অবস্থা সম্পর্কে নবীগণ যা জানেন এবং দেখেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সে স্তর অতিক্রম করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'তোমরা শোনো, আল্লাহর শপথ! আমি যা জেনেছি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং কাঁদতে সবচেয়ে বেশি'। (বুখারী)

তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে পেছনে ঠিক তেমনভাবেই দেখি যেমনভাবে সামনে দেখি'। (বুখারী)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) কে দু'টো পবিত্র চোখ দান করেছিলেন। তিনি সে চোখ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পেতেন। কিন্তু তাঁর পেছনে চোখ না থাকলেও তিনি আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া শক্তির কারণে পেছনেও দেখতে পেতেন। অর্থাৎ সামনে পেছনে তিনি একইভাবে দেখতেন। নবী-রাসূলগণ অদৃশ্য জগতের যতটুকু সংবাদ মানুষকে জানিয়ে গেছেন, এ কথা ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে, তাঁরা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে ঐ পরিমাণ জ্ঞানই রাখতেন। বরং এর চেয়ে শত সহস্রগুণ বেশি জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে।

অকারণে তাদেরকে এই জ্ঞান দান করা হয়নি। এসব জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়েছিল তাদের দায়িত্বের কারণে। তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করতেন সে দায়িত্ব পালন করতে গেলে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তাদের সীমাহীন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল। এই জ্ঞান তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক হত। তাঁরা যা দেখতেন এবং বুঝতেন তা সাধারণ মানুষের জানার বা বুঝার প্রয়োজন নেই। যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু তাঁরা

মানুষকে জানিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ ঐ অদৃশ্য জ্ঞান সহ্য করতে পারবে না। এ কারণেই মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানাননি।

হযরত মূসা (আ:)ই প্রথম দিকে সহ্য করতে পারেননি, নবী করীম (সা:)ও প্রথম দিকে ঐ জ্ঞানের জগৎ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাহলে সাধারণ মানুষের সামনে ঐ জ্ঞানের সামান্যতম বিন্দু প্রকাশিত হলে এই মানুষের পক্ষে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না।

এই পৃথিবীতে নবী-রাসূল সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী এবং তাঁরা মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যে ঘটনা ঘটে তা হয়তঃ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু ঐ একই ঘটনা যদি নবীর জীবনে ঘটে তাহলে তা গুরুত্ব বহন করে। সে ঘটনা তাঁর অনুসারীদের জন্য অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। নবী জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাও মানুষের জন্য আইনে পরিণত হয়। এ কারণে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিলো। কারণ নবী জীবনের সকল কিছুই মানুষের জন্য অনুসরণীয়। নবী করীম (সা:) তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদেরকে বলতেন, 'আমি তোমাদের সাথে যে আচরণ করি, তা মানুষকে জানিয়ে দাও। আমি দিনে যা করি এবং রাতে যা করি, সকল কিছুই মানুষকে জানিয়ে দাও'।

কারণ তাঁর জীবনের সকল কিছুই মানুষ অনুসরণ করবে। তাদের জীবনের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজও মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে না। কোনো নবী যদি কখনো কোনো কাজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে করেও থাকেন, তাহলে সাথে সাথে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। কেননা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার কিতাবেই নয়, মহান নবীর জীবন আদর্শ হিসেবেও মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, আর এই বিধানে আল্লাহ্ তা'য়ালার অপছন্দনীয় সামান্য কোনো অংশ থাকতে পারবে না।

পৃথিবীতে প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূল আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে একই মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁদের দায়িত্ব অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে অদৃশ্য জগতের জ্ঞান দান করেছিলেন। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী কিভাবে তিনি পরিচালনা করছেন, এটা তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে। তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু ঘটান আবার মৃত থেকে জীবিত করেন তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এই পৃথিবী ও অদৃশ্য জগতের মাঝে যে পর্দা অন্তরায় হিসেবে রয়েছে, মহান আল্লাহ্ সে পর্দা তাঁদের দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে এমন সব দৃশ্য দেখিয়েছেন, যে দৃশ্য অবলোকন করলে সাধারণ মানুষ চেতনা হারিয়ে ফেলবে।

এসব জিনিসের প্রতি মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে, নবীগণ মানুষকে এসব জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ কারণেই নবীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ঐসব জিনিসের সাথে চাক্ষুষ পরিচয় করে দিয়েছেন। অনেকে আবার নবীদের সাথে পৃথিবীর মানুষ দার্শনিকদের তুলনা করে থাকেন। দার্শনিকগণও তো এমন অনেক কথা বলেন, যা দেখা যায় না। অর্থাৎ নবী আর দার্শনিকদেরকে তারা এক কাতারে দাঁড় করাতে চান।

পৃথিবীর দার্শনিকগণ যা বলেন তা অনুমানের ভিত্তিতে বলেন। যেসব দার্শনিক মানুষ হিসেবে নিজের মর্যাদা ও অবস্থান, জ্ঞানের পরিধি অবগত আছেন, তারা কখনো নিজের মতামতই চরম সত্য বলে রায় দেন না। কিন্তু নবী-রাসূল যা বলেন, তা নিজের চোখে দেখে এবং ওহী জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। নবীগণ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেন না। কিন্তু দার্শনিকগণ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে। নবীদের চোখের সামনে গোপন জগতের পর্দা উঠিয়ে যা দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েই কথা বলেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্ত ান হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ঘটনাক্রমে পিতার সান্নিধ্য থেকে কয়েক বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা তাঁর সন্তানের সন্ধান জানতেন না। তাঁর অন্যান্য সন্তানগণ ব্যবসা উপলক্ষ্যে যখন মিশর গিয়েছিল তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের রাষ্ট্রপতি। তিনি জীবিত আছেন এর চিহ্ন স্বরূপ ভাইদের কাছে তাঁর শরীরের একটি জামা দিয়েছিলেন, যেন তাঁর পিতা সান্ত্বনা লাভ করেন।

সেই জামা নিয়ে যখন তাঁর ভাইগণ আসছিল তখন কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থান করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর শরীরের গন্ধ অনুভব করছিলেন। এ ধরনের ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁর এ নবীকে দান করেছিলেন। কিন্তু এরপরেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সকল নবীই মানুষ ছিলেন। তাদের ভেতরে মানবিক সত্তা ছিল। তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার কোনো অভিনব সৃষ্টি ছিলেন না। একজন মানুষকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না।

সাধারণ মানুষের এই পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন হয়, নবী-রাসূলেরও তাই হত। তাঁরা ক্ষুধা অনুভব করতেন, তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন হত। রক্ত মাংশে গঠিত ছিল তাদের শরীর। তাঁরাও বেদনা অনুভব করতেন। রোগাক্রান্ত হতেন। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁরাও শ্রম দিতেন। বিবাহিত জীবনে তাঁদেরও সন্তান জন্ম হতো। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে তাদেরকেও যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু তাদের মানবীয় এই সত্তা পরিচালিত হত মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইশারায়। কেননা, তাদের জীবনের সবটুকুই তাঁর অনুসারীদের জন্য ছিল অনুসরণীয়।

মুমিনদের জন্য নির্ধারিত যে গুণাবলী এবং পূর্ণমান, সে মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা এই পৃথিবীতে একজন মুমিনের পক্ষেও সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুমিনের মান ওঠা নামা করে। যখন সে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকে তখন মুমিন হিসেবে সে পূর্ণমানে অবস্থান করে। আর তাঁর দ্বারা যখন সামান্য ভুল হয়ে যায় তখন সে ঐ পূর্ণমান থেকে সামান্য নীচে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আকাংখিত মানে প্রতিটি মুহূর্ত অবস্থান করা মানুষ হিসেবে মুমিনদের জন্য সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন হলো, নবী-রাসূলেরও অবস্থা এমন হতো কি না। এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পবিত্র কুরআন-হাদীসে অনুসন্ধান করবো। আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই, হযরত নূহ (আঃ) এর যুবক সন্তান যখন তাঁরই চোখের সামনে পানিতে ডুবে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন হযরত নূহ (আঃ) এর ভেতরে মানবীয় দুর্বলতা ক্ষণিকের জন্য স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর সে সন্তান ছিলো আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের শত্রু। মুহূর্ত কয়েকের ভেতরে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আল্লাহর বিধানের মুকাবেলায় তিনি যুবক সন্তানের মমতা হৃদয়ে স্থান দেননি।

এ ধরনের নানা ঘটনা বিভিন্ন নবীর জীবনে সাময়িকের জন্য ঘটেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ মুহূর্তের ভেতরে নবীকে সংশোধন করেছেন। একজন নবীর নিষ্পাপ হবার অর্থ এই নয় যে, নবীর দ্বারা পাপ সংঘটিত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। অথবা সব ধরনের পাপ ও ভুল করার ক্ষমতা নবীর সত্তা থেকে মহান আল্লাহ ছিনিয়ে নিয়েছেন। প্রকৃত বিষয় হলো, নবী ভুল করার প্রবণতা রাখেন কিন্তু তাঁর মানবিক আবেগ অনুভূতি, মানবিক গুণাবলী, ইচ্ছা আশা নিরাশার অধিকারী হবার পরেও তিনি এমন আল্লাহভীরু ও সৎ হন যে, তিনি কখনো সচেতনভাবে কোনো ভুল করেননি।

প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে খারাপ প্রবৃত্তি অবস্থান করছে, মানুষ যত খারাপ কাজ করে ততই সেই খারাপ প্রবৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ খারাপ কাজ বা পাপের কাজই হলো কুপ্রবৃত্তির খোরাক বা আহার। নবীর ভেতরে সেই শক্তি আহার না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং নবীর মধ্যে পাপ করার কোনো আকাংখা সৃষ্টি হতে পারে না। তারপরেও তাঁর দ্বারা যদি সামান্যতম ভুল হতে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করেন। কারণ নবীর পদস্খলন শুধু তাঁর পদস্খলন নয়, সমগ্র উম্মতের পদস্খলন। নবী যদি মহাসত্যের বাইরে ভুলের দিকে বিন্দু পরিমাণ এগিয়ে যান, তাহলে সমগ্র পৃথিবী ভুলের দিকে কয়েক শত মাইল এগিয়ে যাবে।

নবী-রাসূল যে নিষ্পাপ ছিলেন এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। গুনাহ তথা নাফরমানীর কাজে জড়িয়ে পড়া, নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য হারাম কাজ করা থেকে নবী-রাসূলকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এই সংরক্ষণ শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের জন্যই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবীদেরকেই দান করে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে

সম্মানিত করেছেন। সৃষ্টির সকল মানুষের তুলনায় তাদেরকে বিশিষ্ট বানিয়ে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মর্যাদা তাদেরকে দান করা হয়েছে।

পাপ ও অবাধ্যতা থেকে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ সংরক্ষণ লাভের এই মর্যাদা শুধুমাত্র নবীদেরই রয়েছে। নবী-রাসূল ব্যতীত এই গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সৃষ্টি জগতে আর কোনো মানুষের নেই এবং কোনো মানুষের তা প্রাপ্যও নয়। নবী-রাসূলগণ এই সংরক্ষণ লাভ করেন শুধুমাত্র বড় বড় পাপ থেকেই নয়, ছোট ছোট পাপ থেকেও তাঁরা এই সংরক্ষণ লাভ করেন। এ কারণে তাদের দ্বারা আল্লাহর সাথে সামান্যতম অবাধ্যতা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

নবী-রাসূল নিষ্পাপ মাসুম, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা মানবীয় প্রকৃতিই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই ভুল-ভ্রান্তির প্রকৃতি সম্পন্ন। মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও উদ্যম উদ্যোগ কোনো কোনো সময় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এ যেমন সত্য, তেমনি সাময়িক ক্রোধ বা অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়েও নবী রাসূল এমন কোনো কাজ হঠাৎ করতে পারেন, যা আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ করেন।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করে দেন। সে ভুলকে স্থায়ী হতে দেন না। সে ভুলের প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এসব ক্ষুদ্র ভুলের ওপরে নবীগণ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। এমন হতে পারে যে, নবীকে আল্লাহ ভুল করার সুযোগ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করেন যে, নবীগণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এ কারণে নবীগণ পাপী হন না বা তাদের মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না।

সাময়িকের জন্য নবীগণ যে ভুল করতে পারেন বা মহান আল্লাহর বলে দেয়া কথা ভুলে যেতে পারেন, তার বড় প্রমাণ হযরত আদম (আ:)। তিনি ভুল করেছেন, এ উপলব্ধিবোধ তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হবার সাথে সাথে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন, মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে নবুয়্যাত দান করেছেন। নবীগণ যাদু প্রভাবিত হতে পারেন। হযরত মূসা (আ:) এর সামনে যখন ফিরাউনের যাদুকররা যাদু নিক্ষেপ করেছিল, সে সময়ের চিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে–

قَالَ بَلْ أَلْقُواج فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى– فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى–

যাদুর প্রভাবে তাঁর (মূসার) কাছে মনে হলো তাদের (যাদুর) রশি ও লাঠিগুলো বুঝি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে, (এতে মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভয় (ও শঙ্কা) অনুভব করলো। (সূরা ত্বাহা-৬৬-৬৭)

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অভয় দান করে বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই। তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো। তা এখনই তাদের মিথ্যা জিনিসগুলো গিলে ফেলবে। ওরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, তা যাদুকরের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যাদুকর কখনই সফলকাম হতে পারে না, তা ওরা যতই শক্তি দেখাক না কেনো।

সে সময় সাধারণ মানুষ যেমন যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, হযরত মূসা (আ:) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কুরআন বলছে, তিনি ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয় পাওয়া ছিল তাঁর মানবীয় দুর্বলতা। কিন্তু তিনি এই ভয়ের ওপর স্থায়ী ছিলেন না। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি নিজেকে ভয় মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে যাদু কোনো নবীকে বিভ্রান্ত করতে বা তাঁর নবুয়্যাতের প্রতি বিরূপ কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। স্বয়ং নবী করীম (সা:) এর ওপর দৈহিকভাবে যাদুর ক্রিয়া ঘটেছিল। এ কারণে তিনি তাঁর জীবনে বেশ কষ্ট অনুভব করেছেন।

হযরত ইউনুস (আ:) তাঁর জাতিকে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। তারা অস্বীকার করেছিল। তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন। বললেন তিনদিনের মধ্যে আযাব আসবে। লোকজন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কাতর প্রর্থনা করেছিল। মহান আল্লাহ শাস্তি মওকুফ করে দিলেন। হযরত ইউনুস (আ:) চিন্তা করলেন, তিনদিনের ভেতরে যখন আযাব এলো না তখন এবার তাঁকে লোকজন মিথ্যাবাদী ধারণা করে তাঁকে হত্যা করবে।

তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশের অপেক্ষা না করে দেশ ত্যাগ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতীত কোনো নবীর জন্য তাঁর স্থান ত্যাগ করা নবুয়্যাত-মর্যাদার পরিপন্থী। সুতরাং মহান আল্লাহ তাকে গ্রেফতার করলেন। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। তাঁকে বিশাল এক মাছ গ্রাস করেছিল। আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। এ ধরনের অনেক ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, নবীগণ সাময়িক ভুল করলেও মহান আল্লাহ তা সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু তাদের সে ভুল মারাত্মক কিছু ছিল না। তা ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র পর্যায়ের।

প্রত্যেক নবীর চরিত্রের সনদপত্র মহান আল্লাহ দান করেছেন। নবী করীম (সা:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا–

(হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে

আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করে। (সূরা আহ্যাব-২১)

নবী করীম (সা:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ–

নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। (সূরা ক্বালাম-৪)

সূরা ইয়াসিনের প্রথম আয়াতেই বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ করে আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে সহজ-সরল এবং নির্ভুল পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রেরিত নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। হযরত ইবরাহীম (আ:)ও আল্লাহর কাছে অতীব মর্যাদাবান নবী এবং মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ج

তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ। (সূরা মুমতাহিনাহ-৪)

সূরা মরিয়মে হযরত ইবরাহীম (আ:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ একজন মর্যাদাবান নবী। একই সূরায় হযরত মূসা, হযরত ইদরীস ও হযরত ইসমাঈল (আ:) এর প্রশংসা করেছেন। নবী-রাসূল মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন–

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ط فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هَؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ- أُوْلَآئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ط قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ط إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِيْنَ ع

এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়্যাত দান করেছি, (আজ) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই), আমি তো (অতীতে) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি। আল্লাহ (এদের) সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন; (হে নবী) আপনি এদের পথেরই অনুসরণ করুন। (সূরা আনয়াম-৮৯-৯০)

প্রত্যেক নবীই ছিলেন মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাঁরা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। বদরের প্রান্তরে নবী করীম (সা:) সিজদায় অবনত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি এ দাবী করেননি যে আমি একাই যথেষ্ট, আমার সামনে যে শত্রু আসবে সে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব

(আ:) রোগে আক্রান্ত হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তিনি স্বয়ং এ দাবী করেননি যে, আমি রোগ মুক্ত করতে সক্ষম।

হযরত ইউনুস (আ:) বিপদগ্রস্থ হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করেছেন, তিনি নিজে এ দাবী করেননি যে, আমি বিপদ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনে তাদের ইতিহাস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মহান নবী-রাসূল ছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান বান্দা। তাঁরাই যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী হয়েছেন, বিপদগ্রস্থ হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষও যেনো একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়। কোনো মৃত মানুষ বা পৃথিবীর কোনো শক্তির কাছে যেন সাহায্যের জন্য আবেদন না করে মানুষ যেনো আরেক মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়।

নবী-রাসূলদের মর্যাদা

নবী ও রাসূল এ দু'টো শব্দই আরবী এবং শব্দ দু'টোর অর্থও পৃথক। নবী শব্দের অর্থ সম্পর্কে অভিধানবিদগণের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। কেউ কেউ 'নবী' শব্দটিকে আরবী 'নাবা' শব্দ থেকে গঠিত বলেছেন এবং এর অর্থ করেছেন 'সংবাদ'। কেউ কেউ বলেছেন, আরবী 'নাবুউ' ধাতু থেকে 'নবী' শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থ হচ্ছে 'উন্নতি ও উচ্চতা'। এ অর্থের দিক থেকে এর মানে হয় 'উন্নত মর্যাদা' ও 'সুউচ্চ অবস্থান'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মূলত শব্দটি 'নাবী' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং এর অর্থ 'পথ'। আর তাদেরকে এ জন্যে 'নবী' বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন মানুষের সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়ার পথ বা তাঁরা হলেন মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার দিকে যাবার পথ।

আরবী 'রাসূল' শব্দের অর্থ 'প্রেরিত'। এ অর্থের দিক থেকে আরবী ভাষায় দুত, পয়গম্বর, বার্তাবাহক ও রাষ্ট্রের দূতের জন্যেও এ 'রাসূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি এমনসব ফিরিশতার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় অথবা এমন সব উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষকে 'রাসূল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছে নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে সাধারণত এ শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে দেখা যায়, একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু নবী বলা হয়েছে এবং কোথাও বা শুধু রাসূল বলা হয়েছে। অথবা কোথাও নবী-রাসূল একই সাথে বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে রাসূল ও নবী শব্দ দুটো এমনভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে অনুভব করা যায়, এ উভয়ের মধ্যে মর্যাদা বা কাজের ধরনের দিক দিয়ে কোনো পারিভাষিক

পার্থক্য রয়েছে। সূরা হজ্জ-এর ৫২ নং আয়াতে নবী ও রাসূল শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সূরা হজ্জ-এর উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে নবী ও রাসূল শব্দ দু'টির পার্থক্যের ধরন কি তা নিয়ে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেউই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে নবী ও রাসূল-এর মধ্যে পৃথক মর্যাদা চিহ্নিত করতে পারেননি। গবেষকগণ শুধু এ নিশ্চয়তা সহকারে বলেছেন, রাসূল শব্দটি নবী শব্দের তুলনায় বিশিষ্টতাসম্পন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল হন না। অর্থাৎ নবীদের মধ্যে রাসূল শব্দটি এমন সব নবীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যাদেরকে সাধারণ নবীদের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো।

ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, মর্যাদা নিরুপণ হয় জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মের কারণে। নবুয়্যাত পূর্ব জীবনে নবী-রাসূলের চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র ও বাস্তব জীবনধারা ছিলো সর্বোচ্চ মানের। কারণ হঠাৎ করেই কোনো মানুষকে নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত করা হয় না। রূহের জগতেই ফায়সালা হয়ে যায় আল্লাহ তা'য়ালা কোন্ ব্যক্তিকে নবী হিসাবে মনোনীত করবেন। যেমন হযরত জাকারিয়া (আঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়েছিলেন–

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِنِ اسْمُهُ يَحْىٰ لا لَمْ نَجْعَل لَّه مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا–

হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া, এর পূর্বে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি। (সূরা মারইয়াম-৭)

কোনো দিক থেকে ত্রুটি সম্পন্ন কোনো মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল নির্বাচিত করেননি। নবী-রাসূল নির্বাচিত হয়েছেন এমন ধরনের মানুষ যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিক দিয়ে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোনো নবী-রাসূলকে এমন কোনো দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাষ্পদ হন অথবা লোকজন তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত মূসা (আঃ) তো তোতলা ছিলেন।

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, হযরত মূসা (আঃ) এর নামে প্রচলিত এ কথাটি কুরআন-হাদীসের নয়। ইয়াহূদী- খৃষ্টানদের রচিত বাইবেল ও তালমুদ থেকে এ কথাটি গ্রহণ করা হয়েছে। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে ৪: ১০- মূসা (আঃ) এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'হায় সদাপ্রভু! আমি বাকপটু নহি, ইহার পূর্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ করিবার পরেও নহি। কারণ আমি জড়মুখ ও জড় জিহ্বা'। তালমুদে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, শৈশবে হযরত মূসা যখন ফিরআউনের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন একদিন তিনি ফিরআউনের মাথার

মুকুট নামিয়ে নিজের মাথায় পরেন। এতে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, এ শিশুটি এই কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে না এটি শিশুর শিশুসুলভ চপলতা। এ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয় এভাবে যে, শিশুর সম্মুখে স্বর্ণ ও আগুন রাখা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে তাই রাখা হলো। শিশু মূসা আগুন উঠিয়ে মুখে দিলেন। এতে তাঁর জিহ্বা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হলো এবং তিনি তোতলা হয়ে গেলেন।

এই কাহিনী বাইবেল ও তালমুদ থেকে কুরআনের কতিপয় তাফসীরে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি এ কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কারণ শিশু যদি আগুনেও হাত দেয় তাহলে সে আগুন উঠিয়ে মুখে দেয়া তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ আগুনের তাপ বা দহন জ্বালা অনুভব করার সাথে সাথেই তো শিশু তা ফেলে দিবে অথবা হাত সরিয়ে নিবে।

কুরআনের বর্ণনা থেকে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি যে, হযরত মূসা (আঃ) নবুয়্যাত লাভের পরে দাওয়াতী কাজের লক্ষ্যে যে ধরনের বাগ্মীতার প্রয়োজন তা মূসা (আঃ) নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রথম দিকে বাকপটু ছিলেন না। ইতোপূর্বে তিনি কখনো বক্তৃতা দেননি আর বিষয়টি ফিরআউনের জানা ছিলো, কেননা তিনি ফিরআউনের ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস যাদের নেই, তারা বক্তৃতা দিতে গেলে স্বভাবসুলভ সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যেই তিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীন বুঝানোর মতো শব্দ চয়ন করে মূল বিষয়টি বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করার যোগ্যতা আল্লাহর কাছে চেয়েছিলেন।

হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন বাকপটু, এ কারণে তিনি হযরত হারুন (আঃ) কে নিজের সহযোগী হিসাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আঃ) এর এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিলো। হযরত মূসা (আঃ) কে আল্লাহ কত উচ্চে মর্যাদা দিয়েছিলেন যে, মূসা (আঃ) যেনো পৃথিবীর আলো বাতাসে আসতে না পারেন এ জন্যে ফিরআউন অগণিত গর্ভবতী নারীকে হত্যা করেছিলো। অসংখ্য সদ্যজাত শিশু সন্তানকে হত্যা করেছিলো। নিজের রাষ্ট্র ক্ষমতা নিরাপদ করার উদ্দেশ্যেই ফিরআউন এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো। শিশু মূসাকে দেখার সাথে সাথে তো তাঁকে হত্যা করার কথা।

কিন্তু মহান আল্লাহ ফিরআউনসহ অন্যান্য সকলের মনে হযরত মূসার প্রতি গভীর মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা কি বিশাল মর্যাদা দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখেই ছিলে। মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির সম্মুখে থাকা যে কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার তা কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِىْ–

হে মূসা, আমি আমার পক্ষ থেকে ফিরআউন ও অন্য মানুষদের মনে তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেনো তুমি আমার চোখের সামনেই বড় হতে পারো। (সূরা ত্বাহা-৩৯)

হযরত ইউসুফ (আ:) কৈশরে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা নিজ পিতা হযরত ইয়াকুব (আ:)-এর কাছে বর্ণনা করার পর তিনি নিজ সন্তানকে বলেছিলেন–

وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ–

এমনি করেই তোমার মালিক তোমাকে (নবুয়্যাতের জন্যে) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (সহ দুনিয়ার জ্ঞান) শিক্ষা দিবেন। (সূরা ইউসুফ-৬)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইউসুফ (আ:) কে এভাবে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া (আ:) এর প্রশংসা করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يَا يَحْيِى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ط وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا لا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ط وَكَانَ تَقِيًّا– وَبَرًّام بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا– وَسَلمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّاع

(ইয়াহইয়া যখন বড় হলো, তখন আমি তাকে বললাম) হে ইয়াহইয়া, আমার কিতাবকে তুমি শক্তভাবে ধারণ করো, প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে ছেলে বেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম। সে আমার একান্ত কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা লাভ করলো, সে ছিলো আসলেই একজন পরহেযগার ব্যক্তি। তদুপরি সে ছিলো পিতা-মাতার একান্ত অনুগত, কখনো অবাধ্য ও নাফরমান ছিলো না। তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হয়েছিলো যেদিন তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন) যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম-১২-১৫)

প্রত্যেক নবী-রাসূলই মহান আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবে তাদের মর্যাদার ধরণ ছিলো পৃথক। হযরত ঈসা (আ:) কে আল্লাহ তা'য়ালা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই কথা বলার মর্যাদাসহ অন্যান্য মর্যাদা দান করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর লোকজন যখন নানা ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেছিলো তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বলেছিলেন–

قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللَّهِ قف آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا– وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ س وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلوةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا– وَبَرًّا بِوَالِدَتِى ز وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا– وَالسَّلمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا–

আমি আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেনো তিনি আমাকে তাঁর অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন যেন আমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান করি। আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে নাফরমান করে পয়দা করেননি। আমার ওপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, শান্তি সেদিন যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো। (সূরা মারইয়াম-৩০-৩৩)

হযরত ইবরাহীম (আ:) কে আল্লাহ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করে তাঁকে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হিসাবে ঘোষণা করেছেন–

هُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِّلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا

তিনি (পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সঙ্কীর্ণতা রাখেননি, (তোমরা প্রতিষ্ঠিত থেকো) তোমাদের (জাতির) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর; সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো। (সূরা হজ্জ-৭৮)

মহান মালিক আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ:) এর প্রশংসা করে বলেছেন–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ ط إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا–

এই কিতাবে তুমি ইবরাহীমকে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক সত্যবাদী নবী। (সূরা মারইয়াম-৪১)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَه مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِيْنَ–

আমি পূর্বেই ইবরাহীমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া-৫১)

তাঁর পিতা ছিলেন নমরুদ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকার, দেশের জনগণ ও নিজ পিতাকে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত দেখে তিনি পিতাকে বলেছিলেন–

يَا أَبَتِ إِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا–

হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। (সূরা মারইয়াম-৪৩)

হযরত লূত (আ:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيْنَ لا وَأَدْخَلْنَاهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ط إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

(ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, তাকেও আমি এমন একটি জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গোনাহ্গার জাতি, আর আমি তাকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছি, সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল। (সূরা আম্বিয়া-৭৪- ৭৫)

হযরত ইসহাক (আ:) ও হযরত ইয়াকুব (আ:) সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا- وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ع

এদের সবাইকে আমি নবী বানিয়েছি। আমি তাদের ওপর আমার আরো বহু অনুগ্রহ দান করেছি এবং মানুষদের মধ্যে আমি তাদের সুউচ্চ সম্মানও দান করেছি। (সূরা মারইয়াম-৪৯-৫০)

হযরত ইসমাঈল (আ:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ ز إِنَّه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا ج وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَه بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّه مَرْضِيًّا-

এ কিতাবে তুমি ইসমাঈলের কথাও স্মরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রুতি পালনকারী, আর সে ছিলো রাসূল ও নবী। সে তার আপনজনদের নামাজ প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, সে ছিলো তার মালিকের (আল্লাহর) একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি। (সূরা মারইয়াম-৫৪-৫৫)

হযরত ইদরীস (আ:) সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ ز إِنَّه كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ق لا وَّرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-

তুমি এ কিতাবে ইদরীসের কথাও স্মরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম-৫৬-৫৭)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُوْدَ سُلَيْمَانَ ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط إِنَّهُ أَوَّابٌ-

আমি দাউদকে ছেলে হিসাবে সুলাইমানকে দান করেছি, সে ছিলো আমার উত্তম একজন বান্দা, সে অবশ্যই ছিলো তার মালিকের প্রতি নিষ্ঠাবান। (সূরা ছোয়াদ-৩০)

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ ج وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِى رَحْمَتِنَا ط إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِيْنَ-

ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফল, এরা সবাই আমার ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম, কারণ তারা ছিলো নেককার মানুষদের দলভুক্ত। (সূরা আম্বিয়া-৮৫-৮৬)

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ–

আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৫)

নবী-রাসূলদের অসীম মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাদের সাথে বিরোধিতা বা তাদের কথা অমান্য করা অথবা তাদের সাথে কোনো প্রকার বেয়াদবি করা মহান আল্লাহর সাথে বিরোধিতা করার শামিল বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

আর যারাই এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের জানা উচিত আল্লাহ তাদের কঠোর আযাব দিবেন। (সূরা আনফাল-১৩)

নবী-রাসূলদের আল্লাহ তা'য়ালা এত উচ্চে মর্যাদা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে। একটি জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হবে, তা নির্ধারণ করার জন্যই নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়। জাতি যদি তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে সে জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা উন্নতি সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌছে দিবেন এবং তাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিরাজ করবে শান্তি। অমুসলিম দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সর্বত্র অশান্তির দাবানলে জ্বলতে জ্বলতে জীবনকে নিজেদের জন্যে এক দুর্বিষহ বোঝা মনে করছে, আর এ জন্যেই তারা 'স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার' এর জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

জাতি যদি নবীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তাদের জীবনে নেমে আসবে অশান্তির দাবানল। জাতি যদি নবীর সাথে ইনসাফ করে অর্থাৎ নবীর আনুগত্য করে, তাহলে সে জাতি আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে ইনসাফ লাভের অধিকারী হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ সে জাতির প্রতি ইনসাফ করেন। আর জাতি যদি নবী বা নবীর আনিত আদর্শের সাথে ইনসাফ না করে তাহলে তাদের ভাগ্যে অশান্তিই নির্ধারিত হয়। এর সবথেকে বড় প্রমাণ হলো বর্তমানে মুসলিম মিল্লাত। পৃথিবীতে প্রচুর অর্থবিত্ত, সম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী হয়েও এরা আজ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত।

কারণ মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে নবী করীম (সা:) এর মর্যাদার সাথে। তিনি যে আদর্শ উপহার দিয়েছেন, সেই আদর্শের প্রতি যতদিন মুসলিম মিল্লাত সম্মান প্রদর্শন করে তা অনুসরণ করেছে, ততদিন এ মিল্লাত পৃথিবীতে মর্যাদার আসনে আসীন ছিলো। যখনই তারা এ আদর্শের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তখনই তাদের ললাটের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্মম নির্যাতন আর নিস্পেষন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج فَإِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ–

প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই একজন রাসূল আছে, অতপর যখনি তাদের কাছে তাদের রাসূল এসে যায়, তখন সিদ্ধান্ত করার কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুলুম করা হবে না। (সূরা ইউনুস-৪৭)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্যে যে ইনসাফের বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাহলো মুসলিম মিল্লাত যদি নবী করীম (সা:) এর আদর্শ অনুসরণ করে তাহলে তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে মর্যাদার সুউচ্চ আসন। আর যদি তারা এ আদর্শের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে তাদের জন্যে রয়েছে দাসত্বের জীবন। আর এটাই হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনসাফ, এ ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হয়নি এবং আগামীতেও হবে না।

ইতিহাস কথা বলে, যে জাতির প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং প্রেরিত নবী-রাসূলের মর্যাদাগত কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী সেই একই ইনসাফ করেছেন। যে জাতি নবী-রাসূলের প্রতি ইনসাফ করেনি, তারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে আর যারা ইনসাফ করেছে তারা মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে।

শেষ নবী-রাসূলই বিশ্বনবী (সা:)

নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাপরিক্রমায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে সবশেষে প্রেরণ করলেন নবী করীম (সা:) কে। অন্যান্য নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সেই একই দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পণ করা হলেও এ দায়িত্বের গুরুত্ব ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নবী-রাসূল হিসাবে দায়িত্বের গুরুত্ব ও পরিধির ব্যাপকতার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করেছেন। এ কথা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط

এই (যে) নবী-রাসূলরা (রয়েছে), এদের কাউকে কারো ওপর আমি বেশি মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও (কেউ) ছিলো যাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেছেন এবং (এর মাধ্যমে) কারো মার্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা-২৫৩)

গুরু দায়িত্ব অর্পণ এবং দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত করা হয় সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তির প্রতি- এটাই সাধারণ নিয়ম। মর্যাদাও আবর্তিত হয় যোগ্যতা ও দায়িত্বের পরিসরকে কেন্দ্র করে। প্রেরিত অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের দায়িত্বের পরিধি ছিলো সীমাবদ্ধ তথা সসীম। নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূলই দেশ, জাতি, সমাজ, এলাকা ও গোত্রভিত্তিক দায়িত্ব লাভ করে সেভাবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালনে জাতি ও গোত্রগত এবং ভৌগলিক পরিধি অতিক্রম করার অনুমতি তাঁদেরকে দেয়া হয়নি। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি এবং তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর সম্মানিত দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে দায়িত্ব অর্পণকারী মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص

(হে মুহাম্মাদ স.), আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (হিসাবে এসেছি), আল্লাহ তা'য়ালা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান। (সূরা আল আ'রাফ-১৫৮)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর হাতে জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর এবং যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই যাঁকে নবী-রাসূল হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, তিনি তাঁর দায়িত্বের পরিধিও জানিয়ে দিলেন। বিশেষ জনপদের অধিবাসী, জনগোষ্ঠী, গোত্র বা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তিনি আহ্বান জানাতে বললেন না যে, 'আমি শুধু তোমাদেরই জন্য নবী-রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি' বরং মহান মালিক তাঁকে বলতে বললেন, 'আপনি মানুষদেরকে জানিয়ে দিন, 'আমি তোমাদের সকলের জন্য নবী-রাসূল হিসাবে আগমন করেছি'। কথা অত্যন্ত স্পষ্ট, নবী করীম (সাঃ) সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর দায়িত্বের পরিধি বিশ্বব্যাপী। আকাশমণ্ডলী, নদী, সমুদ্র অগাধ জলধী, ঘনারোণ্য, বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর, বিপদশঙ্কুল পাহাড়-পর্বত এবং মাটির অতল তলদেশেও যদি কোনো মানুষ অবস্থান করে, সেই মানুষটির জন্যেও তিনিই একমাত্র নবী-রাসূল এবং তাঁর সম্মানিত দায়িত্বের পরিধি ঐ পর্যন্তও বিস্তৃত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاًط وَكَفى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا–

আমি আপনাকে মানুষদের জন্যে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, আর সাক্ষী হিসাবে তো আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা-৭৯)

নবী করীম (সা:) কে মহান আল্লাহ্ মহুমাত্রিক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এর মধ্যে দু'টো বিশেষণ হলো তিনি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে তিনি যেমন সুসংবাদ দান করেছেন তেমনি শান্তি শৃঙ্খলার বিপরীত পথে চললে ধ্বংস গহ্বরে নিমজ্জিত হতে হবে এ সম্পর্কে সতর্কও করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা সমগ্র মানবজাতির কাছে তাঁর মর্যাদাবান পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا–

(হে নবী!) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। (সূরা আস্ সাবা-২৮)

يَآ أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لا وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا–

হে নবী! আমি আপনাকে (হিদায়াতের) সাক্ষী (করে) পাঠিয়েছি, (আপনাকে) বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনি হচ্ছেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও (হিদায়াতের) সুস্পষ্ট প্রদীপ। (সূরা আল আহযাব-৪৫-৪৬)

إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيْرٌ– إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًاط وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ–

(আসলে) আপনি তো (জাহান্নামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নন। অবশ্যই আমি আপনাকে সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ একজন সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি, কখনো কোনো উম্মত এমন ছিলো না, যাদের জন্যে কোনো (না কোনো একজন) সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি। (সূরা ফাতির-২৩-২৪)

সমগ্র সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে করুণার মূর্ত প্রতীক হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ–

(হে নবী!) আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

তাঁর প্রতি অসীম মর্যাদার প্রতীক হিসাবে এমন এক মহান গ্রন্থ আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন, যে গ্রন্থ কিয়ামত পর্যন্ত সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য মানবজাতিকে দেখিয়ে দিবে–

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا–

কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী এই) 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে (তিনি এর মাধ্যমে) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা ফুরকান-১)

উক্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ সমগ্র মানবমণ্ডলীকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে মহাসত্যের আলোয় আলোকিত পথের ওপর এনে দাঁড় করাবে–

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِلا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ لا

(এ কুরআন এমন) এক গ্রন্থ, যা আমি আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (মহাসত্যের) আলোতে বের করে আনতে পারেন- তাঁর পথে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। (সূরা ইবরাহীম-১)

নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাত শতাব্দী, স্থান, কাল বা কোনো জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নবুয়্যাত বিশ্বজনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কর্তব্য রেসালাতে নববীর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক অনুসরণ করা। এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, 'হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি'। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

তিনিই বিশ্বনবী এবং তাঁর মর্যাদাবান এ দায়িত্বের পরিধি সৃষ্টি জগতের সকল সীমা অতিক্রম করে পরকালীন জগতে জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইন্তেকালের পরে মানুষ যখন কবর তথা আলমে বরযাখে প্রবেশ করবে তখন প্রথম প্রহরেই নবী করীম (সাঃ) কে দেখিয়ে বা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্নের যথাযথ জবাবের ওপর নির্ভর করবে উপস্থিত মুহূর্ত থেকে পরবর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করা সহজ হবে না কঠিন হবে। হাশরের ময়দানে মুসিবতের দিনে এবং হাউজে কাওসার থেকে শীতল সুস্বাদু পানি পান করিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানো- সকল স্তরেই নবী করীম (সাঃ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

মর্যাদাগত, ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে আমরা নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র নাম মোবারকের পূর্বে 'বিশ্বনবী' বিশেষণটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ

বিশেষণটির মাধ্যমে তাঁর উচ্চ মর্যাদার শত সহস্র ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করা যায় না। অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের তুলনায় নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা সর্বাধিক আর ঠিক এ কারণেই তাঁর দায়িত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। অন্যান্য নবীর মিশন জারি রাখার জন্যে তাদের উম্মতদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করা হয়নি। কিন্তু মুসলমানদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার কারণে।

অন্য কোনো নবী-রাসূলের অনুসারীদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে, তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নবী-রাসূলের আদর্শিক মিশন সমগ্র দুনিয়াব্যাপী সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ব্যতিক্রম শুধু মুসলিম মিল্লাত। পবিত্র কুরআনে এ মুসলিম মিল্লাতকে 'মধ্যমপন্থা' অবলম্বনকারী মিল্লাত হিসাবে পরিচিতি দিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর মিশনকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর অতুলনীয় মর্যাদা ও তাঁর পরে দ্বিতীয় কোনো নবী-রাসূল পাঠানো হবে না এবং অতুলনীয় মর্যাদা সমুন্নত বা প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে এটি বাস্তব সত্য যে, কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সে আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত দল বা সংস্থা গঠন করতে হয়। সে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকে। সমগ্র দেশে থাকে স্থানীয় কার্যালয়। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময় যে সকল নির্দেশ ঐ স্থানীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় তা ঐ আদর্শের অনুসারী নেতা-কর্মীগণ বাস্তবায়ন করে থাকেন। তেমনি মুসলিম একটি মিল্লাতের নাম এবং এ মিল্লাতের আদর্শ ইসলাম। এই মিল্লাতের জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তিনি এই মিল্লাতের জন্য একটি কেন্দ্র নির্মাণ করলেন। কেননা, এই মিল্লাতের যিনি বিশ্বনেতা তাঁর আগমনের সময় সমাগত। হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও তাঁর আগমনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এভাবে দোয়া করলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

হে আমাদের মালিক! তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি (এমন) একজন রাসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের তোমার কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে, উপরন্তু সে তাদের পবিত্র করে দিবে, কারণ তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। (সূরা বাকারা-১২৯)

সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) যে ঘর পুনঃনির্মাণ করলেন তা কোনো সাধারণ ঘর ছিল না। এই ঘর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটিই ছিল, সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখান থেকেই পরিচালিত হবে, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর মা'কে জনমানবহীন এই প্রান্তরে রেখে যাওয়া হয়েছিল, ইসমাঈল (আঃ) এর কুরবানীও ছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে এবং কা'বার নির্মাণও ছিল ঐ একই লক্ষ্যে।

সমগ্র পৃথিবীতে যারা তাওহীদের মশাল বহন করবে, তারা যেন প্রতি বছরে একবার হজ্জ নামক বিশ্ব সম্মেলনে এসে সমবেত হয়, একত্রে সমস্বরে এক আল্লাহর দাসত্বের ঘোষণা বজ্রকণ্ঠে দিতে পারে, পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করতে পারে, একে অপরের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সমাধানের বাস্তব পন্থা অবলম্বন করতে পারে, আল্লাহ বিরোধী শক্তির মুকাবিলা কিভাবে করা যায় এবং সমগ্র পৃথিবীতে কিভাবে এক আল্লাহ তা'য়ালার বিধান প্রতিষ্ঠা করা যায়–এ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যেই সেদিন কা'বা নির্মাণ করে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিশ্বনবী তথা বিশ্বনেতাকে প্রেরণের দোয়া করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষকে সে ঘরের দিকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেই কা'বাঘর সম্পর্কে মহান আল্লাহ এই ঘর বানানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলেছেন, 'এই ঘর হিদায়াতের কেন্দ্র, এখান থেকেই একত্ববাদের বাণী সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে'। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ার প্রতি লক্ষ্য করলে কতকগুলো বিষয় আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. এমন এক ব্যক্তিত্বকে বিশ্বনবী বা বিশ্বনেতা হিসাবে প্রেরণ করা হোক, যিনি মানবমণ্ডলীরই একজন। অর্থাৎ মানুষের বাইরের কোনো সত্তা নয়। মানুষের সকল ইচ্ছা, আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা, মায়া-মমতা তথা সকল অনুভূতি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম কেবলমাত্র মানুষই। এ জন্যেই মানুষের মধ্য থেকেই বিশ্বনেতাকে নির্বাচিত করার আবেদন করা হয়েছিলো।

২. তিনি মহান আল্লাহর সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিবেন, সৃষ্টি হিসাবে স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য কি তা বিশদভাবে মানুষকে জানিয়ে দিবেন এবং স্বয়ং আল্লাহই যে একমাত্র ইলাহ ও রব অর্থাৎ তিনিই আইনদাতা, বিধানদাতা এবং সকল বিষয়ের প্রতিপালক- এ বিষয়টিও মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিবেন।

৩. পৃথিবীতে মানুষ ভারসাম্যমূলক জীবন-যাপন করবে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ- যে সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন, এ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান বিশ্বনবী তথা বিশ্বনেতা মানবজাতিকে শিক্ষা দিবেন। অর্থাৎ প্রগতির ফল্গুধারায় আপ্লুত শোষণমুক্ত, শান্তিপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ,

বস্তুর কল্যাণকর কর্মে ব্যবহারকারী এবং উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী দেশ, জাতি ও সমাজ বিনির্মাণে যা কিছু প্রয়োজন, তা কাংখিত বিশ্বনেতা শিক্ষা দিবেন।

৪. দোয়ায় বলা হয়েছিলো, 'এমন এক বিশ্বনেতা প্রেরণ করুন, যিনি মানুষকে পবিত্র করে দিবেন'।

যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার যাবতীয় জীবনোপকরণ দিয়েছেন, সেই আল্লাহর দাসত্ব করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত এবং মানুষ ক্রমশ মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সম্মানের এমন এক পর্যায়ে এ মানুষ পৌঁছে যায় যে, যেখানে স্বয়ং ফিরিশতাও পৌঁছতে সক্ষম নয়। আবার এ মানুষ নিজের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান ভুলে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নিজের মহান মালিক আল্লাহকে ত্যাগ করে তার অনুরূপ আরেক সৃষ্টির, কোনো জড়পদার্থের বা নিজ হাতে গড়া কল্পিত কোনো শক্তির দাসত্ব করে, তখন সে মানুষের মর্যাদা শূন্যের কোঠা অতিক্রম করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাপ্য মর্যাদাও হারিয়ে ফেলে। আর এ অবস্থায়ই একজন সম্মানিত মানুষের জন্য অপবিত্রতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া বুঝায়।

যখন মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দেয়, নিজের সম্মানকে অবহেলা করে আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে বলেই সে মানুষ তারই অনুরূপ আরেকজন মানুষকে নিজের বিধানদাতা, আইনদাতা, মুক্তিদাতা এবং যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে বরণ করে। অথবা কোনো জড়পদার্থকে নিজের মনস্কামনা পূরণকারী হিসাবে বরণ করে বা নিজ হাতে গড়া কোনো কল্পিত বস্তুর দাসত্ব করে। তারই অনুরূপ সৃষ্টি আরেকজন মানুষ তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান দিবে এবং মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির উপকরণ দিবে, যাবতীয় নীতিমালা রচনা করে দিবে আর সে তা অবলীলাক্রমে মেনে চলবে- এ ধরনের মর্যাদাহীনতার অপবিত্রতা থেকে সকল মানুষকে পবিত্র করবেন, 'এমন একজন বিশ্বনবী বা বিশ্বনেতা প্রেরণ করুন' এ দোয়াই হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন।

মানুষের চিন্তাধারা, চেতনা, অভ্যাস, স্বভাব-চরিত্র, চলমান জীবনধারা, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও মতবাদ মতাদর্শকে ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত করে সকল কিছুকে পরিশুদ্ধ করবেন বিশ্বনবী (সাঃ) এ কামনাই মহান আল্লাহর কাছে করেছিলেন মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর পবিত্র এ দোয়ারই উত্তর স্বরূপ নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে ইবরাহীম (আঃ) এর চাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে বলছেন—

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ط

(এই সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যেই) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার 'আয়াত' পড়ে শোনাবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুদ্ধ করে দিবে এবং (তৃতীয়ত) সে তোমাদেরকে আমার কিতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দিবে, (সর্বোপরি) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করবে, যা তোমরা কখনো জানতে না। (সূরা বাকারা-১৫১)

মানুষ নিজেকে কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখবে, নিজের প্রতি, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রতি মানুষের দায়িত্ব- কর্তব্য কি, এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ ছিলো সম্পূর্ণ অন্ধকারে। মহাকাশের শূণ্য মার্গে, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রে, অদৃশ্য বায়ুমণ্ডলে এবং অন্যান্য স্তরে, শূন্য মার্গের অদৃশ্য কৃষ্ণ গহ্বরে (Black hole), ওজন স্তরে, মহাশূন্যে ঘূর্ণয়মান পাথরের সাম্রাজ্যে, পাতালপুরীর কৃষ্ণ বিবরে, অগাধ জলধীর বিভিন্ন স্তরসহ অতল তলদেশে, মাটির তলদেশে খনিসমূহের স্তর অতিক্রম করে উত্তপ্ত গলিত লাভার স্তরে, পর্বতের সৃষ্টি কৌশল ও অবস্থানে, পশুদলের মাঝে, অরোণ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নবী-রাসূলগণই সর্বপ্রথম মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন বস্তুর ব্যবহার। বিজ্ঞান যে সকল বিষয় বর্তমানে মানুষকে জানাচ্ছে, এসব বিষয় সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মানুষকে অবগত করেছেন। বস্তুর ধ্বংস নেই, বস্তু অবিনাশী। মানুষেরও ধ্বংস নেই, ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে মৃত্যুর পরে আরেকটি অনন্তকালের জীবন রয়েছে এবং সেখানে পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কিছুর হিসাব দিতে হবে- এ সকল বিষয় ছিলো মানুষের অজানা। অর্থাৎ মানুষ যা জানতো না তাই নবী করীম (সাঃ) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এ জন্যেই হাদীস শরীফে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছেন–

لِمَا بُعِثْتَ–

'কী কারণে আপনার আগমন?'

জবাবে তিনি জানিয়েছেন–

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا–

'আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসাবে'।

মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর শিক্ষক ছিলেন নবী করীম (সাঃ), এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ج وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ–

আল্লাহ অবশ্যই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে (নবী) তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অথচ এরা সবাই ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো। (সূরা আলে ইমরান-১৬৪)

এ আয়াতে নবী করীম (সাঃ) কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদাতা হিসাবে পরিচিতি দান করেছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সকল বিষয়ের এই মহান শিক্ষককে 'ধর্মনেতা' পরিচয়ে আবদ্ধ রেখে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছি নীতি নৈতিকতাহীন উশৃংখল প্রকৃতির কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত মানুষকে। ধর্মীয় নীতিমালার সামান্য কিছু অংশ শেখার জন্যে আমরা নবী করীম (সাঃ) এর দিকে হাত প্রসারিত করি, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অন্যান্য সকল নীতিমালা গ্রহণ করার জন্যে নবী করীম (সাঃ) এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বার্থান্বেষী চরিত্রহীন ধুরন্ধর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকদের প্রতি মুখাপেক্ষী হই।

নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত অভ্রান্ত, নির্ভুল ও প্রকৃত সত্য জ্ঞান, সিদ্ধান্ত এবং কৌশল অন্য কোনো মানুষ কখনোই দিতে পারে না এবং সেটা কোনো মানুষের জানাও নেই, এ বিষয়টি মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে যে, 'তিনি এসব বিষয়ে মানবজাতিকে অবগত করানোর পূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো'। আরেক আয়াতে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে বলছেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الأُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ق وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَلٍ مُّبِيْنٍ–

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আমার) গ্রন্থের (কথা ও সে অনুযায়ী পৃথিবীতে চলার) কৌশল শিক্ষা দিবে, অথচ এ লোকগুলোই (রাসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো। (সূরা আল জুমুয়া-২)

মানুষ তার নিজের সত্তার দিক দিয়েই একটি জগৎ বিশেষ। তার এই জগতের মধ্যে অসংখ্য শক্তি, যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতা বিদ্যমান। তার এই জগতের মধ্যে জাগ্রত

রয়েছে কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, আবেগানুভূতি, ভাবাবেগ, ঝোঁক-প্রবণতা, কাম, ক্রোধ, জেদ, হঠকারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। মানুষের দেহ ও মনের রয়েছে অসংখ্য দাবি। মানুষের আত্মা, প্রাণ ও স্বভাবের রয়েছে সীমাহীন জিজ্ঞাসা। প্রতিনিয়ত তার মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই হলো মানুষের জটিল অবস্থা।

এই জটিল অবস্থাসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে মানব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজও নানা ধরনের জটিল সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। মানব সমাজ অসীম ও অসংখ্য জটিল সমস্যার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ লাভের সাথে সাথে এসব জটিলতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

এসব সমস্যা ছাড়াও পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা ব্যবহার করা এবং মানবীয় সংস্কৃতিতে তা ব্যবহার উপযোগী করে প্রয়োগ করার প্রশ্নেও মানুষের ভেতরে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে অসংখ্য জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষ তার নিজের দুর্বলতার কারণেই তার সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে একই সময়ে পূর্ণ ও সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। এ কারণে মানুষ নিজের জন্য জীবনের এমন কোন পথ স্বয়ং সে নিজেই রচনা করতে পারে না, যে পথ নির্ভুল হতে পারে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের ভেতরেই একটি জগৎ রয়েছে এবং সে জগৎ অসংখ্য জটিল বিষয় সমন্বিত, অসংখ্য শক্তি-সামর্থ সে জগতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং যে বিধি-বিধান, মত-পথ রচনা করবে, সে বিধান স্বয়ং মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি-সামর্থের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করবে, তার সমস্ত কামনা-বাসনার সাথে প্রকৃত অধিকার বুঝিয়ে দিবে, তার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রবণতার সাথে ভারসাম্যমূলক আচরণ করবে, তার দেহের ভেতরের ও দেহের বাইরের যাবতীয় প্রয়োজন সঠিকভাবে পূরণ করবে, তার সমগ্র জীবনের যাবতীয় সমস্যার দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে সেসব কিছুর এক সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান বের করবে এবং বাস্তব জিনিসগুলোও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে সুবিচার, ইনসাফ ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহার করবে, এসব কোনো কিছুই মানুষের পক্ষে কক্ষনো সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বয়ং যখন নিজের পথ-প্রদর্শক, আইন-কানুন, বিধান রচয়িতার ভূমিকা পালন করে, তখন নিগূঢ় সত্যের অসংখ্য দিকের মধ্য থেকে কোনো একটি দিক, জীবনের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোনো একটি প্রয়োজন, সমাধানযোগ্য সমস্যাবলীর কোনো একটি সমস্যা তার চেতনার জগতে এমনভাবে

প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক– অন্যান্য দিক ও প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয় না।

কারণ তার চেতনার জগৎ তো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বিশেষ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এভাবে বিশেষ মানুষের ওপরে বিশেষ কোনো মত বা আদর্শ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়ার কারণে জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সামঞ্জস্যহীনতার এক চরম পর্যায়ের দিকে তা বক্র গতিতে চলতে থাকে।

মানব জীবনের এই চলার বাঁকা গতি যখন শেষ স্তরে গিয়ে উপনীত হয় তখন মানুষের জন্য তা অসহ্যকর হয়ে জীবনের যেসব দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে ইতোপূর্বে দৃষ্টি দেয়া হয়নি, সেসব দিক তরিৎ গতিতে বিদ্রোহ করে এবং সেসব প্রয়োজন পূরণ করতে বলে, সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি করতে থাকে। কিন্তু তখন আর মানুষের পক্ষে সেসব প্রয়োজন পূরণ করা ও সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয় না। কারণ পূর্বানুরূপ সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতি পুনরায় চলতে থাকে।

পূর্বে যেসব সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতির ফলে মানুষের যেসব দাবি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে ভয়-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে রাখা হয়েছিল, তা পুনরায় মানুষের ওপর প্রচণ্ড গতিতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাকে নিজের বিশেষ দাবি অনুযায়ী বিশেষ একটি লক্ষ্যের দিকে গতিবান করে তোলার চেষ্টা করে।

এ সময় অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে পূর্বের ন্যায় আচরণই করতে থাকে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন কখনো সঠিক, সত্য, সহজ-সরল পথে একনিষ্ঠভাবে চলার মতো পরিবেশ লাভ করে না। সমস্যার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে ক্রমশঃ ডুবে যেতে থাকে। একটি ধ্বংস গহ্বর থেকে কোনক্রমে সে উঠতে সক্ষম হলেও ছুটতে গিয়ে অন্য আরেকটি ধ্বংস গহ্বরে সে আছড়ে পড়ে। মানুষ এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ এক জীব যে, কোনো কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম তাকে নির্ধারণ করে নিতে হয় তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্য কোনো জীবের ন্যায় এ মানুষ লক্ষ্যহীন কাজ করতে পারে না আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গেলেই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন্ আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, কোন্ আদর্শের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী সে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে।

মানুষের নিজের রচনা করা কোনো মতবাদ মানুষকে আদর্শের সন্ধান দেয় না বিধায় মানুষ চরম হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানব চরিত্র এমনি যে, কোনো মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয় তখন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা।

পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় চিন্তা ও চেতনার শূন্যতা নিয়ে, মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না বলে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আদর্শের সন্ধানে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে চিন্তা ও চেতনার জগতের শূন্যতা পূরণ করার জন্য তার সামনে বিচিত্র ও মানব চিন্তার বিপরীতমুখী আদর্শের সমাবেশ ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের যে কি করুণ পরিণতি ঘটে তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে।

কোনো একজন মানুষের অনেকগুলো বন্ধু ছিলো। বন্ধুদের মধ্যে কেউ শুকনো কাঠ ব্যবসায়ী, কেউ তুলা ব্যবসায়ী, কেউ কাপড় ব্যবসায়ী, কেউ পেট্রোল ব্যবসায়ী, কেউ কেরেসিন তৈল ব্যবসায়ী, কেউ খড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিলো কাগজ ব্যবসায়ী। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো, গভীর রজনীতে ঐ অনেকগুলো বন্ধুর অধিকারী ব্যক্তিটির আপন বাসগৃহে আগুন লেগেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে তার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলছে, 'আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করো'।

লোকটির এই করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে তার সকল বন্ধুরা ছুটে এলো। কাঠ ব্যবসায়ী বন্ধু প্রচুর কাঠসহ ছুটে এসে অগুনের ভেতরে তা ছুড়ে দিলো। কাপড় ব্যবসায়ী বন্ধু কতকগুলো কাপড়ের থান এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে মারলো। খড় ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েক বোঝা খড় এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিল। এভাবে কাগজ ব্যবসায়ী বন্ধু কাগজ, পেট্রোল ব্যবসায়ী বন্ধু পেট্রোল, কেরোসিন ব্যবসায়ী বন্ধু কেরোসিন আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিলো। ফল যা হবার তাই হলো। আগুন নির্বাপিত হবার পরিবর্তে আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সকল বন্ধুর কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করা অর্থাৎ বন্ধুর ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলা। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্ত বন্ধুর জন্য এই লোকগুলো যা করলো তাতে করে বিপদগ্রস্ত বন্ধুর বিপদ বৃদ্ধি বৈ কমলো না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের জন্য যত আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করেছে তা সবই আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভুল দিক থেকে তার গতি শুরু হয় এবং ভুল দিকেই তা উপনীত হয়ে সমাপ্তি লাভ করে এবং সেখান থেকে পুনরায় অন্য কোনো ভুল পথের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। এসব অসংখ্য বাঁকা ও ভ্রান্ত পথের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত এমন একটি পথ একান্তই আবশ্যক। যেন মানুষের সমস্ত শক্তি ও কামনা-বাসনার প্রতি, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি, মানুষের আত্মা ও শারীরিক দাবির প্রতি এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রতি যথাযথ–ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ করা, যে আচরণে কোনো ধরনের বক্রতা ও জটিলতা থাকবে না, বিশেষ কোনো দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না।

বস্তুত মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ এবং তার সাফল্য ও সার্থকতা লাভের জন্য এটা একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতিই এই সত্য-সঠিক পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। পৃথিবীর কোনো অমুসলিম বা ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তানায়ক এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিক আর না-ই দিক, এ কথা অকাট্য সত্য যে, অসংখ্য বাঁকা-চোরাপথ, ভ্রান্তপথ থেকে বারবার বিদ্রোহ ঘোষণার মূল কারণ হলো, মানব প্রকৃতি সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথের সন্ধানেই ছুটতে থাকে।

পক্ষান্তরে এ কথা সর্বজনবিদিত ও অকাট্য সত্য যে, মানুষ স্বয়ং মুক্তির এই রাজপথ আবিষ্কার করতে ও চিনতে সক্ষম হয় না এবং সিরাতুল মুস্তাকিম রচনা করতে পারে না– শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সিরাতুল মুস্তাকিম রচনা করার মতো জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই তা রচনা করতে সক্ষম। ঠিক এই উদ্দেশ্যসাধন করার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষকে মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসা তথা আল্লাহর গোলামীর পথ, 'সিরাতুল মুস্তাকিম' কোনটি তা প্রদর্শন করা।

আল্লাহর কুরআন এই মহামুক্তির মহান পথ সিরাতুল মুস্তাকিমকে 'সাওয়া আস-সাবীল' নামেও মানুষের সামনে পেশ করেছে। পৃথিবীর এই নশ্বর জীবন থেকে শুরু করে আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বাঁকা-চোরা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের মাঝখান দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম বা মহামুক্তির মহান পথ সরল রেখার মতোই আল্লাহর জান্নাতের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সুতরাং এই পথের যিনি পথিক হবেন, তিনি এই পৃথিবীতে নির্ভুল-অভ্রান্ত পথের পথিক হবেন এবং আলমে আখিরাতের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবেন।

আর যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সিরাতুল মুস্তাকিমের অভ্রান্ত পথ চিনতে ব্যর্থ হবে বা হারিয়ে ফেলবে সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতেও বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভুল পথের যাত্রী আর আলমে আখিরাতে তাকে অনিবার্যরূপে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ সিরাতুল মুস্তাকিম বা সাওয়া-আস সাবীল ব্যতিত অন্য সকল বাঁকা পথের শেষ প্রান্ত আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি জাহান্নাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

বস্তুবাদ আর জড়বাদের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত একশ্রেণীর চিন্তানায়কগণ বর্তমান মানুষের জীবনকে ক্রমাগতভাবে একটি প্রান্ত থেকে বিপরীত দিকের আরেকটি প্রান্তে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখে এই ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক কার্যক্রম (Dialectical process) মানুষের জীবনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক স্বভাবসম্মত পথ। এসব চিন্তাবিদগণ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছেন যে, প্রথমে এক চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে, ঠিক অনুরূপভাবে সে ঐ প্রান্ত থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরেকটি

চরমপন্থী দাবী (Antithesis) তাকে বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে পৌঁছাবে। এভাবে উভয় প্রান্তের আঘাতের সংমিশ্রণে মানুষের জন্য তার জীবন বিকাশের পথ (Synthesis) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসবে আর এটাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র অভ্রান্ত পথ।

ভোগবাদে বিশ্বাসী এসব জড়বাদীদের আবিষ্কার করা ক্রমবিকাশ লাভের এই পথকে ক্রমবিকাশ লাভের পথ না বলে চপেটাঘাত খাওয়ার পথ বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ মানুষের জীবনের সঠিক বিকাশের পথে এই পথ বারংবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানব জীবন বিকাশের পথে এ পথ অর্গল তুলে দেয়। প্রতিটি চরমপন্থী দাবী মানুষের জীবনকে তার কোনো একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয় ও তাকে কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে হতে যখন সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে তা অনেক দূরে চলে যায়, তখন স্বয়ং জীবনেরই অন্যান্য যেসব সমস্যার প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান করা বা সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়নি, তা বিদ্রোহ শুরু করে।

এভাবে একটির পর একটি দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, মানুষের জীবন থেকে শান্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই অন্ধদের দৃষ্টি সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে যেতে বাধা দেয় তাদের সীমাহীন ভোগ বিলাস। এ জন্য তারা দেখতে পায় না, সিরাতুল মুস্তাকিমই হলো মানব জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র সত্য-সঠিক পথ। আর বিশ্বনবী (সা:) এই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথটিই মানব জাতিকে প্রদর্শন করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাঁকে প্রেরণ করা হয়ছিলো। এই বিস্তারিত আলোচনায় নবী করীম (সা:) কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শান্তি, শৃংখলা, উন্নতি, সমৃদ্ধি, প্রগতি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে এবং পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত চিন্তাধারায় তাড়িত ছিলো। অন্ধকারের কৃষ্ণ গহ্বর থেকে বের করে আলোর জগতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহ করে নবী করীম (সা:) কে অতুলনীয় মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে নবী করীম (সাঃ) এর উচ্চ মর্যাদা

ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, ব্যক্তির অনন্য অসাধারণ যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্ম সম্পাদন এবং ব্যাপক পরিধিতে দায়িত্ব পালন ইত্যাদির কারণেই ব্যক্তি মর্যাদার আসনে আসীন হয় এবং এটাই পৃথিবীতে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। অনন্য সাধারণ গুরুত্বের কারণে পৃথিবীতে কতিপয় স্থানও মানুষের কাছে মর্যাদাকর স্থান বলে বিবেচিত হয়। এসব স্থানে যাতায়াত করাও মানুষ আভিজাত্যের প্রতীক ও সম্মানজনক বলে মনে করে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনাসমূহ, শাসকবৃন্দের বাসভবন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মিলনায়তন ও দ্রব্যাদি ক্রয়ের বিপনীসমূহ, অবকাশ যাপন কেন্দ্র, চিত্তবিনোদনের স্থানসমূহ, ব্যয়বহুল হোটেলসমূহ ইত্যাদি মানুষের কাছে বিশেষ মর্যাদাকর স্থান বলে বিবেচিত হয়।

ব্যক্তির অবস্থান ভেদেও কতিপয় ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত। এসব ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলা, সান্নিধ্যে যাওয়া, সম্পর্ক রাখা ও একত্রে ছবি তোলাও সাধারণ মানুষ মর্যাদাকর কাজ বলে মনে করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ধরনের বিষয় হলো, সম্মানিত ব্যক্তি ও মর্যাদাবান স্থান নির্বাচনে মানুষ মূখ্য ভূমিকা পালন করে এবং নির্বাচকদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটলে সম্মানিত ব্যক্তিকে আস্তা কুড়োয় নিক্ষেপ করে এবং মর্যাদাবান স্থানও নিকৃষ্ট স্থানে পরিণত হয়।

কোনো ব্যক্তি বা স্থানকে মর্যাদা প্রদান করা না করার ক্ষেত্রেও মানুষ দ্বিধা-বিভক্ত এবং মনোনয়ন সিদ্ধান্তে ঐক্য থাকে না। যেমন প্রাকৃতিক আশ্চর্যজনক বিষয় বা স্থান নির্বাচনে মানুষের মধ্যে ব্যাপক মত-পার্থক্য রয়েছে, এ বিষয়টি সুরাহা করার জন্যে বর্তমানে অনলাইনে ভোটের ব্যবস্থা করে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ কোনো ব্যক্তি বা স্থানকে যখন মর্যাদা দেয় তখন সাধারণ মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সে স্থান বা ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং এটাই সাধারণ মানুষের রীতি। মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই রীতি-নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, তাহলে সকল বিষয়ে যিনি একক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী এবং সমগ্র সৃষ্টিসমূহের যিনি স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং নিয়ন্ত্রক, সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই সৃষ্টি কতিপয় ব্যক্তিবর্গ, স্থান ও সময়কে যখন সর্বাধিক মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেন, সেই মর্যাদার গুরুত্ব ও উচ্চতা কতটা বিশাল তা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন্ ব্যক্তিকে সর্বাধিক মর্যাদা দিবেন এবং কোন্ স্থান ও সময়কে মর্যাদায় ভূষিত করবেন, এ ব্যাপারে নিরঙ্কুশ একক ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁরই। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ, স্থান ও সময়কে মর্যাদাকর মনে করা এবং সম্মান প্রদর্শন করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের স্বভাব-

প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কতিপয় ব্যক্তি, স্থান ও সময়কে সর্বাধিক সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে কতক স্থানকে বিশেষত্ব প্রদান করে সর্বাধিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

যেমন মক্কা ও মদীনা নগরীকে মহান আল্লাহ অনন্য সাধারণ বিশেষত্ব দিয়ে মর্যাদা প্রদান করেছেন। এ দু'টো স্থান সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সর্বাধিক মর্যাদায় ভূষিত স্থান। আবার এ দু'টো স্থানের মধ্যেও এমন কতকগুলো বিশেষ স্থান রয়েছে, যেগুলো আরো অধিক মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন এ দুটো স্থানের মসজিদ- মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববী। মক্কায় বায়তুল্লাহ্ শরীফ, এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাজরে আসওয়াদ, এর দরজা যার নাম মুলতাজিম, বায়তুল্লাহ্র উত্তর দিকের স্থান যার নাম হাতিম, মীজাবে রহমত অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণকালে বায়তুল্লাহ্র ছাদ থেকে যে স্থান থেকে বৃষ্টির পানি ঝরে, পশ্চিম- দক্ষিণ কোণে রুকুনে ইয়ামানী, পূর্ব পাশে মাক্বামে ইবরাহীম, কা'বা শরীফের চার দিকে যে স্থান দিয়ে তাওয়াফ করা হয়, এর নাম মাতাফ এবং ফিলিস্তীনে অবস্থিত মসজিদুল আক্বসা।

পবিত্র মদীনা নগরীর সম্মানিত এলাকা, মসজিদে নববী, পবিত্র রওজা মুবারক, রিয়াজুল জান্নাত, পবিত্র মিম্বার শরীফ, মসজিদে কুবা, জাবালে ওহূদ বা ওহূদ পাহাড়, দারুস সালামসহ ইত্যাদি স্থান। মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা কয়েকটি দিন, কিছু সময় ও মাসকেও সর্বাধিক মর্যাদায় ভূষিত করে বিশেষত্ব দান করেছেন। যেমন মাসের মধ্যে সর্বাধিক মার্যাদাবান মাস রামাদান, এই রামাদান মাসের শেষ দশদিনের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই কদরের রাত- যে রাতকে মহান আল্লাহ অগণিত রাতের তুলনায় সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। পবিত্র জুমুয়ার দিন এবং এ জুমুয়ার দিনে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বিশেষ এক সময়কে। এ জুমুয়ার দিনে এমন কতক মুহূর্ত রয়েছে যখন দোয়া কবুল করা হয়ে থাকে। আশুরার দিন, হজ্বের মৌসুমে আরাফার দিন, যিলহজ্ব মাসের দশদিন এবং প্রতি রাতের তৃতীয়াংশ অর্থাৎ শেষ রাতের মর্যাদা অধিক। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহ করে প্রথম আকাশে অবতরণ করে বান্দাদের নানা সমস্যার কথা উল্লেখপূর্বক আহ্বান করে একমাত্র তাঁরই কাছে আবেদন জানাতে বলেন।

মহান আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, এ সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকেই তিনি সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। আবার এ মানুষের মধ্য থেকে নির্বাচিত নবীগণকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। নবীগণের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূল নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মর্যাদা আরো অধিক। আবার নবী-রাসূলদের মধ্য থেকে মহান আল্লাহ কতক নবী-রাসূলকে বিশেষত্ব প্রদানপূর্বক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং আরবী ভাষায় যাঁদেরকে 'উলুল আযম' বলা হয়।

নবী-রাসূলদের মধ্যে 'উলুল আযম' বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অধিকারীদের মধ্যে কেবলমাত্র নবী করীম (সাঃ) কে বিশেষত্ব প্রদানপূর্বক সর্বাধিক মর্যাদায় অলংকৃত করেছেন। আবার ঠিক এ কারণেই অন্যান্য নবী-রাসূলের অনুসারীদের তুলনায় নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী তথা মুসলিম মিল্লাতকে বিশেষত্ব দিয়ে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আবার মানবজাতির প্রথম প্রজন্ম ও পরের প্রজন্মের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতকে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী নির্বাচিত করেছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি রিযক দান করেছি, অতপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

আবার এ আদম সন্তান তথা মানুষের মধ্যে নবী হিসাবে নির্বাচিত করে যাঁদেরকে নবুয়্যাত দান করা হয়েছে, তাঁদের মর্যাদা মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَوَهَبْنَا لَه إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلاًّ هَدَيْنَاج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِه دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ ط وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ- وَزَكَرِيَّا وَيَحْىٰ وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

অতঃপর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো দুই জন সুপুত্র); এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নূহকেও হিদায়াতের পথ দেখিয়েছি, অতঃপর তার বংশের মাঝে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইফসুফ, মূসা এবং হারুনকেও (আমি হিদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলইয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত। (আরো পথ দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও; এদের সবাইকে আমি (নবুয়্যাত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছি। (সূরা আল আনয়াম-৮৪-৮৬)

অপরদিকে নবীদের মধ্যেও কতক নবীকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বানানো হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ–

আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৫)

বিশেষভাবে রাসূল মনোনীত করা প্রসঙ্গে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌم بَصِيْرٌج

আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর ওহী বহন করার জন্যে) ফিরিশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও তিনি রাসূল মনোনীত করেন। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। (সূরা হজ্ব-৭৫)

রাসূলদের মধ্যেও একের ওপর আরেকজনকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط

এই (যে) নবী-রাসূলরা (রয়েছে), এদের কাউকে কারো ওপর আমি বেশি মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে এমনও (কেউ) ছিলো যাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেছেন এবং (এর মাধ্যমে) কারো মার্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা বাকারা-২৫৩)

সকল নবী-রাসূলের মধ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) কে অনন্য বৈশিষ্ট প্রদানপূর্বক সর্বাধিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মহান মালিক আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। বিশেষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে তা নিতান্তই দূরহ বিষয়। তবে পবিত্র কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে যতোটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তার কিছু অংশ আমরা এ গ্রন্থে তুলে ধরবো ইন্‌শাআল্লাহ।

বিশ্বনবীর উপমা সূর্য-চন্দ্রের সাথে নয়, প্রদীপের সাথে

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নবী করীম (স:) এর মর্যাদা প্রসঙ্গ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সূর্য বা চন্দ্রের সাথে উপমা দেননি, দিয়েছেন প্রদীপের সাথে। আল্লাহ তা'য়ালা এ কথা বলেননি যে, 'আমি আপনাকে মানুষের জন্য সূর্যের বা চন্দ্রের মতো আলো দানকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি'। বরং তিনি বলেছেন–

يَآ أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا–

হে নবী! আমি আপনাকে (হিদায়াতের) সাক্ষী (করে) পাঠিয়েছি, (আপনাকে) বানিয়েছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপনি হচ্ছেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও (হিদায়াতের) সুস্পষ্ট প্রদীপ। (সূরা আল আহযাব-৪৫-৪৬)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ বিশাল আলোকোজ্জ্বল সূর্য এবং প্রশান্তিদায়ক মায়াবী কিরণ দানকারী চন্দ্রের সাথে নবী করীম (সা:) এর উপমা না দিয়ে স্বল্প পরিসরে আলো বিতরণকারী ক্ষুদ্র প্রদীপের সাথে কেনো উপমা দিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে সূর্য এবং চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি। সূর্য একটি বিশালাকারের উত্তপ্ত গ্যাসীয় অগ্নিগোলক, সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আলো এবং তাপ বিকিরণ করলেও এই সূর্যের পক্ষে আরেকটি সূর্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সূর্যের অভ্যন্তরে মহান আল্লাহ যে শক্তি দান করেছেন, এই শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র আরেকটি সূর্য কখনো সৃষ্টি করতে পারবে না। আর চন্দ্রের তো নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোয় চন্দ্র আলোকিত। এর পক্ষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো তৈরী করাও সম্ভব নয়, কেননা আল্লাহ তা'য়ালা সে শক্তি চন্দ্রকে দান করেননি।

এবার প্রদীপের দিকে দৃষ্টিপাত করি, ক্ষুদ্র প্রদীপের সামান্য আলো অগণিত প্রদীপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। হাজার কোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেও স্বয়ং সে ক্ষুদ্র প্রদীপ অমর অক্ষয়, এর আলো দান বা অন্য প্রদীপ জ্বালানোর ক্ষমতা কখনো বিলীন বা নি:শেষ হয় না। নবী করীম (সা:) স্বয়ং এবং তাঁর আদর্শ এমনি এক প্রদীপ, বিগত চৌদ্দশত বছরব্যাপী সমগ্র পৃথিবীতে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে এবং অনন্তকালব্যাপী আলো বিকিরণ করবে। কিন্তু এ আলো কখনো নি:শেষ হবে না। এমনকি কেউ এ আলো নির্বাপিত করার ষড়যন্ত্র করলে এর গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হবে ইনশাআল্লাহ।

কবি বলেছেন, 'ইসলাম কি ফিতরাত মেঁ কুদরাত নে লাচাক দিয়া, যিতনি দাবাউগি উতনি উভরে গা'। অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃতিগত শক্তির লাবণ্যতা এতই প্রখর যে, কেউ এর শক্তি হ্রাস করতে চাইলে তা আরো অধিক বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

নবী করীম (সা:) এর আন্দোলনের কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ আন্দোলনকে অঙ্কুরেই নি:শেষ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলেছে, চলছে এবং চলবে। জড়বাদী শক্তি এ আন্দোলনের দিকে দন্ত-নখর বিস্তার করেছে এ আন্দোলনকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়ার জন্য। মুখের ফুৎকারে তারা নবী করীম (সা:) এর জ্বালানো প্রদীপ নির্বাপিত করতে চেয়েছে। অপরদিকে সূচনালগ্নেই আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِؤُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلاَّ أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ–

এ (মূর্খ) লোকেরা তাদের মুখের (এক) ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর (দ্বীনের) মশাল নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফিরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর! (সূরা আত্ তাওবা-৩২)

লক্ষ্য করুন, নাইন ইলেভেন এ নিজেরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ঘোষণা দিয়ে আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। 'লাদেন' ট্যাক্স আবিষ্কার করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর এ অন্যায় ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়ে হাজার হাজার কোটি ডলার মুসলমানদের কাছ থেকে চুষে নিলো। নানাভাবে ইসলামী দল, ব্যক্তিত্ব, সংঘ ও সংগঠন ধ্বংস করার ব্যবস্থা করলো। প্রচার মাধ্যমে দিবারাতি অহর্নিশি ইসলামকে সন্ত্রাসী আদর্শ ও কুরআনকে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণদাতা হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করলো। কিন্তু এতকিছুর পরেও আমেরিকাসহ সমগ্র দুনিয়ায় ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

কুরআন অবতীর্ণের সময়কালে বিরোধিতার যে ঝড় সৃষ্টি করা হয়েছিলো তখনই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّه عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ–

অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দিবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কুরআনই মূলত) সত্য; (হে নবী, আপনার জন্যে) এ কথা কি যথেষ্ট নয়, আপনার মালিক (আপনার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। (সূরা হামীম আস্ সাজদা-৫৩)

নবী করীম (সাঃ) যখন ইসলামী আন্দোলনের প্রদীপ জ্বালালেন, তখন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ প্রদীপকে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র ও দমন-নিপীড়ন চলছে। কিন্তু সকল বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে প্রদীপের কান্তিময় কিরণচ্ছটা দিগন্তবলয় স্পর্শ করেছে। আরবের ইসলাম বিরোধী শক্তি নিজেদের জীবনকালেই দেখেছিলো প্রদীপের এ আলো সমগ্র আরবকে আলোকিত করে আশেপাশের সকল দেশ অতিক্রম করে আফ্রিকা পর্যন্ত কিরণ দান করেছিলো। নিজেরা তখন একান্তই অসহায়ের মতো নবী করীম (সাঃ) এর এ প্রদীপের সম্মুখে শির নত করে অধো:মুখে দণ্ডায়মান হয়েছিলো। প্রদীপের এ অপ্রতিরোধ্য কিরণ এক বিরাট বিশাল ধর্মীয়, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, নৈতিক, চিন্তাগত ও মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধন করেছিলো।

যেখানেই প্রদীপের কিরণচ্ছটা পতিত হয়েছে সেখানেই মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যোগ্যতা ও গুণ-বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে এবং কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ স্বভাবসমূহ অবদমিত হয়ে মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ কেবলমাত্র দুনিয়াত্যাগী ফকির দরবেশ এবং নিভৃতে বসে 'আল্লাহু আল্লাহু' নাম জপকারীদের মধ্যে যেসব গুণ-বৈশিষ্ট দেখার আশা পোষণ করতো এবং সমাজ ও দেশ পরিচালকদের মধ্যে যেসব গুণ-বৈশিষ্ট দেখার কল্পনাও করতে পারতো না, নবী করীম (সাঃ) এর প্রদীপ সেই সকল গুণ-বৈশিষ্ট ও উন্নতমানের নৈতিকতা সমাজপতিদের, শাসকদের রাজনীতিতে, বিচারকদের আদালতে, রাষ্ট্রের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী সেনাপতিদের পরিচালিত যুদ্ধে বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজস্ব আদায়কারীদের আচরণে এবং দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গন আলোকিত করেছিলো। প্রদীপের এই আলোয় নির্মিত সমাজে সাধারণ মানুষকে নৈতিক চরিত্র ও আচরণ এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এতই উর্ধ্বে তুলে ধরেছে যে, অন্যান্য সমাজের অভিজাত হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও তার তুলনায় অত্যন্ত নীচু মানের বলে অভিহিত হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রদীপের এ কিরণ মানুষকে কুসংস্কার ও অমূলক ধ্যান-ধারণার আবর্ত থেকে বের করে জ্ঞান-গবেষণা এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও কর্মনীতির সুস্পষ্ট রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের সমাজে এমন কতক সমস্যা রয়েছে যে সমস্যার সমাধানের সুত্র সম্পর্কে ন্যূনতম কল্পনাও পৃথিবীর চিন্তাবিদদের মনে আসেনি, অথচ নবী করীম (সাঃ) এর এ প্রদীপ সামাজিক জীবনের সেই সকল রোগ-ব্যাধির এমন চিকিৎসা করেছে যে, সেসব রোগের মূলোৎপাটিত হয়েছে।

সামাজিক জীবনের অপরাপর সমস্যা যেমন বর্ণ, গোত্র, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য, একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং তাদের মধ্যে উচ্চ নীচের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, আইনগত অধিকার ও বাস্তব আচরণের আধিক্য, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন, জবাবদিহি ও সমালোচনার উর্ধ্বে সরকারের অবস্থান, মৌলিক অধিকার থেকেও জনগণের বঞ্চনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তিসমূহের অমর্যাদা, সমরাঙ্গনে বর্বরতা ও পশুসুলভ আচরণ এবং এমন ধরনের অগণিত সমস্যার অন্ধকার নবী করীম (সাঃ) এর প্রদীপের আলোয় দূরীভূত হয়েছিলো।

প্রদীপের এ স্নিগ্ধ আলো আরব ভূমিতে রাজনৈতিক অরাজকতার স্থানে শৃংখলা, খুন খারাবী ও নিরাপত্তাহীনতার স্থানে নিরাপত্তা, পাপাচারের স্থানে আল্লাহভীতি ও পবিত্রতা, জুলুম ও ইনসাফহীনতার স্থানে ন্যায় বিচার, নোংড়ামী ও শত্রুতার স্থানে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং যে জাতির লোকজন নিজ গোত্রের নেতৃত্ব দেয়ার স্বপ্ন ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মর্যাদাসম্পন্ন পদের বিষয় কল্পনাও করতে সক্ষম ছিলো না, প্রদীপের এ আলো তাদেরকে পৃথিবীর নেতা বানিয়ে দিয়েছিলো। কবি বলেছেন–

در فشانی نے ترے قطروں کو دریا کردیا
دل کو روشن کردیا انکھی کو بینا کردیا
خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ھادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا

মুক্তা বরষণে তোমার বিন্দু হলো বিশাল বারিধি সমান,
হৃদয়ে জ্বালালে নূরের মশাল, নয়নে করিলে দৃষ্টিদান।
পথহারা ছিলো যাঁরা, তাঁদের করিলে দিশারী জগতের;
পরশ দৃষ্টি তব মৃতদেরকে বানালো জীবনদাতা।

অর্থাৎ হে রাসূল (সাঃ)! আপনার পরশে সঙ্কীর্ণতা উদার হলো, আঁধার মনে আলো উদ্ভাসিত হলো, কল্যাণ দৃষ্টি উন্মোচিত হলো, ভ্রান্তরা পথ-প্রদর্শক হলো আর মৃতরা হয়ে গেলো অন্যদের ত্রাণকর্তা।

নবী করীম (সাঃ) ছিলেন উজ্জ্বল প্রদীপ এবং প্রদীপের এ আলো নির্বাপিত করার জন্যে সমসাময়িক কালে যারা চেষ্টা করেছিলো, সেই প্রজন্মের লোকজন নিজ চোখে দেখেছিলো, কিভাবে এ আলো জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী দেখছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদীপের আলো কিভাবে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রদীপের এ আলো মুসলিম মনমানসিকতা এমনভাবে আলোকিত

করেছিলো যে, মুসলিম মিল্লাতের পতন যুগেও তারা নৈতিক চরিত্রের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, বর্তমানে যারা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের একক নেতৃত্বের দাবীদার হয়েছে তারা পতন যুগের মুসলমানদের নৈতিকতার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।

ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এমনকি ইউরোপের পরাজিত জাতিসমূহের সাথে যে মর্মস্পর্শী নির্যাতনমূলক আচরণ করেছে এবং বর্তমানেও করছে, মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসের কোনো যুগেই এসব বর্বরতার কোনো দৃষ্টান্ত কেউই পেশ করতে পারবে না। নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের কল্যাণকারিতাই মুসলমানদের মধ্যে এতটা মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছে যে, বিজয় অর্জন করেও তারা কখনো বর্বর হতে পারেনি, যে বর্বরতা অমুসলিমরা ইতিহাসের প্রতিটি যুগে দেখিয়েছে এবং বর্তমানেও দেখাচ্ছে।

ইতিহাস কথা বলে, মুসলমানরা যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পেনের শাসক ছিলো তখন তারা খৃষ্টানদের সাথে স্নেহশ্রদ্ধা ও মমতার বাঁধনে ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করেছিলো। কিন্তু খৃষ্টানরা সেখানে বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের সাথে বর্বরতার নিষ্ঠুর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলো। ভারতে দীর্ঘ আটশ' বছরের শাসনকালে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে কিভাবে ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করেছে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা ক্ষমতার দৌড়ে বিজয়ী হবার পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে কতটা বর্বর আচরণ করছে তা পৃথিবীবাসী দেখছে। হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহযোগিতায় ইয়াহূদীরা ফিলিস্তীনে প্রতি মুহূর্তে যে আচরণ করছে তা দেখে পৃথিবীর হিংস্র জানোয়ারও লজ্জায় মুখ আড়াল করবে।

আল্লাহর অঙ্গীকার, প্রদীপ শিখা চির অনির্বান

পৃথিবীতে প্রেরিত কোনো নবী-রাসূলকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করেননি যে, 'তোমার বর্তমান সময় থেকে ভবিষ্যৎকাল অধিক ভালো হবে বা তোমাকে এমন কিছু আমি দান করবো, যা পেয়ে তুমি খুশী হবে'। শুধু মাত্র এ মহান মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) কে এবং এ মর্যাদা কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُوْلَى ط وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ط

অবশ্যই আপনার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম, অল্পদিনের মধ্যেই আপনার মালিক আপনাকে (এমন কিছু) দিবেন যে, আপনি এতে খুশী হয়ে যাবেন। (সূরা দুহা-৪-৫)

লক্ষ্য করুন, সূরা হামিম সাজদার ৫৩ নং আয়াত যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো' অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের কাছে ওয়াদা দিয়েছেন এবং তা বাস্ত

বায়নও করেছেন, আবার সূরা দুহার উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ যে ওয়াদা তাঁর প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সা:) কে দিয়েছেন, এমন ওয়াদা মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকেও দেননি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ওয়াদা দেয়া- এই উচ্চ মর্যাদায় নবী করীম (সা:) কে ভূষিত করা হয়েছে। মক্কী জীবনের সেই দু:সহ দিনগুলোয় মহান আল্লাহ তাঁকে আগামী দিনের সুসংবাদ জানিয়ে বললেন, বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন প্রাথামিক পর্যায় অতিক্রম করছে এবং এই অবস্থায় আপনি যে প্রবল বাধার মুকাবিলা করছেন, সেই বাধা কখনো স্থায়ী হবে না। আগামীতে আপনার জন্য শুভ দিন অপেক্ষা করছে। যেমন রাত যতো গভীর হতে থাকে উজ্জ্বল সূর্যের আগমনী ঘন্টা ততই জোরে বাজতে থাকে- তেমনি বাধার তীব্রতা যতোই তীব্র হচ্ছে আপনি ততই সফলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই আপনার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

আল কুরআন ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দানে বর্তমানে আপনি যে পর্যায় অতিক্রম করছেন, আগামীতে যে পর্যায়সমূহ আপনার সামনে প্রতিভাত হবে, তা পূর্বের পর্যায়ের তুলনায় অবশ্যই উত্তম হবে এবং এই পরিবর্তনের ধারা কখনো থেমে থাকবে না। এভাবে করে আপনি ক্রমশঃ একটি শুভ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাবেন। সেই সোনালী সূর্য উদিত হবার আর বেশি দেরী নেই, যে সূর্যের উজ্জ্বল আলো অবলোকন করে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনার প্রতি আপনার রব অনুগ্রহের ধারা বৃষ্টির মতোই বর্ষণ করতে থাকবেন। সেই দিনটি বেশী দূরে নয় যখন আপনিও দেহ-মনে তৃপ্তিদায়ক নিদ্রার পরমুহূর্তের মতোই প্রশান্তি অনুভব করবেন। আপনি আন্দোলনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করার পরে যখন সফলতা অর্জন করবেন তখন আপনার দেহ-মন থেকে যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। আপনি শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করবেন। একটি করে দিন আপনার জীবন থেকে অতিবাহিত হবে নতুন দিনের আগমন ঘটবে, সেই নতুন দিনটি আপনার কাছে পূর্বের তুলনায় উত্তম হবে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী করীম (সা:) এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এমন সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। পরবর্তীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে আক্ষরিক অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ যে অবস্থায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন তা যে বাস্তবে পরিণত হবে এমন আশার আলো কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। সে সময় মক্কায় যে অসহায় ইয়াতিম এক ব্যক্তি গোটা জাতির জাহিলিয়াতের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তার পক্ষে এতদূর সাফল্য লাভ কোনো সময় সম্ভব হবে তা কল্পনা করাও ছিলো অসম্ভব বিষয়।

ইসলামী আন্দোলনের শৈশবকাল। নবী করীম (সা:) আল্লাহর নির্দেশে একা এই পথে অগ্রসর হলেন। ক্রমশঃ মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গীসাথী জুটে গেল। আপন আত্মীয়-স্বজন তাঁকে

শুধু দূরেই নিক্ষেপ করলো না, আন্দোলনের শত্রুদের সাথে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সাথে শত্রুতা করতে লাগলো। সমগ্র জাতি তাঁর দুশমনে পরিণত হলো। অন্ধকার! চারদিকে ঘোর অমানিশার অন্ধকার! কোথাও সফলতার সামান্যতম আলোর রেশটুকুও নেই। এই ঘন তমশার মধ্যে তাওহীদের প্রদীপ ক্ষীণ শিখায় আলো বিকিরণ করছিল আর সেই আলোর শিখাকে বিরোধীগোষ্ঠী ফুঁৎকারে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ঠিক এই কঠিন মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিশ্চয়তা দিলেন, আপনি মোটেও বিচলিত হবেন না। হতাশার বিন্দুমাত্রও যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। আগামীতে আপনার জন্য শুভদিন অপেক্ষা করছে। অচিরেই সাফল্যের সোনালী সূর্য উদিত হবে এবং সেই সূর্যের আলোয় আন্দোলনের ময়দান থেকে অন্ধকার দূরিভূত হবে। আপনি চিন্তা করবেন না, যে জাহিলিয়াত আপনার সামনে পাহাড়ের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে তা নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করবে। আজ যে সঙ্কটপূর্ণ দিন আপনি অতিবাহিত করছেন, তা অতিক্রম করে আগামী দিন হবে আপনার জন্য শুভক্ষণ। আপনি তো পরশ পাথর। আপনার স্পর্শে সকল কিছুই খাঁটি সোনায় পরিণত হবে। এই আন্দোলন এক সময় পৃথিবীর আনাচে কানাচে কম্পন সৃষ্টি করবে। কারো ক্ষমতা নেই তাওহীদের এই আমানত- এর ধারক-বাহকদের বুক থেকে মুছে ফেলার। যে কা'বা ঘরে আজ আপনাকে তাওহীদের ধ্বনি উচ্চারণ করতে দিচ্ছে না, সেই দিন সামনে যখন তাওহীদের এই ধ্বনি কা'বা ঘরের চার দেয়াল অতিক্রম করে প্রান্তর ছাড়িয়ে অগাধ জলধী পেরিয়ে অপ্রতিহত বন্যার গতিতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হতে থাকবে।

সমগ্র পৃথিবীর সবথেকে মর্যাদার আসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনিই হবেন এই পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। পৃথিবীব্যাপী আপনার নামটিই সবথেকে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ط

আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। (সূরা ইনশিরাহ-৪)

শুধু পৃথিবীতেই নয়, কিয়ামতের ময়দানে আপনিই হবেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। কল্পনার অতীত নিয়ামাত দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করা হবে। সুতরাং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যান। পেছনে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, সামনের দিকে অগ্রসর হন। এমন এক সময় আসবে যখন আপনার বিরোধিদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে তারা আজ আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, ঐ স্থান থাকবে আপনার পবিত্র পায়ের নীচে। যে মাথা আজ গর্বিত ভঙ্গিতে আপনার সামনে উঁচু হয়ে রক্তচক্ষু তুলে ধরছে, সেই মাথা আপনার পদপ্রান্তে

লুটিয়ে পড়বে সেদিন বেশি দূরে নয়। এমন সময় আপনার সামনে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে, যখন আপনার শত্রুপক্ষ আপনার কাছে শুধু করুণাই ভিক্ষা চাইবে–

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিশ্চয়ই আপনার নিন্দুকেরাই হবে শিকড়-কাটা অসহায়। (সূরা কাওসার-৩)

'সামান্য দিনের ব্যবধানে আপনার রব আপনাকে এমন সব নিয়ামাতের অধিকারী করবেন, যা লাভ করে আপনার খুশীর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না'। আল্লাহ তা'য়ালার এই ওয়াদা নিছক শুধু কথার কথাই ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের জীবনকালেই ওয়াদা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অবর্তমানে তাঁরই অনুসারীরা তাঁর আনীত আদর্শ ইসলামকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করবে, সে চিত্রও রাসূলের সামনে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার অবর্তমানে আমার উম্মত যেসব এলাকায় বিজয় কেতন উড্ডয়ন করবে সেসব এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে। তা দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি'।

'হে মক্কা! এই পৃথিবীর সকল কিছুর থেকে তুমি আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর সন্তানেরা আমাকে থাকতে দিলো না'। এই কথাগুলো বিশ্বনবী (সাঃ) এর। তাঁর মনে বড় সাধ ছিল মক্কায় অবস্থান করে প্রাণভরে বাইতুল্লাহর খেদমত করবেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাঁর আদর্শ ইসলামকে সহ্য করেনি। তাঁকে মক্কায় থাকতে দেয়নি। প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনার দিকে যাবার সময় অশ্রু সজল দৃষ্টিতে কা'বার দিকে তাকিয়ে তিনি উল্লেখিত কথাগুলো বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন। তাঁর শৈশব কৈশোর ও যৌবনের চারণভূমি মক্কা তিনি বিজয় করলেন। অত্যন্ত দ্রুত ইসলাম চারদিকে তার সৌরভ ছড়িয়ে দিলো। দক্ষিণ উপকূল থেকে উত্তরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে পারস্যোপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরবদেশ নবী করীম (সাঃ) এর শাসনাধীনে এলো। সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকার তিনি শাসক হলেন।

আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই ভূখণ্ড এক সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের নিয়ন্ত্রণে আসে। নবী করীম (সাঃ) এতটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন যে, তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য যখনই রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চরমভাবে পর্যদুস্ত হয়েছে। তাওহীদের আওয়াজ গোটা সাম্রাজ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানব রচিত সকল মতবাদ মতাদর্শ গর্বিত মস্তক অবনমিত করে রাসূলের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে। যেসব মানুষের মনমানসিকতায় শিরকের অন্ধকার পূঞ্জিভূত ছিল, সে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। নরখাদকের মতোই যারা নারীর ইজ্জতের ওপরে

হামলা করতো, তারা সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানে হয়ে পড়েছিল নারীর ইজ্জতের অতন্দ্রপ্রহরী। অগণিত মানুষের মন-মস্তিকে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবসাধিত হয়েছিল। জাহিলিয়াতের বর্বর অন্ধকারে যে জাতি ছিল নিমজ্জিত, মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে সেই জাতি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় জাতিতে পরিণত হয়েছিল, পরিবর্তনের এই ধরনের ঘটনা গোটা বিশ্বের ইতিহাসে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই তাঁর নবীকে খুশী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাসূল (সা:) এর বিদায়ের পরে ইসলামী আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীর বাতিল শক্তির তখ্তে তাউসে যে কম্পন সৃষ্টি করেছিল, সে কম্পনের ফলে জাহিলিয়াতের বিশাল বিশাল দূর্গ ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল। ইউরোপ ও আফ্রিকার একটি বিশাল অংশের ওপরে ইসলাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর মানুষ জ্ঞানার্জন ও সভ্যতা শেখার জন্য ছুটে আসতো ইসলামের কাছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই তাঁর নবীর কাছে দেয়া ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এই নিয়ামাত তিনি তাঁর নবীকে পৃথিবীতেই দিয়েছিলেন, আর আদালতে আখিরাতে তাঁকে যে কি ধরনের নিয়ামাত দানে ধন্য করবেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

নবী করীম (সা:) কে 'আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি' অর্থাৎ একমাত্র আমিই আপনার নামটি পৃথিবীময় উচ্চকিত করেছি- সর্বত্র প্রশংসা আর শ্রদ্ধাভরে আপনার নামটি উচ্চারণের ব্যবস্থা আমিই করেছি। এ কথাটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে যে সময়ে বলেছিলেন, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে একক ও নি:সঙ্গ একজন মানুষের সাথে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন মুষ্টিমেয় কিছু লোক রয়েছে এবং যাদের অবস্থান মাত্র মক্কা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই লোকের প্রশংসা, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা কিভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে! কিভাবে মানুষ পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নামটি সবচেয়ে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করবে! কিন্তু মানুষ যা কল্পনা করতে অক্ষম মহান আল্লাহ এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সেটাই বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করলেন স্বয়ং তাঁরই শত্রুদের মাধ্যমে। কিভাবে সেটা করলেন, তার একটি পটভূমি রয়েছে।

সে পটভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, নবী করীম (সা:) এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তবুও তাঁকে ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত করা যাচ্ছে না, এ কারণে ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বের মনে ধারণা হলো নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা:) একটা কিছু অর্জন করতে চায় এ কারণে সে এবং তাঁর অনুসারীরা নির্যাতন সহ্য করেও তাদের কার্যক্রমে বিরতি এবং আদর্শ ত্যাগ করছে না। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে ইসলাম বিরোধিদের নেতা ওতবা ইবনে রাবিয়া নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'হে মুহাম্মাদ (সা:)! বলো তো, প্রকৃত পক্ষে তোমার মনের

ইচ্ছাটা কি? যদি মক্কার নেতৃত্ব কামনা করো তাহলে তা গ্রহণ করতে পারো। যদি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে কামনা করো তাহলে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। গোটা মক্কার ধনরত্ন চাও আমরা তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তবুও তুমি যা বলছো তা থেকে বিরত হও'।

বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা না বলে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তাকে শুনিয়ে দিলেন। আয়াতের অর্থ হলো, 'হে রাসুল! আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে মহান আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। তোমরা তাঁকেই অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করো। আপনি তাদেরকে আরো বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার করো? যিনি মুহূর্ত কালের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর সাথেই তোমরা অংশীদার স্থাপন করছো? তিনিই হলেন গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক'। বিশ্বনবীর মুখে পবিত্র কুরআন শুনে ওতবা থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর মুখ থেকে আর একটি কথাও বের হয়নি। দ্রুত সে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ (সাঃ) এর সামনে থেকে সরে পড়েছিল।

ইসলামের শত্রুরা নবী করীম (সাঃ) কে নির্বংশ, নিঃসঙ্গ মনে করেছিল, ধারণা করেছিল তাঁর আদর্শ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু মাত্র ১৩ বছরের মধ্যেই তারা দেখতে পেলো রাসূলের আদর্শ গ্রহণকারীদের একটি বিরাট দল তৈরী হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই আদর্শের প্রচার, প্রসার ও টিকিয়ে রাখার জন্য যে লোকগুলো প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছে, সেই লোকগুলো তাদেরই ভাই, বোন, চাচা, মামা এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান। যারা রাসূলকে নির্বংশ বিশেষণে বিশেষিত করেছিলো, তারা দেখতে পেলো, বিরাট একটি দল প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, যারা রাসূলের আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং একটির পরে আরেকটি যুদ্ধে ঐ লোকগুলো তার প্রমাণও দিয়ে দিলো।

নির্বংশ বিশেষণে তারা যাকে বিশেষিত করেছিল, মক্কার সেই ইয়াতিম বালকটি পরিণত বয়সে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যখন মক্কায় নিজ অধিকার আদায় করতে এলেন, তখন নির্বংশ বিশেষণ যারা দিয়েছিল তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা এমনকি মৌখিকভাবে সান্তনা দেয়ার মতো একটি লোকও আরবে খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। এরপর তারা দেখলো তদানীন্তন পৃথিবীর মানচিত্রের সাড়ে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকার একচ্ছত্র শাসক হলেন ঐ লোকটি যাঁকে তারা শেকড় কাটা বলেছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকলো, গোটা পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধি

দল কিভাবে আল্লাহর রাসূলের পদচুম্বন করে। ইসলামের সাথে যারা বিরোধিতা করে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই কালক্রমে তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত করে দেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ হলো না। ইসলাম বিরোধিদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আরবেরই শুধু নয়, আরবসহ আরবের বাইরের জগৎ থেকে দলের পরে দল লোক এসে ঐ লোকটির হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছিল, যে লোকটিকে তারা শেকড় কাটা বলেছিল।

আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খালফ, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, উতাইবা, উম্মে জামীল প্রমুখ ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের বংশধর অবশ্যই পৃথিবীতে রয়েছে। কিন্তু এ কথা কারো বলার মতো হিম্মত নেই যে, আমরা অমুকের বংশধর। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বংশধররা যেমন গৌরবের সাথে দাবী করে যে, আমরা অমুকের বংশধর। কিন্তু সে যুগের ইসলাম বিরোধী নেতাদের বংশধরদের মধ্যে এমন কারো সাহস নেই, যিনি বলবেন আমি আবু জেহেল বা আবু লাহাবের বংশধর।

ঘৃণিত লোকদের সাথে কারো সম্পর্ক রয়েছে, এই দাবী করা কেউ পছন্দ করে না। রাসূলের পর থেকে যারাই ইসলামের সাথে বিরোধিতা করেছে, ইসলামী আন্দোলনকে এই যমীন থেকে উৎখাত করতে চেয়েছে, স্বয়ং তাদেরই নাম-নিশানা এই পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর যে দেশে এবং যেখানেই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, সেই আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের ওপরে চলেছে পৈশাচিক নির্যাতন। কারাগারের অন্ধকার জীবনে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে। তারপরেও এই আন্দোলনের গতি রোধ করা যায়নি। যারা বিরোধিতা করেছে বরং তারাই আবু জাহিল আর আবু লাহাবদের মতো ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে গিয়েছে এবং মুছে যেতে থাকবে।

হিজরতের পরে মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর সুষমামণ্ডিত নামটি আরব জাহানের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তিনি দেখলেন, মহান আল্লাহ কিভাবে তাঁর নামটিকে প্রতিটি জনপদে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিটি স্থানে গোপনে প্রকাশ্যে, নীরবে-নির্জনে মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে মমতা জড়িত ভাষায় কিভাবে তাঁর নামটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, তা তিনি জীবিত থাকাবস্থায়ই দেখে গেলেন। এরপর তাঁর বিদায়ের পরে তাঁরই অনুগত সাহাবায়ে কেরাম তাঁরই আনীত আদর্শ নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লেন। পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রতিটি জনপদে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:)' নামটি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে উচ্চারিত হতে থাকলো। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে উচ্চারিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হতেই থাকবে।

কোথায় নেই তাঁর পবিত্র নামের পরশ। পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন শুধুমাত্র পাঁচবার আজানেই পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' (সাঃ) নামটি। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক এই নামটিকে কত অলঙ্কারেই না সজ্জিত করেছেন। কেউ বলেছেন, এই নামের পবিত্র পরশ পেয়েই বোধহয় গোলাপ অপূর্ব এই সুরভী লাভ করেছে। বুলবুলী আর কোকিল ঐ নামের পরশ লাভেই অপূর্ব কণ্ঠ লাভ করেছে। ঐ 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' (সাঃ) নামের পরশ ব্যতীত বুলবুলীর গান আর কোকিলের কুহু ধ্বনিই বৃথা, ফুলের বাগানে আবদ্ধ কলির হাসিও বৃথা। বেগবান বন্যার অপ্রতিরোধ্য গতির মতোই 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' (সাঃ) নামটি জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সুদূর চাঁদের বুকেও 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' (সাঃ) নামটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং যা স্বকর্ণে শ্রবণ করেছেন। পৃথিবীতে মসজিদ আর মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে আর সেই সাথে অসীম মমতায় উচ্চারিত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (সাঃ) নামটি।

অমুসলিমদের মধ্যে বিখ্যাত অসংখ্য মনীষীগণ, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনেতা, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ ইত্যকার বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করে এত প্রশংসা করেছেন যে, তা একত্রিত করলে বিরাট আকারের গ্রন্থ রচিত হবে। ডঃ মাইকেল হার্ট লিখিত দি হান্ড্রেড (The Hundred) নামক গ্রন্থে 'মুহাম্মাদ' নামটিকেই সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠসমূহের প্রবেশ পথে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নাম উল্লেখ করে যে নামফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ (Epitaph) স্থাপন করা হয়েছে, সে নামফলকের প্রথমেই শ্রেষ্ঠ আইনদাতা (Law Giver) হিসাবে 'মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ' (সাঃ) নামটিকেই সর্বপ্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত আজান ও নামাজে তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতের কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে, তাঁর প্রশংসা বাণী ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তাঁর জন্য দোয়া করা হচ্ছে অগণিত কণ্ঠে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন- 'হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে জানালেন, আমার রব ও আপনার রব জানতে চেয়েছেন যে, আমি কিভাবে আপনার নামকে উচ্চকিত করে দিয়েছি। আমি বললাম, সেটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, যখন যেখানেই আমার নাম উচ্চারিত হবে, তখন সেখানেই আমার নামের সাথে আপনার নামও উচ্চারণ করা হবে'। পৃথিবীতে যেখানেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাম তাঁর বান্দাহ্রা যখনই উচ্চারণ করছে, তখনই বিশ্বনবীর প্রিয় নামটিও পরম শ্রদ্ধাভরে পাশাপাশি উচ্চারণ করছে।

নবী করীম (সাঃ) এর নাম মুবারকের মর্যাদা

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে মানুষকে সম্বোধনের পৃথক কিছু বিষয় রয়েছে। প্রচলিত সংস্কৃতি অনুসারে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। আমাদের দেশে অমুক চাচা, অমুক মামা, অমুক ভাই অথবা বড় চাচা, ছোট চাচা বা বড় মামা অথবা বড় ভাই ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রথমে নাম তারপরে চাচা, মামা, খালু ইত্যাদি। পশ্চিমা বিশ্বে মিস্টার অমুক বলে সম্বোধন করা হয়। সাউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে পরিচিত বা অপিরিচিত মানুষকে ইয়া মুহাম্মাদ বা ইয়া আহ্মাদ, সাদিক বা হাবিব বলে সম্বোধন করা হয়। নবী করীম (সাঃ) যে যুগে পৃথিবীতে এসেছিলেন সে সময় অধিকাংশ লোকের গুণবাচক নাম ছিলো এবং মূল নামে না ডেকে গুণবাচক নামেই ডাকতো। কাউকে অমুকের সন্তান বলেও ডাকা হতো, যেমন ইবনে খাত্তাব বা খাত্তাবের সন্তান।

নবী করীম (সাঃ) এর নামকরণের বিষয়টি ঘটেছে সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ইশারায়। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন হযরত আমিনাকে স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়েছিলো তোমার সন্তানের নাম রাখবে 'আহ্মাদ'। নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) এর মুখে এই 'আহমাদ' নামটি উচ্চারিত হয়েছিলো। তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন–

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ إِسْرَآئِيْلَ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًام بِرَسُوْلٍ يَّأْتِى مِنم بَعْدِى اسْمُه أَحْمَدُ ط

(স্মরণ করো ঈসার কথা), যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এক রাসূল, আমার আগের তাওরাত কিতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদদাতা (তার একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পর এক রাসূল আসবেন, তাঁর নাম আহ্মাদ। (সূরা আস্ সফ-৬)

নবী করীম (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হবার পরে দাদা আব্দুল মুত্তালিব প্রাণপ্রিয় নাতীকে চুমু দিয়ে চাদরে আবৃত করে কোলে নিয়ে পবিত্র কা'বা ঘরে এসে তাঁর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রাণভরে দোয়া করলেন। তারপর সপ্তম দিনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করে প্রিয় নাতীর নামকরণ করলেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তৃপ্তি সহকারে আহার করে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে জানতে চাইলো, 'আপনার নাতির কি নামকরণ করলেন?' তিনি বেশ গর্বভরে জবাব দিলেন, 'আমি আমার নাতির নামকরণ করেছি মুহাম্মাদ'।

সে যুগে 'মুহাম্মাদ' নাম তেমন কেউ রেখেছে বলে জানা যায় না। উপস্থিত লোকজন বেশ অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'আমাদের মধ্যে যে ধরনের নাম রাখা হয় তেমন নাম না রেখে ব্যতিক্রমধর্মী নাম রাখলে যে!' আব্দুল মুত্তালিব মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'আমি চাই যে, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি এবং আকাশে আল্লাহ তাঁর সীমাহীন প্রশংসা করুন। আমার নাতি চিরদিন যেনো সর্বত্র প্রশংসিত হয় এবং এ জন্যেই আমি তাঁর নামকরণ করেছি মুহাম্মাদ'।

উল্লেখ্য, 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ অতি প্রশংসিত। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা যাঁর প্রশংসা করেন এবং সকল সৃষ্টিকুল যাঁর প্রশংসা করে। অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ দেননি, কিন্তু নবী করীম (সা:) এর প্রতি দরূদ প্রেরণের আদেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর মর্যাদাবান নবী-রাসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন এবং ফিরিশতারাও প্রেরণ করেন। এই নামটির মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, এই নামটি শোনার সাথে সাথে কেউ যদি 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' না বলে অর্থাৎ দরূদ না পড়ে তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর নারাজ হবেন। আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে যত সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, তাদের সকলকেই তিনি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। হযরত আদম (আ:) মানব জাতির আদি পিতা। তিনিই প্রথম মানব, প্রথম নবী, প্রথম রাসূল এবং প্রথম বিজ্ঞানী। সেই আদম (আ:) কে সৃষ্টি করেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ–

হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই জান্নাতে বসবাস করতে থাকো। (সূরা আল বাকারা-৩৫)

হযরত নূহ্ (আ:) যাঁকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। কেননা প্রবল বন্যায় সকল কিছু নি:শেষ হয়ে যাবার পর তাঁর থেকেই পুনরায় মানব বংশের বিস্তার ঘটেছে। তাঁর সন্তান ছিলো ইসলামের কঠিন দুশমনদের অন্তর্গত। তাঁর সেই সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ডেকে বললেন–

قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ–

আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে নূহ্, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সূরা হূদ-৪৬)

বন্যার পানি নেমে যাবার পর আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহ্ (আ:) কে ডেকে বললেন–

قِيْلَ يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ط

হে নূহ্ (বন্যার পানি নেমে গেছে) এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে। (সূরা হূদ-৪৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে স্বপ্নে সবথেকে প্রিয় বস্তু কুরবানী দেয়ার নির্দেশ পেয়ে মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ:) নিজ সন্তান ইসমাঈল (আ:) কে কুরবানী করার উদ্যোগ নিলেন। এরপর মহান আল্লাহ তাঁকে আহ্বান জানালেন–

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ لا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج

তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি (আমার দেখানো) স্বপ্ন সত্য প্রমাণ করেছো। (সূরা আস্ সাফফাত ১০৪-১০৫)

হযরত মূসা (আ:) মহান আল্লাহর খুবই আদরের নবী ছিলেন। তিনি মাদাইন থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফেরার পথে কোনো এক শীতের রাতে উপত্যকায় আলো দেখে আগুন ধারণা করে পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি ওখানে গিয়ে দেখি আগুন আনতে পারি কিনা। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আহ্বান জানালেন–

يَا مُوْسى إِنِّىْ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ لا

হে মূসা, আমিই আল্লাহ- সৃষ্টিকুলের একমাত্র মালিক। (সূরা কাসাস-৩০)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسى–

হে মূসা, (বলো তো) তোমার ডান হাতে ওটা কি? (সূরা ত্বাহা-১৭)

হযরত দাউদ (আ:) কে মহান আল্লাহ বিশাল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা ডেকে বললেন–

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

হে দাউদ, আমি তোমাকে এই যমীনে আমার খলীফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তেমনটি করলে এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (সূরা ছোয়াদ-২৬)

হযরত জাকারিয়া (আ:) বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলো বন্ধ্যা। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁকে ডেকে বলেছিলেন–

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُه يَحْى لا لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا–

হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া, এর পূর্বে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি। (সূরা মারইয়াম-৭)

তাঁর এ সন্তান বড় হলো এবং মহান আল্লাহ যখন তাঁকে নবুয়্যাত দান করলেন তখন তাঁকে ডেকে বললেন–

يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ط وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا لا

হে ইয়াহ্ইয়া, আমার কিতাবকে তুমি শক্তভাবে ধারণ করো, প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে ছেলে বেলায়ই বিচার-বুদ্ধি দান করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম-১২)

হযরত ঈসা (আ:) যাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতা ব্যতীত বিশেষ কুদরতের মাধ্যমে মাতৃগর্ভে পাঠালেন। তাঁকে ডেকে বললেন–

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ–

হে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মা'কে দান করেছিলাম। (সূরা মায়েদা-১১০)

এভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসাবে ঘোষণা করে যাঁদের ভুয়সী প্রশংসা ও বিশেষ গুণ-বৈশিষ্টের প্রশংসা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, সেই সকল নবী-রাসূলদের সকলকেই নাম ধরে ডেকেছেন। ব্যতিক্রম শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ক্ষেত্রে, তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা কখনো নাম ধরে ডাকেননি। সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, মালিক, শাসক, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, আইনদাতা, একমাত্র ইলাহ মহান আল্লাহ তা'য়ালা। সেই তিনিই তাঁর অনুপম অদ্বিতীয় সৃষ্টি নবী করীম (সা:) কে এমন বিশাল মর্যাদা দান করেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নাম ধরে কখনো ডাকেননি। নবী করীম (সা:) এর মর্যাদার কারণে তাঁর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা কত উচ্চে তা কল্পনা করা যায়!

যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব নবী করীম (সা:) কে এভাবে ডেকেছেন–

يَآ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط

হে রাসূল, যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি অন্যের কাছে পৌছে দিন। (সূরা মায়েদা-৬৭)

মানুষ মহান আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এ অবস্থা দেখে নবী করীম (সা:) অসম্ভব পেরেশান হয়ে বিচলিত বোধ করতেন। মানসিক যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। প্রিয় হাবিব মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছেন, এ অবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা বরদাস্ত করলেন না। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

يَآ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ–

হে রাসূল, যারা দ্রুত গতিতে কুফুরীর পথে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেনো আপনাকে দু:খ না দেয়। (সূরা মায়েদা-৪১)

অর্থাৎ আপনি ওদের নিয়ে চিন্তা করবেন না। ওদেরকে মহাসত্য বুঝিয়েছেন, তারা সত্য গ্রহণ না করে কপটতার আশ্রয় নিচ্ছে বা সত্য প্রত্যাখ্যান করছে। এ জন্যে আপনি কষ্টানুভব করবেন না। ওদেরকে ওদের ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিন।

ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে, নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে দিচ্ছে। কেউ কোথাও নেই যে তাঁকে একটু সাহায্য করবে বা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। সকলেই ইসলামের দুশমনদের ভয়ে তটস্থ। চরম এ অসহায় অবস্থায় মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে ডেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন–

يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ع

হে নবী, আপনার জন্যে এবং আপনার অনুবর্তনকারী মুমিনদের জন্যে তো আল্লাহ তা'য়ালাই যথেষ্ট। (সূরা আনফাল-৬৪)

সকল শক্তির বড় শক্তি যদি কারো পাশে থাকে, তাহলে অন্য কোনো শক্তিকে পরোয়া করার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ তা'য়ালা যাঁকে মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন করে নাম ধরে না ডেকে 'নবী' বলে সম্বোধন করে বলছেন, 'আমি আল্লাহই আপনার জন্যে যথেষ্ট' তাঁর জাগতিক কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আর থাকে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় বন্ধুকে সরাসরি নাম ধরে না ডেকে নানা ধরনের প্রিয় নামে সম্বোধন করেছেন। নবী করীম (সা:) কম্বলে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন, ডাকার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এভাবে ডেকেছেন–

يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ لا قُمْ فَاَنْذِرْ لا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لا

হে কম্বল আবৃত, (কম্বল ছেড়ে) উঠুন এবং মানুষদের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করুন, আপনার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (সূরা মুদ্দাসসির-১-৩)

বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নবী করীম (সা:) শুয়ে আছেন, ডাকার প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ডাকছেন–

يَآ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لا قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً لا

হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী, রাতে (নামাজের জন্যে) উঠে দাঁড়ান, কিছু অংশ বাদ দিয়ে। (সূরা মুযযাম্মিল-১-২)

মর্যাদার কোন্ উচ্চ চূড়ায় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বন্ধু নবী করীম (সা:) কে সমাসীন করেছেন যে, তাঁরই সৃষ্টিকে তিনি নাম উচ্চারণ করে না ডেকে নানা বিশেষণে

ডাকছেন। আল্লাহু আকবার! আমরা সেই নবীরই উম্মত, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা ভুলে গিয়ে পৃথিবীর নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন মানুষদেরকে নিজেদের নেতা বানিয়ে অনুসরণ করছি। আর ঠিক এ কারণেই বর্তমানে নির্যাতন আর লাঞ্ছনার সর্বপ্লাবী প্লাবন আমাদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সর্বত্র লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে নবী করীম (সাঃ) এর নাম

প্রত্যেক নবী-রাসূলকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করেছেন কিন্তু সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণে নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করেননি। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে পবিত্র কুরআনে চার স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের একশত চৌদ্দটি সূরার মধ্যে চারটি সূরায় নবী করীম (সাঃ) এর নাম প্রাসঙ্গিক কারণে 'মুহাম্মাদ' (সাঃ) উল্লেখ করা হলেও এটি সম্বোধনগত কারণে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ–

মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন রাসূল ছাড়া (অতিরিক্তি) কিছুই নয়, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছে (তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে), তাই তিনি যদি (আজ) মরে যান অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (তাঁর আনীত জীবন বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিবে? আর যে ব্যক্তিই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনো আল্লাহর (দ্বীনের) কোনোরকম ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন। (সূরা আলে ইমরান-১৪৪)

নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র নাম মুবারক সম্বলিত এ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলো, ওহূদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে ইসলামের দুশমনরা যখন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আঘাত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছিলো সে মুহূর্তে প্রাণ উৎসর্গকারী কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের দেহকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সকল আঘাত প্রতিহত করছিলেন, যেনো আল্লাহর রাসূলের দেহ মুবারকে আঘাত না লাগে। ধনীর সন্তান তরুণ সাহাবী হযরত সাইয়্যেদ মুসাইয়্যেব (রাঃ) সেদিন যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের ডান হাতে এমনভাবে আঘাত পেলেন যে, তাঁর ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তিনি বাম হাতে ইসলামের পতাকা তুলে ধরলেন। ইসলামের দুশমনরা তাঁর বাম হাতেও আঘাত করলো। বাম

হাতও তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তিনি শাহাদাতবরণ করা পর্যন্ত নিজের মুখ দিয়ে ইসলামের পতাকা কামড়ে ধরে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। ওহূদ যুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিপক্ষ তাঁকে যত বার আঘাত করেছিলো প্রত্যেক আঘাতের জবাবে তিনি বলছিলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط

মুহাম্মাদ (সা:) একজন রাসূল ছাড়া (অতিরিক্তি) কিছুই নয়, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছে (তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে)। (সূরা আলে ইমরান-১৪৪)

হযরত সাইয়্যেদ মুসাইয়্যেব (রা:) এ কথাই ইসলামের দুশমনদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন, 'মুহাম্মাদ (সা:) মহান আল্লাহর একজন রাসূল মাত্র, অতীতের নবী-রাসূলও মৃত্যুবরণ করেছেন। মুহাম্মাদ (সা:)ও তো একদিন মৃত্যুবরণ করবেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইসলাম নি:শেষ হবে না। ইসলাম ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা:) এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ আদর্শ চিরন্তন- কালজয়ী। কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকার জন্যেই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। তোমরা ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা:) কে হত্যা করে ইসলামকে হত্যা করতে পারবে না'।

উল্লেখ্য, তখন পর্যন্ত এ কথাগুলো কুরআনের আয়াত হিসাবে অবতীর্ণ হয়নি। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেই চরম মুহূর্তে হযরত সাইয়্যেদ মুসাইয়্যেব (রা:) এর বলা কথাগুলো মহান আল্লাহর এতই পছন্দ হয়েছিলো যে, পরবর্তীতে তিনি হুব-হু সে কথাগুলো পবিত্র কুরআনের আয়াত হিসাবে অবতীর্ণ করলেন।

ওহূদের ময়দানে উদ্ভূত পরিস্থিতির এক পর্যায়ে ইসলামের দুশমনরা প্রচার করলো যে, মুহাম্মাদ (সা:) নিহত হয়েছেন। এ সংবাদে মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন বলাবলি শুরু করলো, 'মুহাম্মাদ (সা:) যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকবেন, তাহলে তিনি মারা পড়লেন কিভাবে? আমাদের উচিত এখন ইসলামী জীবন বিধান ত্যাগ করে পূর্বপুরুষের আদর্শে ফিরে যাওয়া'।

তাঁদের এ ধরনের কথা ও মনোভাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা জানিয়ে দিলেন, 'নবী-রাসূলগণ মৃত্যুবরণ করবেন এটাই তো স্বাভাবিক, কেননা তাঁরাও তো মানুষ। মুহাম্মাদ (সা:) ও একজন মানুষ, তিনিও মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যুর কারণে কেউ যদি ইসলামী জীবন বিধান ত্যাগ করে তাহলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করবে ক্ষতি তারই হবে'। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সা:) এর নাম উল্লেখপূর্বক উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ আয়াতে নবী করীম (সা:) কে নাম ধরে ডাকা হয়নি। নবী করীম (সা:) এর নাম মুবারক পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাব-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ع

হে মানুষ (তোমরা জেনে রেখো), মুহাম্মাদ (সা:) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সীল (মোহর), আল্লাহ তা'য়ালা সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন। (সূরা আহযাব-৪০)

এ আয়াতে নবী করীম (সা:) এর নাম মুবারক উল্লেখ করার এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিষয়টি নবী করীম (সা:) এর নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনের সাথে জড়িত। সে সময় আরবে পালক পুত্রকে গর্ভজাত সন্তান হিসাবেই বিবেচনা করা হতো এবং পালক সন্তানও নিজ সন্তানের মতোই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো। হযরত জায়েদ বিন হারেসা (রা:) নামক নবী করীম (সা:) এর একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন এবং তিনিই সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী যাঁর নাম মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবের ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হযরত জায়েদ (রা:) ছিলেন কালব গোত্রের হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির সন্তান। তাঁর গর্ভধারিণী মা সু'দা বিনতে সা'লাবা ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মা'ন শাখার মেয়ে। তিনি আট বছর বয়সী সন্তান জায়েদকে নিয়ে নিজ পিতার বাড়িতে এলে বনী কাইন ইবনে জাস্‌র এর লোকজন সেখানে আক্রমণ করে লুটপাটের পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত মানুষদের মধ্যে আট বছরের শিশু জায়েদও ছিলেন।

তায়েফ এলাকার কাছাকাছি সে সময় উকাযের মেলা হতো। এই মেলায় শিশু জায়েদকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয় এবং তাঁকে কিনে নেন হযরত খাদিজা (রা:) এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম। তিনি মক্কায় এসে নিজ ফুফু হযরত খাদিজা (রা:) কে উপহার হিসেবে হযরত জায়েদকে দিয়ে দেন। বিয়ের পরে নবী করীম (সা:) কিশোর জায়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদিজা (রা:) এর কাছ থেকে তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। এভাবে কিশোর ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন যাঁকে মাত্র কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা শ্রেষ্ঠ নবী-রাসূলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। হযরত জায়েদ (রা:) এর বয়স তখন পনের, এ সময় তাঁর পিতা হারেসা ইবনে শারাহীল ও চাচা হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সন্ধান পেয়ে নবী করীম (সা:) এর কাছে এসে প্রস্তাব দেন, 'আপনি মুক্তিপণ হিসাবে যা চান তাই দিবো, আপনি আমার সন্তানকে আমাদের কাছে ফেরৎ দিন'।

নবী করীম (সা:) বললেন, 'আপনার ছেলেকে ডেকে আনছি এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায় তাহলে তাঁর ইচ্ছা সে

যেতে পারে। আর যদি সে চায় তাহলে আমার কাছেও থাকতে পারে। আপনাদের সাথে যেতে চাইলে আমি মুক্তিপণ হিসাবে কোনো অর্থ নিবো না, এমনিতেই দিয়ে দিবো। আর যদি সে আমার কাছেই থাকতে চায় তাহলে আমার নীতি এটা নয় যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইবে আর আমি তাকে তাড়িয়ে দিবো'।

এ কথা শুনে হযরত জায়েদ (রাঃ) এর পিতা ও চাচা বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'আপনি যা বললেন তা ইনসাফেরও অতিরিক্ত, অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের সন্তানকে এখানে নিয়ে আসুন'।

নবী করীম (সাঃ) হযরত জায়েদ (রাঃ) কে ডেকে এনে উপস্থিত লোক দু'জনকে দেখিয়ে বললেন, 'তুমি কি এ লোক দু'জনকে চিনো?'

হযরত জায়িদ (রাঃ) নিজ পিতা ও চাচার সান্নিধ্যে গিয়ে বললেন, 'জ্বি, এ দুজনের একজন আমার পিতা ও অন্যজন আমার চাচা'।

নবী করীম (সাঃ) হযরত জায়েদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মধুর স্বরে বললেন, 'তুমি তোমার পিতা ও চাচাকেও চিনো এবং আমাকেও চিনো। এখন তুমি ইচ্ছে করলে তাদের সাথে চলে যেতে পারো আর মন চাইলে আমার সাথেও থাকতে পারো। এ ব্যাপারে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে'।

হযরত জায়েদ (রাঃ) নিজ পিতা ও চাচার মমতার সান্নিধ্য থেকে সরে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর পরম স্নেহের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না'।

বিস্ময়ে বিমূঢ় সন্তান বুভুক্ষ পিতা ও চাচা অবাক দৃষ্টিতে নিজ সন্তানের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে পিতা সন্তানকে বললেন, 'বাবা, স্বাধীন জীবনের তুলনায় তুমি দাসত্বের জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছো? নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে অনাত্মীয় একজনের কাছে দাস হিসাবে থাকতে চাচ্ছো?'

হযরত জায়েদ হাতের ইশারায় নবী করীম (সাঃ) কে দেখিয়ে পিতার বিস্মিত চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'এই মানুষটির মধ্যে আমি যেসব গুণ-বৈশিষ্ট দেখেছি, এরপর আর পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষকে এই মানুষটির ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না'।

নিজ সন্তানের মুখে এ ধরনের কথা শুনে পিতা ও চাচা অত্যন্ত খুশী হয়ে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র সান্নিধ্যে সন্তানকে রেখে চলে যান। এরপরই নবী করীম (সাঃ) হযরত জায়েদকে স্বাধীন করে দিয়ে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর ছায়াতলে গিয়ে কুরাইশদের

সমাবেশে ঘোষণা দেন, 'আপনারা সাক্ষী থাকুন, আজ থেকে জায়েদ আমার সন্তান, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হবো'।

এভাবে তখনকার সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) হযরত জায়েদ (রাঃ) কে নিজের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিলে লোকজন তাঁকে জায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলে সম্বোধন করতে থাকে। এরপর নবী করীম (সাঃ) নবুয়্যাতের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার পরে সর্বপ্রথম যে চারজন কোনো প্রকার প্রশ্ন ব্যতীতই তাঁর প্রতি ঈমান এনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমজন হযরত খাদিজা (রাঃ), দ্বিতীয়জন হযরত জায়েদ (রাঃ). তৃতীয়জন হযরত আলী (রাঃ) ও চতুর্থজন হযরত আবু বকর (রাঃ)। পরবর্তীতে চতুর্থ হিজরীতে নবী করীম (সাঃ) নিজের ফুফাতো বোন হযরত যয়নব (রাঃ) এর সাথে হযরত জায়েদ (রাঃ) এর বিয়ে দেন। কিন্তু তাদের বিয়ে দেড় বছরও টিকেনি, দাম্পত্য জীবনে তিক্ততা দেখা দেয় এবং পরিশেষে তালাক পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। অপরদিকে ইনসাফের বিপরীত যুক্তিহীন একটি প্রথাকে দু'পায়ে দলিত মথিত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত যয়নবকে বিয়ে করার জন্যে নবী করীম (সাঃ) কে আদেশ দেন।

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত যয়নবকে বিয়ে করলে ইসলামের দুশমনরা প্রচার করতে থাকে যে, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন, অথচ তিনি যে আদর্শ প্রচার করছেন সে আদর্শেও নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করা হারাম'। তাদের এই অপপ্রচারের জবাব দেয়া হলো সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে।

বলা হলো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কোনো পুত্র সন্তানই নেই। জায়েদ তাঁর সন্তান নয়, সুতরাং তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করে হারাম কাজ করলেন কিভাবে? তোমরা নিজেরাই তো জানো, তাঁর কোনো পুত্র সন্তানই নেই, তাহলে তাঁর প্রতি এই অপবাদ কেনো দিচ্ছে? তোমরা সমাজে যে অবৈধ রীতি প্রচলিত করেছো, তা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যেই তো রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা যে হালাল বিষয়টি হারাম করে রেখেছো, তা হালাল করে দেয়াই রাসূলের দায়িত্ব। তিনি যদি এই হারাম বিষয়টি ভেঙ্গে না দেন, তাহলে তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হবে না, যিনি এ প্রথা ভাঙ্গবেন। কারণ তিনিই শেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হবে না'। এই কথাগুলোই মানুষকে জানানোর প্রয়োজনে উক্ত আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করার পরে কোনো মানুষ যদি অতীতের গত হয়ে যাওয়া নবী-রাসূলের আনীত আদর্শ, যা কিনা মানুষ বিকৃত করেছে। সেসব বিকৃত আদর্শ কেউ যদি অনুসরণ করে তাহলে তারা যেমন সরল

সঠিক পথে চলতে পারবে না এবং আল্লাহর আদালতেও মুক্তি পাবে না। অভ্রান্ত পথে চলতে ইচ্ছুক হলে, পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও প্রগতির পথে চলতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহর আদালতে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক হলে তাদেরকে অবশ্যই সেই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে, যা মুহাম্মাদ (আ:) এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই নবী করীম (সা:) এর নাম মুবারক উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لا كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ-

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, মুহাম্মাদ-এর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে, যা একান্ত ভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, আল্লাহ তাদের জীবনের সব গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ-২)

নবী করীম (সা:), সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারীগণ ইসলামের বিপরীত কোনো মতাদর্শ বা আদর্শের সাথে কখনো আপোষ করেন না এবং তাঁদেরকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সম্মুখে মাথানত করানো কখনো সম্ভব নয়, এ কথাগুলো স্পষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الإِنْجِيْلِ قف كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَه فَآزَرَه فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ع

মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল, অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, তারা রুকু ও সিজদাবনত অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও (এ আনুগত্য ও) সিজদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও (আর তা হচ্ছে), যেমন একটি বীজ- যা থেকে বেরিয়ে আসে (ছোট্ট) কিশলয়, অতপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির

এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে, (এভাবে একটি মুমিন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা (আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের ওপর) ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা ফাতাহ-২৯)

এ কথার অর্থ এটা নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম বা রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারীগণ ইসলামের বিপরীত আদর্শের লোকদের সাথে খুবই রূঢ়, কর্কশ ও নির্দয় আচরণ করে থাকেন। বরং এর অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরাম ও প্রকৃত মুসলিমরা ঈমানের পরিপক্কতা, নীতি আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, অবিচলতা, চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং ঈমানী দূরদৃষ্টির কারণে ইসলামের বিপরীত আদর্শের লোকদের সম্মুখে দুর্জয় ও অনমনীয় এবং হিমাচলের মতোই অনড় হয়ে আছেন। তাঁরা কর্দমাক্ত মাটি বা মোমের মতো নয় যে, যেদিকে খুশী সেদিকেই তাদেরকে ঘুরানো সম্ভব। তাদের ঈমান এত দুর্বল নয় যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির রক্তচক্ষু দেখে তাঁরা মাথানত করবেন, ফাসির মঞ্চে গিয়েও তাঁরা নীতি আদর্শের প্রশ্নে অটল থাকবেন।

কোনো লোভ-লালসা দেখিয়েও তাদেরকে তাদের নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। এসব লোক অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় না। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদের লোভেও এরা আদর্শ ত্যাগ করে না। পবিত্র কুরআনের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা ময়দানে সংগ্রাম করছে, সে সংগ্রাম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা বিরতি দেন না। অবিরাম তাঁরা আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মুখপানে উল্কার বেগে ছুটতেই থাকেন। বাতিল শক্তির নির্যাতন, শোষণ, নিপীড়ন, জেল-জুলুম কোনো কিছুই তাঁদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

ইসলামী আদর্শ যারা এই যমীন থেকে উৎখাত করতে চায়, এ লক্ষ্যেই যারা তৎপর, তাদের বিরুদ্ধে এসব লোক অনমনীয় ও কঠোর। ইসলামের দুশমন নয়, অথবা যারা ইসলাম বুঝে না, তাদের প্রতি এসব লোক অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, নমনীয়, ভদ্র, নম্র, দয়াবান, স্নেহময় ও তাদের হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তাঁরা নিজেরাও পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত মমতাবান। তাদের মধ্যে আদর্শিক বন্ধনের কারণে তাঁরা একে অপরের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল। অন্যের বিপদকে এরা নিজের বিপদ মনে করে একে অপরের পাশে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

উক্ত আয়াতে বাহ্যিক চেহারায় সিজদার চিহ্ন রয়েছে বলতে নামাজ আদায় করার কারণে যেসব লোকের কপালে বা দেহের অন্য কোনো স্থানে যেসব চিহ্নের সৃষ্টি হয়, এ আয়াতে ঐসব চিহ্নের কথা বলা হয়নি। উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহভীতি, উন্নত

নৈতিকতা, নম্রতা, বিনয়, ভদ্রতা, মানসিক ঔদার্য, সহৃদয়তা, শালীনতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার সেই সকল নিদর্শন যা সার্বিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যমূলক জীবন যাপনের কারণে ব্যক্তির সমগ্র মুখাবয়বে, দৃষ্টির চাহনীতে, চাল চলনে, কথার ধরনে, ওঠা বসায় ভাস্বর ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুখমণ্ডল এমন একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ যার প্রত্যেক ছত্রে ব্যক্তির মন-মানসিকতা স্পষ্ট লেখা রয়েছে।

একজন বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, শালীন ও নির্বিরোধী লোকের মুখমন্ডল একজন দাম্ভিক, অহঙ্কারী, কলহপ্রিয় ও কঠোর প্রকৃতির লোকের মুখমন্ডল থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পূত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোকদের মুখাবয়ব চরিত্রহারা লোকদের মুখাবয়ব থেকে পৃথক হয়। ভদ্র, নির্মল ও উন্নত নৈতিক চরিত্রবান লোকদের আকৃতি প্রকৃতি পাপাচারে নিমজ্জিত চরিত্রহীন লোকদের আকৃতি প্রকৃতির থেকে ভিন্ন ধরনের হয়। উক্ত আয়াতে এ কথাগুলোই বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর আদর্শের যথাযথ অনুসারীদের দেখলেই তাদেরকে সর্বোত্তম মানুষ বলে বিবেচিত হয়। কারণ তাদের সমগ্র মুখমন্ডলে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জ্যোতির্ময় কিরণচ্ছটা দ্যূতি বিকিরণ করতে থাকে। আর এ কথাগুলোই বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের নাম উক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এভাবে পবিত্র কুরআনে মাত্র চার স্থানে নবী করীম (সাঃ) এর নাম মুবারক আল্লাহ তা'য়ালা প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য নবী-রাসূলদের প্রতি নিজ জাতির সম্বোধন

পৃথিবীতে প্রেরিত অন্যান্য নবী-রাসূলদের মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং যেমন নাম উল্লেখপূর্বক সম্বোধন করেছেন, তেমনি তাদের নিজ জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্রের লোকজন তাদেরকে নাম উল্লেখ করেই সম্বোধন করেছে। এ ব্যাপারে নবী-রাসূলের অনুসারীদের প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো বলে প্রতীয়মান হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল নবী-রাসূলের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন তাঁদেরকে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে নাম ধরে ডেকেছেন তা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁদের অনুসারী এবং দেশের লোকজন কিভাবে তাঁদেরকে ডাকতো এখন আমরা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর জাতির লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরব্যাপী তিনি নানা পদ্ধতি অবলম্বনে লোকদেরকে দাওয়াত দিলেন। সামান্য সংখ্যক মানুষ ব্যতীত আর কেউই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলো না। তিনি জাতিকে জানালেন, 'যদি তোমরা আমার দাওয়াত গ্রহণ না করো তাহলে আল্লাহ

তা'য়ালা আযাব দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন'। তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর নাম উল্লেখপূর্বক বলেছিলো–

قَالُوْا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ–

লোকেরা বললো, হে নূহ্ (এ বিষয়টি নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিতণ্ডা করছো এবং বিতন্ডা তুমি একটু অতিমাত্রায়ই করে ফেলেছো, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে সে (আযাবের) জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো। (সূরা হূদ-৩২)

হযরত হূদ (আ:) এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, নিজ জাতিকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু জাতি তাঁর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি, নবী-রাসূল প্রেরিত হবার অর্থই ছিলো সে জাতির ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যাওয়া। হয় তারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে নতুবা মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন হবে। এক পর্যায়ে হূদ (আ:) নিজ জাতিকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, আর তোমরা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছো। আমি আশঙ্কা করছি, তোমরা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হবে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যাবে'।

এসব লোকজন অবাধ্যতা প্রদর্শন করে আল্লাহর নবী হযরত হূদ (আ:) এর নাম ধরে ডেকে জানিয়ে দিলো–

قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ–

হে হূদ, তুমি তো আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার মুখের কথায় আমরা কিন্তু আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার লোক নই, আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস করে মুমিন হয়ে যাবো না! (সূরা হূদ-৫৩)

হযরত সালেহ (আ:) নিজ জাতিকে মহান আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করে শান্তি-স্বস্তির সাথে পৃথিবীতে জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিজের রচনা করা বিধান ও নিজ হাতে গড়া মাবুদের দাসত্ব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর গোলামী করার আহ্বান তিনি জানালেন। তাঁর জাতির লোকজন তাঁর নাম ধরে ডেকে জানিয়ে দিলো–

قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ–

তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন একজন মানুষ ছিলে, যার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক বড় বড় আশা করা হতো, আর এখন কি তুমি আমাদের সে সব মাবুদের দাসত্ব থেকে বিরত রাখতে চাও যাদের দাসত্ব আমাদের পিতা-মাতারা যুগ যুগ ধরে করে আসছে, আসলে তুমি যে জীবন ব্যবস্থার দিকে আমাদের ডাকছো সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, এ ব্যাপারে আমরা খুব দ্বিধাগ্রস্তও বটে! (সূরা হূদ-৬২)

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নিজ পিতাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আব্বা, তুমি কেনো এমন এক জিনিসের পূজা করো যা দেখতে পায় না, কিছু শুনতে পায় না, যা তোমার কোনো কাজেও আসবে না। আব্বা, আমার কাছে আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি। তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। আব্বা, সে জ্ঞানের মৌলিক কথা হচ্ছে, তুমি শয়তানের গোলামী করো না, কারণ শয়তান হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী। আব্বা, তুমি যদি শয়তানের গোলামী করতে থাকো, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, পরম দয়ালু আল্লাহর কোনো আযাব এসে তোমাকে স্পর্শ করবে আর তুমি জাহান্নামে শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে'।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা নিজ সন্তানের মুখ থেকে এসব কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রোধে ধমকে উঠলো–

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيْمُ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا–

সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি আসলেই আমার দেব-দেবীদের থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো। তবে শোনো, এখনো যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো, আর যদি জীবিত থাকতে চাও তাহলে তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও। (সূরা মারইয়াম-৪৬)

মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার পরে নিজ জাতির লোকজন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর নাম ধরে ডেকে জানতে চেয়েছিলো–

قَالُوْا ءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيْمُ–

তারা (তাকে) জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের মূর্তিগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো! (সূরা আম্বিয়া-৬২)

বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে আইনের মাধ্যমে সমকামিতা বৈধ করা হয়েছে এবং যৌন বিকৃতি তাদের কাছে দোষের কিছু নয়। হযরত লূত (আঃ) এর জাতির মধ্যে এ

ধরনের প্রবণতা ছিলো। সে জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল ফিরিশতা প্রেরিত হয়েছিলো তাঁরা হযরত লূত (আ:) এর নাম উল্লেখ পূর্বক ডেকে বলেছিলো–

قَالُوْا يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ–

তারা বললো, হে লূত, (তুমি ভেবো না) আমরা তো হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফিরিশতা, (আমাদের কথা দূরে থাক) এরা তো তোমার কাছেও পৌঁছতে পারবে না, তুমি (বরং এক কাজ করো,) রাতের কোনো এক প্রহরে তোমার পরিবার- পরিজনসহ (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়ো, তবে তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়) পেছনে ফিরে না তাকায়, কিন্তু তোমার স্ত্রী ব্যতীত; (কেননা) যা কিছু (আযাবের তাণ্ডব) তাদের (ওপর) ঘটবে, তা তার (ওপর)ও ঘটবে; তাদের (ওপর আযাব আসার) ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; সকাল হতে আর কতোই বা দেরী! (সূরা হূদ-৮১)

হযরত শুয়াইব (আ:) নিজ জাতিকে মহান আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর দাসত্ব করো এবং এ দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তোমরা নামাজ আদায় করো'। নিজ জাতির লোকজন তাঁর নাম ধরে ডেকে জবাব দিয়েছিলো–

قَالُوْا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاؤُا ط إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ–

তারা বললো, হে শুয়াইব, তোমার নামাজ কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের দাসত্ব ছেড়ে দিবো যাদের দাসত্ব আমাদের পিতৃপুরুষেরা করতো, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তা করতে পারবো না? (আমরা জানি) নিশ্চয়ই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ! (সূরা হূদ-৮৭)

এক পর্যায়ে আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহীরা হযরত শুয়াইব (আ:) কে হত্যা করার হুমকি দিয়ে নাম ধরে ডেকে বলেছিলো–

قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ج وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ز وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ–

তারা বললো, হে শুয়াইব, তুমি যা (ভালো ভালো কথাবার্তা) বলো তার অধিকাংশ কথাই আমাদের (ঠিকমতো) বুঝে আসে না (আসল কথা হচ্ছে), আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা (অবশ্যই) তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, (তা ছাড়া) তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালী নও (যে, অতপর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে)। (সূরা হূদ-৯১)

হযরত ইউসুফ (আ:) কারাবন্দী থাকা অবস্থায় অন্য বন্দীদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছিলেন। সে দেশের শাসক এক স্বপ্ন দেখে এর অর্থ জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কেউই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারেনি। অবশেষে শাসক জানতে পারলেন তাঁর কারাগারে এমন একজন বন্দী রয়েছেন যিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলতে পারেন। সন্ধানদাতাকে শাসক কারাগারে পাঠালে তিনি হযরত ইউসুফ (আ:) এর নাম ধরে ডেকে বলেছিলেন–

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّيْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ-

হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, তুমি আমাদের 'সাতটি মোটা গাভী সাতটি পাতলা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'- এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা বলে দাও, যাতে করে এ ব্যাখ্যা নিয়ে আমি মানুষদের কাছে ফিরে যেতে পারি, হয়তো এর ফলে তারা তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও জানতে পারবে। (সূরা ইউসুফ-৪৬)

এ স্বপ্ন দেখেছিলো সে দেশের শাসক, রাজ-সভাষদদের মধ্যে কেউই এর অর্থ বলতে পারেনি। বন্দী থাকা অবস্থায় যে লোকটির দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফ (আ:) বলে দিয়েছিলেন, তিনিই শাসককে জানিয়েছিলেন, আপনার কারাগারে বন্দী একজন আছেন যিনি এর সঠিক ব্যাখ্যা বলতে পারবেন। শাসক উক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠালে তিনি হযরত ইউসুফ (আ:) কে নাম ধরে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন।

ফিরআউন ধারণা করতো সে-ই সকলের মালিক ও প্রতিপালক। এ জন্যে সে হযরত মূসা (আ:) ও হযরত হারুন (আ:) কে লক্ষ্য করে নাম ধরে ডেকে প্রশ্ন করেছিলো তাঁদের মালিক সম্পর্কে–

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَا مُوْسَى-

ফিরআউন বললো, হে মূসা (বলো), কে (আবার) তোমাদের মালিক? (সূরা ত্বাহা-৪৯)

হযরত মূসা (আ:) এর অনুসারীদের আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ থেকে খাদ্য অবতীর্ণ করতেন এবং তা আহার করে তারা জীবন ধারণ করতো। হতভাগাদের এ খাদ্য ভালো লাগলো না, তারা নিজেদের নবীকে নাম ধরে ডেকে বলেছিলো–

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوْسى لَن نَّصْبِرَ عَلى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِنْم بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط

হে মূসা, প্রতিদিন একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই আর ধৈর্য ধরতে পারবো না, তুমি তোমার মালিকের কাছে বলো তিনি কিছু ভূমিজাত দ্রব্য, তরিতরকারী, পিঁয়াজ, রসুন, ভুট্টা, ডাল উৎপাদন করেন। (সূরা বাকারাহ-৬১)

কিছু লোককে মূর্তি পূজা করতে দেখে এই হতভাগারা হযরত মূসা (আ:) এর নাম ধরে ডেকে দাবী জানালো–

يَا مُوْسى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ط

হে মূসা, তুমি আমাদের জন্যেও এ ধরনের একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন এদের দেবতা রয়েছে। (সূরা আল আ'রাফ-১৩৮)

এভাবে প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই তাঁর অনুসারীরা নাম ধরে সম্বোধন করতো এবং বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিলো না। মর্যাদাগত কারণে নবী করীম (সা:) এর ক্ষেত্রে বিষয়টি নিষিদ্ধ। নাম ধরে আহ্বান জানানো অনেক পরের বিষয়, নবী করীম (সা:) এর সম্মুখে সামান্যতম বেয়াদবিও সহ্য করা হতো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ডেকেছেন, 'হে আল্লাহর রাসূল বা হে আল্লাহর নবী' বলে। হযরত খাদিজা (রা:) প্রাণপ্রিয় স্বামী নবী করীম (সা:) কে আহ্বান জানাতেন, 'ইয়া আবাল কাসেম' অর্থাৎ হে কাসেমের আব্বা' বলে। নবী করীম (সা:) এর এক পুত্র সন্তানের নাম ছিলো কাসেম, তিনি শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

নবী করীম (সা:) এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা

কখনো কোনো একজন সাহাবীও নবী করীম (সা:) এর সম্মুখে বেয়াদবী করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সকল সময় প্রস্তুত থাকতেন। নিজের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এমনকি নিজের প্রাণের তুলনায় নবী করীম (সা:) কে তাঁরা অধিক ভালোবাসতেন। সুতরাং আকাশের নীচে যমীনের বুকে সর্বাধিক প্রিয় এ মানুষটির সাথে যেনো নিজের অজান্তেও বেয়াদবি না ঘটে এ ব্যাপারে তাঁরা সর্বোচ্চ সচেতনতা অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে আলোচক হিসাবে প্রেরণ করলো। এ লোকটি নবী করীম (সাঃ) এর সাথে মুখোমুখি বসে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করলো এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলো। আল্লাহর রাসূলের পিছনে শাণিত তরবারী হাতে মক্কার আলোচকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরবের চিরন্তন প্রথানুযায়ী উরওয়া আলোচনা চলাকালে ডান হাত দিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করছিলো। বিষয়টি মর্যাদাহানীকরও ছিলো না এবং সামাজিক প্রথা হিসাবে আল্লাহর রাসূলও এতে আপত্তি জানাননি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি সহ্য করলেন না। হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রাঃ) আহত সিংহের মতোই গর্জন করে উঠলেন, 'উরওয়া, তোমার হাত সরিয়ে নাও! আর একবার যদি তোমার হাত আল্লাহর রাসূলের দাড়ি স্পর্শ করতে এগিয়ে আসে তাহলে আমার তরবারী তোমার হাতকে ফিরিয়ে দিবে'।

মুসলমানদের সংখ্যা তখন নিতান্তই অল্প, নারী-পুরুষসহ দুই হাজারেও উন্নীত হয়নি। সারা দুনিয়া তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদা রক্ষায় সিংহের মতো গর্জন করেছেন। একজন অমুসলিম আরবের আবহমান প্রথা অনুসরণ করছে মাত্র, এটাও তাঁরা বরদাস্ত করেননি। বর্তমানে দেড়শত কোটির ওপরে মুসলমানদের সংখ্যা, প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন হলেও অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম নারীর গর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিই হচ্ছে। এ পৃথিবীতে অনেকগুলো বিশালায়তন রাষ্ট্রের অধিকারী মুসলিমরা। অঢেল অর্থ-সম্পদের মালিক তাঁরা। অগণিত বনজ, খনিজ, মৃত্তিকা, জলজ সম্পদের মালিক এবং অসংখ্য কর্মীর হাত রয়েছে মুসলমানদের। আণবিক অস্ত্রসহ বহু ধরনের অস্ত্র রয়েছে এদের হাতে।

এরপরেও প্রায় দিনই নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি আঘাত আসছে। পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) এর ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশসহ তাঁর প্রতি কটুক্তি করা হচ্ছে। তাঁর প্রতি মর্যাদাহানীকর বিষয় সম্বলিত অগণিত প্রকাশনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ দেড়শত কোটির অধিক মুসলমান নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে। এর স্বাভাবিক পরিণতির কারণেই মুসলমানরা বর্তমান পৃথিবীতে সবথেকে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। একটি চতুষ্পদ প্রাণী বা পিপিলীকার প্রাণের যে মূল্য দেয়া হচ্ছে তা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না।

মক্কার আলোচক উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখা বিস্ময় গোপন করতে পারেনি। হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী

করীম (সাঃ) এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ঢেলে দেওয়া শ্রদ্ধা আর তুলনাহীন অনুপম ভালোবাসার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে উরওয়া হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। মানুষ যে আরেকজন মানুষকে এতটা অকৃত্রিম ও অসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা করতে পারে তা ছিলো উরওয়ার কল্পনারও অতীত। প্রেরকদের কাছে ফিরে এসে সে বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলো, 'আমি পারস্য সম্রাটের দরবারে গিয়েছি, রোম সম্রাট ও নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। সম্রাট ও রাজার প্রতি রাজ সভাসদদের আচরণ দেখেছি। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথীগণ তাঁর সাথে যে আচরণ করে তার তুলনা কোথাও দেখিনি। কোনো একজন মানুষকে তাঁর অনুসারীরা যে হৃদয় দিয়ে এমনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করার জন্যে অকৃত্রিমভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তাঁর প্রতি যে এভাবে আনুগত্যের মাথানত করে দিতে পারে, তা আমি কোথাও দেখিনি। আমি দেখলাম, তাঁর মুখ থেকে কোনো আদেশ বের হবার সাথে সাথেই তাঁর সাথীরা তা পালন করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে। তিনি অজু করেন কিন্তু অজুর পানি মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁর সাথীরা দু'হাতে নিয়ে নিজেদের দেহ সিক্ত করতে থাকে। তিনি থুথু বা কফ নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিতেই অগণিত হাত এসে তাঁর মুখগহ্বরের সম্মুখে তালু বিছিয়ে দেয়। নিক্ষিপ্ত কফ বা থুথু সকলে একটু একটু করে নিয়ে গভীর মমতায় নিজ দেহে সুগন্ধির মতোই ব্যবহার করে। এমন দৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি। পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়ে তাঁর সাথীরা তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে আগ্রহী হবে না'।

এটাই ছিলো নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার বাস্তব প্রতিফলন। একবার দরবারে নববীতে সাহাবায়ে কেরাম বসে কথা বলছিলেন, তাঁদের পরস্পরের মধ্যের আলোচনা বোধহয় কিছুটা গুঞ্জন সৃষ্টি করেছিলো। রাসূলের কর্ণকুহরে অন্যের উচ্চকণ্ঠ প্রবেশ করবে বা রাসূলের কণ্ঠের তুলনায় অন্যের কণ্ঠ তাঁর সম্মুখে উচ্চ হবে, মহান আল্লাহ এটা বরদাস্ত করলেন না। তৎক্ষণাত আয়াত অবতীর্ণ করে নির্দেশ দিলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ-

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু কণ্ঠে আওয়াজ করো, নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়াজে কথা বলো না, এমন যেনো কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম এ কারণেই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না। (সূরা হুজুরাত-২)

কল্পনাতীত উচ্চে নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা, যাঁর সামনে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলাও আল্লাহ্ তা'য়ালা পছন্দ করেননি। সতর্ক করে দেয়া হলো, কেউ যদি নবী করীম (সাঃ) এর সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলে তাহলে তাঁর জীবনের সকল কাজকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে। এ আদেশের মাধ্যমে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম মিল্লাতকে জানিয়ে দেয়া হলো তাঁরা যে নবী-রাসূলের অনুসারী, তাঁর মর্যাদা কতটা বিশাল এবং উচ্চতার কোন্ উচ্চ শিখরে। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবীর অনুসারী হবার কারণে তাঁদের মর্যাদাও মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে কতটা উচ্চে পরোক্ষভাবে এ কথাও উক্ত নির্দেশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

উপস্থিত ঐ মানুষগুলোকেই সতর্ক করা হয়েছিলো, যারা নবী করীম (সাঃ) এর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল কিছু উৎসর্গ করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। আর অনুপস্থিত লোকজন যদি নবী ও তাঁর আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তাদের মর্যাদা বলতে পৃথিবীতে কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এ বিষয়টিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কথার মাধ্যমে, 'তোমাদের সব কাজকর্ম এ কারণেই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না'। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম মিল্লাতের কোনো কর্মেরই ন্যূনতম মূল্য নেই এবং মর্যাদা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই শুধুমাত্র এ কারণে যে, মুসলিম মিল্লাত নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর আদর্শের প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা প্রদর্শন করছে।

নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য অর্জনে ধন্য হয়েছিলেন, দরবারে রেসালাতের প্রতি কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, কিভাবে রাসূলের সাথে কথা বলতে হবে, কথা বলার সময় কোন্ শব্দ চয়ন করে কথা বলতে হবে এবং কতটা উন্নত শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে, তা যেমন শিক্ষা দেয়া হলো তেমনি একথাও তাঁদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো- তাঁরা যেনো ক্ষণিকের জন্যেও ভুলে না যায় যে, কোন্ ব্যক্তির সম্মুখে তাঁরা কথা বলছেন। তাঁরা সাধারণ কোনো মানুষের সাথে কথা বলছেন না, পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহ্ বা সম্রাটের সাথেও কথা বলছেন না। সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নবী-রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলছেন।

মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুধুমাত্র উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের জন্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যেই প্রযোজ্য। যদিও বর্তমানে দৈহিকভাবে নবী করীম (সাঃ) অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, সে কুরআন অবিকৃত অবস্থায় উপস্থিত। তাঁর মর্যাদাবান আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ উপস্থিত এবং তিনি যে আদর্শ সহকারে প্রেরিত হয়েছিলেন সেই 'ইসলাম' সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত। জীবিত থাকা অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি

সাহাবায়ে কেরাম সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, বিনিময়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর নেতৃত্ব তাঁদের পদতলে এনে দিয়েছিলেন। সকল সমস্যা সমাধানের সুত্রের আশায় সমগ্র পৃথিবী তাঁদেরই দিকে চাতক পাখির মতোই তাকিয়ে থাকতো। তাঁদের প্রবর্তিত সভ্যতা-সংস্কৃতিই পৃথিবীতে বিজয়ীর আসনে আসীন হয়েছিলো। মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তিকামী মানুষের আদর্শ ও অনুসরণীয় নেতা বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের নগদ বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে বাস্ত বে প্রদর্শন করেছেন।

মুসলিম মিল্লাতকে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে, পৃথিবীতে তাদের উন্নতি, প্রগতি, মর্যাদা সকল কিছুই নবী করীম (সাঃ), কুরআন তথা তাঁর আনীত আদর্শের সাথে জড়িত। মুসলিম মিল্লাত যতদিন রাসূল (সাঃ), কুরআন ও তাঁর আনীত আদর্শের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করেছে, ততদিনই তাঁরা মর্যাদার আসনে আসীন থেকেছে। আর যখনই তাঁরা এসবের প্রতি উদাসীন্য ও অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তখনই তাঁরা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণকৃত কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের আদেশ-নিষেধ শোনামাত্র যদি তাঁরা মর্যাদা প্রদর্শন ও আনুগত্যের মাথানত করে দেয়, তাহলে পুনরায় তাঁরা তাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

যে মুসলমানের হৃদয়ে সামান্য পরিমাণ ঈমানের গন্ধ রয়েছে, সেই মুসলমানও যখন নবী করীম (সাঃ) এর নাম বা তাঁর পবিত্র বিষয়সমূহ অথবা মদীনার প্রসঙ্গ শোনে, তখন তাঁর মনে ভিন্ন এক আবেগের ঢেউ খেলে যায়। মনে আক্ষেপ জাগে, একটিবার– মাত্র একটি বারও যদি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর ঐ অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখতে পেতাম! যদি আমি সাহাবায়ে কেরামের একজন হতাম! স্বপ্নের মধ্যেও যদি সবথেকে ঐ সুন্দর মানুষটিকে পলকের জন্যেও দেখতে পেতাম! ক্ষণিকের জন্যেও যদি তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য অনুভব করতে পারতাম!

নবী করীম (সাঃ) এর প্রসঙ্গ শুনলে এ ধরনের অনেক কল্পনাই মনের জগতে উঁকি দেয়। এর কারণ হলো, ইসলামী চিন্তা-চেতনাবোধ যাদের মধ্যে রয়েছে, অজান্তেই তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি নিজ প্রাণের থেকেও বেশি আকর্ষণ অনুভব করে থাকেন। আর এই আকর্ষণের বাস্তব প্রকাশ হলো, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি কেউ সামান্য কটাক্ষ করলেও তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। ঈমানের অন্যতম দাবী হলো, একজন মুসলমান আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে নিজ প্রাণের তুলনায় অধিক ভালোবাসবে। আর এই ভালোবাসার প্রমাণ সে দিবে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে। শুধুমাত্র মুখে নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে সে ভালোবাসার সামান্যতম মূল্যও দেয়া হবে

না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নবী (সা:) এর আদর্শ অনুসরণ করার জন্যে ব্যাকুল থাকে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, বুঝতে হবে সেই ব্যক্তিই তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সা:) কে নিজ চোখে দেখে ধন্য হয়েছেন, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য অনুভব করেছেন, তাঁর সাথে প্রাণভরে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন, একত্রে তাঁর সাথে চলাফেরা ও আহার করারও সুযোগ পেয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের একজন আল্লাহর রাসূল (সা:) কে যেভাবে ভালোবাসতেন, তাঁর সেই ভালোবাসা যদি দাড়ি পাল্লার একদিকে রাখা হয় আর সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ভালোবাসা আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তবুও সেই সাহাবার ভালোবাসার ওজনই বেশি হবে। বুখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন, 'তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলো না, আমার সাহাবায়ে কেরামের এক মুষ্ঠি দানের যে মূল্য সারা দুনিয়ার মুসলমানদের দানের সে মূল্য হবে না'।

ইতিহাস অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে বদর, ওহূদ, খন্দকসহ অধিকাংশ যুদ্ধ যাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো তারা ছিলেন পরস্পর ঘনিষ্ঠজন। পিতা একদিকে পুত্র আরেক দিকে, এক ভাই একদিকে অপর ভাই অন্য দিকে এবং মা এক দিকে আর সন্তান আরেক দিকে। এভাবে একান্ত আপনজনদের মধ্যেই ঐ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়েছিলো। এর একমাত্র কারণ ছিলো নবী করীম (সা:) এর প্রতি তাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত ভালোবাসা। আল্লাহর রাসূল (সা:) যে আদর্শের ভিত্তিতে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিলেন, সেই আদর্শ এবং স্বয়ং নবীর প্রতি অসীম ভালোবাসাই পিতাকে বাধ্য করেছে সন্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনা করতে। সন্তান বাধ্য হয়েছে গর্ভধারিণী মায়ের কথা অমান্য করতে। স্ত্রী বাধ্য হয়েছে প্রিয়তম স্বামীকে পরিত্যাগ করতে।

হৃদয়ের আকর্ষণ ও ভালোবাসা কোন্ সীমা অতিক্রম করলে পিতা-মাতা জেনে বুঝে সচেতনভাবে নিজের কলিজার টুকরা, নাড়ি ছেঁড়া ধন, নয়নের পুত্তলি সন্তানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করতে পারেন তা কল্পনা করা যায়!

সে যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হযরত খানসা (রা:) মহিলা সাহাবী ছিলেন। এখন পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে দেশে দেশে পঠিত হচ্ছে। তিনি নবী করীম (সা:) ও তাঁর আদর্শকে কেমন ভালোবাসতেন ইতিহাসে ফিরে তাকাই। কাদেশিয়ার যুদ্ধে তিনি তাঁর অবলম্বন চারজন সুদর্শন যুবক সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি সন্তানদের ডেকে বললেন, 'আমার কলিজার টুকরা সন্তান, অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে আমি তোমাদেরকে বড় করেছি। তোমরা পিছু হটবে না। আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনে

শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিবে। যদি তোমরা সকলেই শাহাদাতবরণ করতে পারো, তাহলে আমি শহীদের মা হিসেবে গর্ববোধ করবো'।

হযরত খানসা (রাঃ) এর কাছে যুদ্ধের ময়দান থেকে একের পর এক সংবাদ আসতে থাকলো, 'তোমার অমুক সন্তান শহীদ হয়ে গেলো'। এভাবে একের পর এক তাঁর সকল সন্তানের শাহাদাতের সংবাদ আসে আর মা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এভাবে একে একে তাঁর চার সন্তানই শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তবুও শ্রেষ্ঠা এই নারীর মধ্যে যেনো অপূর্ণতা রয়ে গেলো। তাঁর যেনো মনে হলো, তাঁর আরো সন্তান থাকলে তাদেরকেও তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রেমে সিক্ত হয়ে কুরবান করে দিতেন।

ওহূদের ময়দান থেকে যখন মদীনায় সংবাদ পৌঁছলো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আর নেই। দুশমনদের হাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। এই সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে শোকের মাতম মদীনার সর্বত্র আছ্‌ড়ে পড়লো। কে কাকে সান্ত্বনা দেয়। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক সকলেই শোকে পাগলপারা। সকলেই ছুটছে ওহূদের ময়দানের দিকে। বনী দীনার গোত্রের একজন নারী ওহূদের ময়দানের দিকে শোকে আলুথালু বেশে ছুটে আসছিলো। এই নারীর পিতা, ভাই, স্বামী-সন্ত ানরা ইসলামের পক্ষে ওহূদের ময়দানে যুদ্ধে এসেছিলো। পথে একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাচ্ছো'?

জবাবে উক্ত নারী জানালো, 'ওহূদের ময়দানের দিকে যাচ্ছি'।

প্রশ্নকারী উক্ত নারীকে জানালো, 'তোমার স্বামী এ যুদ্ধে এসেছিলো, সে শাহাদাতবরণ করেছে'।

সে নারী ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলো, 'কে শহীদ হয়েছে জানতে চাই না। বলো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কেমন আছেন'?

এভাবে পথে একের পর এক তাঁকে জানানো হলো, তোমার স্বামী, ভাই, পিতা ও সন্তান শাহাদাতবরণ করেছে। প্রত্যেক বারই উক্ত নারী ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলো, 'কে শহীদ হয়েছে জানতে চাই না। বলো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কেমন আছে'?

এরপর ওহূদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সে নারী সাহাবায়ে কেরামের কাছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা তাঁকে জানালেন, 'তিনি ভালো আছেন, তুমি যেমন কামনা করো আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তেমনি আছেন'।

উক্ত নারী সাহাবায়ে কেরামের কথা যেনো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। ব্যাকুল কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে শুধুমাত্র একটি বার দেখতে চাই, আমাকে একটু দেখার সুযোগ দাও'।

সাহাবায়ে কেরাম সে নারীকে ঐ স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আহত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাঁকিয়ে উক্ত নারী কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাই শাহাদাতবরণ করেছে, আমার কোনো যন্ত্রণা নেই। আপনি জীবিত আছেন এটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় সান্ত্বনা'।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে উক্ত নারী যে কি পরিমাণ ভালোবাসতেন তা কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ বা তুলনা করা যাবে না। প্রত্যেকটি পুরুষ ও মহিলা সাহাবা, তা তাঁরা যে বয়সেরই ছিলেন না কেনো, সকলের কাছেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর মর্যাদা তাঁদের প্রাণ ও পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় অনেক অনেক বেশী ছিলো। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে কথার বলার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হবার পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে এমনভাবে কথা বলতেন, যেনো মনে হতো যে তাঁরা নীরবে চুপিসারে কথা বলছেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন সকল সাহাবায়ে কেরামের কাছেই বিষয়টি যেনো অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। হযরত উমার (রাঃ) তো মেনে নিতেই পারছিলেন না যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করতে পারেন। তিনি শাণিত তরবারী হাতে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি বলবে যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন সে ব্যক্তির মাথা দেহের সাথে থাকবে না'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে যখন ঘোষণা করলেন, 'যাঁরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দাসত্ব করতো তাঁরা যেনো জেনে রাখে যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যাঁরা মহান আল্লাহর দাসত্ব করে তাঁরা যেনো জেনে রাখে, আল্লাহ তা'য়ালা চিরঞ্জীব এবং চির অক্ষয়'।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিজ প্রাণের তুলনায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আদর্শকে ভালোবাসতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে তোমাদের সকল কিছুর তুলনায় প্রিয় না হবো, আমার উপস্থাপিত আদর্শ প্রিয় না হলে তোমরা কেউ-ই মুমিন হতে পারবে না'।

মুমিনদের প্রাণপ্রিয় মদীনা- মক্কা অপেক্ষা সমতল ভূমি এবং কৃষিকাজের উপযোগী ভূমি এখানে রয়েছে। মদীনার মাটি খুবই সজীব এবং উর্বর। এখানে নানা ধরনের ফসল

উৎপন্ন হয়ে থাকে। মদীনার অদূরেই ইতিহাস বিখ্যাত সেই ওহূদ পাহাড় আর স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের রক্তে রঞ্জিত ওহূদ প্রান্তর। মদীনার প্রশস্ত ও গলি পথ, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, প্রান্তর, উর্বর ভূমি, বৃক্ষ, তরুলতা, পায়ের নীচের ঘাসসহ সবকিছুই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে। সর্বত্রই এক সময় এসব স্থান আল্লাহর নবী আর সাহাবায়ে কেরামের পদচারণায় স্পন্দিত হতো। এখন আর তাঁদের পবিত্র পদচারণা শোনা যায় না, সবকিছুতেই সীমাহীন নীরবতা। এখানে বাতাসে শুধু ভেসে বেড়ায় মুমিনের নীরব কান্না। সতর্কতার সাথে নিজের কানকে সজাগ না করলে সে কান্নাও শোনা যায় না। কেউ-ই এখানে শব্দ করে কাঁদেন না। শব্দ করে কাঁদলে যদি আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবি হয়ে যায়!

আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, 'আমার রাসূলের সামনে কণ্ঠ উঁচু করো না'। কুরআনের এই আয়াতটি রাসূল (সাঃ) এর রওজা মোবারকের সম্মুখেই উৎকীর্ণ করা রয়েছে। সুতরাং এখানে কেউ-ই কোনোরূপ শব্দ করেন না। নবী করীম (সাঃ) এর রওজা মুবারকের সামনে কোনো মুমিন যাবে আর তাঁর চোখ শুক্‌নো থাকবে অথবা বুকের মধ্য থেকে বোবা কান্না তোলপাড় করে কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসতে চাইবে না, এমনটি কখনো হতে পারে না। তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধের কারণে কেউই শব্দ করে কাঁদেন না। নীরবে শুধু চোখের পানি ঝরে বুক ভিজিয়ে দেয়। কারণ পৃথিবীতে অবস্থানকালে আল্লাহর হাবীব মর্যাদার যে উচ্চ আসনে আসীন ছিলেন, ইন্তেকালের পরও তিনি সেই আসনেই আসীন রয়েছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি কোনো ধরনের বেয়াদবি হয় এমন আচরণ করা হারাম।

নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা ও ওহী আয়ত্বকরণ

নবী করীম (সাঃ) এর কত বিশাল মর্যাদা, সম্মানের কোন্ উচ্চ শিখরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বসিয়েছেন তা কল্পনাও করা যায় না। অন্যান্য নবী-রাসূলদের যখন আল্লাহ তা'য়ালা ওহী দান করেছেন তখন তাঁদেরকে বিশেষ স্থানে ডেকে নিয়ে তারপর ওহী দিয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) কে মিসরের যে সিনাই উপত্যকায় ডেকে নিয়ে ওহী দিয়েছিলেন আমার মিশর সফরের সময় সে উপত্যকায় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই নগণ্য গোলামকে নিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) মহান মালিক আল্লাহর ডাক শুনে নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে পায়ের জুতা খোলার কথা ভুলে গিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'জুতা পায়ে এখানে আসা যাবে না, জুতা খুলে এসো'।

আমিও ঐ উপত্যকায় জুতা খুলে গেলাম। ঐ স্থান দেখলাম যেখানে মূসা (আঃ) কে ওহী দেয়ার জন্যে ডাকা হয়েছিলো। অপরদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবী করীম

(সাঃ) কে যখন ওহী দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি যেখানে যে অবস্থায় থেকেছেন সেই অবস্থাতেই তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে। বিশেষ কোনো স্থানে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়নি। সুউচ্চ মর্যাদার কারণেই স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণের এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন ওহী এনে নবী করীম (সাঃ) কে পড়ে শুনাতেন তখন তিনিও তাঁর সাথে সাথে পড়তেন। নবী করীম (সাঃ) পড়ার এই কষ্টটুকু করবেন এটাও মহান আল্লাহ্ বরদাস্ত করলেন না। তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবকে পরম মমতায় জানিয়ে দিলেন–

لاَ تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه ط إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْآنَه ج فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه ج ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه ط

আপনি দ্রুত আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না, এর একত্র করা ও আপনাকে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর, অতএব আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে আপনার কাছে) যখন কুরআন পড়তে থাকি, তখন আপনি সে পড়ার (দিকে মনোযোগ দিন এবং এর) অনুসরণ করার চেষ্টা করুন, অতঃপর আপনাকে এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর। (সূরা কিয়ামাহ্-১৬-১৯)

'আপনার ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তা মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। ওহী আপনার মানসপটে অঙ্কিত করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। ওহীর এই মণিমুক্তাগুলো আপনার ভেতরে একটির পর একটি সজ্জিত করার দায়িত্ব আমার। আপনার ভেতরে ওহীর প্রতিটি শব্দ স্মরণ রাখা ও সংরক্ষিত রাখা আপনার নিজস্ব কোনো যোগ্যতার বিষয় নয়। এটা একান্তই আপনার প্রতি আমার অনুগ্রহ'।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন পর্যন্তও নবী করীম (সাঃ) ওহী ধারণে অভ্যস্থ হননি। এ জন্য তিনি ওহী অবতীর্ণের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে সাথে অতি দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন- যেন কোনো একটি শব্দও তিনি ভুলে না যান।

রাসূল (সাঃ) অতি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করছেন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায়, এতে তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ ঘটছে, তিনি কষ্ট অনুভব করছেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই সামান্য কষ্টটুকুও সহ্য করতে পারলেন না। সাথে সাথে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আপনি অস্থির হবেন না, আপনি নীরবে শুনতে থাকুন- আপনার হৃদয়ে ওহী অঙ্কন করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন,

'কুরআনের কোনো একটি শব্দ ভুলে যেতে পারেন, এ জন্য আল্লাহর রাসূল বার বার তা আবৃত্তি করছিলেন'।

আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত জিবারঈল (আ:) ওহী শুনিয়ে শেষ করার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল ওহীর প্রথমাংশ আবৃত্তি শুরু করতেন। রাসূলের এভাবে আবৃত্তি করার উদ্দেশ্য ছিল, যেন তিনি ভুলে না যান। রাসূলের এই ব্যস্ততা দেখে মহান আল্লাহ তাঁকে গভীর মমতায় জানালেন–

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُه ز وَقُل رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا–

আল্লাহ তা'য়ালা অতি মহান, তিনিই (সৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (তিনিই কুরআন নাযিল করেছেন, হে নবী), আপনার কাছে তাঁর ওহী নাযিল পূর্ণ হওয়ার আগে কুরআনের ব্যাপারে কখনো তাড়াহুড়ো করবেন না, (তবে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চাইলে) বলুন, হে আমার মালিক, আমার জ্ঞান (ভান্ডার) আপনি বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্বহা-১১৪)

এসব আয়াতে আল্লাহর রাসূলের অতুলনীয় মর্যাদার দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাসূল (সা:) পবিত্র কুরআন স্মরণে গেঁথে নেয়া এবং হৃদয়পটে অঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করছিলেন, রাসূলকে সামান্য এই কষ্টটুকুও আল্লাহ করতে দেননি। তাঁকে জানিয়ে দিলেন, 'হে রাসূল! আপনার কোনো কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যখন আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুধু শুনতে থাকুন। আপনার মানসপটে ওহীর প্রতিটি শব্দ একটির পরে আরেকটি গেঁথে দেয়ার দায়িত্ব আমার। শুধু তাই নয়, যে ওহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যও আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো'। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسى لا

আমি যে ওহী পাঠাবো তা আমিই আপনাকে পড়িয়ে (অন্তরে গেঁথে) দেবো, অত:পর আপনি আর তা ভুলবেন না। (সূরা আ'লা-৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে নিশ্চয়তা দিলেন, 'ওহী মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি কেনো এত ব্যস্ত হচ্ছেন তা আমার অজানা নয়। কারণ আমার কাছে অপ্রকাশিত কিছুই থাকে না। প্রকাশ্য বিষয়ও যেমন আমার গোচরে রয়েছে তেমনি অপ্রকাশিত গোপন বিষয়সমূহও আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। অতএব আপনি ব্যস্ততা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে ওহী শুনতে থাকুন। আপনি এই ওহী

কখনোই ভুলবেন না। আপনি কখনো স্থায়ীভাবে আপনার ওপরে অবতীর্ণ করা কুরআন ভুলে যাবেন না। আপনি যেন তা ভুলে না যান সে দায়িত্ব আমি আল্লাহ গ্রহণ করলাম'। রাসূলের সম্মান- মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চে পৌঁছে দিয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বেও রাখেননি। মানুষের জীবনে যা ঘটা স্বাভাবিক রাসূলের ক্ষেত্রেও গোনাহ্ ব্যতীত স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রকাশ করিয়ে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূলও মানুষ এবং মানব জাতির ভেতর থেকে রাসূল নির্বাচিত করে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিই করা হয়েছে।

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় দেখা যায়, একদিন ফজরের নামাজ আদায়কালে আল্লাহর রাসূল কুরআনের একটি আয়াত বাদ দিয়েই তার পরবর্তী আয়াত পড়তে থাকলেন এবং এভাবে নামাজ শেষ করলেন। সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'য়াব (রাঃ) জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ঐ আয়াতটি কি মনসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে? রাসূল (সাঃ) জবাবে বললেন, মনসুখ হয়নি- বরং আয়াতটি আমার তখন স্মরণ হয়নি'। (বুখারী)

মর্যাদার অতুলনীয় নিদর্শন, কিবলা পরিবর্তন

হিজরী প্রথম সালেই নামাজে পরিবর্তন এসেছিল। ফরজ নামাজসমূহ দুই রাকায়াত আদায় করা হতো। প্রথম হিজরী থেকে যোহর, আসর ও এশার ফরজ নামাজ চার রাকায়াত আদায়ের আদেশ বলবৎ হলো। কিন্তু মুসাফিরদের জন্য দুই রাকায়াতই স্থির থাকলো। নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার কিছুদিন পরেই সেই মহান সাহাবী দু'জন ইন্তেকাল করেছিলেন যাদের একজন ছিলেন হযরত কুলসুম ইবনে হাদাম (রাঃ)। এই সাহাবী মদীনার কুবা পল্লীর বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রথম মেহমান হয়েছিলেন। মক্কার অনেকেই তাঁর বাড়িতে ছিলেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আসওয়াদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)। প্রথম যে ছয়জন মদীনাবাসী মক্কার আকাবায় নবী করীম (সাঃ) এর হাত মুবারকে বাইয়াত হয়েছিলেন, হযরত আসওয়াদ (রাঃ) ছিলেন তাদেরই একজন।

এ ছয় জন সাহাবীর মধ্যে বাইয়াত করার জন্য হযরত আসওয়াদ (রাঃ) সর্বপ্রথমে নবী করীম (সাঃ) এর হাতে হাত রেখেছিলেন। আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় নবী করীম (সাঃ) যে ১২ জনকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আসওয়াদ (রাঃ) ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের আহ্বায়ক। তিনিই সর্বপ্রথম মদীনায় জুমার নামাজ কায়েম করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে আহ্বায়কের পদ শূন্য হলে গোত্রের লোকজন আরেকজনকে মনোনীত করেছিল।

অন্য কাউকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হলে দলাদলি সৃষ্টি হতে পারে বিধায় নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং সেই গোত্রের আহ্বায়ক হলেন। কারণ বনী নাজ্জার গোত্রে ছিল তাঁর নানার বাড়ি। অবাক হবার মত ঘটনা ছিল এই যে, এ সময় ইসলাম বিরোধিদের দু'জন নেতাও মারা গিয়েছিল। একজন ছিল হযরত খালিদ (রাঃ) এর পিতা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আরেকজন হলো হযরত আমর (রাঃ) এর পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমি। এ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বড় মেয়ে হযরত আসমা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত বীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) কে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন।

পবিত্র মক্কা থেকে মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করার পরে কিছুদিন কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এ কারণে এ কথা প্রচলিত হয়ে পড়েছিল যে, ইয়াহূদীরা তন্ত্রমন্ত্র করেছে ফলে মুসলমানদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সকল মুসলমান আনন্দে উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিয়ে মদীনার ইয়াহূদীদের কলিজায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। নেতৃত্বের বৈশিষ্টসম্পন্ন দু'জন সাহাবীর ইন্তেকালে নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। ইয়াহূদীরা এ সময় বলেছিল, 'মুহাম্মদ (সাঃ) যদি প্রকৃতই নবী হতেন তাহলে তিনি এমন আঘাত পেতেন না'। তাদের এ কথার জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'আমার সাথীদের জন্য আমি আল্লাহর কাছে কোনো অধিকার রাখি না'।

হিজরী দ্বিতীয় সালে মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহ কেবলা পরিবর্তন করে দিলেন। তারপরই প্রতিরক্ষা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। এ পর্যন্ত মুসলমানরা নীরবে আঘাত সহ্য করেছে। এবার তাদের প্রতি আত্মরক্ষা এবং প্রতিঘাতের নির্দেশ দেয়া হলো। ইতোপূর্বে মুসলমানরা নামাজ আদায় করতেন বাইতুল মাকদিসকে কেবলা করে। এই বাইতুল মাকদিসকে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানরাও পবিত্র জ্ঞান করে। সে সময়ও বর্তমানের ন্যায় তাঁরা বাইতুল মাকদিসকে তাদের কেবলা মনে করতো। মক্কার ও মদীনার পৌত্তলিকরা কেবলা মনে করতো কা'বা ঘরকে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে জাতির পিতা সে জাতির জন্য আবশ্যক ছিল ভিন্ন একটি কেবলা হওয়া। যে কেবলা মুসলমানদেরকে একত্ববাদের একটি প্রতীক হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিতি দিবে।

নবী করীম (সাঃ) মক্কায় অবস্থান করাকালে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করতেন। মাকামে ইবরাহীম ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। ফলে কা'বাঘর এবং বাইতুল মাকদিস উভয়টিই তাঁর সম্মুখে থাকতো। মদীনায় আসার পরে দেখা গেল ইয়াহূদীরাও বাইতুল মাকদিসকে কেবলা বানিয়ে তাদের ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করছে। পূর্ববর্তী নবীদের প্রবর্তিত বিধানের আংশিক অনুসারী ছিল তারা। আর পৌত্তলিকরা কোনো নবীর আনীত বিধানের কিছুই অনুসরণ করতো না।

পৌত্তলিক, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান। এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে ইয়াহূদী খৃষ্টানগণ। কারণ তারা আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় মুসলমানরা তাদের কেবলাকেই অর্থাৎ বাইতুল মাকদিসকেই কেবলা হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য যেমন পৃথক কেবলা নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক ছিল এবং এ বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) চিন্তার জগতে আকাংখা পোষণ করতেন। তদানীন্তন যুগে পৌত্তলিকরা স্বয়ং ইয়াহূদীদেরকে তাদের ধর্মীয় কারণে প্রধান্য দিয়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো।

পৌত্তলিকদের সন্তান জন্মগ্রহণ না করলে বা সন্তান জীবিত না থাকলে তারা মানত করতো যে, তাদের এ সন্তান জীবিত থাকলে তারা তাকে ইয়াহূদী হিসাবে গড়বে। এরপর মুসলমানরাও বাইতুল মাকদিসের দিকে কেবলা করে নামাজ আদায় করতে থাকলে ইয়াহূদীরা বেশ গর্বানুভব করতো। কারণ পৌত্তলিকরাও তাদেরকে সম্মান করে এবং মুসলমানরাও তাদেরই কেবলাকে কেবলা বানিয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) দীর্ঘ ১৬ মাস মদীনায় অবস্থানকালে বাইতুল মাকদিসকে কেবলা হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ সময়ের মধ্যে ইসলামও ব্যাপকভাবে চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং সামান্য কিছু বছরের ব্যবধানে মক্কাও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। নবী করীম (সাঃ) অনুভব করতেন যে বনী ইসরাঈলের (ইয়াহূদীদের) নেতৃত্বের যুগের অবসান হয়েছে এবং সেই সাথে বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন প্রকৃত ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায়ের সময় আসন্ন। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) হৃদয় গভীরে প্রবল এক আকাংখা অণুক্ষণ গুঞ্জন সৃষ্টি করতো।

কিন্তু নবী করীম (সাঃ) কখনো মহান মালিক আল্লাহর দরবারে পবিত্র হাত মুবারক দুটো তুলে ধরে এভাবে বলেননি যে, 'হে আমার মালিক, আপনি বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে আমার জন্যে কিবলা নির্ধারণ করে দিন'। তিনি শুধুই আকাশের দিকে পবিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এ প্রত্যাশায় যে, কখন আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করবেন। কিবলা পরিবর্তনের দিন নবী করীম (সাঃ) এক সাহাবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি যোহরের নামাজ আদায় করছিলেন এবং তিনিই ছিলেন ইমাম। দুই রাকায়াত আদায় করেছেন, এরই মধ্যে ওহী অবতীর্ণ হলো—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا س فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ط

(কিবলা পরিবর্তনের জন্যে) আপনি আকাশের দিকে তাকিয়ে (যেভাবে আমার আদেশের অপেক্ষায়) থাকতেন, তা আমি অবশ্যই দেখতে পেয়েছি, তাই আমি আপনার পছন্দমতো (দিককেই) কিবলা বানিয়ে দিচ্ছি, (এখন থেকে) তোমরা এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে ফিরে (নামাজ আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো তোমাদের মুখমণ্ডল সে দিকেই ফিরিয়ে দিবে। (সূরা আল বাকারা-১৪৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে মর্যাদার কোন্ সুউচ্চ সোপানে উপনীত করেছেন যে, তাঁর হৃদয় গভীরে কোনো আকাংখা জেগে উঠলেই মহান আল্লাহ সে পবিত্র আকাংখা পূরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পরম মমতায় বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন, 'আপনি মনে মনে যে আকাংখা পোষণ করছেন এবং আকাশের দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন তা আমি দেখছি। আপনার আকাংখা অনুযায়ীই কিবলা পরিবর্তন করে দিলাম'।

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হবার সাথে সাথেই নবী করীম (সাঃ) নামাজরত অবস্থায় তৃতীয় রাকায়াতেই বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইতুল্লাহ অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। নামাজে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করে যোহরের অবশিষ্ট দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করলেন।

কিবলা পবির্তন হবার পরে ইয়াহূদীরা প্রচার করতে থাকে যে, 'মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের সকল কাজে বিরোধিতা করেন। এ কারণেই তিনি কেবলা পরিবর্তন করেছেন। এটা শুধু বিরোধিতার কারণেই বিরোধিতা'।

এ সময় মদীনায় মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন ছিলো, যারা ছিলো মূলতঃ ইয়াহূদী। তারা মুসলমানের দলে শামিল হয়ে ইসলামের ক্ষতি করতে তৎপর ছিল। এদেরকেই মুনাফিক বা কপট বলা হয়েছে। এদেরকে সে সময় পর্যন্ত চেনার কোনো উপায় ছিলো না। তারা মুসলমানদের সাথে এসে নামাজও আদায় করতো। এই কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদের চেহারা প্রকৃত মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে ইয়াহূদীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কিবলা পরিবর্তনের সমালোচনা করতে থাকলো। প্রকৃত মুসলমানদের জন্য সুবিধা হয়ে গেল, তাঁরা তাদের শত্রুকে চিনতে পারলো।

নবী করীম (সাঃ) মদীনায় আসার পরে কোনো বিরোধিতার মুকাবিলা করেননি বা প্রকাশ্যে কেউ বিরোধিতা করেনি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মদীনায় ইসলাম বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব ছিলো না। মদীনার একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ছিলো ইয়াহূদী।

পৌত্তলিকদের অস্তিত্ব ছিলো। তারা মুসলমান এবং ইসলামকে কখনোই সুনজরে দেখেনি। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে বিরোধিতা তখন পর্যন্ত করেনি। কারা ইসলামের শত্রু তা তখন পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়নি।

এরপর আর মাত্র কিছুদিন পরেই সত্য আর মিথ্যার প্রাকাশ্যে সসস্ত্র যুদ্ধের সূচনা ছিলো অনিবার্য। এই সংঘাত মুকাবেলার জন্য আদর্শনিষ্ঠ কর্মী এবং আনুগত্যশীল কর্মীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ধরণের কর্মী বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে কি পরিমাণ আছে সেটাও নবী করীম (সা:) এর সামনে প্রকাশ হওয়া আবশ্যক ছিলো। ঠিক এ সময়েই মহান আল্লাহ কিবলা পরিবর্তনের আদেশ দিলেন। মদীনায় ইয়াহূদী আর মুনাফিকরা বিতর্ক শুরু করলো। তাদের তৎপরতাই প্রমাণ করে দিলো ইসলামের শত্রু কারা।

এ অবস্থায় নবী করীম (সা:) তাঁর সাথে আদর্শনিষ্ঠ এবং আনুগত্যশীল কর্মী কতজন আছে, যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ইসলামের শত্রুদের সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবেন। শত্রুদের অপতৎপরতার জবাব দিতে ময়দানে এগিয়ে যাবেন। সুতরাং কেবলা পরিবর্তন মুসলমানদেরকে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি সুসংগঠিত এবং আনুগত্যশীল করেছিল সন্দেহ নেই।

হিজরী দ্বিতীয় সালেই মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপূর্বে মুসলমানগণ শুধু আঘাতই সহ্য করেছেন। এবার তাঁরা প্রতিরোধ করতে শুরু করেছিলেন। কেউ তাদের ওপরে আক্রমণ করতে এলে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অনায়াসে আর জুলুম করতে দেয়া যাবে না, হিজরী দ্বিতীয় সাল থেকেই মুসলমানগণ এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় সালেই নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা:) এর বিয়ে হযরত আলী (রা:) এর সাথে সুসম্পন্ন হয়। কলিজার টুকরা কন্যার বিয়েতে নবী করীম (সা:) রশি দিয়ে বানানো একটি চারপায়া, দুটি মাটির কলসি, আটা পেষা দু'টো চাকি, চামড়ার একটি তোষক, যা খেজুর পাতা দিয়ে ভর্ত্তি ছিল ও পানির একটি মশক উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় হিজরীতেই রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়। ফিতরা আদায় করাও এ সময় থেকেও শুরু হয়। নবী করীম (সা:) সাদকায়ে ফিতরের তাৎপর্য এবং কল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন। এই বছরে ঈদুল ফিতরের নামাজ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঈদগাহে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আদায় করা হয়। ইতোপূর্বে কখনো ঈদের নামাজের জামায়াত আদায় হয়নি।

হিজরী তৃতীয় সালের ১৫ই রমজান নবী করীম (সাঃ) এর প্রিয় নাতী হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন। এ বছরে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হয়, তাঁরা যেনো কোনো পৌত্তলিকদেরকে বিয়ে না করে। কারণ ইতোপূর্বে এই নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। ইসলামের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ এই বছরেই জারি করা হয়। ইতোপূর্বে উত্তরাধিকারে নিকট আত্মীয়দের অধিকার ছিলো না।

হযরত উমার (রাঃ) এর মেয়ে হযরত হাফসা (রাঃ) এর স্বামী বদরের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এ বছরেই নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যদা দেন। হযরত উসমান (রাঃ) এর সাথে এ বছরেই নবী করীম (সাঃ) এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

হিজরী চতুর্থ সালে মদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা জারি করা হয়। অবশ্য এ সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এ বছরে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ইয়াহূদীরা ব্যভিচার সম্পর্কে একটি মামলা দায়ের করে। তিনি তাদের তাওরাতের রায় অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়ে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার আদেশ দেন। এ বছরেই তিনি হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে ইবরানী ভাষা শিক্ষার আদেশ দেন। তিনি মাত্র ১৫ দিনে ইবরানী ভাষা শিখেন। এই ভাষা শেখার কারণ ছিল, তাওরাত ছিলো ইবরানী ভাষায়, ইয়াহূদীরা আল্লাহর আইন সম্পর্কে অনেক কিছুই গোপন করতো।

হিজরী চতুর্থ সালের শাবান মাসে নবী করীম (সাঃ) এর আরেক নাতী হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন। রাসূল (সাঃ) এর জীবনে এ বছরে আরেকটি শোকের ঘটনা ঘটে। উম্মুল মুমেনিন হযরত জয়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ) এ বছরে ইন্তেকাল করেন। এই বছরে তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কে বিয়ে করেন।

হিজরী পঞ্চম সালে ইসলামের ইতিহাসে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পানি কোথাও পাওয়া না গেলে তায়াম্মুমের নির্দেশ এই সালে অবতীর্ণ হয়। যখন ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করে সে সময় কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে, অর্থাৎ খাওফের নামাজ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী এই বছরে অবতীর্ণ হয়। সে সময় পর্যন্ত আরবে এক ধরনের তালাক প্রথা চালু ছিলো, যাকে বলা হতো জিহার। এই কুপ্রথা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং এ কারণে কাফফারা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পালক পুত্র সংক্রান্ত কুসংস্কার এ বছরেই বাতিল করা হয়। ব্যাভিচারের শাস্তি হিসাবে এ বছরে বলবৎ করা হয়। অপবাদ আরোপ সংক্রান্ত শাস্তি সম্পর্কে আইন-কানুন এ বছরেই জারি করা হয়। মুসলিম নারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁরা বাইরে বের হবার সময় যেনো পর্দা অবস্থায় বের হয়। অলংকারের প্রদর্শনী না করে। চলাফেরায় মার্জিত রুচির পরিচয় দেয়। কথোপকথনের সময় অশালীন ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ না করে। নিবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়, তাঁরা যেনো পরপুরুষের সামনে না আসে।

ষষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগে বা সপ্তম হিজরীর প্রথমে নবী করীম (সাঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসকের কাছে ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। হিজরী অষ্টম সালে উম্মুল মুমেনিন হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রাঃ) এর গর্ভে হযরত ইবরাহীম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর এই সন্তানকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত ইবরাহীম (রাঃ) সতের বা আঠার মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। কুসংস্কারবাদীরা বলছিল, 'নবীর সন্তান ইন্তেকাল করেছে, এ কারণে আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে এবং শোকে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এসেছে'।

এ কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত সকলকে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ মহান আল্লাহ তা'য়ালার অগণিত নির্দশনের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে এর সম্পর্ক নেই'।

এরপর নবী করীম (সাঃ) কুসুফের নামাজ অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের নামাজ মুসলমানদেরকে নিয়ে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আদায় করেছিলেন। তাঁর মেয়ে হযরত যয়নাব (রাঃ) এ বছরেই ইন্তেকাল করেন।

হিজরী নবম সালেই মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা মহান আল্লাহ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কারণ, এই সময় জাকাত আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন গোত্রে জাকাত আদায় করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই সালে সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) হজ্জের ময়দানে যে ঘোষনা দিয়েছিলেন, কুরআন বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তা অষ্টম হিজরীতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু কার্যকরী করা হয়েছিল নবম হিজরীতে। আল্লামা আত্ তাবারী উল্লেখ করেছেন, এই ঘোষনা জারী করার পরে অমুসলিমরা স্রোতের মতই ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছিল।

এত অধিক প্রতিনিধি দল এই হিজরীতে এসেছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে নবম হিজরীকে 'প্রতিনিধি আগমনের বছর' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবেই যেনো সমগ্র ধরণীতে সত্যের আলোর প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের বন্ধু আবিসিনিয়ার বাদশাহ এ বছরেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদেরকে এভাবে দিয়েছিলেন, 'হে মুসলমানগণ! আজ তোমাদের ভাই আসমাআ ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মাগফিরাতের জন্য তোমরা দোয়া করো'। নবী করীম (সাঃ) তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন মুসলমানদের দুর্দিনের বন্ধু। তাঁর নীরব সমর্থনে ইসলাম অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ্

পবিত্র কুরআনে তিনটি শব্দ একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শব্দ 'মা'বুদ' দ্বিতীয়টি 'আব্দ' আর তৃতীয়টি হলো 'ইবাদাহ্' বা ইবাদাত। 'মা'বুদ' শব্দের অর্থ হলো মুনিব, মালিক, যিনি পূজা আরাধনা লাভের যোগ্য, যার কাছে আবেদন পেশ করা হয় বা যাঁর দাসত্ব করা হয় ইত্যাদি। 'আব্দ' শব্দের অর্থ হলো, যে দাসত্ব করে, চাকর, গোলাম, দাস, কারো আদেশে যে ব্যক্তি সকল কর্ম সম্পাদন করে ইত্যাদি। আর 'ইবাদাহ্ বা ইবাদাত' শব্দের অর্থ হলো, দাসত্ব করা, গোলামী করা, আদেশকৃত কর্ম সম্পাদন করা, দায়িত্ব পালন করা, মুনিবের নির্দেশে চাকর যে দায়িত্ব পালন করে বা মুনিব কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করা অথবা প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম সমষ্টি। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সমগ্র সৃষ্টির মা'বুদ বা মুনিব, সৃষ্টি হলো তাঁর দাস বা আব্দ এবং স্রষ্টার নির্দেশে সৃষ্টি যে কর্ম সম্পাদন করে সে কর্মই হলো ইবাদাত।

প্রশ্ন হলো, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে যে 'আব্দ' শব্দ ব্যবহার করেছেন তা কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব কিছুটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং 'ইলাহ্' এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের তিনিই একমাত্র ইলাহ্। তাঁর উলুহিয়াত সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী বিস্তৃত এবং তা কোথাও সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর উলুহিয়াতে কারো সামান্যতম অংশ নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, কেউ ইচ্ছে করলে তাঁর উলুহিয়াতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও দাবী করতে পারে না। কেউ দাবী করলেও তা কার্যকর করার ন্যূনতম ক্ষমতাও দাবীকারী প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা এমন এক অদ্বিতীয় ইলাহ্- যিনি তাঁর উলুহিয়াত যেমনভাবে এবং যখন খুশী তা প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর কাছে কোনো সুপারিশও করতে পারে না বা উলুহিয়াত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করার কোনো অবকাশও পায় না।

সকল কিছুর ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই নিরঙ্কুশ উলুহিয়াত প্রয়োগকারী এবং তাঁর সমপর্যায়ের কোনো কিছুর অস্তিত্ব সমগ্র সৃষ্টিলোকে নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর সৃষ্টি কোনো মানুষকে 'আমার আব্‌দ বা বান্দাহ্' বলে পরিচয় দেন তখন তা সাধারণ কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অথবা আল্লাহর ব্যবহৃত 'আব্‌দ' শব্দ থেকে সাধারণ কোনো অর্থ গ্রহণ করা যায় না বা সাধারণ মানুষকে যে অর্থে 'আব্‌দ বা বান্দাহ্' বলা হয় সে অর্থেও তা প্রয়োগ হয় না। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা যাঁকে 'আমার আব্‌দ বা বান্দাহ' বলে পরিচয় দেন তখন সে বান্দাহ্ বা আব্‌দ-এর 'আবদিয়্যাত'-ও অদ্বিতীয় তুলনাহীন হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর কোনো বান্দাহকে 'আমার বান্দাহ্ বা আব্‌দ' বলে সমগ্র সৃষ্টির কাছে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন বুঝতে হয় সে বান্দাহ্ 'আব্‌দিয়্যাত' এর সকল স্তর অতিক্রম করে মা'বুদ বা মহান মুনিবের সান্নিধ্যে নিজের অবস্থান করে নিয়েছেন। নবী করীম (সা:) মহান আল্লাহ তা'য়ালার সেই একক ও অদ্বিতীয় তুলনাহীন 'আব্‌দ' যিনি 'আব্‌দিয়্যাত' এর সকল সোপান অতিক্রম করে মহান মা'বুদ আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। 'আব্‌দিয়্যাত' এর পূর্ণতার সকল স্তর অতিক্রম করে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছেন- যেখানে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনিই এক, অদ্বিতীয় ও তাঁর সমকক্ষ কেউই অতীতে ছিলেন না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও উক্ত স্তর কেউ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

পবিত্র কুরআন হলো সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টা মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ নিষেধ, পছন্দ অপছন্দ ও অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতির সমষ্টি এবং এটি একটি অতি মর্যাদাবান কিতাব। আর নবী করীম (সাঃ) হলেন এ কিতাবের বাহক এবং জীবন্ত কুরআন। তিনি ছিলেন চলমান কুরআন এবং এরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর কাছে কেউ কেউ জানতে চেয়েছিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু বলুন'। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি কুরআন পড়ো না? কুরআনই তো তাঁর জীবনধারা'। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার যে অধিকারসমূহ রয়েছে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে যেমন দেখতে চান এবং যে স্তরে তিনি সৃষ্টিকে উপনীত করতে চান, নবী করীম (সা:) সে অধিকারসমূহ এমনভাবে আদায় করেন যে, তিনি পূর্ণতার অতি উচ্চে উপনীত হয়েছেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) এর প্রতি যে ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপানে স্থান দিয়েছেন, এরই বাস্তব প্রকাশ হলো তিনি তাঁকে 'আবদ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَاعَلىٰعَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه ص

আমি আমার (আব্দ) বান্দার ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও, তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরাও (রচনা করে) নিয়ে এসো। (সূরা বাকারা-২৩)

নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ মিরাজে নিয়েছিলেন, নিয়ে যাবার সে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَه مِنْ آيَاتِنَا ط إِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ–

পবিত্র ও মহিমান্বিত (সেই আল্লাহ তা'য়ালা) যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম। যেনো আমি তাঁকে আমার (অদৃশ্য জগতের) কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, (মূলত) সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা তো স্বয়ং তিনিই। (সূরা বনী ইসরাঈল-১)

কল্পনাও করা যায় না নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মর্যাদার কোন্ উচ্চ সোপানে উঠিয়েছেন। সম্মানিত মেহমান যে পথ বেয়ে যাবেন বা যে পথে তাঁকে আনা হবে, সেই পথের পরিবেশ আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে নিয়ামতে পূর্ণ করেছিলেন, কেমন ছিলো দৃষ্টিনন্দন সেই দৃশ্য, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, 'যার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি আগেই বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম'।

জাগতিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য করলে মানুষের যে আয়োজন থাকে মেহমানের সম্মানে, তা থেকেই মহান রাব্বুল আলামীনের ব্যবস্থাপনা কেমন হতে পারে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। সাধারণ মানুষ প্রিয় অতিথি, সম্মানিত মেহমান বা ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। সাধারণ বিমান নয়, বিশেষ বিমানে তাঁকে আনা হয়। বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ করার পূর্বেই বিমান বাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিমান আকাশেই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। অবতরণ করার পরে তাঁকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দিয়ে এর পর গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে তিনি যে পথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যাবেন এবং ওখান থেকে যে সকল স্থান তাঁকে পরিদর্শন করানো হবে, এসব পথ সজ্জিত করা হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমানকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মর্যাদার কারণেই তাঁর ভ্রমণ পথের পারিপার্শ্বিকতাকে তিনি এমনভাবে সজ্জিত করেছিলেন যা কোনো মানুষের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব নয়। শুধু সজ্জিতই নয়, তিনি ভ্রমণ পথের পারিপার্শ্বিকতাকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণও

করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) কে নিয়ে যাবার পূর্বেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ সম্মানিত বান্দার প্রতি এমন কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেননি, যে কিতাব বোধগম্য নয়। অথবা যে কিতাবের বিধি-বিধান অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য। অথবা যে কিতাব মানুষের জন্যে বোঝা বিশেষ। এমন ধরনের কোনো কিতাব যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হতো তাহলে মানুষ আপত্তি তুলতো, 'বাহক এমনি এক কিতাব বহন করে এনেছেন যা বোধগম্য নয় এবং এর বিধি-বিধান অনুসরণযোগ্যও নয়'। এ অভিযোগ নবী করীম (সাঃ) এর উচ্চ মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করলেন, 'আমি আমার এ বান্দার প্রতি এমনি এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে কোনো ধরনের বক্রতা নেই'। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ط

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে, যিনি তাঁর (আব্দ) বান্দার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তার কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ-১)

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করার তা আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করলেন। এ কথাটিও বলতে গিয়ে আল্লাহ আব্‌দ বা বান্দাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ط

অতপর সে তাঁর (আল্লাহর) বান্দার (আব্‌দ) কাছে ওহী পৌঁছে দিলো, যা তার পৌঁছানোর (দায়িত্ব) ছিলো। (সূরা নাজম-১০)

সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তির প্রতি এমনই এক সম্মানিত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, যে কিতাব মানুষকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর জগতে নিয়ে আসে। সকল ধরনের জ্ঞান ভাণ্ডারের খনি যে কিতাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই কিতাবই নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ–

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর (আব্‌দ) বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যেনো তিনি তোমাদের (জাহিলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন। (সূরা হাদীদ-৯)

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط

তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করো, (আরো) বিশ্বাস করো সে (বিজয় ঘটিত) বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন এবং একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার (আব্দ) বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম। (সূরা আনফাল-৪১)

وَأَنَّه لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًاع

যখন আল্লাহর এক (আব্দ) বান্দাহ্ তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ বা জ্বিনের) অনেক সদস্যই তার আশেপাশে ভীড় জমাতে লাগলো। (সূরা জ্বিন-১৯)

أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى لا عَبْدًا إِذَا صَلّٰى ط

তুমি কি সে (দাম্ভিক) লোকটিকে দেখেছো যে তাঁকে বাধা দিলো (বাধা দিলো আল্লাহর) এক (আব্দ) বান্দাকে যে নামাজ আদায় করছিলো। (সূরা আলাক-৯-১০)

হযরত ঈসা (আ:) শিশু বয়সে দোলনায় শুয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ–

'আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার বান্দাহ্'।

অপরদিকে নবী করীম (সা:) স্বয়ং যেমন নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ্ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন তেমনি আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁকে পরম স্নেহে পরিচয় করে দিয়েছেন 'আমার বান্দাহ্' বলে।

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে নবী করীম (সা:) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'আব্দ' বা বান্দাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যে বার্তাটি পৌছানো হয়েছে তাহলো, নবী করীম (সা:) মহান আল্লাহর একজন বান্দাহ্, আল্লাহই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করেছেন। তিনিই তাঁকে প্রতিপালন করছেন, যেমনটি অন্যান্য সৃষ্টিকেও তিনি প্রতিপালন করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর বান্দাহ্ তারপরে তিনি তাঁর রাসূল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মর্যাদার সাথে তাঁকে কখনোই তুলনা করা যাবে না এবং তাঁর উলুহিয়াতের অংশও তিনি নন। যেসব গুণ-বৈশিষ্ট মহান আল্লাহর জন্যে প্রযোজ্য সেসব গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অংশেরও অধিকারী তিনি নন।

এসব ব্যাপারে যারা সাধারণ মুসলমানদের সম্মুখে কথা বলেন, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। নবী করীম (সা:) সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তা যেনো মহান আল্লাহর দেয়া সম্মান-মর্যাদার স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মর্যাদার স্তর স্পর্শ না করে। আল্লাহ তা'য়ালা যে সীমারেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন

তাঁর নবীর ক্ষেত্রে, সে সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করেই রাসূল (সাঃ) এর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) এর রিসালাত ও অন্যান্য নবী-রাসূলের অঙ্গীকার

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে মর্যাদার কোন্ উচ্চ শিখরে উপনীত করেছেন দেখুন, পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণের সূচনা যখন করেন তখন আদম (আঃ) এর পর থেকে বিশ্বনবীর পূর্বে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের কাছ থেকেই এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, 'তোমার পূর্বে যে নবী প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং পরে যাঁকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর প্রতি স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে'। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন নবী করীম (সাঃ), যাঁকে এ ধরনের কিছু বলার প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালা রাখেননি। কারণ তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করা হবে না। তাঁকে দিয়েই নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করা হবে বিধায় তাঁর কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَاب وَّحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِه وَلَتَنْصُرُنَّه ط قَالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِىْ ط قَالُوْا أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ–

আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে) কিতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম। অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার কোনো) রাসূল আসবে, যে তোমাদের কাছে রক্ষিত (আগের) কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'য়ালা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি (এ কথার) ওপর (আমার এ) অঙ্গীকার গ্রহণ করছো? তাঁরা বললো, হ্যাঁ আমরা (মেনে চলার) অঙ্গীকার করছি, আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে (এ অঙ্গীকারের) সাক্ষী হয়ে রইলাম। (সূরা আলে ইমরান-৮১)

নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে সকল নবী-রাসূলের কাছ থেকেই মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন এবং এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তাঁর পরবর্তী নবী-রাসূল সম্পর্কে নিজেদের অনুসারীদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমার পরে যিনি আসবেন তোমরা তাঁকে অনুসরণ করবে'।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বের সকল নবী-রাসূলের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে এ কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন–

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولآئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ–

অতপর যারা তা (অঙ্গীকার) ভঙ্গ করে (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে পরিগণিত) হবে। (সূরা আলে ইমরান-৮২)

কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) এর কাছ থেকে এই ধরনের কোনো অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, 'আপনার পরে যিনি আসবেন আপনি আপনার অনুসারীদের জানিয়ে দিন, তাঁকে অনুসরণ করতে হবে'। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি না নেয়াই এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না এবং তিনিই সমগ্র পৃথিবীর জন্যে শেষ নবী-রাসূল। নবী-রাসূলের সিল মোহরের উচ্চ মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে দান করেছেন। হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছ থেকেও এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা তাদের অনুসারীদের এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'আমার পরে যিনি আসবেন তোমরা তাঁকে সমর্থন করবে, তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর আনীত বিধান অনুসরণ করবে'।

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوْ بَدَالَكُمْ مُوْسى فَاتَّبَعْتُمُوْه وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسى حَيًّا وَّأَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لاَتَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَّا وَسَّعَه إِلاَّ إِتِّبَاعِىْ–

সে মহান সত্তার শপথ যার মুষ্ঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, আর আমাকে পরিত্যাগ করো তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। বাস্তবিকই মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যাতের সময় পেতেন, তাহলে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সুত্রে বলা হয়েছে, তাঁর পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোনো উপায় থাকতো না। (দারেমী, মুসনাদে আহমদ)

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে তাঁর পূর্বের নবী-রাসূলগণ নিজ অনুসারীদের যে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, তা না মেনে তাঁরা নিজেদের নবীর নির্দেশও যেমন অস্বীকার করেছে এবং নবী করীম (সাঃ) কে অনুসরণ না করে বিদ্রোহীদের দলে শামিল হয়েছে। রাসূল (আঃ) এর আনীত ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ না করে যারা বিকৃত আদর্শ অনুসরণ করছে বা নিজেদের আবিষ্কৃত জীবন বিধান অনুসরণ করছে, তাদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَه أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তা'য়ালার (বিধানের) সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

এবার দেখুন নবী করীম (সা:) কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সাম্প্রদায়িকতা ও সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছে দিলেন। তিনি তাঁকে ঘোষণা করতে বললেন–

قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ-

(হে নবী), আপনি বলে দিন, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ওপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার ওপরও (আমরা আরো ঈমান এনেছি), আমরা আরো ঈমান এনেছি, মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, (আল্লাহর) এ নবীদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের পার্থক্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) (সূরা আলে ইমরান-৮৪)

আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:)-এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকেই এ নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেনো পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে ঔদার্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিজেদেরকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে রাখে। মুসলিম মিল্লাত পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষা অনুসরণ করে বলেই এ পৃথিবীতে তাঁরা সবথেকে পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি এবং অমুসলিম প্রতিবেশীকে এরা অতি সহজেই নিজেদের প্রতিবেশীর অধিকার বুঝিয়ে দেয়। নিজেদের নবীর নির্দেশ অমান্য করে যারা নবী করীম (সা:) এর আনীত আদর্শ ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ না করে ভিন্ন বিধান গ্রহণ করেছে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, আখিরাতে সে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

নবী করীম (সাঃ) এর মু'জিযা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, তাদের জন্যে তিনটি বিষয় ছিলো অপরিহার্য এবং এ তিনটি বিষয়ই তাঁদেরকে দান করা হয়েছিলো। সে তিনটি বিষয় (এক) ওহী (দুই) উন্নত চরিত্র এবং (তিন) মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা। একান্ত অপরিহার্য এ তিনটি বিষয় দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন।

এক. ওহী মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেন এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্যে ওহী ছিলো একান্তই অপরিহার্য বিষয়। কারণ তাদেরকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তা পূর্ণ করার জন্যেই তাঁদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হতো। ওহী ব্যতীত তাঁদের মিশন পূর্ণ হতো না।

নবী-রাসূলকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার এটা নিয়ম ছিলো না যে, তিনি তাঁদের সাথে আকাশ থেকে কোনো ফিরিশতা অবতীর্ণ করবেন এবং সে ফিরিশতা সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলবেন, 'এ ব্যক্তিকে তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নির্বাচিত করা হয়েছে, তোমরা এ ব্যক্তির আনুগত্য করো'।

দুই. সৃষ্টিগতভাবে এটি সকল মানুষের সহজাত ধারণা যে, নবী-রাসূলের চরিত্র হয় নিষ্কলুষ, সর্বাধিক উন্নত গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী এবং অপার্থিব জ্ঞান বিবেকের অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে যাদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন, সর্বাধিক উন্নত নৈতিক চরিত্রের গুণ-বৈশিষ্ট দান করেছেন। তাঁদের তুলনায় সমগ্র পৃথিবীতে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও অভ্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী আর কেউই ছিলেন না। আর এসব উন্নত বৈশিষ্ট আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই তাদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে দান করেছিলেন।

নবী-রাসূলগণ যখনই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন, তখন ইসলামের দুশমনরা তাদের প্রতি নানা ধরনের কল্পিত অপবাদ দিলেও তাঁদের স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিযোগ তোলার সাহস করেনি। কারণ তারা এ কথা ভালো করেই জানতো যে, এই ব্যক্তি আমাদের সকলের থেকে উন্নত বৈশিষ্টের অধিকারী।

তিন. মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল নবী-রাসূলকেই তাঁদের কর্মপরিধি এবং পরিবেশ পরিস্থিতির গুরুত্বানুযায়ী প্রয়োজন অনুপাতে মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। এই মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা সকলকেই একই ধরনের দান করা হয়নি। এর ধরন ছিলো ভিন্ন এবং পদ্ধতিও ছিলো ভিন্ন।

এ পৃথিবীতে সাধারণ মুসলমানের জন্যে 'অদৃশ্যের প্রতি ঈমান' আনাই যথেষ্ট, কিন্তু নবী-রাসূলদের যে দায়িত্ব সহকারে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিলো, তাদের জন্যে বিষয়টি 'অদৃশ্যের প্রতি ঈমান' পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না। অর্পিত দয়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্যে সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য ও মহাসত্য প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার প্রয়োজন ছিলো, এই প্রয়োজনের জন্যেই তাঁদেরকে মু'জিযা দান করা হয়েছিলো। পৃথিবীতে সাধারণ মানুষকে সত্য জানার জন্যে যেমন পরীক্ষা-নীরিক্ষা, আন্দাজ-অনুমান ও গবেষণা করতে হয়, তারপরেও সত্য উদ্ঘাটন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্তমানে যা সত্য বলে ধারণা করে পরবর্তীতে সে ধারণা পরিবর্তন করতে এ মানুষ বাধ্য হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সত্য জ্ঞান অনুধাবনের অভ্রান্ত ক্ষমতা মানুষের নেই বিধায় তারা তাদের ধারণা বার বার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং সত্যের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

একজন নবী-রাসূলকেও আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণ মানুষের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেননি। তাঁদেরকে সৃষ্টি রহস্য নিজ চোখে দেখানো হয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রক্রিয়াতেই তাঁদেরকে অভ্রান্ত জ্ঞান দান করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) এর মু'জিযা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৬০ নং আয়াতে, হযরত সালেহ (আ:) এর মু'জিযা সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ৭৩ নং আয়াতে, হযরত মূসা (আ:) এর মু'জিযা সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ১১৬, ১১৭ নং আয়াত, সূরা ত্বাহা-এর ১৭ থেকে ২৩ ও ৭৭ নং আয়াত এবং অন্যান্য সূরায়, হযরত সুলাইমান (আ:) এর মু'জিযা সম্পর্কে সূরা আন্ নাম্ল-এর ১৬, ৩৮ ও ৪০ নং আয়াত, হযরত ঈসা (আ:) এর মু'জিযা সম্পর্কে সূরা মারইয়াম এর ২৭ ও ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর পড়লে নবী-রাসূলদের মু'জিযা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা যাবে। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও বিভিন্ন নবী-রাসূলের মু'জিযা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যান্য সকল নবী-রাসূলদের যেসকল মু'জিযা দান করা হয়েছিলো, তা ছিলো তাঁদের জীবনকালের সাথে সম্পর্কিত। তাঁরা যতদিন পর্যন্ত এ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের মু'জিযার কার্যকারিতা ছিলো। ইন্তেকালের সাথে সাথে তাঁদের প্রতি দানকৃত মু'জিযারও কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হযরত দাউদ (আ:) যে কোনো

ধরনের লোহা হাতের সাহায্যে গলিয়ে তা দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী লৌহজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতে পারতেন এবং এ মু'জিযা মহান আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে এ ধরনের মু'জিযা আজ পর্যন্তও কেউ দেখাতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও পারবে না। লোহা ঠিকই আছে কিন্তু সেই মু'জিযা নেই।

হযরত সুলাইমান (আঃ) সকল প্রাণীর ভাষা বুঝতেন এবং বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়েছিলো। কাঠের তক্তার ওপর বসে বাতাসকে তিনি আদেশ করতেন উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বাতাস তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো। তাঁর ইন্তেকালের পরে এ মু'জিযা আর কাউকে দেয়া হয়নি, আজও বাতাস ও তক্তা রয়েছে কিন্তু সেই মু'জিযা আর নেই। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে ঐ মু'জিযার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) পাখি যবেহ্ করে তা আহার করার পর পাখীর হাড় কোনো এক পাহাড়ের ওপর রেখে আসলেন, তারপর পাখিগুলোকে ডাক দিতেই হাড়গুলো পুনরায় জীবন্ত পাখি হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এলো। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে এ মু'জিযার সমাপ্তি ঘটলো। কিয়ামত পর্যন্ত এ ক্ষমতা কারো হবে না যে, পাখি যবেহ্ করে আহার করার পর তার হাড় দিয়ে পুনরায় জীবিত পাখি তৈরী করা।

হযরত মূসা (আঃ) হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করতেন তা এক বিশাল আকারের সর্পে পরিণত হতো। লাঠি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু মূসা (আঃ) নেই বিধায় লাঠি সর্পে পরিণত হয় না। হযরত সালেহ্ (আঃ) পাথুরে পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বের করে আনলেন সাথে সাথে সেই উষ্ট্রী শাবকও প্রসব করলো। পৃথিবীতে অসংখ্য পাথুরে পাহাড় রয়েছে, কিন্তু এসব পাহাড় থেকে কেউ উট বের করা দূরে থাক, ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকাও বের করতে পারে না। এভাবে সকল নবী-রাসূলের ইন্তেকালের সাথে সাথে তাঁদেরকে প্রদত্ত মু'জিযাও আল্লাহ্ তা'য়ালা উঠিয়ে নিয়েছেন।

ব্যতিক্রম শুধু নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযা। মহান আল্লাহ্ তাঁকে অগণিত মু'জিযা দানে ধন্য করেছিলেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর থেকে মাতৃগর্ভে আসা, ভূমিষ্ঠ হওয়া, তাঁর শৈশব-কৈশোর, তারুণ্য, যৌবনকাল এবং ইন্তেকালের মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে যে সকল মু'জিযা ঘটিয়েছেন, তা একত্রিত করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। নবী করীম (সাঃ) বয়সে যখন কয়েক বছরের বালক, সমগ্র দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। লোকজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তারা বায়তুল্লাহ্‌র ছায়াতলে গিয়ে আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলেই কা'বা শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলো। চাচা আবু তালিব বালক নবী করীম (সাঃ) কে নিজের ঘাড়ে বসিয়ে কা'বা শরীফের ছায়াতলে গিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে থাকলেন। দোয়ার মধ্যে এক

পর্যায়ে তিনি বালক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দিকে ইশারা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই চেহারা দেখেও কি তুমি বৃষ্টি দিবে না!'

ইতিহাস কথা বলে, এভাবে বালক মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দেখিয়ে বৃষ্টির জন্যে আবেদন করার পরে লোকজন নিজেদের ঘরে ফিরে যাবারও সময় পায়নি। ক্ষণিকের মধ্যে মক্কার আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো তারপর শুরু হলো প্রবল বর্ষণ।

নবী করীম (সাঃ) তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। অনাবৃষ্টির কারণে প্রাণীজগৎ এবং মানুষ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৃক্ষ তরুলতা শুকিয়ে যাচ্ছে। মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আবেদন জানালেন, তিনি যেনো বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেন। বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল দোয়া করলেন উপস্থিত লোকজন বাড়িতে ফিরে যাবার সুযোগও পেলেন না। মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হলো।

একাধারে কয়েকদিন বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকলো। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন জানালো, 'হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি বন্ধের জন্যে দোয়া করুন'। নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন।

সে সময় মক্কায় কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। দৈহিক শক্তির অধিকারী বীরগণ কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো। নবী করীম (সাঃ) এসব প্রতিযোগিতায় কখনো অংশগ্রহণ করেননি। নবুয়্যাত লাভের পূর্বে আরবের খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর তাঁর সাথে লড়াই করার জন্যে বার বার বলতে থাকলে তিনি সেই কুস্তিগীরকে এমন শিক্ষা দিয়ে ছিলেন যে, জীবিত থাকা পর্যন্ত সে আর কখনো নবী করীম (সাঃ) কে উত্যক্ত করেনি। দৈহিক শক্তির দিক থেকেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে এমন মু'জিযা দান করেছিলেন যা কল্পনাও করা যায় না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'আমি মক্কা নগরীর সেই সব পাহাড় আর বিশাল পাথরগুলোকে এখনো দেখলে চিনতে পারবো, যেসব পাহাড় আর পাথরের পাশ দিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে পথ চলার সময় আমি দেখতাম, গাছগুলো তাঁর প্রতি ঝুঁকে আসছে আর বৃক্ষ ও পাথর থেকে আওয়াজ শুনতাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি মহান আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি মক্কার ঐসব পাথরগুলোকে চিনি, নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে ঐসব পাথরের পাশ দিয়ে পথচলার সময় পাথরগুলোর মধ্য থেকে সালামের আওয়াজ ভেসে আসতো'। (মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, দারেমী)

মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে এতে মিম্বার ছিলো না। নবী করীম (সাঃ) একটি খেজুর গাছের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন। মিম্বার বানানোর পরে তিনি মিম্বারে বসে বক্তব্য দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শুনতে পেলেন, কেউ যেনো করুণ কণ্ঠে কাঁদছে। কান্নার উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো, সেই খেজুর গাছের খুঁটি থেকে কান্নার আওয়াজ নির্গত হচ্ছে। আল্লাহর হাবীবের স্পর্শ বঞ্চিত হয়ে বিরহ কাতর স্বরে শুকনো খেজুর গাছটি করুণ স্বরে কেঁদেছিলো। নবী করীম (সাঃ) উক্ত গাছটির দিকে এগিয়ে গিয়ে আদর জানানোর পরে গাছটির কান্না বন্ধ হলো। (বুখারী, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী, নাসাঈ, আবু ইয়ালী, তাবরাণী, বায়হাকী)

খন্দক যুদ্ধের সময় পরীখা খননকালে বিশাল একটি পাথরের চাঁই পরীখা খননে বাধার সৃষ্টি করলো। সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত চেষ্টাতেও পাথরের চাঁই ভাঙ্গা গেলো না। নবী করীম (সাঃ) এগিয়ে এসে গাঁইতি দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে বিশাল পাথরের চাঁইটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলো। (বুখারী, নাসাঈ, বায়হাকী, আবু নাঈম, ইবনে সায়াদ, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর)

নবী করীম (সাাঃ) হযরত আবু বকর, হযরত উমার, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন, তাঁদেরকে সাথে নিয়ে একটি পাহাড়ের ওপর উঠলে পাহাড়টি আন্দোলিত হতে থাকে। আল্লাহর নবী (সাঃ) পাহাড়ের ওপর পবিত্র কদম মুবারক দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'স্থির হও, তোমার ওপর আল্লাহর রাসূল, সিদ্দীক এবং শহীদ আরোহণ করেছে'। পাহাড় স্থির হয়ে গেলো। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে হাম্বল, তিরমিযী, নাসাঈ, দারে কুত্নী, আবু ইয়ালী, বায়হাকী)

নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে ভ্রমণে ছিলেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন হলে তিনি দেখলেন পর্দা করার মতো কোনো আড়াল নেই। তিনি হযরত জাবের (রাঃ) কে সাথে নিয়ে খোলা ময়দানের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ময়দানের এক পাশে দু'টো বৃক্ষ। তিনি বৃক্ষ দু'টোকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মহান আল্লাহর আদেশে আমার আনুগত্য করো'। এরপর তিনি যেমনটি চাইলেন বৃক্ষ দু'টো তেমনি হয়ে গেলো এবং বৃক্ষ দু'টোকে আড়াল করে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করলেন। তারপর পুনরায় বৃক্ষ দু'টো পূর্বের অনুরূপ হয়ে গেলো। (মুসলিম, আহমাদ, বায়হাকী)

হিজরতের সময়ের ঘটনা, প্রিয় বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) মদীনার দিকে যাচ্ছেন। খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ায় পথিমধ্যে তাঁরা ক্ষুধা অনুভব করলেন। দেখলেন সুদর্শন এক কিশোর অনেকগুলো ছাগল চরাচ্ছে। নবী করীম (সাঃ) বালককে ডেকে জানতে চাইলেন, 'ছাগলের কি দুধ আছে?'

বালক জবাব দিলো, 'এ ছাগল আমার নয়, আমি অন্যের ছাগল চরাই। আমি এ ছাগলের মালিকের অনুমতি ব্যতীত আপনাদেরকে দুধ দিতে পারবো না'।

রাসূল (সাঃ) বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এমন একটি কম বয়সী ছাগী আমার কাছে নিয়ে এসো, যা এখনো বাচ্চা দেয়ার বয়সে উপনীত হয়নি'।

বালক অল্প বয়সী একটি ছাগী আনলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) গর্তযুক্ত একটি পাথর যোগাড় করলেন যা দেখতে অনেকটা পাত্রের মতো। নবী করীম (সাঃ) কম বয়সী ছাগীর স্তনে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে হাত দিতেই স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। বালকসহ তাঁরা দুধ পান করলেন এবং ছাগীর স্তন যেমন ছিলো পুনরায় তেমনি হয়ে গেলো। (ইবনে সায়াদ)

একজন মরুচারী বেদুঈন নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আপনি যে আল্লাহ্ তা'য়ালার রাসূল তা আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো?'

নবী করীম (সাঃ) সম্মুখের দিকে একটি খেজুর গাছের দিকে ডান হাতের ইশারা করে বললেন, 'ঐ খেজুর গাছটি যদি আমার নির্দেশ মেনে নেয় তাহলে কি তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে?'

বেদুঈন জানালো, এমন ঘটনা ঘটলে সে ঈমান আনবে। রাসূল (সাঃ) গাছের খেজুর গুচ্ছের দিকে ইশারা করা মাত্র খেজুর গুচ্ছ গাছ থেকে পৃথক হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তিনি পুনরায় ইশারা করতেই তা স্বস্থানে চলে গেলো। এ দৃশ্য দেখে বেদুঈন তখনি ইসলাম গ্রহণ করলো। (তিরমিযী, তারিখ-ই বুখারী)

হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর বাহন ঘোড়াটি ছিলো অত্যন্ত দুর্বল ও রোগা। চলতে ফিরতে ছিলো খুবই দুর্বল। নবী করীম (সাঃ) একদিন সে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া মাত্র ঘোড়াটি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হয়ে গেলো। তিনি মদীনা শহর ঘুরে এসে বললেন, 'এই ঘোড়াটি খুবই কোমল এবং আরামদায়ক'। এরপর থেকে উক্ত ঘোড়াটির মুকাবিলায় অন্য ঘোড়াগুলো দুর্বল মনে হতো। (বুখারী)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যে তাঁরা নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে গভীর রাত পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। তারপর অন্ধকার রাতে বাড়ী ফিরতে তাঁদের চলার পথে দেখতে পেতেন, তীব্র আলো পথের অন্ধকার দূর করে দিচ্ছে। তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত আলো তাদের সাথী হয়ে থাকতো। রাতের অন্ধকারে রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে বাড়ী ফিরে যাবার সময় কোনো সাহাবীর হাতের লাঠি থেকেও আলো নির্গত হতো এবং সে আলোয় পথ দেখে তাঁরা বাড়ী ফিরতেন। (বুখারী, হাকেম, ইবনে সায়াদ, বায়হাকী)

একজন সাহাবীর একটি উট হঠাৎ উন্মাদের মতোই আচরণ করতে লাগলো। এলাকার লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়লো, এ বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) শোনামাত্র সেখানে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! পশুটির কাছে যাবেন না। মানুষকে আঘাত করা এ উটটির স্বভাবে পরিণত হয়েছে'।

নবী করীম বললেন, 'চিন্তা করো না'। কথা শেষ করেই তিনি উটটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখামাত্র উটটির মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেলো। ক্ষণপূর্বের সেই উন্মাদনা দূর হয়ে গেলো। শান্ত ভঙ্গিতে উটটি নীচু হতে হতে রেসালাতে নববীর পবিত্র কদমে লুটিয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল পবিত্র হাত মুবারক দিয়ে উটের মাথা মুখ স্পর্শ করে উটটি তার মালিককে ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টিই জানে যে আমি আল্লাহর রাসূল, শুধু মানুষই নাফরমানী করে'। (দারেমী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবি শাইবা, বায়হাকী, তাবারাণী, বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

নবী করীম (সাঃ) মদীনার এক সাহাবীর বাগানে গিয়ে দেখলেন, একটি উট বাঁধা রয়েছে আর উটটি করুণ কণ্ঠে আওয়াজ করছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে দেখে উটটি রেসালাতে নববীর দিকে অশ্রু সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ নাড়াতে থাকলো। তিনি উটটির কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। উটটি নীরব হয়ে আদর জানাতে লাগলো। তিনি উপস্থিত লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, 'এ উটটির মালিক কে?' একজন সাহাবী এগিয়ে এসে জানালো সে এটির মালিক। নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এই নিরীহ প্রাণীর অধিকারী করেছেন। তোমাদের দায়িত্ব হলো এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। এই উটটি আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি একে নির্যাতন করো এবং ক্ষুধার্ত রাখো'। (আবু দাউদ, আহমাদ, মুসলিম, আবু নাঈম)

নবী করীম (সাঃ) এর বলা কথাগুলো হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) স্মরণে রাখার জন্যে একদিন নিজের কাপড় বিছিয়ে দরবারে নববীতে বসলেন। রাসূল (সাঃ) এর কথা শেষ হতেই তিনি কাপড় গুটিয়ে নিজের বুকের সাথে মিশালেন। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমি আর কখনো কোনো হাদীস ভুলিনি। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু তালহা (রাঃ) একদিন নবী করীম (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনে অনুভব করলেন তিনি ক্ষুধার্ত। নিজ বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রাঃ) এর কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, মাত্র কয়েকটি রুটি রয়েছে এবং এগুলো সন্তানদের খাওয়াতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, সন্তানরা ক্ষুধার্ত থাক- আল্লাহর রাসূলের জন্যে এ রুটি পাঠাতে হবে। উম্মে সুলাইম সন্তান হযরত আনাস (রাঃ) এর হাতে রুটিগুলো দিয়ে দরবারে নববীতে পাঠিয়ে দিলেন।

বালক আনাস (রাঃ) রুটিগুলো নিয়ে এসে দেখলেন, দরবারে নববীতে অনেক মানুষ। এখন এ রুটি দিলে রাসূল (সাঃ) কিছুই খেতে পাবেন না, সবগুলো লোকদের দিয়ে দিবেন। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন, লোকগুলো বিদায় নিলে তিনি রুটিগুলো দিবেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর দৃষ্টি হযরত আনাসের ওপর পতিত হলো। তিনি বললেন, 'তালহা তোমার মাধ্যমে খাবার পাঠিয়েছে?'

হযরত আনাস সম্মতিসূচক জবাব দিলেন। নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ হযরত তালহার বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। হযরত আনাসও নিজ বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের কাছে রুটিগুলো দিলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত তালহা (রাঃ) বিস্মিত দৃষ্টিতে রাসূল (সাঃ) এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাসূল (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইমকে বললেন, 'যা কিছু আছে নিয়ে এসো'।

হযরত আনাস (রাঃ) এর নিয়ে যাওয়া ঐ রুটিগুলো এবং সামান্য ঘী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। নবী করীম (সাঃ) নিজ হাতে রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরো করে ঘী দিয়ে মাখালেন। তারপর দশজন দশজন করে সাহাবাকে ঘরে প্রবেশ করে খেতে বললেন। প্রত্যেক সাহাবা পেটপুরে আহার করলেন, আল্লাহর রাসূলের পবিত্র হাতের স্পর্শে মহান আল্লাহ এতই বরকত দিয়েছিলেন যে, মাত্র একজনের খাদ্য প্রায় আশিজন মানুষ খাবার পরও উদ্বৃত্ত রয়ে গেলো। (বুখারী)

তরুণ সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) এর পিতা অনেক ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে সকল ঋণের বোঝা এসে তাঁর কাঁধে চাপলো। ঋণ দাতাদের মধ্যে সকলেই ছিলো ইয়াহূদী। সেবার বাগানে যে খেজুর হলো তা সবগুলো দিয়েও ঋণ পরিশোধ হবে না। বিষয়টি তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে জানালেন। তিনি বললেন, 'গাছের খেজুরগুলো পেড়ে তুমি একস্থানে জমা করো'। হযরত জাবের (রাঃ) পরামর্শ মতো তাই করলেন। নবী করীম (সাঃ) এসে একস্থানে জমা করা খেজুরগুলোর চারপাশে ঘুরলেন। তারপর ঋণ দাতাদেরকে খেজুর দিয়ে ঋণ পরিশোধের আদেশ দিলেন। সকলের ঋণ পরিশোধের পরও দেখা গেলো, প্রথমে খেজুর যে পরিমাণ ছিলো সেই পরিমাণই রয়ে গিয়েছে। (বুখারী)

একজন সাহাবী নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে কিছু যব চেয়ে নিলেন। এরপর প্রত্যেক দিন তিনি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে উক্ত যবের পাত্র থেকে যব নিয়ে খেতে থাকলেন। কয়েক দিন খাবার পরও পাত্রে যব যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেলো। তিনি যবের পরিমাণ ওজন করে দেখে বিষয়টি রাসূল (সাঃ) কে জানালেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি যদি যব ওজন না করতে তাহলে পূর্বে যেমন তা বরকত দিচ্ছিলো, তা-ই দিতে থাকতো'। (মুসলিম, আহমাদ)

খন্দক যুদ্ধের সময় পরীখা খনন করতে করতে নবী করীম (সাঃ) সহ সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন ক্ষুধার্ত। হযরত জাবের (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর অবস্থা দেখে বাড়িতে গিয়ে নিজ স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। তিনি একটি ছোট্ট ছাগল যবেহ করে যব দিয়ে তা রান্না করলেন। হযরত জাবের (রাঃ) চুপি চুপি নবী করীম (সাঃ) কে খেতে যাবার অনুরোধ করলেন। রাসূল (সাঃ) সকল সাহাবায়ে কেরামকে খুশীর সংবাদ জানিয়ে বললেন, 'জাবের আমাদের খাবার প্রস্তুত করেছে, তোমরা আমার সাথে চলো'।

সকলেই নবী করীম (সাঃ) এর সাথে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত জাবের (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিব্রতবোধ করছেন। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বরকতের জন্যে দোয়া করে খাদ্য পরিবেশন করতে আদেশ করলেন। বিশাল এক বাহিনী খাওয়ার পরেও খাদ্য পাত্রে যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেলো। (বুখারী)

হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সাহাবায়ে কেরাম কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে কুয়ার পানি নিঃশেষ হয়ে গেলো। নবী করীম (সাঃ) এর কাছে সংবাদ পৌছলে তিনি পবিত্র মুখ মুবারকে কিছুটা পানি নিয়ে তা পানিহীন কুয়ায় নিক্ষেপ করা মাত্র কুয়া পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। (বুখারী)

সাহাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে ভ্রমণে থাকা অবস্থায় পানি ফুরিয়ে গেলো। নবী করীম (সাঃ) এর জন্যে কিছুটা অজুর পানির ব্যবস্থা করা হলে তিনি নিজে অজু করে সে পানির পাত্রে হাত মুবারক রাখলেন। পবিত্র হাতের বরকতে প্রত্যেক আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। অগণিত সাহাবায়ে কেরাম সে পানি দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করলেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

এ ধরনের অসংখ্য মু'জিযা সম্পর্কিত ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে যে কত উচ্চে মর্যাদা দান করেছিলেন তা এসব মু'জিযাসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে অনুভব করা যায়। তবে যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলকেই বিশ্বাস করে না, কোনো মু'জিযাই তাদের কপাট বন্ধ অন্ধকার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

মু'জিযা, মিরাজুন্নবী (সাঃ)

মিরাজের পূর্বে নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে বহু সংখ্যক মু'জিযা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের দেখিয়েছেন। অগণিত মানুষ দেখেছে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র হাতের ইশারায় আকাশের চন্দ্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পুনরায় তা পূর্বের ন্যায় ধারণ করেছে। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ–

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা ক্বামার-১)

অসংখ্য অগণিত মু'জিযার মধ্যে নবী করীম (সাঃ) এর জীবনে মিরাজ ছিলো অন্যতম মু'জিযা এবং এটি তাঁর জীবনেতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শুধু তাঁকেই নয়, মহান আল্লাহ্ গুরুত্বপূর্ণ নবী-রাসূলদের এমন অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়েছেন, যা সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। এসব নিদর্শনের মাধ্যমে নবীদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি জগৎ ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানদান করেছেন। যে সকল নবী-রাসূলকে অতিন্দ্রীয় নিদর্শন দেখানো হয়েছে তাদের সকলের বিষয়টির ধরন একরূপ ছিল না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদেরকে প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখানো হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিয়োজিত করার সময় দর্শনের যাবতীয় বস্তুভিত্তিক শর্তাবলীর আবরণ তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে অপসারিত করা হয়েছে। স্থান এবং সময়ের সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাদের দৃষ্টিপথ ও যাত্রা পথ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। ফলে তাঁরা এই মাটির পৃথিবীতে অবস্থান করে মহান আল্লাহর সৃষ্টি এমন অনেক কিছুই দেখেছেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর বাইরের জগতের সংবাদ অনুগ্রহ করে অবগত করেছেন এবং অনেক গোপন দৃশ্য দেখিয়েছেন।

এ ধরনের প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে একজন নবী-রাসূল মহান আল্লাহর ঐ সকল ক্ষমতা এবং সৃষ্টি দর্শন করেছেন যা সাধারণ মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। তাঁরা ফেরেশতার সান্নিধ্য অনুভব করেছেন। মহান আল্লাহর অসংখ কুদরত দর্শন করেছেন। আকাশ এবং পৃথিবীর রহস্য তাদের সামনে উন্মোচন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের বহু কিছু দর্শন করিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতাকে সত্য পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে বলেছিলেন–

يَا أَبَتِ إِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا–

হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতঃএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করবো। (সূরা মারইয়াম-৪৩)

এ পৃথিবীতে সাধারণ ঈমানদার লোকদের জন্য যে কাজ করতে হয় তাহলো, ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য তাদেরকে সেইসব নিগূঢ় সত্যকে নিজেদের চোখে বাস্তবে দর্শন করানো একান্ত কাম্য ছিলো, যে সকল বিষয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বলে থাকেন এবং যেদিকে তাঁরা মানুষকে আহ্বান জানাতেন। সমগ্র পৃথিবীবাসীকে লক্ষ্য করে তাঁরা এ ঘোষণা দিয়েছেন, 'তোমরা যারা কেবলমাত্র ধারণা ও অনুমানের পেছনে ছুটে থাকো, আমরা কিন্তু ধারণা বা অনুমানের পেছনে ছুটি না। আমরা যা নিজ চোখে দেখেছি তাই তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। তোমাদের কাছে রয়েছে অমূলক ধারণা, আর আমাদের কাছে রয়েছে অভ্রান্ত জ্ঞান। তোমরা অন্ধ আর আমরা প্রত্যক্ষদর্শী দৃষ্টিমান'।

আর ঠিক এ কারণেই নবী-রাসূলগণের কাছে ফিরিশতাগণ প্রকাশ্যভাবে এসেছেন, সমগ্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত মহান আল্লাহর অকল্পনীয় বিশাল শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংশ তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। তাঁদেরকে জান্নাত- জাহান্নাম, নিজেদের চোখে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। নবুয়্যাতের পদে অভিষিক্ত হবার পূর্বেই তাঁরা ঈমান বিল গায়েবের পর্যায় অতিক্রম করেছেন এবং নবুয়্যাত লাভ করার পরে তাঁদেরকে ঈমান বিশ্ শাহাদাত তথা প্রত্যক্ষ ঈমানের নিয়ামত দানে ধন্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন এ বিষয়টি হযরত ইবরাহীম (আ:) কে দেখানো হয়েছে। এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করছে–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ط قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

(আরো স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম বললো, হে মালিক, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, কেনো (না দেখে) তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হ্যাঁ (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সান্ত্বনা পাবে (এই যা); আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, (তুমি বরং এক কাজ করো), চারটি পাখী ধরে আনো, অত:পর (আস্তে আস্তে) এই পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওদের নাম তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের শরীর কেটে কয়েক টুকরায় ভাগ করো,) তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অত:পর ওদের (সবার নাম ধরে) তুমি ডাকো, (দেখবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার

কাছে দৌড়ে আসবে; তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ তা'য়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ ও কুশলী। (সূরা আল বাকারা-২৬০)

মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে নির্দেশ দিলেন মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) তা বাস্তবায়ন করার পর পাখীগুলোর নাম ধরে ডাক দিলেন, পাখীগুলো জীবন্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে একজন মানুষের কথা আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর নাম পরিচয় উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো গবেষক সে ব্যক্তিকে নবী বলে অনুমান করেছেন। এ মানুষটি নিজ বাহন গাধায় আরোহণ করে একটি বিধ্বস্ত জনপদ অতিক্রম করছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বাহন থেকে নেমে সাথে থাকা খাদ্য ও পানীয় একদিকে রেখে গাধাটি পাশেই বেঁধে একস্থানে বসলেন। চারদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত এ জনপদকে মহান খালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুনরায় কিভাবে জীবনদান করবেন!' আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন–

أَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَاج قَالَ أَنَّى يُحْى هذه اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَاج فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَه ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ قف وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًاط فَلَمَّا تَبَيَّنَ له لا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

অথবা (ঘটনাটি) কি সেই ব্যক্তির মতো যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখলো, তা (বিধ্বস্ত হয়ে) আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ মৃত জনপদকে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশ বছর ধরে মৃত (ফেলে) রাখলেন, অত:পর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্র পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেনো আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাড় পাঁজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, (তুমি নিজেই দেখতে পাবে) আমি কিভাবে তা

একটার সাথে আরেকটার জোড়া লাগিয়ে (নতুন জীবন) দিয়েছি, অত:পর কিভাবে তাকে আমি গোস্তের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, অত:পর (এভাবে আল্লাহর দেখানো) এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন বলে উঠলো, আমি (এটা) জানি, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আল বাকারা-২৫৯)

হযরত মূসা (আ:) এর সামনে থেকে জ্ঞানের জগতের আবরণ সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন, যে জ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সামান্যতম ধারণাও করতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার ক্ষুদ্রতম একটি হযরত মূসা (আ:) এর সম্মুখে প্রকাশ করার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তাঁর হাতের লাঠিকে যখন বিশাল সর্পে পরিণত করা হলো তখন তিনি প্রথম দিকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার সে দৃশ্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে এভাবে অঙ্কন করেছেন–

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلَّى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يَا مُوْسى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف إِنَّكَ مِنَ الآمِنِيْنَ-

(তাকে আরো বল হলো,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত) সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো না; (তার প্রতি তখন আদেশ করা হলো,) হে মূসা, তুমি এগিয়ে এসো, ভয় পেয়ো না। তুমি হচ্ছো নিরাপদ মানুষদেরই একজন। (সূরা আল কাছাছ-৩১)

এভাবে হযরত ইউসুফ (আ:), হযরত ইয়াকুব (আ:), হযরত নূহ (আ:) অর্থাৎ মহান আল্লাহ যে নবী-রাসূলকেই ইচ্ছা করেছেন তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে প্রয়োজন অনুসারে আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁরা অদৃশ্য জগতের বহু কিছু নিজ চোখে দেখে তাদের অনুসারীদেরকে সাবধান এবং সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

কিন্তু নবী করীম (সা:) এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিলো ভিন্ন ধরনের। সকল নবী- রাসূলদের নেতা ছিলেন তিনি। বিশেষ কোনো এলাকা বা জাতির জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতেও তাঁর নবুয়্যাত আবদ্ধ করা হয়নি। তাঁর নবুয়্যাত পৃথিবী থেকে কিয়ামতের ময়দানে অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি বিশ্বনবী নবী, তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ওপরে যিনি সকল বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করবেন, তাঁকে তাঁর পদের উপযুক্ত করে গড়ার জন্য যে ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিলো মহান আল্লাহ তা-ই করেছিলেন। বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁর জ্ঞানের পরিধি যতদূর বিস্তৃতি ঘটানো আবশ্যক ছিল মহান আল্লাহ তাই ঘটিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর মিরাজ ছিল অন্য নবী-রাসূলের প্রত্যক্ষ দর্শনের থেকে

ভিন্ন ধরনের। অন্য নবীদের ক্ষেত্রে যা করা হয়নি তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে তাই করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) এর মিরাজের ব্যাপারে যে পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁকে দৈহিকভাবে সরাসরি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে উপস্থিত করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই বলেছেন, তাঁর মিরাজ হয়েছিল স্বাপ্নিকভাবে। তাদের এ কথা বলার পেছনে দু'টো কারণ বিদ্যমান। প্রথমটি হলো কুরআন বুঝার দুর্বলতা এবং দ্বিতীয়টি হলো কুরআন ও রাসূলের প্রতি অধিক ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিরোধিদের অপবাদ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা। কেননা, বিজ্ঞান যখন ঘোষনা করেছে মানুষের পক্ষে কোনো কিছুর মাধ্যম ব্যতীত মহাকাশ ভ্রমণ করা অসম্ভব এবং বিজ্ঞান তা প্রমাণও করে দেখিয়েছে। তখন নবীর একশ্রেণীর প্রেমিকগণ ভেবে দেখেছেন, কুরআনে যেহেতু নবী করীম (সাঃ) এর শারীরিক মিরাজের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়নি এবং বিজ্ঞানও প্রমাণ করে দিয়েছে শারীরিক মিরাজ হওয়া অসম্ভব। সেহেতু মিরাজ হয়েছিল স্বাপ্নিকভাবে এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত। রাসূল (সাঃ) দাবী করেছেন তাঁর মিরাজ হয়েছিল, অতএব রাসূলের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে স্বপ্নের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ নেই। সুতরাং নবীর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার কারণেই তাঁরা দাবী করেছেন, বিশ্বনবী (সাঃ) এর মিরাজ হয়েছিল স্বপ্নের মাধ্যমে।

নবী করীম (সাঃ) এর মিরাজ দৈহিক না স্বাপ্নিক

আমরা মিরাজের বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করতে চাই, পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈল-এ মহান আল্লাহ্ মিরাজের প্রসঙ্গে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِىْ
بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَه مِنْ آيَاتِنَا ط إِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ–

পবিত্র ও মহিমান্বিত (সেই আল্লাহ্ তা'য়ালা) যিনি তাঁর (এক) বান্দাহ্‌কে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম, যেন আমি তাকে আমার (অদৃশ্য জগতের) কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। (সূরা বনী ইসরাঈল-১)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বাহ্যিক দিক দিয়ে এ কথা প্রমাণীত হয় না যে, বিশ্বনবী (সাঃ)-কে শারীরিকভাবে উর্ধ্ব আকাশ পাড়ি দিয়ে বিশেষ কোনো স্থানে নেয়া হয়েছিল। এ আয়াতে এ কথাই বাহ্যিক দিক দিয়ে বুঝা যায়, তাঁকে রাতের এক বিশেষ অংশে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালিমের মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছে।

পক্ষান্তরে এই আয়াতের প্রথম শব্দ দিয়েই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীর মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে বিশ্বনবীকে শারীরিকভাবে মিরাজ করানো সম্ভব এবং তিনি তা করিয়েছেন। এই আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণ হলো, যে সময়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পৃথিবীকে গ্রাস করছিল, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে পৃথিবীর মানুষ চমকিৎ হচ্ছিল, সে সময়ে গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা কোথাও ছিল ঘুমিয়ে, কোথাও ছিল তাঁরা পদানত, কোথাও ছিল তাঁরা ভিন্ন জাতির গোলামী করতে ব্যস্ত, কোথাও তাঁরা বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে শরীর ভাসিয়ে দিয়েছিল, কোথাও তাঁরা আপন ভাইয়ের রক্তপাতে ছিল ব্যস্ত, কোথাও একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোওয়াবাজীতে লিপ্ত ছিলো। আবিষ্কারের অবসর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। আবিষ্কার করা তো দূরে থাক, তাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে এই অবসর তাদের হয়নি।

ইসলাম বিরোধী শক্তি সমস্ত পৃথিবী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করে শক্ত হাতে শাসনদণ্ড ধারণ করেছিল। পৃথিবীর নেতৃত্বও ছিলো ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে। আবিষ্কারের যাবতীয় উপকরণ তাদেরই হাতে। শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের হাতে। কোন্ পদ্ধতিতে এবং কিভাবে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, এ সব কিছুই তাদের হাতে। কুরআনের শিক্ষকও ছিল তাঁরা বাইবেলের শিক্ষকও ছিল তাঁরাই। মুসলমান মুল্লাদের ক্ষীণ দাবীর কারণে এবং নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কতক স্থানে ইসলাম শিক্ষার নামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দিল বটে, কিন্তু সে সব মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেয়া হবে সেটা আড়ালে বা প্রকাশ্যে থেকে তাঁরাই নির্ধারণ করে দিল।

এ অবস্থা অবলোকন করেই ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন, 'মুল্লাকে মসজিদে নামাজ আদায়ের সুযোগ দেয়া হয়েছে আর মূর্খের দল ভেবেছে ভারতে বোধহয় ইসলামের স্বাধীনতা রয়েছে'।

আবার কোথাও যদিও বা ইসলামের প্রেমিকগণ নিজেদের উদ্যোগে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে সকল মাদ্রসায় কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীকে বুঝানো হবে, এমন শিক্ষকের ছিল তীব্র অভাব। স্কুল কলেজে যারা অধ্যয়ন করছিল তাঁরা তো পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী শিক্ষাই লাভ করছিল। ইসলাম বিরোধিদের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের ভেতরে দুই ধরণের শিক্ষায় দুটো দল সৃষ্টি হলো। মাদ্রাসা থেকে যারা বের হলো তাঁরা দেশ পরিচালনার অযোগ্য কিন্তু চরিত্রবান। তাদের চরিত্রে আল্লাহর ভয় কিছুটা পাওয়া গেল। আর স্কুল কলেজ থেকে যাঁরা বের হলো তাঁরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশ পরিচালনার যোগ্য বটে কিন্তু চরিত্রহারা। তাদের ভেতরে আল্লাহভীতি দূরে থাক, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অনুপস্থিতি ছিল প্রকট।

ইসলাম বিরোধিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কুরআন হাদীসের প্রচার প্রসার কিভাবে সম্ভব তা আমাদের বোধের অগম্য। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল তাই। পঞ্চাশ জন মানুষ একস্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহ রাসূলের কথা শুনবে কি শুনবে না সেটাও ছিল ইসলাম বৈরীদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। এই অবস্থায় ও পরিবেশে কুরআন ভিত্তিক গবেষণা ও কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব ছিলো না। বর্তমানে যা সম্ভব তা সে সময়ে সম্ভব ছিল না। ফলে এমন লোক তৈরী হতে পারেনি, যারা কুরআনের শব্দ দিয়েই প্রমাণ করে দিবে, ইসলাম যা বলে এবং বিশ্বনবী যা বলেছেন, করেছেন, তাঁর পবিত্র জীবনে যা ঘটেছে তার কোনটিই যুক্তিহীন বা অবৈজ্ঞানিক নয়।

মিরাজ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়ের অবতারণা করে অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক নই। আমরা স্পষ্ট কথা বলতে চাই, এই পৃথিবী থেকে মানব শরীর কোনো কিছুর মাধ্যম ব্যতীত আকাশ ভ্রমণ করতে পারে না, তা অসম্ভব। মহান আল্লাহ উর্ধ্বাকাশে মানুষের কল্যাণের জন্যই নানা ধরনের স্তর ও মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। রয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর গ্যাস ও বায়বীয় স্তর, প্রতি মুহূর্তে উল্কাপাত ঘটছে, রয়েছে ভাসমান পাথরের সাম্রাজ্য। এ সকল স্তর অতিক্রম করে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছা বা আকাশ অতিক্রম করে ভিন্ন কোনো জগতে পৌঁছা অসম্ভব। এই চর্মদেহ নিয়ে ঐ সকল স্তর অতিক্রম করা কল্পনাও করা যায় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান স্বীকার করে, 'যা আজ কল্পনার অতীত তাই আগামী কাল বাস্তবে দেখা যায়'।

এ কথাটি সর্বক্ষেত্রেই যেন প্রযোজ্য। আজ এক দলের সাথে বৈরী সম্পর্ক কাল আবার তা স্বাভাবিক। মিস্টার জুলভার্ণ যে সময় তাঁর পাতাল সম্পর্কিত কল্পনা প্রসূত লেখা লিখেছিলেন বর্তমানে তা বাস্তব। সুতরাং কিছু কল্পনা বাস্তবে পরিণত হওয়া সময় ও সাধনার বিষয় মাত্র। মিরাজ সম্পর্কে আজও মানুষের কাছে যা কল্পনার বিষয় কাল তা বাস্তবে রূপলাভ করবে না তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মিরাজ সম্পর্কিত আয়াতের শুরুতে যদি বলতেন, 'আল্লাযি আস্‌রা' অথবা 'হুওয়াল্লাযি আস্‌রা' অর্থাৎ যিনি বা তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাহ্‌কে। কিন্তু এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেননি। তিনি বলেছেন, 'সুবহানাল্লাযি আস্‌রা' অর্থাৎ পাক পবিত্র ও মহিমান্বিত। আয়াত শুরু হয়েছে 'সুব্‌হান' শব্দ দিয়ে। যার অর্থ হলো তিনি দুর্বলতা ও অক্ষমতা নামক নাপাকি বা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।

অর্থাৎ মানুষ যা অসম্ভব বলে চিন্তা করে তিনি সেই অসম্ভব থেকে মুক্ত। তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সৃষ্টি জগতে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে সব তাঁরই সৃষ্টি। যেখানে যে শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যে শক্তিকে বড় বাধা বলে বিবেচনা করে তা মহান আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত সে সব

শক্তি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তাদেরকে সক্রিয় হতে বললে তারা সক্রিয় হয় আর নিষ্ক্রীয় হতে বললে তারা নিষ্ক্রীয় হয়। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এর যে শারীরিকভাবে মিরাজ হয়েছিল এতে অসম্ভবের কিছুই নেই।

মহাকাশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভিন্ন জগতে পৌছার জন্য যে বাধা রয়েছে, সে বাধা তো মহান আল্লাহরই আজ্ঞাবহ। এ সব আজ্ঞাবহ সৃষ্টিসমূহ মানুষের ন্যায় স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন অবাধ্য গোলাম নয়। আল্লাহর আদেশের বিপরীত কিছু করার ক্ষমতাই ঐসব সৃষ্টিসমূহকে দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাঁরই আদেশে পথ প্রদর্শক হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে এমন জগতে ভ্রমণে যাবেন, যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

এরপরেও সাধারণ মানুষ যদি তা অসম্ভব বলে চিন্তা করে এ কারণে মহান আল্লাহ মানুষের সে ধারণাকে খণ্ডন করে বলেছেন, 'তোমরা যা অসম্ভব বলে চিন্তা করছো, যে সম্পর্কে তোমরা দুর্বল, তোমরা যা করতে অক্ষম, আমি আল্লাহ ঐ সকল দুর্বলতা, অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ভ্রমণ পথের পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম'।

এরপরেও আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা রয়েছে। যান-বাহন থামতে হবে এ জন্য একটি Signal এর ব্যবস্থা রয়েছে। চলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এ জন্য আরেকটি ওধথভটফ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। চলতে হবে এ জন্য আরেকটি Signal এর ব্যবস্থা আছে। এ সব Signal এর মুখোমুখি হলে যান-বাহনের চালক অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যান-বাহন চলতে হবে, এ ধরনের Signal পেলেও কারণ বিশেষে যান-বাহন চলে না। ট্রাফিক পুলিশ চলতে দেয় না। রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তির জন্য বা বিদেশী সম্মানিত অতিথির ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে ট্রাফিক পুলিশ প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করে। বিশেষ বিশেষ রাস্তায় যান-বাহন এবং সাধারণের চলাচল সাময়িকের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। যান-বাহনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সম্মানিত মেহমান চলে যাবার পরে গতি আবার সচল হয়।

মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন সর্ব শ্রেষ্ঠ মেহমান আগমন করবেন। এমনও তো হতে পারে, মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল গতি সে সময় স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। বৃক্ষের পাতা যেদিকে হেলেছিল গতি না থাকার কারণে পাতা ঐ অবস্থায় ছিল। চন্দ্র-সূর্য তারকা, বাতাস, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, উর্ধ্ব জগতের যাবতীয় শক্তির গতি তিনি থামিয়ে দিয়ে তাঁর মর্যাদাবান সম্মানিত মেহমান বিশ্বনবী (সাঃ) কে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়েছিলেন। নিয়ে যাবার পথে যে সকল বাধার বিষয় রয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআনের এ কথাও তো প্রযোজ্য যে, 'পারিপার্শ্বিকতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম' অর্থাৎ যা

কিছু বাধা সৃষ্টি করে বলে তোমাদের ধারণা তা আমি পূর্বেই অপসারিত করেছিলাম। সুতরাং রুহানীভাবে মিরাজ হয়েছে না স্বাপ্নীকভাবে মিরাজ হয়েছে, এ সব কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

সর্বশ্রেষ্ঠ মাকামে নবী করীম (সাঃ)

নবী করীম (সাঃ) এর জীবনে কখন মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে ইতিহাসে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা য়ায়। মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে মতপার্থক্য নেই। সে সময় নির্দিষ্ট কোনো বছর বা সনের প্রচলন ছিল না বিধায় কোন্ মাসের কোন্ তারিখে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মিরাজ রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাস সম্পর্কে কেউ বলেছেন রমজান মাসের ১৭ তারিখ, কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল, আবার কেউ বলেছেন রজব মাসের ২৭ তারিখ বা শাওয়াল মাসে।

বছর সম্পর্কে বলা হয়েছে হিজরতের তিন বছর পূর্বে। হযরত আবু তালিব এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের পরে যে মিরাজ হয়েছিল এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে। তিনি বলেছেন 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হবার পূর্বেই হজরত খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন এবং হিজরতের তিন বছর পূর্বে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল'।

হাদীস ও সিরাতের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটা বুঝা যায়, হিজরতের এক বছর পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। এ ধরণের আরো কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় হিজরতের পূর্বেই মিরাজ হয়েছিল। আর এই সময় মিরাজ হওয়াও ছিল সময়ের দাবী। কারণ আর মাত্র এক বছর বাকী ছিল ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার। রাষ্ট্র প্রধানের কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য তা নবী করীম(সাঃ) কে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মত লোক মক্কাতেই নানা ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল। নবী করীম (সাঃ) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা ব্যাপী বিস্তৃত একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

হিজরতের পরপরই তাঁর জীবন ধারায় মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বিরাট পরিবর্তন আসবে, দীর্ঘ তেরো বছর ধরে তিনি নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাঁর চোখের সামনে তাঁরই প্রাণ প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হয়েছে, প্রতিকার করতে পারেননি, এ সবের অবসান ঘটবে এবং এবার আঘাত এলে প্রতিঘাত করা হবে, বিশাল একটি রাষ্ট্রের– যে রাষ্ট্রে নানা রঙের, বর্ণের, ভাষার, ধর্মের, জাতির লোক বাস করবে, এমন একটি রাষ্ট্রের খুটিনাটি আইন-কানুনের প্রয়োজন। এ সকল দিক সামনে রেখেই তাঁর মিরাজ যথা সময়েই মহান আল্লাহ

সংঘটিত করেছিলেন। বিশাল সে রাষ্ট্রের মূলনীতি কি কি, মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন।

নবী করীম (সাঃ) এবং মুসলমানগণ যে চরম সমস্যার মুকাবিলা করছিলেন এবং সে সমস্যা অচিরেই দূরীভূত হয়ে সৌভাগ্য শশী উদিত হবে, তারই শুভ ইঙ্গিত ছিল পবিত্র মিরাজ। হিজরতের পর হতে সার্বিক কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার এক নতুন পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটন হবে, ঠিক সে সময়েই এমন এক মহিমান্বিত রাতের আগমন ঘটলো, যে রাত ছিল মহান আরশে আজীমে পৌঁছার গৌরবময় রাত। এ রাতে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যত কার্যকরী উপাদান রয়েছে সে সব উপাদানসমূহকে নির্দেশ দিলেন, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি যেন পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকে। জান্নাতের দ্বাররক্ষীকে আদেশ করা হলো, সম্মানিত মেহমান আগমন করবেন, সকল কিছুই নবসাজে সজ্জিত করা হোক। যে পথে মেহমান আগমন করবেন এবং যে সকল এলাকা পরিদর্শন করবেন, সে পথসমূহ এবং এলাকাসমূহ সজ্জিত করা হোক। হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে আদেশ করা হলো, দ্রুতগামী যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনায়ও অধিক দ্রুতগামী বাহন মেহমানের জন্য প্রস্তুত করে যথাস্থানে প্রস্তুত রাখা হোক।

মহামান্য অতিথিকে স্বাগত জানানোর জন্য উর্ধ্ব জগতের সকল কিছু প্রস্তুত হয়ে গেল। যাত্রা পথে জান্নাতি সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করা হলো। সর্বত্র জান্নাতের আনন্দ সমিরণ প্রবাহিত হতে থাকলো। মানুষ যে জগতের স্পর্শ সহ্য করতে সক্ষম সে শক্তি নবী করীম (সাঃ) কে দান করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আঃ) মর্ত্যধামে পবিত্র মক্কায় উপস্থিত হলেন। বুখারী, মুসলিম হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আবুজার (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) যে গৃহে অবস্থান করছিলেন সে গৃহের ওপরের আবরণ উন্মুক্ত করা হলো। জিবরাঈল (আঃ) প্রবেশ করে রাসূল (সাঃ) এর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে তাঁর বুকের ভেতরে পবিত্র জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর বিশ্বাস এবং যাবতীয় জ্ঞান তাঁর ভেতরে প্রবেশ করানো হলো। এরপর নেয়া হলো মাসজিদুল আকসায় এবং সেখান থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিয়ে প্রথম আকাশে এসে দ্বার রক্ষককে বললেন, 'দ্বার উন্মুক্ত করো'।

রক্ষী জানতে চাইলেন, 'কে?' জিবরাঈল (আঃ) নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলো, 'আপনার সাথীর পরিচয় দিন?' উত্তর দেয়া হলো, 'আমার সাথী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'।

এভাবে বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পরিচয় জানার পরে দ্বার উন্মুক্ত করা হলো। এরপর তাঁকে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) প্রথম আকাশে আরোহণ করলেন। সেখানে তিনি একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখলেন, তাঁর দক্ষিণ পাশে একদল মানুষ এবং তিনি তাদেরকে

দেখে হাসেন এবং তাঁর বাম পাশে একদল মানুষ তিনি তাদেরকে দেখে কাঁদেন। রাসূল (সাঃ) কে দেখে তিনি বললেন,'হে মর্যাদাবান সন্তান! সম্মানিত নবী! স্বাগতম!'

নবী করীম (সাঃ) সঙ্গীকে সে ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গী তাঁকে জানালো তিনি হযরত আদম (আঃ)। তাঁর ডানদিকে যাদেরকে দেখলেন তাঁরা জান্নাতি আর বামদিকে যাদেরকে দেখলেন তারা জাহান্নামী। এ কারণে তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন আর বাম দিকে তাকিয়ে কাঁদেন। এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করানো হলো। সেখানেও তাঁর সাথে নবীদের সাক্ষাৎ ঘটলো। এভাবে একটির পরে আরেকটি আকাশ পার হয়ে তিনি ষষ্ঠ আকাশে কতক নবীদের সাক্ষাৎ পেলেন। সকল নবী-রাসূল তাঁকে স্বাগত জানালেন। এরপর আকাশের সকল স্তর অতিক্রম করে জিবরাঈল (আঃ) তাকে আল্লাহর আরশে আজীমের কাছে পৌঁছে দিলেন। মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপহার নিয়ে তিনি নিচের দিকে এলেন।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজসহ ফিরছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনার উম্মতের জন্য কি উপহার দেয়া হলো?' তিনি জানালেন নামাজের কথা। মূসা (আঃ) বললেন, 'আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে যান, আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না'।

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে আবেদন জানালেন, মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে নামাজ কমিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনার উম্মত নামাজের এই সংখ্যাও আদায় করতে পারবে না। আপনি ফিরে গিয়ে আরও কমিয়ে আনুন'। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটলো। শেষে যখন মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট রইলো তখন মহান আল্লাহ্ জানালেন, আমার আদেশের পরিবর্তন হয় না। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দেয়া হবে। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও মূসা (আঃ) পরামর্শ দিলেন কমিয়ে আনার জন্য। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জানালেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালাকে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দেয়ার কথা বলতে আমি ভীষণ লজ্জা অনুভব করছি'।

এবার তাঁকে সুসজ্জিত সিদরাতুল মুনতাহা পরিদর্শন করানো হলো। জান্নাত দেখানো হলো, জান্নাতে মোতির তৈরী প্রাসাদসমূহ দেখলেন এবং সেখানের মাটি ছিল মিশ্‌ক দিয়ে নির্মাণ করা।

একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিরাজের পূর্ণাঙ্গ ঘটনা কোনো একটি হাদীসেও উল্লেখ করা হয়নি। অনেকগুলো হাদীস একত্রিত করলে তারপর সম্পূর্ণ ঘটনা একত্রিত করা যায়। এর কারণ হলো, বর্ণনাকারীদের ভেতরে যিনি ঘটনার

যতটুকু শুনেছেন ততটুকুই বর্ণনা করেছেন। কোনো বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সাঃ) কা'বাঘরের হাতিম এলাকায় ঘুমিয়ে ছিলেন। কুরাইশরা যখন কা'বা মেরামত করেছিল সে সময় তারা অর্থের অভাবে একটি অংশ বাদ রেখে কা'বার পুনঃনির্মাণ করেছিল। ঐ বাদ দেয়া অংশকেই হাতিম বলে। বর্তমানেও সে অংশ রয়েছে। এখানেই তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হযরত উম্মে হানি (রাঃ) এর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন।

হজরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ) কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাঁকে একটি অদ্ভুত দর্শন পশুর ওপরে আরোহণ করালেন। পশুটি ছিল গাধা এবং ঘোড়ার আকৃতির মাঝামাঝি এবং দু'পাখা বিশিষ্ট। যার নাম বর্ণনা করা হয়েছে বুরাক। আরবী বুরাক শব্দ বারকুন শব্দ থেকে এসেছে। এ শব্দের অর্থ হলো, বিদ্যুৎ। এই পশুটির রং ছিল সাদা। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর ইশারায় উক্ত বুরাক মুহূর্তের মধ্যে বাইতুল মাকদিসে এসে উপনীত হলো। সেখানে বিশ্বনবী (সাঃ) অসংখ্য নবী-রাসূল ও ফেরেশতা দেখলেন, তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিনি তাদের সাথে কুশল বিনিময়ের পরে তাঁরা সকলেই নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। ইমামের স্থান ছিল শূন্য, বিশ্বনবীকে সেখানে এগিয়ে দেয়া হলো। এভাবে সকল নবী-রাসূল এবং ফেরেশেতাগণ বিশ্বনবীর নেতৃত্বে নামাজ আদায় করলেন।

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, বাইতুল মাকদিসে নামাজ আদায় করা হয়েছিল মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। উর্ধ্ব জগতে যাবার সময় বাইতুল মাকদিসে তাঁর সামনে দু'টো পানীয় পূর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হলো। একপাত্রে ছিল শরাব অন্যটিতে দুধ। নবী করীম (সাঃ) দুধের পাত্র উঠিয়ে পান করলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! উন্নত চরিত্র আপনার মধ্যে বিদ্যমান। আপনার উম্মতের মধ্যেও এমন হবে। শরাব আপনার জন্য নিষিদ্ধ'।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাঁকে উর্ধ্ব জগতে উঠানো হয়। আকাশের বিভিন্ন স্তরে সম্মানিত নবী-রাসূলদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর তাঁকে উপস্থিত করা হয় সিদরাতুল মুনতাহায়। এখানে পৌঁছার পরে হযরত জিবরাইল (আঃ) তাঁকে বিনীতভাবে অবগত করেন, 'আমাদের জন্যে এই সীমা অতিক্রম করার অনুমতি নেই'।

প্রমাণ হয়ে গেল যেখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) যেতে পারেন না, সেখানে নবী করীম (সাঃ) এর অবাধ পদচারণা। তারপর তিনি বাইতুল মামুরে পৌঁছলেন। এই বাইতুল মামুর হলো কা'বার মৌলিক ভবন। এখান থেকে তাঁকে মহান আল্লাহ নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন। তিনি মহান আল্লাহকে দেখেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা না করাই উত্তম। তাঁর দেখা না দেখার সাথে পৃথিবীর মানুষের জীবনের কোনো সমস্যা জড়িত

নয়। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে কল্পকাহিনী রচনা করা বা তা নিয়ে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, 'কোনো মানব চক্ষু আমাকে দেখতে পারে না'। নবী করীম (সাঃ)ও মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ ছিলেন, তবে তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ সৃষ্টি মহামানব। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা তাঁর জন্যেও প্রযোজ্য।

এরপর জান্নাত- জাহান্নাম এবং মহান আল্লাহর নানা কুদরত তাঁকে পরিদর্শন করানো হলো। সৎ কর্মের কি পুরস্কার এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে কি ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে তা দেখানো হলো। মহান আল্লাহ যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে আহ্বান করেছিলেন তা পূর্ণ হবার পরে তাঁকে পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল তা মহান আল্লাহই অবগত আছেন। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, রাতের কিছু অংশে তা সংঘটিত হয়েছিল। অনেকের কাছে বিষয়টি বোধগম্য নয়, রাতের সামান্য অংশে এতকিছু পরিদর্শন করা কি করে সম্ভব?

নবী করীম (সাঃ) কে মিরাজে নেয়ার সময় যদি পৃথিবীর গতি হরণ করা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সম্ভব। একটি ঘড়িকে যদি রাত বারোটার সময় বন্ধ করে রাত চারটায় পুনরায় চালু করা হয়, তাহলে ঘড়ির কাঁটা ঐ রাত বারোটার স্থান থেকেই ঘুরতে থাকবে, রাত চারটার স্থান থেকে ঘুরবে না। তিনি যদি রাত একটার সময় যাত্রা আরম্ভ করে থাকেন আর সে সময়েই যদি সকল সৃষ্টির গতি মহান আল্লাহ বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তাহলে পৃথিবীর সময় তো স্থির হয়েছিল। সময় সামনের দিকে এগিয়ে যায়নি। তিনি যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন তখন পুনরায় পৃথিবীকে গতিদান করা হয়েছে, স্থির সময় পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই। সে সময়ে কি ঘটেছিল মহান আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন।

আজ থেকে শতকোটি বছর পূর্বে মহাকাশে, সাগরের অতল তলদেশে তথা পৃথিবীর কোথায় কি ঘটেছিল, গবেষণায় তা উদ্ঘাটন হচ্ছে। মিরাজ সংঘটিত হবার কালে পৃথিবীর সময় স্থির হয়ে পড়েছিল কিনা তা হয়তঃ একদিন গবেষণায় জানাও যেতে পারে। চাঁদে কবে কোন্ দিন কোন্ সময় ফাটল ধরেছিল তা যদি বর্তমানে বলে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবীর সময় কোনো এক শুভ মুহূর্তে স্থির হয়েছিল কিনা তা বলে দেয়া অসম্ভবের কিছুই নেই।

নবী করীম (সাঃ) মানুষকে মিরাজের কথা শোনানোর পরে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের নতুন খোরাক পেয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। কতক দুর্বল

মুসলমানের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) শোনার সাথে সাথেই মন্তব্য করেছিলেন,'আল্লাহর রাসূল যদি এ কথা বলে থাকেন যে তাঁর মি'রাজ হয়েছিল, তাহলে তা অবশ্যই সত্য'। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সিদ্দীক-এ আকবার উপাধী দান করেছিলেন।

সে সময় মক্কা থেকে জেরুজালিমে আসার যেসব বাহন ছিল, সেসব বাহন ব্যবহার করেও বাইতুল মাকদিসে আসতে কয়েক দিনের রাস্তা অতিক্রম করতে হতো। রাসূল (সাঃ) ইতোপূর্বে কখনো বাইতুল মাকদিস দেখেননি। তাঁকে যখন বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে এমনভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি বোধহয় সে ভবনটির সামনে দাঁড়িয়ে ভবনটির খুটিনাটি দিক সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। ভবনটির কোথায় কি আছে না আছে সম্পূর্ণ তিনি বলেছিলেন। তিনি যাত্রা পথে ব্যবসায়ীদের কিছু কাফেলাকে দেখেছিলেন, তাদের সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কায় এলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বর্ণনা আর তাদের বলা কথার ভেতরে পার্থক্য সূচিত হলো না। সুতরাং মিরাজের ঘটনা সে সময়েই ছিল প্রমাণীত সত্য। বর্তমানে মিরাজের বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে তা একান্তই উদ্দেশ্যমূলক।

মিরাজ সম্পর্কে যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে এর জন্য দায়ী আমরা মুসলমানরাই। কারণ আমরা গাছের শিকড় না ধরে তার শাখা প্রশাখা ধরে টানা হেঁচ্ড়া করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। কি উদ্দেশ্যে তাঁর মিরাজ হলো, এর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কি, এর শিক্ষা কি, মিরাজ থেকে নবী করীম (সাঃ) মানব জাতির জন্য কি কল্যাণ বহন করে এনেছিলেন, এ সম্পর্কে লেখনিতে বা বক্তৃতায় আলোচনা না করে, মিরাজে তিনি কি কি দেখলেন, কোন্ পথে গেলেন, কার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো এসব গৌণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় সময় অতিবাহিত করা হয়। ফল যা হবার তাই হয়েছে। এসব অলৌকিক বর্ণনা আধুনিক নাস্তিক্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। মিরাজের মূল লক্ষ্যও অধিকাংশ মানুষ জানতে পারেনি। শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য মিরাজ থেকে নবী করীম (সাঃ) মুক্তির কোন্ উপহার বহন করে আনলেন তা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি। বিষয়টি চিন্তাবিদ, গবেষক ও উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

উত্থিত প্রশ্ন ও তার জবাব

হাদীসের গ্রন্থসমূহে নবী করীম (সাঃ) এর মিরাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ২৫ বা ২৬ জনের এক বিরাট সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম মিরাজ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে হযরত আয়িশা (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবু জার (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হুজাইফা (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত মালিক (রাঃ) সহ সাহাবায়ে কেরাম মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে জেরুজালিমের বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে নিদর্শন দেখাবেন।

পবিত্র কুরআনে এর বেশি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। হাদীসে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, গভীর রজনীতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে উঠিয়ে বক্ষ বিদীর্ণ করে বুরাকে সওয়ার করিয়ে মক্কা থেকে মাসজিদুল আক্বসায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি সকল নবী-রাসূলের সাথে নামাজ আদায় করেন। তারপর তাঁকে উর্ধ্ব জগতে নিয়ে যান। মহাকাশের বিভিন্ন স্তরে তাঁর সাথে সম্মানিত নবী-রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর আরো উচ্চতায় তাঁকে আরোহণ করানো হয়। সেখান থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নিদের্শ গ্রহণ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এ সময় ফরজ করা হয়। এরপর তিনি পুনরায় বাইতুল মাকদাসে এসে পরে মক্কায় কা'বাঘরে আসেন।

বিভিন্ন হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, উর্ধ্ব জগতে তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রদর্শন করানো হয়। তিনি জাহান্নামে অপরাধীদের নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে দেখেন। পুরস্কার প্রাপ্তদের জান্নাতে বিভিন্নভাবে ভোগ বিলাসে মগ্ন দেখেন। হাদীস শরীফ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করার পরে ইসলাম বিরোধীগণ তাঁকে বিদ্রুপ করতে থাকে এবং কিছু সংখ্যক দুর্বল মুসলমানের বিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। হাদীসের এই যে বিস্তারিত বর্ণনা, তা পবিত্র কুরআনের বিপরীত নয় বরং কুরআনের বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ হাদীস শরীফের বিস্তারিত বর্ণনা। সুতরাং হাদীসের বর্ণনা অবিশ্বাস করে তা এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই।

আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি, এ বিষয়টি ধ্যান যোগে বা স্বপ্ন যোগে ঘটেনি। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় শারীরিকভাবে মিরাজের ঘটনা ঘটেছে। পবিত্র কুরআনের 'সুব্হান' শব্দের মধ্যেই এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে যদি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর একস্থান থেকে আরেক স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, হাজার হাজার মাইল

ব্যবধানে থেকে অবিকল কণ্ঠে পরস্পরে কথা বলা যায়, মুহূর্তের মধ্যে একস্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করা যায়, তাহলে হাদীসের বর্ণনাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? একটি বিষয় সামনে রেখে নবীদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাসমূহ আলোচনা করতে হবে। বিষয়টি হলো সম্ভব এবং অসম্ভব, এই দু'টো বিষয় সামনে রাখতে হবে।

সম্ভব এবং অসম্ভব- এই শব্দ দু'টো কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ দু'টো শব্দ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে কি এ শব্দ দু'টো প্রযোজ্য? মানুষ যদি স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন উঠায় তাহলে বলতে হয়, সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, শক্তিধর, অসীম ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম যেমন বিশ্বাস করতেন, আরশে আজীম থেকে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ওহীর আগমন যদি অসম্ভব না হয়, তাহলে মিরাজ কি করে অসম্ভব হতে পারে?

এক শ্রেণীর মানুষ প্রশ্ন তোলে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে। তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহর কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কুদরত সসীম নয় অসীম এবং কোথাও সীমাবদ্ধ নয়, নির্দিষ্ট কোনো স্থানে তাঁর ক্ষমতা অবস্থান করে না। কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) কে আরশে আজীমে ডেকে নিয়ে তাঁর সাথে আল্লাহ কথোপকথন করলেন, এ থেকে তো এ কথাই প্রতীয়মান হয় আল্লাহ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছেন। নতুবা নবী করীম (সাঃ) কে আরশে আজীমে ডেকে নেয়া হলো কেনো? তিনি তো যে কোনো স্থান থেকেই নবীর সাথে কথা বলতে পারতেন? দ্বিতীয় যে প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বনবী (সাঃ) কে জাহান্নামের শাস্তি প্রদর্শন করা হলো। বিভিন্ন অপরাধে মানুষ শাস্তি ভোগ করছে তা তিনি দেখে বর্ণনাও করেছেন। সৎ কাজের পুরস্কার হিসাবে জান্নাতে কে কিভাবে ভোগ বিলাসে মগ্ন আছে তা তিনি দেখে বর্ণনাও করেছেন। এখন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হলো না, মানুষের বিচার হলো না, তাঁর পূর্বেই মানুষকে কিভাবে জান্নাতে পুরস্কার দেয়া হলো এবং কিভাবেই বা জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হলো?

এমন প্রশ্নকারীদের চিন্তার দৈন্যতার কারণেই তাঁরা এ ধরনের প্রশ্ন করে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মহান আল্লাহর ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অসীম। পক্ষান্তরে সৃষ্টির সাথে আচরণ করার সময় তিনি স্বীয় কোনো অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে নয়, বরং সৃষ্টির দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে সৃষ্টিকে বিশেষ স্থানে নিতে হয় এবং এটি সেই সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে যখন কথা বলেছেন, সৃষ্টির অক্ষমতার কারণে বিশেষ সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে, যেন তাঁর সৃষ্টি তাঁর সকল কথা শুনতে এবং বুঝতে পারে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি জগতের অনু-পরমাণু বা তার থেকেও ক্ষুদ্র যদি কিছু থেকে থাকে সকল কিছুই দেখার ক্ষমতার অধিকারী। এই দেখার জন্য তাঁকে সময় ক্ষেপণ বা পৃথকভাবে দেখার প্রয়োজন হয় না। সকল সৃষ্টি তিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে একবারেই দেখতে পান। কিন্তু মানুষ এর বিপরীত। মানুষকে কোনো কিছু দেখার জন্য সে স্থানে যেতে হয় বা দূরের কিছু দেখার জন্য কোনো কিছুর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষ একবারে এক দৃষ্টে একশতটি জিনিস দেখতে পারে না। তাকে পৃথকভাবে দেখতে হয়। মানুষের এই অক্ষমতার জন্যই তাঁকে মহান আল্লাহর দরবারে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ কিছু দেখার জন্য কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু মানুষ স্থানের মুখাপেক্ষী। সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জন্য অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তার সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। মানুষের এই দূর্বলতার কারণেই মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহকে নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান করে বান্দাহর সাথে কথা বলেছিলেন।

মাটিতে দাঁড়ানো তিন বছর বয়স্ক শিশুর কপালে স্নেহভরে চুমো দিতে হলে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে অবশ্যই নিচু হয়ে সে শিশুর কপালের কাছে তাঁর মুখ নিয়ে যেতে হবে। নতুবা শিশুর কপালের নাগাল পাওয়া যাবে না। বয়স্ক লোককে নিচু হয়ে শিশুর কপালের কাছে মুখ নিতে হলো, এ পদ্ধতি তাঁর দূর্বলতার কারণে গ্রহণ করতে হলো না, শিশুর দূর্বলতার কারণেই বয়স্ক লোকটিকে বসে বা কুজো হয়ে শিশুর কপালের কাছে নিজের মুখ নিতে হলো। শিশুর প্রতি স্নেহের বশে বয়স্ক ক্ষমতাবান মানুষকে তাঁর ক্ষমতার পরিধি সংকুচিত করে শিশুর কপালের কাছে নিজের মুখ নিতে হলো শিশুর অক্ষমতার কারণে, নিজের অক্ষমতার কারণে নয়।

এবার দ্বিতীয় যে বিষয়টি পুরস্কার এবং শাস্তির বিষয়। এসব বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) কে যা দেখানো হয়েছিল তা প্রকৃত বিষয়ের প্রতীকী রূপমাত্র। এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁরই সৃষ্টি মানুষের কর্মের পরিণতি কি হবে তার প্রতীকী রূপ দেখিয়েছিলেন। জান্নাতে কিভাবে মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার নেয়ামত ভোগ করবে এর প্রতীকী রূপ এবং জাহান্নামেও বাস্তব অবস্থার প্রতীকী রূপ তাঁকে দেখানো হয়েছিল। সুতরাং এ সকল বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। আবারও ঐ পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে, স্রষ্টার ক্ষমতা অসীম। তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। অম্ভব শব্দটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য, স্রষ্টার জন্য নয়।

নবী করীম (সাঃ) এর মিরাজ, মানবতার মুক্তি সনদ

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে পবিত্র মক্কার বুকে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করার প্রায় এক যুগ অতিবাহিত হবার পরে দিকে দিকে তাওহীদের স্রোত নীরবে প্রবাহিত হচ্ছিল। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই সে স্রোত দু'কুল প্লাবিত বন্যার রূপ ধারণ করবে। ইসলাম বিরোধিরা তাওহীদের এই অদম্য স্রোতধারা বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালেও তাওহীদের দুর্দমনীয় স্রোতধারার সম্মুখে তারা বাধার বিন্ধাচল দাঁড় করাতে পারেনি। নানা প্রচেষ্টায় এই স্রোতের কেন্দ্রবিন্দু নবী করীম (সাঃ) কে নিস্তব্ধ নিথর করার তৎপরতা চালিয়েছে।

কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তাওহীদের এই স্রোতধারা আরব ভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল প্লাবিত করেছে। এমন একটি গোত্রের অস্তিত্ব সে সময় ছিল না, যে গোত্রে দু'একজন মানুষ ইসলামী কাফেলার কর্মী ছিলেন না। আরবের আনাচে কানাচে সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। এ আন্দোলনের প্রভাবে প্রতিটি গোত্র ছিলো প্রভাবিত। এক যুগ পূর্বে নবী করীম (সাঃ) মাত্র একজন কর্মী হযরত খাদিজা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে যে কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, আজ সে আন্দোলনের কর্মী প্রত্যেক ঘরে ঘরে।

খোদ মক্কাতেই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একদল মানুষ গড়ে উঠেছিল যারা এ মহান আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যে কোনো বিপদের ঝুকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা নিজের প্রাণ, কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ অকাতরে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সুদূর মদীনায় শক্তিশালী বিরাট দু'টি'গোত্র এই মহান কার্যক্রমের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সে সময় এটা একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, নবী করীম (সাঃ) কে মক্কা থেকে মদীনায় যেতে হবে এবং চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত মুসলিমকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর অবসান ছিল অত্যাসন্ন। পূর্ব গগণে তরুণ তপনের ইশারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাহ্কে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। এ সময়েই তাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হলো সূরা বনী ইসরাঈল। মহান ইসলামী রাষ্ট্রের ১৪ টি মূলনীতি দান করা হলো। শিক্ষাদান পর্যায়ে নৈতিকতা ও সমাজতত্ত্বের এমন বড় বড় কতকগুলো মৌলনীতি উপস্থাপিত করা হলো, যার ওপরে ভিত্তি করে মানব জীবনের যাবতীয় সাংগঠনিক কাঠামো কায়েম করাই নবী করীম (সাঃ)-এর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ এই ১৪টি মূলনীতিকে 'ইসলামের ঘোষণাপত্র' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এই ঘোষণাপত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর পূর্বেই সমগ্র আরববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। মিরাজের উপহার, বিশ্ব মানবতার এই মুক্তি সনদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যে মহান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সামনে রেখে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করে নিচ্ছেন, সে উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এই ১৪টি মূলনীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমগ্র বিশ্বের মানবতার মহাকল্যাণ। এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সমাজ এবং রাষ্ট্রই হবে আকাশের নিচে আর মাটির বুকে একমাত্র আদর্শ রাষ্ট্র।

এই নীতির বাইরে অন্য কোনো নীতি অবলম্বন করা হলেই অশান্তি আর হাহাকার অনিবার্য। মানুষ প্রতি মুহূর্তে যে শান্তির জন্য লালায়িত, সে শান্তি এই মিরাজের উপহারের মধ্যেই নিহিত। মানুষের মুক্তির এটাই একমাত্র সনদপত্র। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে মিরাজের উপহার, মানব জাতির মুক্তির মহাসনদ পেশ করা হয়েছে। আমরা সে ১৪টি দফা এবং তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানে পেশ করবো। উল্লেখ্য এ সকল দফা উক্ত সূরার ২৩ নং আয়াত থেকে ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ–

এক. 'তোমার মালিক ফায়সালা করে দিয়েছেন, একমাত্র তাঁর দাসত্ব ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করো না'। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

প্রথম দফার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কারো পূজা, উপাসনা, বন্দেগী, দাসত্ব তথা গোলামী এবং শর্তহীন আনুগত্য করা যাবে না। একমাত্র তাঁরই আদেশকে আদেশ এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন গ্রহণ ও অনুসরণ করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। অন্য কথায় পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ। নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এই কথাটির ওপরে যে, মহান আল্লাহই হলেন একমাত্র আইনদাতা। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, একমাত্র মহান আল্লাহই হলেন সমগ্র বিশ্বের মালিক এবং শাসক, তাঁর দেয়া আইনই এই পৃথিবী নামক রাষ্ট্রের আইন। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া আইনই সকল ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে, এই আইনই মানব জাতির একমাত্র অনুসরণীয় আইন এবং সকল মানুষ শর্তহীনভাবে তাঁরই বিধান অনুসরণ করবে।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا-

দুই. 'তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, তাদের একজন বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের সাথে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলবে। অনুকম্পায় তুমি তাঁদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার মালিক, তাঁদের প্রতি ঠিক সেভাবেই তুমি দয়া করো, যেমন করে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলো'। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩-২৪)

অর্থাৎ শিশুকালে আমি যেমন অসহায় ছিলাম, আমার সেই অসহায় অবস্থায় আমার মাতা-পিতা আমার প্রতি যেমন মমতাভরে যত্ন নিয়েছেন, তারা আমার প্রতি যত্ন ও মমতা পোষণ না করলে কোনোক্রমেই আমার পক্ষে এই পৃথিবীতে জীবিত থাকা ও আমার পক্ষে বেড়ে ওঠা সম্ভব হতো না। আমার সেই মাতা-পিতা আজ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে, তারা অসহায়, হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রতি করুণা করুন!

দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন-কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা ও পরিবারের ভিত্তি দৃঢ় করবে। কারণ, দেশের আদর্শ নাগরিক সরবরাহ করে আদর্শ পরিবার। পরিবারে যে শিশুর জন্ম হবে সে শিশুকে যদি ইসলামী আদর্শের ধাঁচে গঠন করা হয়, তাহলে সেই শিশুই হয় দেশের আদর্শ নাগরিক। এ কারণে দ্বিতীয় দফাতেই আদর্শ পরিবারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কুরআনের গবেষকগণ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একজন মুসলমানের উপরে যেমন ফরজ মহান আল্লাহর আইন কানুন মেনে চলা তেমনিভাবে ফরজ মাতা-পিতার খেদমত করা। আল্লাহর অধিকারের পরেই মাতা-পিতার অধিকার। মাতা-পিতার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে যেভাবে তাগিদ করেছেন ঠিক একইভাবে তাগিদ করেছেন মাতা-পিতার ব্যাপারে। মাতা-পিতা যখন বয়সের প্রান্তে পৌঁছে যায়

তখন স্বাভাবিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন, আর দূর্বল মানুষ নিজেদেরকে অসহায় বোধ করেন। সে সময় সন্তানকে স্মরণ করতে হবে নিজের শৈশবের কথা।

শিশু বয়সে সে ছিল অসহায়, নড়াচড়া করার ক্ষমতাও ছিল না, ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও বলার ক্ষমতা ছিলনা। মলমূত্র ত্যাগ করে শরীরে মাখামাখি করলেও নিজের ক্ষমতা ছিল না ঐ অবস্থা থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করার। সন্তানকে স্মরণ করতে হবে সে সময় মাতা ব্যতীত তার কোনো উপায় ছিল না। সেই মুহূর্তে পিতা-মাতা অসীম স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে, আন্তরিকতার সাথে অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে তাকে প্রতিপালিত করেছেন। তাঁরা সন্তানের আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন আর কষ্ট দেখলে বিচলিত হয়েছেন।

এসব কারণে সন্তানকে নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করে মাতা-পিতার জন্য আন্ত রিকতার সাথে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, 'রাব্বুল আলামীন! আমার শৈশব কালে তাঁরা যেমন আমাকে অসীম মায়া-মমতা ও ধন-সম্পদ ব্যয় করে প্রতিপালিত করেছেন, তাদের এই বৃদ্ধাবস্থায় তুমি তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ কর'!

মানুষ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। মানুষের মন মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, অল্পতেই মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে। মাতা-পিতার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়। সন্তানকে বুঝতে হবে, বয়সের কারণে মা-বাপ নানা ধরনের অনাকাংখিত কথা-বার্তা বলবে। সুতরাং সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে বয়সের কারণে তাদের রূক্ষ মন-মানসিকতার প্রতি সদা সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখা। এ সময় মা-বাপ যত কথাই বলুন না কেনো, তাদের প্রতিটি কথাই পরম খুশী ও ধৈর্যের সাথে গ্রহন করা, তাদের কথায় বিরক্তি প্রকাশ বা তাদের সাথে ক্রোধভরে কথা না বলা। তাদের সাথে কথাবার্তায় আচার আচরণে, চলা ফেরায় সন্তানকে হতে হবে বিনয়ী এবং কোমল স্বভাবের। তাদের আদেশ সন্তুষ্টির সাথে পালন করতে হবে। তাদের সামনে অনুগত হয়ে থাকতে হবে, বৃদ্ধ বয়সে মাতাপিতা যখন দূর্বল হয়ে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, সে সময় সন্তানকে একজন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাদের সাথে আচরণ করতে হবে। মাতা-পিতার খেদমত করে তাদের প্রতি সন্তান করুণা বা অনুগ্রহ করছে এই ধারণা মনে স্থান দেয়া যাবে না। বরং তাদের খেদমত করে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করতে হবে, সন্তান তার মাতা-পিতার খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে, এ কারণে সে মহান আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করবে।

বৃদ্ধ বয়সে মাতা-পিতা নানা ধরনের অনাকাংখিত, অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর কথা বলতে পারে। এ সময়ে সন্তান মোটেও বিরক্ত হবে না। তাকে স্মরণ করতে হবে তার নিজের শৈশব কালের কথা, সে সময়ে স্বয়ং সে শিশু অবস্থায় নানা ধরনের বিরক্তিকর প্রশ্ন করেছে, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করে তাঁদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, মা-বাপ তার শিশুসুলভ সকল আচরণ ধৈর্যের সাথে, হাসি

মুখে মেনে নিয়েছেন, মমতাসিক্ত কণ্ঠে শিশু সন্তানের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এ সকল কথা স্মরণে রেখে মা-বাপের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। সন্তানকে প্রত্যেক মুহূর্তে মাতা-পিতার মর্যাদার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কেননা বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মান অভিমান, ক্রোধ বৃদ্ধি পায় বা মানসিক ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাপ নিজের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য, নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য নানা কথা বলতে থাকেন। কারণে অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকেন, কোনো বিষয়ে মতামত দিলে তার মতামতই মেনে নেয়ার জন্য অহেতুক চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। সন্তানদের প্রতি তিনি যে অসন্তুষ্ট এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। সন্তানকে তাদের এ সকল অহেতুক আচরণ হাসি মুখে সহ্য করতে হবে। কোনক্রমেই বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। সন্তানকে মনে রাখতে হবে, সেও একদিন মা-বাপের মত বৃদ্ধ হয়ে তার নিজের সন্তানের মুখাপেক্ষী হবে।

মাতা-পিতা সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের সারমর্ম ইসলামী চিন্ত াবিদগণ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবেই উল্লেখ করা হলো। কুরআন- হাদীসের আলোকে নিজের সন্তনের ওপরে মাতা-পিতার দশটি হক বা অধিকার রয়েছে। সে অধিকারগুলো—

১। মাতা-পিতা যদি নিঃস্ব অভাবী হন তাহলে তাদের অভাব দূর করার আন্তরিক চেষ্টা এবং তাদের সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করবে সন্তান।

২। যদি তাদের সেবাযত্নের প্রয়োজন হয় তাহলে সন্তান তাদের সেবাযত্ন করবে।

৩। তাদের যদি বাসস্থান বা পোষাক না থাকে তাহলে সন্তান তাদের বাসস্থান ও পোষাকের ব্যবস্থা করে দিবে।

৪। মাতা-পিতা আহ্বান করার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ সন্তান তাদের সামনে উপস্থিত হবে।

৫। তাঁদের সামনে ভদ্র ও নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলা যাবে না।

৬। যে কোনো কারণই ঘটুক না কেনো তাদের সাথে সামান্যতম বেয়াদবি করা যাবে না।

৭। মাতা-পিতার সাথে একই সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে তাদের সামনে চলা যাবে না, অপ্রয়োজনে তাদের ডানে বামে যাওয়া যাবে না।

৮। সন্তান নিজের জন্য যা পছন্দ-অপছন্দ করবে মা-বাপের জন্যও তাই করবে।

৯। সন্তান মাতা-পিতার জন্য নামাজ আদায় করে দোয়া করবে। যে সকল সন্তান মা-বাপের জন্য দোয়া করে না তাদের জীবনযাত্রা সমস্যা সংকুল হয়। অপরদিকে যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে মাতা-পিতার জন্য দোয়া করলে সমস্যা দূর হয়ে যায়।

১০। মাতা-পিতা আদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ পালন করতে হবে। অবশ্য তাদের আদেশ আল্লাহ- রাসূলের আদেশের বিপরীত হলে সে আদেশ পালন করা যাবে না।

মাতা-পিতা ব্যতীত যেমন কোনো মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে আগমন করা অসম্ভব ঠিক তেমনি অসম্ভব পরকালে মুক্তি অর্জন করা। এ কারণে কোনো মানুষ নিজের মাতা-পিতা হতে সম্পর্কহীন হতে পারে না। পৃথিবীর জীবনে তাদের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম ঠিক তেমনি আখেরাতের জীবনে সফলতা ও মুক্তির জন্যও তাদের গুরুত্ব সীমাহীন। মা-বাপকে খুশী করে এই পৃথিবীর জীবনে যেমন কল্যাণ পাওয়া যাবে তেমনি পরকালেও জান্নাত পাওয়া যাবে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই মাতা-পিতার অধিকার পদদলিত করা যাবে না।

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ-

তিন. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের যথার্থ পাওনা আদায় করে দিবে এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরও তাদের অধিকার বুঝিয়ে দিবে। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৬)

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوْرًا-

চার. অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৬-২৭)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا-

পাঁচ. যদি তাদের থেকে (অভাবী আত্মীয়, অসহায় মানুষ, মুসাফির এবং বিপদগ্রস্ত মানুষ) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ কারণে যে, বর্তমানে তুমি আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া করুণার সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছো, তাহলে তাদেরকে কোমল কণ্ঠে উত্তর দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৮)

এই কয়েকটি দফার মূল উদ্দেশ্যে হলো রাষ্ট্রের নাগরিক তাঁর স্বীয় রোজগার এবং অর্থ-সম্পদ একমাত্র নিজের ভোগ-বিলাসের জন্যই নির্দিষ্ট করে নিবে না। বরং ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফের সাথে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পরে তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অভাবী মানুষদের অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রের সমাজ জীবনে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা, অপরের অভাব উপলব্ধি করা এবং তা দূর করার মানসিকতা জীবন্ত থাকবে। সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তিকে সাহায্য

করবে। ধনী আত্মীয় তাঁর গরীব আত্মীয়কে সাহায্য করবে। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসাফির যেখানেই যাবে, সেখানেই সে নিজেকে অতিথি বৎসল মানুষ কর্তৃক পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। ইসলামী সমাজে মানুষ অধিকার সচেতন হবে। ধনী ব্যক্তি সচেতন হবে তাঁর এ ধন-সম্পদে অভাবী মানুষদের অধিকার রয়েছে।

একজনের সম্পদ বিনষ্ট হতে দেখলে আরেকজন তা রক্ষা করবে। ধনী ব্যক্তি কাউকে কিছু দিলে তাঁর মনে এ ধারণা জাগবে না যে, সে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ করছে। বরং তাঁর মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকবে যে, সে তাঁর অধিকার আদায় করছে। কোনো মানুষের যদি দান করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে মহান আল্লাহর কাছে দান করার ক্ষমতা প্রার্থনা করবে। কোনো অভাবী তাঁর কাছে এলে সে তাঁর কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাইবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এই দফাগুলোর ভিত্তিতেই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ওয়াজিব ও নফল সাদকার বিধানসমূহ কার্যকরী করা হয়। এ সকল দফার ভিত্তিতেই ওয়াকফ, অসিয়ত ও মীরাসের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়। ইয়াতিমের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। প্রত্যেক জনবসতীর ওপর মুসাফিরের নিম্নপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যে, যার ফলে সমাজের সর্বস্তরে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সাহায্য-সহযোগিতা, দানশীলতার মন-মানসিকতা প্রষ্ফুটিত হয়ে ওঠে। এমনকি সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দান করার প্রবণতা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, স্বতস্ফুর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ আদায় করা ছাড়াও আইনের জোরে যে সব নৈতিক অধিকার আদায় ও প্রদান করা যায় না, সে সব অধিকারসমূহ মানুষ উপলব্ধি করে তা আদায় করতে থাকে। এসব দফার ভিত্তিতে নবী করীম (সাঃ) এমনই এক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতা এমন এক স্তরে উপনীত করেছিলেন যে, মানুষ অন্যের অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত মনে শান্তি স্বস্তি অনুভব করতো না।

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا-

ছয়. নিজের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না এবং তা একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না, এমন করলে স্বয়ং তুমি নিন্দিত এবং দুর্বল হয়ে পড়বে। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৯)

গলায় হাত বেঁধে রাখা, এটি রূপক কথামাত্র। এ কথাটি কৃপণতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর হাত খোলা ছেড়ে দেয়ার অর্থ হলো, হিসাব না করে খরচ করা, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে ব্যয় করা। ওপরের দফাগুলোর সাথে এই দফাটি একত্রে পড়লে এটা উপলব্ধি

করা যায় যে, মানুষের মধ্যে এতটা ভারসাম্য থাকতে হবে, তাঁরা কৃপণ হয়ে অর্থ নিজের হাতে কুক্ষিগত না করে, অর্থের আবর্তন বন্ধ করে না দেয়, অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থের সর্বনাশ না ঘটায়, নিজের অর্থশক্তি নিঃশেষ করে না দেয়। মানুষের ভেতরে ভারসাম্যের এমন সঠিক উপলব্ধিবোধ থাকতে হবে যে, মানুষ ব্যয় করার ক্ষেত্রে ব্যয় করবে এবং অপব্যয় করে নিজের অর্থশক্তি ধ্বংস করবে না।

অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো ব্যয়, বিলাসিতা, নোংরা ও অশ্লীল কর্মে ব্যয়, এমন ধরনের খরচ যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের বদলে অর্থ ভ্রান্ত পথে ব্যয় করে, এমন করা মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের সাথে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের শামিল। আর এসব যারা করে তাঁদেরকেই বলা হয়েছে শয়তানের ভাই।

এই দফা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রকৃত বিষয়ও এটাই যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। মদীনার রাষ্ট্রে প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইন প্রয়োগ করে উচ্ছেদ করা হয় এবং তা হারাম বলে ঘোষিত হয়। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে বৃথা অর্থ ক্ষয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

সে সময় সমাজে এমন অনেক ধরনের প্রথা ও রসম রেওয়াজ চালু ছিল যা উদযাপন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। ব্যয়ের এ সকল বাহুল্য পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির ক্ষমতা দেয়া হয়। যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার অভ্যাসকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। মানুষ অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে অর্থের আবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল গ্রহণ করার পাশাপাশি সমাজে এমন সাধারণ জনমত গঠন করা হয়, মানুষকে এমনভাবে শিক্ষিত করা হয় যে, দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য নাগরিক সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যমূলক ব্যয়ের মধ্যে উত্তম রূপেই পার্থক্য করতে সক্ষম হত।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে জনমত গঠন করা হয়েছিল, সে জনমত কৃপণদেরকে অপমানিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদের সম্মানিত করে, অপব্যয়কারীকে নিন্দা করে, দানকারীদের সমাজের উঁচু স্তরে স্থান করে দেয়। মদীনার রাষ্ট্রে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, সে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব বর্তমানেও মুসলিম সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বর্তমানেও পৃথিবীর সকল দেশে মুসলমানরা কৃপণদের ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং অর্থ-সম্পদ

কুক্ষিগতকারীকে ঘৃণার চোখে দেখে। দানশীল ব্যক্তিগণ বর্তমানেও মুসলমানদের দৃষ্টিতে মর্যাদাবান। কৃপণ যারা, তাদের সম্মান বর্তমানেও মুসলমানদের কাছে নেই।

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيْرًا-

সাত. দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দান করবো এবং তোমাদেরকেও। প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে হত্যা করা এক ভয়ংকর অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

সন্তান যাতে পৃথিবীতেই আসতে না পারে এ কারণে প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সে যুগে আজল করা হতো। আজল করার অর্থ হলো,'পুরুষের জনন ইন্দ্রিয় মিলন কালে শুক্র নির্গত হবার মুহূর্তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে বাইরে বের করে শুক্রপাত করা'।

এরূপ করলে সন্তান গর্ভে আসবে না এ ধরনের নিশ্চয়তা ছিলো না। অধিক সন্তানের কারণে অথবা সন্তান প্রয়োজন নেই এ কারণে মানুষ সন্তান জন্ম লাভের সাথে সাথে অথবা কিছুটা বড় হলে তাকে হত্যা করতো। শুধু কন্যা সন্তানকেই হত্যা করা হতো না, পুত্র সন্তানকেও হত্যা করা হত। এ যুগে সন্তান হত্যা করার পদ্ধতি আধুনিক রূপে পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রয়োগ করে সন্তান হত্যা করার বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে সন্তানকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জন্ম নিরোধের যত ধরনের উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবন করা হয়েছে এসবের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সন্তানকে এই পৃথিবীতে আসতে না দেয়া। এ ধরনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য মহাবিপদই ডেকে আনছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ তথা গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, সদ্যপ্রসূত সন্তান হত্যা বা ভ্রূণ হত্যা করা ইসলাম পরিপূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। ডাক্তার যদি স্বাস্থ্যগত বা অন্য কোনো বৈধ কারণে পরামর্শ দেন তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

ঈমানদার ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ইসলাম অন্য কোনো কারণে তথাকথিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ বৈধ করেনি। নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা মানবিক সকল দিক দিয়েই তথাকথিত গর্ভনিরোধ অত্যন্ত অশুভ। যে মাতা-পিতা সন্তান কামনা করে না তারা স্বয়ং সন্তানের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা যে গোটা মানব জাতির শত্রু হয়ে দাঁড়াবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? যে পিতামাতা স্বয়ং নিজের সন্তানের প্রাণের শত্রু হয়, তারা যে সকল মানুষের সাথে শত্রুতা করতে সামান্যতম দ্বিধা করবে না এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়।

এর কারণ, নিজ ঔরসজাত, নিজ গর্ভস্থ অথবা নিজের গর্ভের সন্তানকে স্বয়ং নিজের হাতেই নিঃশেষ করার জন্য সর্বপ্রথম নিজের মধ্যে চরম নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা,

কঠোরতা, নির্মমতা ও নিতান্তই পশুপ্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া আবশ্যক। নতুবা এমন ধরনের কাজ কোনো ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। সমাজের মানুষের এই নিষ্ঠুরতা ও সন্তানের প্রতি কঠোর মনোভাব সংক্রমিত হয়ে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে এবং সমগ্র জাতির প্রতিই তা অবশেষে আরোপিত হয়।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্য, গোটা প্রাণী জগতে এমন দৃষ্টান্ত নেই, তারা নিজের সন্তানকে নিজেরাই ধ্বংস করে। ভাবতে বড় আশ্চর্য লাগে, যে কাজ পশু করে না সেই নোংরা কাজ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ কিভাবে করে? আজল প্রথা প্রাচীন আরব সমাজে প্রচলিত থাকলেও ইসলামী জীবন দর্শন তা মোটেও সমর্থন করেনি।

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً-

আট. ব্যভিচারের ধারে কাছেও অগ্রসর হয়ো না, তা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম এবং খুবই নোংরা পথ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩২)

এই দফাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের আদিম রিপুর মুখে লাগাম দেয়া হয়েছে এই দফার মাধ্যমে। 'যিনা ব্যভিচার করো না' এ কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে যিনা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। এই আদেশ যেমন ব্যক্তির জন্য তেমনি সমগ্র জাতির জন্য। একজন মানুষ ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে শুধু এমন নয়, বরং ব্যভিচারের দিকে একজন মানুষকে টেনে নিয়ে যায় ব্যভিচারের এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ থেকেও সে দূরে অবস্থান করবে। যিনা ব্যভিচার নারী ধর্ষণ এসব গর্হিত কাজ এমনিতেই ঘটে না। এসব কাজের পেছনে কিছু কার্যকারণ সক্রীয় থাকে। এই দফার প্রেক্ষিতে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যভিচার, ব্যভিচারের উদ্যোগ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস সাধন এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধারা রাষ্ট্রের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এই ধারা বলে ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়।

ব্যভিচার বাস্তবায়নে উদ্যোগকারী অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষদের জন্য পর্দার আইন জারী করা হয়। নগ্নতা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার ও প্রসার কঠোর হাতে দমন করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এসবের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়। ব্যভিচারের নিকট আত্মীয় মদ, নাচ, যৌন উদ্দীপনামূলক গান ও ছবির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। সমাজের সর্বস্তর থেকে অপবিত্রতা বিদায় করা হয়। অর্থাৎ যেসকল কাজ মানুষকে ব্যভিচারের দিকে আকর্ষণ করে, সেসব কাজের শিকড় সমূলে উৎপাটিত করা হয়। সেই সাথে বিয়ে সম্পর্কিত সহজ আইন প্রণয়ন করা হয়। নারীর

অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনে এমন আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা হয় যে, মানুষ নিজের উদ্যেগেই ব্যভিচার সংঘটিত হবার কারণসমূহ উৎখাত করে।

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط إِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا-

নয়. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি (সে চাইলে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেনো হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায় যে ব্যক্তি মযলুম) তাকেই সাহায্য করা হবে । (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৩)

'প্রাণদণ্ডের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার একমাত্র আদালতের' কোনো ব্যক্তি বা সমাজ এ শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ভয়ঙ্কর অপরাধ যে কোনো ব্যক্তিই সংঘটিত করুক না কেনো, হত্যা করার মত শাস্তি প্রয়োগ আদালতের হাতে। 'সত্যের ভিত্তি ব্যতীত' বলতে প্রমাণ বুঝানো হয়েছে। অপরাধীর অপরাধ প্রমাণ হলে ইসলাম যে সকল অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া যায়। এই দফায় আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ মানুষ নিজেকে নিজের মনিব এবং নিজের মালিকানাকে সে নিজেই শেষ করে দিতে পারে, এমন ধারণা করা মারাত্মক ভুল। সে নিজেকে শেষ বা নিজেকে অন্যায় কাজে নিয়োজিত করবে এ অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। এই পৃথিবী একটি পরীক্ষা কেন্দ্র, এখানে পরীক্ষা যে ধরনেরই হোকনা কেনো, এ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সে পালিয়ে যাবে এ অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّه ص

দশ. ইয়াতিমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পন্থায় যা (ইয়াতিমের জন্যে) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হয় তা বাদে- যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (ইয়াতিম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৪)

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً-

এগার. প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কিয়ামতের দিন এ) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে (তোমাদের) জিজ্ঞাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৪)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذَالِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

বার. কোনো কিছু পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওযন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামের (দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল -৩৫)

ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাতের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে অক্ষম সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, এই রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা নেই বা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী করীম (সা:) ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'যার কোনো অভিভাবক নেই আমিই তাঁর অভিভাবক'। অসহায়, ইয়াতিম এবং অক্ষম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন। প্রশাসনিকভাবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

চুক্তি অনুসরণ করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র দৃঢ়তা অবলম্বন করবে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র কোনক্রমেই অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে না। মানুষ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ওয়াদা পালন করবে। এ পর্যায়ে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে মহান আল্লাহর দরবারে এ সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে। দেশের ভেতরে ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক যেন প্রতারিত না হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যেন কোনো ধরনের বৈষম্য বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়, ইসলামী রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যের অধিকারে যেন কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে, রাষ্ট্র সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যেন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই উভয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কারো মনে যেন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় সে প্রতারিত হবে।

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً-

তের. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কিয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)

অনুমান বা কল্পনা নির্ভরতা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রশ্রয় পাবে না। অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার বা দোষারোপ করা যাবে না। সন্দেহের বশে কোনো মানুষকে গ্রেফতার করা

যাবে না। তদন্তে দোষী প্রমাণীত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। এই দফায় এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে নিছক সন্দেহ বা অনুমানের পেছনে না চলে জ্ঞানের পেছনে চলবে। নৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুমান নির্ভর কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

সঠিক জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য ক্ষতিকর মতামতের সৃষ্টি হয়, ইসলাম এসব ক্ষতি থেকে মানুষের চিন্তা এবং কর্ম মুক্ত রাখতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অমূলক ধারণা বা কল্পনা থেকে দূরে অবস্থান করবে। কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুধারণা বা সন্দেহের কারণে অনুসন্ধান ব্যতীত দোষারোপ করবে না। ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এই দফার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হয়, শুধুমাত্র অনুমান বা সন্দেহের বশে কোনো ব্যক্তি বা দেশ বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সন্দেহের বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার বা মারধর করা বা আটক রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ।

অমুসলিমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার তদন্ত ব্যতীত কোনো কথা সমাজে ছড়িয়ে দেয়া যাবে না। প্রমাণ ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যেসব তথাকথিত জ্ঞান শুধুমাত্র সন্দেহ অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রিতাময় ধারণা ও কল্পনানির্ভর, এসবের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যাবে না। পাঠ্য তালিকায় এসব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে, অনুমান করে বা কল্পনা করে কোনো কিছুর অনুসরণ করা যাবে না। যা অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কুরআন- হাদীসের জ্ঞানের ভিত্তিতে যা প্রমাণীত তাই অনুসরণ করতে হবে।

وَلاَ تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا ج إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً-

চৌদ্দ. আল্লাহর যমীনে (কখনোই) দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহঙ্কার করোনা কেনো), তুমি কখনো এ যমীন বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৭)

এমনভাবে চলাফেরা করবে না, এমন ভাষায় এবং ভঙ্গিতে কথা বলবে না যে, তোমার চলাফেরায় বা কথায় অহংকার প্রকাশ পায়। তোমার সকল আচরণে অহংকার বা দম্ভের চিহ্নমাত্র যেন না থাকে। সমাজের কোনো ব্যক্তি না এমন আচরণ করবে না রাষ্ট্র এমন আচরণ করবে। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ

করবে না। তাদের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করবে। তাদের সাথে ওয়াদা বা চুক্তি করলে তা পালন করবে। এই ১৪ দফার ভিত্তিতে মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে রাষ্ট্র ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেছিল। হযরত উমার (রা:) এর শাসনামলে প্রায় অর্ধপৃথিবী তাঁর শাসনাধীনে ছিল। নবী করীম (সা:) যে সময় রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন এবং তাঁর পরে চার খলীফা, হযরত হুসাইন (রা:) এর স্বল্প মেয়াদী শাসনকাল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:) এর শাসনকাল, হযরত উমার ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহ:) এর শাসনকাল, এ সকল শাসকদের শাসনামলে রাষ্ট্রের কোনো মন্ত্রী বা চাপরাসির আচরণেও সামান্য অহংকার দেখা যায়নি।

রাষ্ট্রের শাসকবর্গ, গভর্নর এবং সেনাপতিদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের বিন্দুমাত্র অংশ ছিল না। সে সময় যুদ্ধের ময়দানে একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্রেককারী কথা বলতো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর মুখ থেকে দম্ভ অহংকারের একটি শব্দও নির্গত হত না। তাদের চলাফেরা, ওঠাবসা, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলার বাহন, বাসস্থান, আচার আচরণ কোনো কিছুর ভেতর থেকেই তাদের বিপুল ক্ষমতার সামান্যতম লক্ষণ প্রকাশ পেত না। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে কোনো দেশে প্রবেশ করলে, তাদের হাঁটা বা কথার মধ্যে অহংকারের চিহ্ন থাকতো না। তাঁরা যে একটি দুঃসাহসী বাহিনী এ কথা প্রতিপক্ষের দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সামান্যতম প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তাদের আচরণ, ব্যবহার ছিল কোমল, মমতার মাধুরী মিশ্রিত এবং সৃষ্টিসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তাঁরা ছিলেন সজাগ-সতর্ক, অতি ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকার প্রতি নিজের অজান্তেও যেনো রূঢ় আচরণ না করেন এ ব্যাপারে তাঁরা সজাগ থাকতেন।

নবী করীম (সা:) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা

নবী করীম (সা:) কে আল্লাহ তা'য়ালা যেসকল মু'জিযা দান করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তার মধ্যে পবিত্র কুরআন মাজীদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। তিনি প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর আনীত কুরআন অবিকৃতই রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতই থাকবে ইনশাআল্লাহ। কুরআন নামক যে শ্রেষ্ঠ মু'জিযা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে দান করেছিলেন, সে কুরআন পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে। কুরআনের পূর্বে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিলো, যেসব ভাষায় তা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো সেসব ভাষার অস্তিত্বও পৃথিবী থেকে বহু পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ধর্মগ্রন্থের নামে যেসব কিতাব বর্তমান পৃথিবীতে প্রদর্শন করা হয়, এসব গ্রন্থের মধ্যে স্রষ্টার অবতীর্ণ করা শব্দ কোন্‌টি তা নির্ণয় করতে সক্ষম এমন কেউ ঐসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও নেই। বিকৃতি ঘটিয়ে এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, প্রকৃত সত্য জানার কোনো উপায়ই নেই।

পৃথিবীতে এমন একটি গ্রন্থেরও অস্তিত্ব নেই, যে গ্রন্থের দাড়ি, কমা, সেমিক্লোন মুখস্থ করে রাখা যেতে পারে। ব্যতিক্রম শুধু পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে। কুরআন নামক সুবিশাল এ অলৌকিক গ্রন্থটি যাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হলো, তাঁকে বলা হয়েছিলো, 'আপনি শুধু শুনুন, আপনার হৃদয়পটে এ কুরআন অঙ্কিত করার দায়িত্ব আমার এবং এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার'।

নবী করীম (সা:) শুধু কুরআন শুনলেন, মাত্র একবার শোনার সাথে সাথেই তিনি তা হুবহু তিলাওয়াত করার মর্যাদা অর্জন করলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে তা তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মু'জিযা মহাগ্রন্থ আল কুরআন। তাঁর মুখ থেকে সমকালীন নারী-পুরুষ যাঁরাই এ কুরআন শুনলেন তাঁরাই এ গ্রন্থটি হুবহু মুখস্থ করলেন।

সেই ধারাবাহিকতায় বিগত চৌদ্দশত বছরব্যাপী অসংখ্য অগণিত নারী-পুরুষ এ কুরআন স্মৃতিতে ধারণ করেছে, বর্তমানেও করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবে। এ কুরআন এক জীবন্ত মু'জিযা এবং এই বিস্ময়কর কিতাব যাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, তিনিই এ কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন−

لاَ تُحْصَى عَجَائِبُه وَلاَ تُبْلَى غَرَائِبُه فِيْهِ مُصَابِيْحُ الْهُدَى وَمَنَارِ الْحِكْمَةِ−

'এ কুরআন কখনো পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কুরআন হচ্ছে হিদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার যেনো কূল-কিনারাহীন এক অগাধ জলধী। এর ভেতরে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অনায়ত্ব অসংখ্য দিক-দিগন্ত। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন'।

এটা সেই বিস্ময়কর কিতাব যা নিজেই নিজের ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই কুরআন নামক জীবন্ত মু'জিযা থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা অবশ্যই সত্য সঠিক এবং বক্রতামুক্ত। নবী করীম (সা:) বলেছেন−

مَنْ قَلَ بِه صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِه أُجِرَ وَ مَنْ حَكَمَ بِه عَدَلَ وَ مَنْ دَعَاإِلَيْه هُدِىَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيْمَ−

'এই কুরআন থেকে যে লোক কথা বলে সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে সে ন্যায় বিচার

করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সে সহজ সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কুরআন তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং এ কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ع

আমি এ কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ক্বামার-৪০)

মানুষের জন্য এ কুরআন হৃদয়ঙ্গম করা সহজ করা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও তার বর্ণনাশৈলী, বাচনভঙ্গী পৃথিবীতে প্রচলিত আরবী ভাষার অনুরূপ নয়। এই কিতাবের ভাষা প্রচলিত আরবী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কুরআনের ভাষা নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই কুরআনের ভাষা যেমন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এসেছে তেমনি কুরআন যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবও এসেছে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকেই। পবিত্র কুরআন তার বিবৃত বিষয়, তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত বলে স্পষ্ট ঘোষণাই শুধু দেয়নি, এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَاعَلىٰعَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه ص

আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন। (সূরা বাকারা-২৩)

কোনো কোনো মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন, সে চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের আঙ্গিক বৈশিষ্ট, সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্য এবং উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যাপারে প্রযোজ্য। এ ধরনের ভুল ধারণা যারা পোষণ করে, তারা মূলতঃ কুরআনের গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় আবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কুরআনের মর্যাদা এসব ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কুরআনের শব্দ, ভাষা এবং সাহিত্যিক মান, বর্ণনাশৈলীর দিক দিয়ে যে অনবদ্য, অতুলনীয় এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যে কারণে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'মানবীয় চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এ ধরনের কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়' সে কারণগুলো পবিত্র কুরআনে আলোচিত বিষয়াদি, কুরআন কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। কুরআন যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, যে শিক্ষা মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার মানব সভ্যতার সামনে উন্মোচন

করেছে, যে আদর্শের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তা কোনো মানবীয় মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারে না।

শুধু মানব জাতিই নয়, জ্বিন ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে কিয়ামত পর্যন্তও যদি চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে, তবুও আল্লাহ তা'য়ালার নাযিলকৃত কুরআনের অনুরূপ কোনো কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا-

আপনি বলে দিন, মানব ও জ্বিন জাতি সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে কুরআনের মতো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তবুও তারা আনতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সহযোগী হয়ে গেলেও। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৮)

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এমন একটি বিস্ময়কর কিতাব দান করলেন, যে কিতাবের সামনে পৃথিবীর সকল কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা চিরদিনের জন্য ম্লান হয়ে গেল। আল্লাহ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করলেন–

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِه مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ط

অথবা এরা কি এ কথা বলে, (মুহাম্মাদ স. নামের ব্যক্তি) কুরআন নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি তাই মনে করো তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ মাত্র দশটি স্বরচিত সূরা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা হূদ- ১৩)

فَلْيَأْ تُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِه إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ-

তারা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এ কুরআনের মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসুক না! (সূরা আত্ তুর- ৩৪)

মানুষ যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী তা প্রয়োগ করে এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ ও বিস্ময়কর একটি কিতাব প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ধরনের একটি কালাম রচনা করা মানুষের শক্তি ও প্রতিভা সীমার বাইরের বিষয়। আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো দেশের জনগণের জন্যই শুধু নয়– নয় তা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং অনন্তকালব্যাপী। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস সেই অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও কেউ

প্রদর্শন করেনি, অনাগত কালেও কেউ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ যে শব্দ, অক্ষর, বর্ণনাশৈলী, রচনারীতি, বাচনভঙ্গী সহযোগে যখন অবতীর্ণ করেছিলেন, বর্তমান কাল পর্যন্তও তার একটি অক্ষরও পরিত্যক্ত হয়নি, কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

এই পৃথিবীতে আল কুরআনই হলো একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির সমুদয় চিন্তা-চেতনা, চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এক কথায় মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর যে ব্যাপকতর, সুগভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, এ ধরনের সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রথম পর্যায়ে এই কুরআন পৃথিবীর একটি জাতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জীবন ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। তারপর কুরআনের রঙে রঙিন সেই জাতি গোটা পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সকল জাতির ওপরে কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

এই কুরআন পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে, তা পৃথিবীর কোনো একটি আদর্শ বা গ্রন্থের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। কুরআন শুধুমাত্র সজ্জিত অক্ষরের আকারে কাগজের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং মানুষের বাস্তব কর্মের পৃথিবীতে এর এক একটি শব্দ, প্রভাব, শিক্ষা, চিন্তাদর্শ ও মতবাদের অনুপম রূপায়নে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে এক দৃষ্টান্তহীন কর্ম সম্পাদন করেছে এবং এখনো করছে। কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তার যে প্রভাব ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে। সে যুগে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যে পাঠক পাঠ করতো, কুরআন তার পাঠককে সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতো, কুরআনের এই অতুলনীয় মু'জিযা, প্রভাব ও ক্ষমতা বর্তমানেও যেমন বিদ্যমান রয়েছে, অনাদিকাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকবে।

সে যুগে যারা কুরআনের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তারা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, মুহাম্মাদ (সা:) কুরআনের যে বাণী প্রচার করছেন তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এ কারণে তারা সাধারণ মানুষকে এই কুরআন শোনা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ইসলাম নির্মূলের অগণিত পরিকল্পনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে, রাসূল যখনই কোনো সমাবেশে মানুষকে কুরআনের কথা শোনাবেন, তখনই সেখানে শোরগোল সৃষ্টি করে কুরআন শোনানোর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। নানাভাবে কুরআনের মাহফিলে বাধা সৃষ্টি করা, যেন মানুষের ওপরে এই কুরআন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। ইসলাম বিরোধী শক্তি এই অস্ত্র শুধু সে যুগেই প্রয়োগ করেনি, বর্তমানেও তারা তাদের সেই পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ করে কুরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। ঘৃণ্য

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কুরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। সে যুগে ইসলাম বিরোধিরা সাধারণ মানুষকে কুরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলতো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ–

এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। (হা-মীম আস্ সেজদা-২৬)

কুরআন কী অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী বিস্ময়কর কিতাব, এই কিতাবের দাওয়াত যিনি দিচ্ছেন তিনি কেমন অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর এই ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা ইসলাম বিরোধী নেতারা স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো, এ ধরনের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির মুখ থেকে এমন চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে এই দৃষ্টান্তহীন কালাম যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কুরআনের আন্দোলনের প্রতি দুর্বল হবেই হবে। অতএব যে প্রকারেই হোক, কুরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু যারা এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো, স্বয়ং তারাই নিজেদের অজান্তে আল্লাহর কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তো।

পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর মু'জিযা

হযরত উমার (রাঃ) এর মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষও কুরআনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কুরআনের প্রভাব তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর রাসূলকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে একদিন রাতে তিনি রাসূলকে অনুসরণ করছিলেন। গভীর রাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার নবী কা'বাঘরে নামাজে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি অন্ধকারে অদূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র জবান মুবারক থেকে কুরআন শুনছিলেন। কুরআনের বাণীর অপূর্ব সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে এ কথার উদয় হলো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্ভবত উচ্চমানের কবি হয়েছেন'। তিনি মনে মনে এ কথাগুলো বলছিলেন আর সাথে সাথে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত করালেন–

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ لا

এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়, যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো। (সূরা হাক্কাহ্-৪১)

বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তব্ধ অনড় হয়ে গেলেন হযরত উমার (রা:)। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আল্লাহর রাসূল (সা:) এর দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তিনি মনে মনে বললেন, 'এই লোকটি শুধু উচ্চমানের কবিই হননি, সেই সাথে একজন উচ্চ পর্যায়ের গণৎকারও হয়েছেন। তা না হলে তিনি আমার মনের কথা জানলেন কেমন করে?' তাঁর মনে এ কথা উদিত হবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মুখ থেকে সূরা হাক্কাহ্-এর পরবর্তী আয়াত উচ্চারিত করালেন–

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط

এটা কোনো গণক বা জ্যোতিষির কথাও নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিবেক বিবেচনা করে চলো। (সূরা হাক্কাহ্-৪২)

হযরত উমার (রা:) বিস্ময়ের দ্বিতীয় ধাক্কা খেলেন। তিনি মনে মনে যা বলছেন, আর তার জবাব রাসূল দিচ্ছেন। বিষয়টি তাঁকে সত্য গ্রহণের পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। তাঁর মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো, 'মুহাম্মাদ (সা:) যা পাঠ করছেন, তা কবির বা গণৎকারের কথা নয়। তাহলে তিনি এ কালাম কোথা থেকে লাভ করলেন?' তাঁর মনের এ প্রশ্নের উত্তরও রাসূল (সা:) এর মুখ থেকে শোনা গেল। তিনি সূরা হাক্কাহ্ এর পরবর্তী আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ–

(মূলত) এ কিতাব বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রাসুলের ওপর) অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা আল-হাক্কাহ্-৪৩)

অবশেষে কুরআন এমন প্রভাব হযরত উমার (রা:)-এর ওপর বিস্তার করেছিলো যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কুরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা না থাকায় মূল কিতাব বিকৃত হয়েছিল। পক্ষান্তরে কুরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম (সা:) তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ জন্য কুরআনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো অবকাশ নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে প্রচার মাধ্যমে কোনো একজন কুরআন তিলাওয়াত করছে, যদি সে কোথাও সামান্য একটু ভুল করে তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে শ্রবণরত হাফেজে কুরআন তা শোনার সাথে সাথে বুঝতে পারবে তিলাওয়াতকারী অমুক স্থানে ভুল উচ্চারণ করেছে। পরক্ষণেই সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাফেজে কুরআনগণ সেই তিলাওয়াতকারীকে জানিয়ে দেবে, অমুক আয়াতে সে ভুল উচ্চারণ করেছে বা তিলাওয়াতের সময় অমুক শব্দ বাদ পড়েছে। এভাবে পবিত্র কুরআন অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকেই তাঁর কিতাব পাঠ করার একটি নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। সে নিয়মটি হলো, কুরআন যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় এই কিতাব তিলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে, যে কোনো ভাষার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরআনের অবিকৃত আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় তা তিলাওয়াত করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এই সুযোগ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেয়া হতো, তাহলে এ কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সুযোগ থাকতো। যে কোনো ধরনের বিকৃতি থেকে হেফাজত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحَافِظُوْنَ-

আমিই উপদেশ (সম্বলিত কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। (সূরা হিজর-৯)

আল্লাহর প্রতি ঈমান রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত

নবী-রাসূলদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন বা উদাসীন থেকে মহান আল্লাহর প্রতি যদি কোনো মানুষ ঈমান আনে তাহলে তার সে ঈমানের সামান্যতম মূল্যও নেই। নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান না এনে বা তাঁর আনুগত্য না করে কোনো মানুষের পক্ষে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষকে যে সীমিত জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করে মানুষের পক্ষে জানা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, তারা কিভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব করবে। আর ঠিক এ কারণেই মহান মালিক আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং এটা তাঁদেরই দায়িত্ব যে, মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে কোনো মানুষ যদি অস্বীকার করে, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে বা তাদেরকে সহযোগিতা না করে তাহলে সে মানুষের পক্ষে আল্লাহর গোলাম হওয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন–

يَا بَنِىْ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِىْ لا فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

হে আদম সন্তানরা, যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন কোনো রাসূল আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে, তখন যারা (সে অনুযায়ী) আমাকে ভয় করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নিবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা আল আ'রাফ-৩৫)

সকল ব্যাপারে মানুষ যদি নবী-রাসূলের মুখাপেক্ষী না হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে সে মানুষ নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করলেও তা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। না বুঝে বা যুক্তিহীনভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার অবকাশ ইসলাম দেয়নি, প্রেরিত নবী-রাসূলের নাম পরবর্তী অংশে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে এবং প্রেরিত নবী-রাসূলকে স্বীকৃতি দিয়েই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা নাম্‌লে উল্লেখ করা হয়েছে, সাবার রাণী ইসলামী জীবন বিধান পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করার পর তিনি যখন মুসলমান হবেন তখন তিনি এভাবে ঘোষণা করলেন–

رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

হে আমার মালিক, আমি এতদিন আমার নিজের ওপর জুলুম করে এসেছি, আজ আমি আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর ঈমান আনলাম। (সূরা নামল-৪৪)

তৎকালীন নবী হযরত সুলাইমান (আ:) কে অস্বীকার করে সাবার রাণী যদি মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনতেন তাহলে তার সে ঈমান গ্রহণ করা হতো না। ফিরআউনের যাদুকররা যখন অনুভব করলো, হযরত মূসা (আ:) মহান আল্লাহর নবী-রাসূল এবং তিনি যে পথের দিকে আহ্বান করছেন সেটিই একমাত্র সত্য পথ। তখনি তাঁরা ঈমান আনলো এবং ঘোষণা দিলো এভাবে–

قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ لا رَبِّ مُوْسى وَهَارُوْنَ–

তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারুনের মালিক। (সূরা আল আ'রাফ-১২১-১২২)

সুতরাং নবী-রাসূলের আনুগত্য না করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার অবকাশ নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বশর্ত হলো নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। মানুষ মহান আল্লাহর বিধানের সম্মুখে নিজেকে সোপর্দ করে দিয়ে 'মুসলিম' হয়েছে, এ কথার সাক্ষীও দিবেন নবী-রাসূলগণ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ–

যেনো তোমাদের রাসূল তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। (সূরা হজ্জ-৭৮)

কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতকে দলে দলে বিভক্ত করে তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণ করার সময় প্রত্যেক উম্মতের নবী-রাসূলকে সাক্ষী করা হবে। নবী-রাসূলগণ

সাক্ষী দিবেন তাদের উম্মত তাদের প্রতি ঈমান এনে তাদের আনীত বিধান অনুসরণ করেছিলো কিনা। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে–

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ط

যখন নবী-রাসূলদের সকলকে নির্ধারিত সময়ে (এক জায়গায়) একত্রিত করা হবে। (সূরা মুরসালাত-১১)

وَجِاىْءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ–

নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে উপস্থিত করা হবে, তাদের সবার সাথে ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (সূরা যুমার-৬৯)

নবী-রাসূলের আনীত বিধান মানুষ অনুসরণ করেছে কিনা এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন স্বয়ং নবী আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً لا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاًط

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসাবে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফিরআউনের কাছেও আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৫)

নবী-রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে মহান আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেয়া আর মানুষের দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ–

(হে নবী) আপনি (এদের) বলে দিন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো আল্লাহর রাসূলের (হ্যাঁ), তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আল্লাহর দ্বীন পৌঁছানোর যে দায়িত্ব তার ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে তোমরা দায়ী, যদি তোমরা তার কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে, রাসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহর কথাগুলো) ঠিক ঠিক মতো পৌঁছে দেয়া। (সূরা আন্ নূর-৫৪)

মানুষ রাসূলের আনুগত্য করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা এ ব্যাপারে জবাবদীহী করতে হবে, রাসূলের আনুগত্য না করলে কারো পক্ষে শেষ বিচারের দিনে সফল হওয়া বা মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولآئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ–

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম। (সূরা আন্ নূর-৫২)

শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'য়ালা বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ج

যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে আপনার অনুবর্তন করবে আপনি তার প্রতি স্নেহের আচরণ করুন, আবার যদি কেউ আপনার সাথে নাফরমানী করে তাহলে আপনি তাকে বলে দিন, তোমরা যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি কিন্তু মোটেও দায়ী নই। (সূরা আশ্ শুআরা-২১৫-২১৬)

মুমিন হবার পূর্ব শর্তই হলো নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্য করা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ–

আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আনফাল-১)

নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য থেকে মুহূর্তকালের জন্যেও মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত এ ধরনের কিছু দিকে রাসূলের আনুগত্য করা হলো আর জীবনের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও অন্যান্য দিকে অন্য করো আনুগত্য করা হবে, এ ধরনের সুযোগ ইসলামে নেই। প্রত্যেক মুহূর্তে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র নবী করীম (সাঃ) এরই আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালা ও রাসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, বিশেষ করে যখন তোমরা সব কিছু শুনতেই পাচ্ছো। (সূরা আনফাল-২০)

পবিত্র কুরআনে যেখানেই মহান আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সাথে সাথেই রাসূলেরও আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্য না করে নিজেরা পরস্পরে মতপার্থক্য ও নানা দল উপদলে বিভক্ত হবার

পরিণতি হলো বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরা সবথেকে বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ–

তোমরা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। (সূরা আনফাল-৪৬)

মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং মুমিন হবার অনিবার্য দাবী হলো নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্য করা। মুখে আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য থেকে বিরত থাকার অর্থ নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ–

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রাসূলের, (বিদ্রোহ করে) কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিফলে যেতে দিয়ো না। (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)

নবী করীম (সাঃ) যা কিছু আদেশ করেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেন তা অবশ্যই পালন করা ঈমানের মূল ভিত্তি আর এ বিষয়টি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

আল্লাহর রাসূল তোমাদের যা কিছু অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِه ج وَإِن تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيْمٌ–

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে ঈমান আনো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-১৭৯)

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه–

(খাঁটি ঈমানদার তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে। (সূরা আন্ নূর-৬২)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে যে সকল আয়াতে তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন পাশাপাশি নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিও ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالنُّوْرِ الَّذِىْ أَنزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ–

অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালা, তাঁর রাসূল এবং আমি যে আলো (কুরআন) তোমাদের দিয়েছি তার ওপর ঈমান আনো, তোমরা যা কিছুই করো না কেনো আল্লাহ্ তা'য়ালা তা ভালো করেই জানেন। (সূরা তাগাবুন-৮)

পবিত্র কুরআনের এ ধরনের বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনাও বাধ্যতামূলক এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রশ্নেও রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা মহান আল্লাহ্ এতটাই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য করার অর্থই হচ্ছে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। আর তাঁর নাফরমানী করার অর্থই হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার নাফরমানী করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَ عَنْ ابِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَطَاعَنِىْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهُ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهِ–

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্ তা'য়ালারই আনুগত্য করলো (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি আমার সাথে নাফরমানী করলো সে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথেই নাফরমানী করলো। (বুখারী, মুসলিম)

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে অথচ নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য করে না, তাদেরকে পবিত্র কুরআন কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ ج فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ–

(হে রাসূল) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলো, এ আহ্বান সত্ত্বেও তারা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (আপনি জেনে রাখুন) আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাফিরদের পছন্দ করেন না। (সূরা আলে ইমরান-৩২)

মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পূর্ব শর্ত এবং নিজের গোনাহ মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার পূর্ব শর্তও নবী করীম (সা:) এর প্রতি নি:শর্ত আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মেনে চলো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

নবী করীম (সা:) এর আনুগত্য পরিহারকারী মুমিন নয়

মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস ও নবী করীম (সা:) এর প্রতি বিশ্বাস মুখে ঘোষণা করার পর কোনো ব্যক্তি যদি নবী করীম (সা:) এর আনুগত্য না করে তাহলে সে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবী করলেও মহান আল্লাহর কুরআনের ভাষায় সে ব্যক্তি মুসলিম নয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) কে যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, সে মর্যাদার সাথে কোনো ব্যক্তির মুসলিম থাকা বা না থাকার বিষয়টিও জড়িত। তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করে তাঁর আনুগত্য যে ব্যক্তি করবে, সে ব্যক্তিকেই পবিত্র কুরআন মুসলিম হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে না তথা তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে না, সে ব্যক্তি মুসলিম নয়। যে ব্যক্তি নবী করীম (সা:) এর আনুগত্য করে সে প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَّنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا–

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (তাঁর আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর আমি আপনাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি। (সূরা আন্ নিসা-৮০)

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও সৃষ্টিসমূহের যিনি মালিক, তিনি বলছেন 'আমার রাসূলের আনুগত্য করার অর্থই হলো আমার আনুগত্য করা'। নবী করীম (সা:) সম্পর্কে মহান আল্লাহ

তা'য়ালার বলা অন্যান্য সকল কথা একদিকে রেখে শুধুমাত্র উল্লেখিত আয়াতের কথাগুলোর প্রতি স্থুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মহান নবীকে মর্যাদার কোন্ সোপানে উপনীত করেছেন। রাব্বুল আলামীন তাঁকে সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমনই অতুলনীয় মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর আনুগত্য করার বিষয়টিকে তিনি নিজের আনুগত্য করার সাথে একাকার করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি বিদ্রোহ করার অর্থ মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করা বলে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দিয়েছেন।

নবী করীম (সাঃ) নবুয়্যাত লাভ করার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানব জাতিকে যে সিদ্ধান্তসমূহ দান করেছেন তা নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে অনুসরণ করা মানব জাতির জন্যে অবশ্যকর্তব্য। সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মর্যাদাগত কারণে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে একবার যে কোনো বিষয়ে যে রায় ঘোষিত হয়েছে, তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার ন্যূনতম অধিকারও কোনো মানুষকে দেয়া হয়নি। তিনি যা কিছু আদেশ নিষেধ করেছেন এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকারও কোনো মানুষকে দেয়া হয়নি। অকুণ্ঠ চিত্তে নিঃশর্তভাবে সন্তুষ্টির সাথে মেনে নিতে হবে। নিরুপায় হয়ে অসন্তুষ্টির সাথে কেউ যদি নবী করীম (সাঃ) এর কোনো আদেশ নিষেধ অনুসরণ করে বা মেনে নেয় তাহলে তার ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অতুলনীয় মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন–

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

(হে নবী) না, আমি আপনার মালিকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় আপনাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নিবে, অতপর আপনি যা ফয়সালা করবেন সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং আপনার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে। (সূরা আন্ নিসা-৬৫)

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজের শপথ করে ঘোষণা করেছেন, কোনো মানুষের পক্ষে ঈমানদার হওয়া তথা মুসলিম হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, যতক্ষণ সে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এর পেশ করা জীবন বিধান মেনে না নিবে। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া না নেয়ার ওপর মানুষের

মুসলিম হওয়া তথা ঈমান নির্ভর করে। নবী করীম (সা:) মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে যা কিছু প্রয়োজন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করেছেন। মুসলিম দাবীদার কোনো নারী-পুরুষকে সামান্যতম অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে আল্লাহর রাসূলের দেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করবে বা মেনে না নেয়ার লক্ষ্যে কোনো কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করবে। কেউ যদি এমন করে তাহলে বুঝতে হবে, নবী করীম (সা:) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, সে ব্যক্তি তাঁর উক্ত মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো না।

কোনো মানুষ যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, ভূমি ও রাজস্বনীতি, বিচারনীতি, সমরনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি, বিবাহনীতিসহ যাবতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে নবী করীম (সা:) এর পেশকৃত নীতিমালা পরিহার করে অন্য কারো নীতিমালা অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবী করীম (সা:) এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং সেই ব্যক্তিকে আল্লামা-মাওলানা, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ নামে খ্যাত লোকজনও যদি 'পরহেজগার মুসলিম' বলে ঘোষণা দেয়, তবুও সে ব্যক্তি মুসলিম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَن يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا–

যখন আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর এ অধিকার নেই যে, তারা সে ব্যাপারে নিজেদের এখতিয়ার প্রয়োগ করবে, যে কেউই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে নি:সন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। (সূরা আল আহযাব-৩৬)

যদিও উল্লেখিত আয়াত হযরত যয়নব ও হযরত যায়েদ (রা:)-এর বিয়ে উপলক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু আয়াতে বর্ণিত বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম নর-নারীর জন্যেই প্রযোজ্য। মুসলিম হওয়ার অর্থ বা মুসলিম হিসাবে দাবী করার মর্মার্থই হলো, জীবনের সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, স্বাধীনতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, রুচি-অভ্যাসসহ সকল কিছু মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:) এর সিদ্ধান্তের অধীন করে দেয়া।

নিজের জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সূচনা করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের বৃহত্তর পরিসরে সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যের মাথানত করে দিতে হবে

কেবলমাত্র নবী করীম (সা:) এর আনীত বিধানের সম্মুখে। মসজিদে বা নামাজে কিছু সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম হওয়া আর রাজনৈতিক ময়দানে বা পার্লামেন্টে জীবিত বা মৃত নেতার গোলামী করা, এ দু'টো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী বিষয়। সকল ক্ষেত্রে গোলামীর মস্তক অবনত থাকতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর সম্মুখে এবং নবী করীম (সা:) কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

যে ব্যক্তি মুসলমান হিসাবে পৃথিবীতে জীবন যাপন ও আখিরাতের ময়দানে মুসলিম হিসাবে মহান মালিক আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে চায়, তাকে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিতেই হবে। মত প্রকাশ বা বাক স্বাধীনতার নামে যারা দম্ভ অহঙ্কারের চূড়ায় অবস্থান করতে চায়, মুসলিম হিসাবে দাবী করার তাদের কোনো অধিকার নেই বরং তারা স্বঘোষিত মুনাফিক।

নবী করীম (সা:) এর প্রতি শত্রুদের অভিযোগ, জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা!

পৃথিবীতে প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি সমকালীন লোকদের মধ্যে যারা বিরোধিতা করেছে তারা আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত হিদায়াতকারীদের প্রতি নানা ধরনের কল্পিত অভিযোগ আরোপ করার বৃথা চেষ্টা করেছে। শুধু কল্পিত বিশেষণই আরোপ করেনি, নবী-রাসূলদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করার ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে যে মানুষগুলোকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্বাচিত করে প্রেরণ করতেন, তাঁদের প্রতি মানুষ যে বর্বর আচরণ করতো সে কারণে আল্লাহ তা'য়ালা আফসোস করে বলেছেন–

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ع مَا يَأْتِيْهِم مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ كَانُوْا بِه يَسْتَهْزِؤُوْنَ–

বড়োই আফসোস (এমন সব) বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রাসূলও আসেনি, যাদের তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেনি! (সূরা ইয়াছিন-৩০)

নবী করীম (সা:) এর পূর্বে যে সকল নবী-রাসূলদের প্রতি সমকালীন লোকজন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপসহ নানা ধরনের কল্পিত অভিযোগ আরোপ করতো, এসবের জবাব স্বয়ং উক্ত নবী-রাসূলগণই দিতেন। হযরত নূহ (আ:)-এর প্রতি তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন অভিযোগ করলো–

قَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِه إِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ–

তার জাতির নেতারা বললো (হে নূহ), আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় (নিমজ্জিত) রয়েছো। (সূরা আল আ'রাফ-৬০)

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহ (আ:) কে এক পথহারা জাতির কাছে প্রেরণ করলেন সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে, আর সেই জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন নিজেদের নেতৃত্ব হারানোর আতঙ্কে হযরত নূহ (আ:) এর প্রতিই অভিযোগ করলো যে, 'তুমি নিজেই ভুল পথে রয়েছে এবং জাতিকেও ভুল পথের দিকেই ডাকছো'।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত নূহ (আ:) কে প্রেরণ করলেন কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রেরিত নবীর শত্রুদের আরোপিত অভিযোগের জবাব দিলেন না, জবাব দিলেন স্বয়ং সেই নবী। জবাবে হযরত নূহ (আ:) জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বললেন–

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ–

সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার মধ্যে কোনোই পথভ্রষ্টতা নেই, আমি তো হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে (আসা) একজন রাসূল। (সূরা আ'রাফ-৬১)

হযরত হূদ (আ:) কে আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরণ করলেন চরম ক্ষতির দিকে ধাবমান এক জাতির কাছে। তিনি সেই জাতিকে মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সীমাহীন প্রচেষ্টা শুরু করলেন। জাতির নেতৃবৃন্দ নিজেদের নেতৃত্বের আসন টলটলায়মান হতে দেখে আল্লাহর নবী হযরত হূদ (আ:) এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করলো–

قَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن قَوْمِه إِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ–

তার জাতির নেতৃবৃন্দ, যারা (তাকে) অস্বীকার করেছে, তারা বললো, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত আছো এবং আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন। (সূরা আল আ'রাফ-৬৬)

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন হযরত হূদ (আ:) এ অভিযোগের জবাব কিভাবে দিয়েছিলেন–

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ–

সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা জড়িত নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে (আগত) একজন রাসূল। (সূরা আল আ'রাফ-৬৭)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে প্রমাণ হয় যে, তাদের প্রতি সমকালীন লোকজন যে সকল অভিযোগ আরোপ করেছেন এবং তাদের ব্যাপারে কল্পিত যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছে তার জবাব নবী-রাসূলগণ স্বয়ং দিয়েছেন। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন বিধায় সমকালীন বিরোধিগণ তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি যেসকল ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং যেসব কল্পিত বিশেষণে বিশেষিত করার অপচেষ্টা করেছে, এসব কিছুর জবাব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করতো যে, এ লোকটি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের এ অপবাদের জবাব নবী করীম (সাঃ) দিবেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করলেন না। স্বয়ং তিনি এভাবে জবাব দিলেন–

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ط

তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভ্রষ্টও হয়নি। (সূরা আন নাজম-২)

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিপক্ষগণ নবী করীম (সাঃ)-কে গণবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে তাঁকে সর্বসাধারণের কাছে উন্মাদ হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করে প্রচার করেছে, 'মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মস্তিষ্কে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, তিনি সুস্থ নন বরং পাগল হয়ে গিয়েছেন'। শত্রুদের এসব কল্পনাপ্রসূত অভিযোগের জবাব স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা শপথের মাধ্যমে দিয়েছেন–

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ لا مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ–

শপথ (লেখার মাধ্যম) কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার, আপনার মালিকের (অসীম) দয়ায় আপনি পাগল নন। (সূরা কালাম-১-২)

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে নবী করীম (সাঃ) যাদের মাঝে নিজের শৈশব, কৈশর, তারুণ্য ও যৌবন অতিক্রম করে চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন, তারাই তো তাঁকে ভালোভাবে চিনেছে এ মানুষটি কেমন। চিনেছে বলেই তারা তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে উপাধি দিয়েছে 'আল আমীন বা বিশ্বাসী'। নবী করীম (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের ঢেউ যখন তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থে আঘাত হানলো, তখন তারাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে পাগল হিসাবে আখ্যায়িত করার লক্ষ্যে প্রচার শুরু করলো। তিনি পাগল নন অথবা সকলের তুলনায় সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এ কথা তারাই ভালো জানতো, যারা তাঁর প্রতি এ ঘৃণ্য অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা করছে। তারা অপবাদ দিয়েছে–

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ط

তারা বলে, ওহে- যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে– তুমি অবশ্যই একজন উন্মাদ ব্যক্তি। (সূরা হিজর-৬)

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা অভিযোগকারীদের লক্ষ্য করে জবাব দিলেন–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ج

তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়। (সূরা তাকবীর-২২)

দুশমনরা সাধারণ মানুষকে পবিত্র কুরআন থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে প্রচার করেছে, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী বলে যা দাবী করছেন তা মোটেও সত্য নয়, বরং এসব তাঁর নিজের রচনা করা কথা। শত্রুদের এসব অপবাদের জবাব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা এভাবে দিয়েছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ط إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحى لا

সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে না, বরং তা হচ্ছে ওহী যা (তার কাছে) পাঠানো হয়। (সূরা আন নাজম-৩-৪)

দুশমনদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছে, মুহাম্মাদ (সা:) যে সকল কথা কুরআন বলে প্রচার করছে তা আল্লাহ্ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেননি, বরং শয়তান এসব কথা তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছে। শত্রুদের এসব ভিত্তিহীন কথার জবাব আল্লাহ্ তা'য়ালা দিয়েছেন–

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ لا

এটা অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়। (সূরা তাকবীর-২৫)

শত্রুপক্ষ প্রশ্ন তুলেছে, 'মুহাম্মাদ (সা:) একজন শ্রেষ্ঠ কবি অথবা তিনি উচ্চপর্যায়ের একজন গণক বা জ্যোতিষী'। তাদের এসব প্রশ্নের জবাব নবী করীম (সা:) দিতে গিয়ে সামান্যতম কষ্টানুভব করবেন আল্লাহ্ তা'য়ালা তা বরদাস্ত করেননি। তিনি স্বয়ং জবাব দিলেন–

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ لا وَمَا لاَ تُبْصِرُوْنَ لا إِنَّه لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ج لا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرط قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ لا وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করে বলছি, (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও না, নি:সন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রাসূলের (আনীত) বাণী, এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো, এটা কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কথাও নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিবেক-বিবেচনা করে চলো; (মূলত) এ কিতাব বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রাসূলের ওপর) অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা আল হাক্কাহ্ ৩৮-৪৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের বিরোধিগণ জনসাধারণকে বুঝাতো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন পথহারা কবি এবং এমন একজন পথভ্রষ্ট কবিয়ালের কথায় কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যাদেরকে নিজের উপাস্য দেবতা হিসাবে পূজা দিয়ে আসছি, তাদেরকে কি আমরা ত্যাগ করতে পারি?' তাদের এসব উদ্ভট কথার জবাব আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে দিয়েছেন–

وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ط بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ–

এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের মাবুদদের (আনুগত্য) ছেড়ে দিবো? (অথচ আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং তিনি এসেছেন সত্য (দ্বীন) নিয়ে এবং তিনি (আগের) নবীদের সত্যতাও স্বীকার করছেন। (সূরা আছ ছাফ্‌ফাত-৩৬-৩৭)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিরোধিদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাবে বলেছেন–

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَ مَجْنُوْنٍ–

অতএব (হে নবী, মানুষদের) আপনি এ দিনের কথা স্মরণ করাতে থাকুন, আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহে আপনি কোনো গণক নন, আবার আপনি কোনো পাগলও নন (আপনি হচ্ছেন তাঁর বাণী বহনকারী একজন রাসূল মাত্র)। (সূরা আত তুর-২৯)

নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার সাথে কাব্য রচনা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এ বিষয়টি মানুষের কাছে স্পষ্ট তুলে ধরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করলেন–

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَه ط إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْآنٌ مُّبِيْنٌ–

(তোমরা এও জেনে রেখো,) আমি এ (রাসূল)-কে কাব্য (রচনা) শেখাইনি এবং এটা তার (নবী মর্যাদার) পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (আর তার আনীত গ্রন্থ) তা হচ্ছে একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াছিন-৬৯)

নবী-রাসূলদের অস্বীকারকারীগণ তাদেরই অনুরূপ আরেকজন মানুষকে নবী-রাসূল হিসাবে দাবী করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো। তাদের ধারণা ছিলো, নবী-রাসূলগণ হবেন মানুষ প্রজাতির বাইরের কেউ এবং নিতান্তই যদি সে মানুষ হয় তাহলে তো তাঁর সাথে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফিরিশতা পাঠাবেন এবং তিনি নবী-রাসূলকে সাধারণ মানুষের কাছে এভাবে পরিচয় করিয়ে দিবেন যে, 'তিনি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। যদি তাঁর

অনুসরণ না করো তাহলে তোমাদের ওপর আযাব নিপতিত হবে'। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা প্রশ্ন তুলতো, 'এ আবার কেমন নবী-রাসূল যে, তিনি আমাদের মতোই মানুষ এবং আমাদের মধ্যে যে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট রয়েছে একজন নবীর মধ্যেও তা রয়েছে'।

নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্কে যখন অজ্ঞ লোকজন এমন প্রশ্ন তুললো, 'এ আবার কেমন (ধরনের) রাসূল যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে। কেনো তাঁর সাথে কোনো ফিরিশতা নাযিল করা হলো না যে, তার সাথে (আযাবের) সতর্ককারী হয়ে থাকবে!' অস্বীকারকারীদের এসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِيْ الاَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط أَتَصْبِرُوْنَ ج وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ع

(হে নবী) আপনার পূর্বে আমি আরো যতো রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার করতো, (অন্য মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে যেতো (আসল কথা হচ্ছে) মানুষদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজনের জন্য পরীক্ষার (উপকরণ) বানিয়েছি; (এ পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার মালিক (কিন্তু তোমাদের) সবকিছুই দেখছেন। (সূরা আল ফুরকান-২০)

বিশ্বনবীর মর্যাদাগত কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর জীবনের শপথ করেছেন

নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে প্রেরিত কোনো নবী-রাসূল এবং তাঁরা যে এলাকায় বসবাস করতেন সেই এলাকার নাম উল্লেখ পূর্বক অথবা উক্ত নবী-রাসূলদের জীবনের শপথ আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে কোথাও সন্ধান করে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এতই উচ্চ করেছেন যে, স্বয়ং আরশে আযীমের মালিক- সমগ্র সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের জীবনের শপথ করেছেন–

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ–

(আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে নবী,) আপনার জীবনের শপথ (করে বলছি, সেদিন) এরা নিদারুণ এক নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো (আল্লাহর গযবের কোনো কথাই এরা বিশ্বাস করলো না)। (সূরা হিজর-৭২)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মর্যাদাগত কারণে শুধু নবী করীম (সা:)-এর জীবনের শপথই করেননি, তাঁর মহান নবী যে নগরীতে জন্ম গ্রহণ করলেন, যে স্থান তাঁর শৈশব, কৈশর, তারুণ্য ও যৌবনের চারণভূমি সেই পবিত্র মক্কা নগীরও শপথ করেছেন–

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ لا وَأَنْتَ حِلٌّم بِهٰذَا الْبَلَدِ لا

আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর, এ নগরীতে আপনি (সম্পূর্ণ) স্বাধীন। (সূরা বালাদ-১-২)

পবিত্র মক্কা নগরী সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এখানে সকল প্রাণী নিরাপত্তা লাভসহ স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআনের গবেষকগণ বলেছেন, 'নবী করীম (সা:) মক্কা নগরীতে প্রবাসী কোনো ব্যক্তি নন, তিনি ভিন্ন কোনো এলাকা থেকে এসেও এখানে বসতি স্থাপন করেননি। তিনি এই নগরীতেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর শৈশব, কৈশর ও যৌবনের চারণভূমি এই নগরী। এখানেই তিনি নবুয়্যাত লাভ করেছেন এবং তিনি এখানে অবস্থান করছেন। এসব কারণে এই নগরীর মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে'।

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বালাদের উক্ত আয়াতে বলছেন, 'এটা আপনার আপন এলাকা, আপনার পবিত্র জন্মভূমি। যেখানে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যে কোনো স্থানে গমন ও বিচরণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। অথচ এই নগরীর পরিবেশ আপনার জন্যে এক শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলেছে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী। আপনার প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমি- আপনার চারণভূমিকে আপনারই জন্যে কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছে মিথ্যার অন্ধ পুজারীরা। যে নগরীর প্রত্যেক ধূলিকণা আপনার জন্যে প্রশান্তি দায়ক, সেই নগরীর প্রতি ধূলিকণাকে আপনার জন্যে শাণিত অস্ত্রের রূপ দেয়া হয়েছে'।

যেখানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি একটি প্রাণীকেও নিরাপত্তা দিচ্ছে সত্যের শত্রুরা, পরম আপনজনের হত্যাকারীকেও যে এলাকায় নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। সেই পবিত্র এলাকায় আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সা:) এর এবং তাঁর কোনো অনুসারীর নিরাপত্তা নেই। সেই মহাপবিত্র এলাকায় বিশ্বনবী (সা:) এর পুত পবিত্র দেহের রক্ত ঝরানো বৈধ করা হয়েছে। হালাল করা হয়েছে তাঁদের রক্ত, যারা মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্। পবিত্র হারাম শরীফে আল্লাহর রাসূল মহান আল্লাহকে সিজ্দা দিচ্ছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়েছেন, এই অবস্থায় তাঁর মাথার ওপরে উটের পচা দুর্গন্ধযুক্ত নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

তাঁর পবিত্র কন্ঠনালীতে কাপড় পেঁচিয়ে দু'দিক থেকে এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছে, আল্লাহর রাসূলের শ্বাস বন্ধ হয়ে তাঁর চোখ মোবারক কোঠর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ মুসলমানদেরকে এই পবিত্র স্থানে রক্তাক্ত

করা হয়েছে। যে কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ এবং চরম শত্রুর জন্যেও যে এলাকায় বৈধ অবৈধের সীমা অনুসরণ করা হয়েছে, সেই সীমা অনুসরণ করা হয় নি শুধু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে।

তাঁর অপরাধ (!) একটিই, তিনি মানুষকে মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। মানুষকে শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছেন। তাঁর অনুগত লোকদের অপরাধ (!) তাঁরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করতে রাজী হয়নি। এদের একমাত্র অপরাধ হলো, এরা মহা প্রশংসিত মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। এই অপরাধেই মক্কার জাহিল লোকগুলো তাদের সহায়-সম্পদ, দেহের রক্ত ও প্রাণ পবিত্র এলাকায় বৈধ করে নিয়েছে। মক্কার লোকগুলোও যেমন কা'বা এলাকায় ক্ষুদ্র একটি মশাকে হত্যা করাও অপরাধ মনে করতো, কিন্তু সেই একই এলাকায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করা অপরাধ মনে করতো না। অর্থাৎ এদের কাছে ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর প্রাণের যে মূল্য ও মর্যাদা ছিল, একজন মুসলমানের প্রাণের সে মূল্য ছিল না।

বর্তমানে অমুসলিম শক্তির কাছেও মুসলমানদের প্রাণের কোনো মূল্য নেই। বনের হিংস্র প্রাণীর মূল্য তাদের কাছে অনেক বেশি এবং এসব প্রাণী সংরক্ষণের জন্যে তারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। হিংস্র পশুর চারণভূমি গ্রীষ্মের মৌসুমে প্রায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের কাছ থেকে শোষণকৃত অর্থ ব্যয় করে ঐসব এলাকায় জলাধার নির্মাণ করে দিচ্ছে, যেন কোনো পশু পানি সঙ্কটে না পড়ে। বাঘ, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, শুকর থেকে শুরু করে সামান্য একটি টিকটিকির মতো প্রাণীকেও তারা আধুনিক চিকিৎসা উপকরণে সজ্জিত ক্লিনিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলে।

একবার আটলান্টিক মহাসাগরে বেশ কয়েকটি তিমি বরফে আট্‌কা পড়লো। ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ তড়িঘড়ি করে সেখানে 'আইস কাটার' বরফ কাটা জাহাজ প্রেরণ করে তিমিগুলো উদ্ধার করে সাগরে ছেড়ে দিল। এভাবে বরফে আট্‌কা পড়া তিমিকে উদ্ধার করে এবং এসব দৃশ্য প্রচার মাধ্যমে বার বার প্রচার করে তারা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে থাকে, প্রাণীর প্রতি তারা কতটা দরদী।

দরদ নেই শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে। সে যুগের মক্কার জাহিলদের অনুকরণে আধুনিক জাহিলরাও মুসলমানদের প্রাণের কোনো মূল্য দিচ্ছে না। এক আল্লাহ তা'য়ালাকে তারা বিশ্বাস করে, কুরআনকে তারা মহান আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে, শুধুমাত্র এই অপরাধে (!) মুসলিম নারীদের ইজ্জত-আব্রু হালাল করে নেয়া হয়েছে। মুসলিম শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবকদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে। বন্দী

মুসলমানদেরকে পেছনের দিকে হাত দু'টো বেঁধে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। গর্ভবতী মুসলিম নারীর পেট চিরে গর্ভের শিশুকেও হত্যা করা হচ্ছে। মাতা-পিতার শান্তির কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে পাথরে আছ্‌ড়ে হত্যা করা হচ্ছে। সামান্য একটি পিঁপ্‌ড়ার যে মূল্য রয়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে অমুসলিমদের কাছে মুসলমানের সেই মূল্য নেই। বর্তমান জাহিলদের পূর্বসূরী আরব জাহিলদের চরিত্রে যে গুণ ও বৈশিষ্ট ছিল, সেই একই গুণ ও বৈশিষ্ট বহন করছে আধুনিক জাহিলরা। আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বিধানের শত্রুদের চারিত্রিক মান, গুণ ও বৈশিষ্ট প্রত্যেক যুগে একই রকম ছিল, এদের চরিত্র অপরিবর্তনীয়।

ইসলামের দুশমনরা নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদাক্ষুণ্ণকর কর্মকাণ্ড করছে আর মুসলিম নামধারী অগণিত জনগোষ্ঠী নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন–

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً–

যাতে করে তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর (সর্বোতভাবে) ঈমান আনো, (দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসাবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'য়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো! (সূরা আল ফাতাহ্‌-৯)

ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলদের সাথে বিদ্রোহ করার অপরাধে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেসব এলাকায় বিদ্রোহী জাতির ওপর আযাব অবতীর্ণ করে জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। মক্কা নগরীর ইসলাম বিরোধিদের ওপর আযাব অবতীর্ণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করেননি শুধু মাত্র নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার খাতিরে। যে পবিত্র নগরীতে তাঁর প্রিয় হাবীব এবং সবথেকে বেশি মর্যাদাবান নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই নগরীর ওপর তিনি আযাব অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ–

আল্লাহ তা'য়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দিবেন, অথচ আপনি (এখনো) তাদের মধ্যে (বর্তমান্) রয়েছেন; আর আল্লাহ তা'য়ালা এমনও নন যে, কোনো (জাতির) মানুষদের তিনি শাস্তি দিবেন, অথচ তারা (কিছু লোক) তখনও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। (সূরা আনফাল-৩৩)

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি প্রাণাধিক ভালোবাসা- ঈমানের অপরিহার্য দাবী

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নবী করীম (সাঃ) কে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সৃষ্টিসমূহের মধ্যে তাঁর যে অতুলনীয় মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, এসব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, একজন মুসলিম যদি পূর্ণ মুমিন হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্যই নবী করীম (সাঃ) কে নিজ পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্তুতি, ধন-সম্পদ এমন কি নিজ প্রাণের তুলনায় অধিক ভালোবাসতে হবে। তাঁর প্রতি নিখাদ এবং সর্বাধিক ভালোবাসা না থাকলে কোনো মুসলিমের পক্ষে মুমিনের পূর্ণ স্তরে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে –

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَّالِدِه وَ وَلَدِه وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান- সন্তুতি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِه-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাংখিত মানের মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে। (শরহে সুন্নাহ্- মিশকাত)

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার অর্থ এটা নয় যে শুধুমাত্র কিছু সময় তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা। মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, রবিউল মাসের আগমনে রং বেরংয়ের ফেস্টুন বানিয়ে বিশাল মিছিল করা, তাঁর জীবনী আলোচনার উদ্দেশ্যে মাহফিলের আয়োজন ইত্যাদি করে নবী করীম (সাঃ) এর ভালোবাসার হক আদায় হয়ে যাবে।

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সাঃ) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, তিনি ফিরিশতা ও মানুষকে তাঁর রাসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক এবং তাঁর নাম শোনামাত্র দরূদ পাঠ না করলে গোনাহ্গার হতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা

পোষণকারী মুসলমানদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী দেখা যায়। একটি শ্রেণী নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায় এভাবে, তিনি পাগড়ী, টুপি ও লম্বা জামা ব্যবহার করেছেন, এরাও তাই করে। তিনি নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ আদায় করেছেন, এরাও তাই করে। তিনি বিশেষ বিশেষ খাদ্য পছন্দ করেছেন, এরাও তাই পছন্দ করে। তিনি নফল নামাজ আদায় করেছেন, তাসবীহ-তাহলীল পাঠসহ কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, এরাও তাই করে। এই শ্রেণীর মধ্যে কেউ কেউ রাসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে রবিউল মাসের আগমনে তাঁর জীবনী আলোচনা, মিলাদ মাহফিল, নানা রংয়ের ফেস্টুন বানিয়ে মিছিল এবং রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে নানা ধরনের আবৃত্তি ও গান বা হামদ-নাতের আয়োজনও করে।

আরেকটি শ্রেণীকে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা রাসূল (সাঃ) কে ভালোবেসে কেউ কেউ দাড়ি রাখে, লম্বা জামাও ব্যবহার এবং নামাজ আদায় করে সেই সাথে নামাজের শিক্ষা সাহাবায়ে কেরামের মতো সকল স্তরে বাস্তবায়নের চেষ্টাও করে। এরাও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করার লক্ষ্যে আন্দোলন করে। এরাও হজ্জ আদায় করে এবং হজ্জের শিক্ষানুসারে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এরাও রাসূল (সাঃ) এর জীবনী পর্যালোচনার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যে আন্দোলন- সংগ্রাম করে। এরাও কুরআন তিলাওয়াত করে সেই সাথে কুরআন বুঝার চেষ্টা করে এবং কুরআনের নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করে, হাসিমুখে জেল-জুলুম বরণ করে এবং প্রয়োজনে প্রাণও দেয়। এরাও দরূদ পড়ে, হামদ-নাত আবৃত্তি করে এবং রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি কেউ আঘাত করলে রাসূলের প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসার কারণে বারুদের মতোই জ্বলে ওঠে।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী মুসলিমদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর লোকদের ভালোবাসা কি সমপর্যায়ের? অথবা এই দুই শ্রেণীর ভালোবাসার মূল্যমান কি এক? রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে যেমন একদিকে রয়েছে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, জেল-জুলুম সহ্য করা ও নিজ প্রাণ দেয়ার ঝুঁকি। অপরদিকে রয়েছে ঝুঁকিহীন ভালোবাসা। শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তসবীহ-তাহলীল, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত আদায়, টুপি ও লম্বা জামা ব্যবহার, মিলাদ ও রবিউল আউয়াল মাসে মিছিলের আয়োজন করে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে কোনো ঝুঁকি নেই।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা কেমন ছিলো তা জানা থাকলে বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে এই দু'টি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর ভালোবাসা

প্রকৃত ভালোবাসা এবং সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসার কোটি ভাগের কিছু অংশ হলেও কোন্ শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা জানা যাবে।

সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে আল্লাহর রাসূল (সা:) বর্তমান ছিলেন এবং তাঁদের সম্মুখেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল (সা:) কুরআনের শিক্ষানীতি অনুসারে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁরা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করেছেন এবং বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। সেই সাথে তাঁরা নবী করীম (সা:) ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাস্তবায়ন করেছেন। কুরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা অকাতরে কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূলের মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু দেখলে গর্জে উঠেছেন এবং দুশমনদের সাথে মুকাবেলা করতে গিয়ে তাঁরা পরিবার পরিজনসহ অকল্পনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত হাসিমুখে দান করেছেন। রাসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ হলো, তিনি মহান আল্লাহর নিকট থেকে যে আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, সেই আদর্শ সর্বাত্মক অনুসরণ করা এবং তা সমাজ ও দেশে বাস্তবায়ন করার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ–

(হে নবী,) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসো তাহলে আমার কথা মেনে চলো, (এভাবে আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহ তা'য়ালাও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন; আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আলে ইমরাণ-৩১)

নবী করীম (সা:) কে ভালোবাসার অর্থই হলো জীবনের সকল দিকে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা, এখানে সহজ ও কঠিন দিক বলে কিছুই নেই এবং আংশিক অনুসরণেরও সুযোগ নেই। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে রাসূল (সা:) এর জীবনের সকল দিকই অনুসরণ করতে হবে। যারা সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণে সহজ দিক বা আংশিক তথা ঝুঁকিমুক্ত অনুসরণ করবে অথবা করবে না, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন দেখুন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ–

(হে রাসূল) আপনি (আরো) বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ তা'য়ালা ও (তাঁর) রাসূলের কথা মেনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (আপনি

জেনে রাখুন), আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাফিরদের পছন্দ করেন না। (সূরা আলে ইমরান-৩২)

নবী করীম (সা:) কে একজন মানুষ যখন নিজ প্রাণেরও অধিক ভালোবাসতে সক্ষম হয় তখনই কেবল সেই মানুষের পক্ষে রাসূলের আদর্শের জন্যে নিজের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করা সম্ভব হতে পারে। জেল-জুলুম অত্যাচার সহ্য করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিজের প্রাণও কুরবান করতে পারে। একবার নবী করীম (সা:) এর সাথে কথোপকথনকালে হযরত উমার (রা:) বললেন–

لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلاَّ نَفْسِي–

'হে রাসূল (সা:)! আপনি আমার কাছে সকল কিছুর তুলনায় অধিক বেশি প্রিয় কিন্তু আমার প্রাণের চাইতে অধিক নয়'। এ কথা শুনে নবী করীম (সা:) বললেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِه لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ–

'শপথ ঐ মহান সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রাণের তুলনায় অধিক প্রিয় না হই'। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উমার (রা:) বললেন–

اَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى نَفْسِي–

'আপনি আমার কাছে এখন সকল কিছুর তুলনায় এমনকি আমার প্রাণের তুলনায় অধিক প্রিয়'। এবার নবী করীম (সা:) হযরত উমার (রা:)-কে পূর্ণ ঈমানের সনদ দিয়ে বললেন–

اَلْأٰنَ يَا عُمَرُ–

'হে উমার! এখন তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করলো'।

পবিত্র কুরআন ও সমগ্র হাদীস পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী করীম (সা:) কে ভালোবাসার অর্থই হলো তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা। নিজ সুবিধা অনুসারে সহজ দিক মেনে চলা এবং বিপদ-ক্ষতি হতে পারে এ কথা মনে করে কঠিন দিক অনুসরণ না করা ঈমানদারের লক্ষণ নয়। নবী করীম (সা:) যা কিছু আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার অর্থই হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, এটা করতে পারলেই সীরাত মাহফিলের আয়োজন ও দরূদ পাঠ করা সার্থক হবে এবং আদালতে আখিরাতে তা নাজাতের উসিলা হবে। রাসূলের প্রতি ভালোবাসার নামে এমন কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করা যাবে না বা এমন পদ্ধতিও অনুসরণ করা যাবে না, যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা

অনুমোদন করেনি। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ যেভাবে ঘটিয়েছেন, সেই ভাবেই ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে এবং এটাই পরিপূর্ণ মুমিনের স্তরে উপনীত হবার একমাত্র পন্থা।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এতই অধিক যে, দরূদ পাঠ করা ব্যতীত নামাজ হয় না। নামাজ আদায় করতে হবে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ মহান নবীকে মর্যাদার সর্বাধিক উচ্চস্তরে উপনীত করেছেন বিধায় নামাজের মধ্যেও তাঁর হাবীবের প্রতি দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করার পূর্বেও নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হয়। মৃত মানুষের আত্মার মাগ্‌ফিরাতের জন্যে দোয়া করার পূর্বেও দরূদ পাঠ করতে হয়। এর কারণ হলো, রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুবই খুশী হন এবং দরূদ পাঠকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার দোয়া কবুল করেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠান; (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো। (সূরা আহ্যাব-৫৬)

পবিত্র কুরআনের গবেষকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবীর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর প্রতি সীমাহীন করুণা বর্ষণকারী। তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর কাজে বরকত দান করেন। তাঁর নাম বুলন্দ করেন। তাঁর প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন।

ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাঁকে সর্বাধিক ভালোবাসেন। তাঁর জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাঁকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তাঁর শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দেন।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ হলো, বিশ্বনবী (সাঃ) যখন মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করলেন তখন ইসলামের শত্রুরা নিজেদের মনের আক্রোশ প্রকাশের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অপবাদ দিয়ে চলছিল এবং তারা নিজেরা

এ কথা মনে করছিল যে, এভাবে কাদা ছিটিয়ে তারা তাঁর নৈতিক প্রভাব নির্মূল করে দেবে। অথচ এ নৈতিক প্রভাবের ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা দিনের পর দিন এগিয়ে চলছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করে এ কথা জানিয়ে দিলেন, 'ইসলামের শত্রুরা আমার নবীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে তাঁকে অপদস্ত করার যতই প্রচেষ্টা করুক না কেনো, শেষ পর্যন্ত তারাই ব্যর্থ হবে। কারণ আমি আল্লাহ্ তাঁর প্রতি মেহেরবান এবং সমগ্র বিশ্বজাহানের আইন ও শৃংখলা ব্যবস্থা আমারই নির্দেশে যেসব ফেরেশতার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তারা সবাই তাঁর সহায়ক ও প্রশংসাকারী। আমি যেখানে তাঁর নাম বুলন্দ করছি। আমার ফেরেশতারা তাঁর প্রশংসাবলীর আলোচনা করছে সেখানে তাঁর নিন্দাবাদ করে তারা কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রহমত ও বরকত তাঁর সহযোগী এবং আমার ফেরেশতারা দিনরাত দোয়া করছে, হে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন! মুহাম্মাদ (সা:) এর মর্যাদা আরো বেশি উঁচু করে দাও এবং তাঁর আদর্শকে আরো বেশি প্রসারিত ও বিকশিত করো। এ অবস্থায় ইসলাম বিরোধিরা মুহাম্মাদ (সা:) এর কি ক্ষতি করতে পারে'?

ঈমানদারদের প্রতি দরূদ পাঠানোর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার অর্থ হলো, 'হে লোকেরা! মুহাম্মাদ (সা:) এর বদৌলতে তোমরা যারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করেছো, তারা তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁর মহাঅনুগ্রহের হক আদায় করো। তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে পথ ভুলে বিপথে চলছিলে, এ মহান ব্যক্তি তোমাদের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দান করেছেন। তোমরা নৈতিক অধ:পতনের মধ্যে ডুবেছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সেখান থেকে উঠিয়েছেন এবং তোমাদের এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আজ অন্যরা তোমাদের ঈর্ষা করে। তোমরা বর্বর ও পাশবিক জীবন যাপন করছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সর্বোত্তম মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাজে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর এসব অনুগ্রহ করেছেন বলেই দুনিয়ার ইসলাম বিরোধিরা এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়েছে। নয়তো দেখো, তিনি কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোনো অশোভন আচরণ করেননি। সুতরাং এখন তোমাদের কৃতজ্ঞতার অনিবার্য দাবি হচ্ছে এই যে, তারা এ আপাদ-মস্তক কল্যাণ ব্রতী ব্যক্তিত্বের প্রতি যে পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করে ঠিক একই পরিমাণ বরং তাঁর চেয়ে বেশি ভালোবাসা তোমরা তাঁর প্রতি পোষণ করো। তারা তাঁকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে ঠিক ততটাই বরং তাঁর চেয়ে বেশীই তোমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হবে। তারা তাঁর যতটা নিন্দা করে ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী তোমরা তাঁর প্রশংসা করো। তারা তাঁর যতটা অশুভাকাংখী হয় তোমরা ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশি শুভাকাংখী হয়ে যাও এবং তাঁর পক্ষে সেই একই দোয়া করো যা আল্লাহ্ তা'য়ালার ফেরেশতারা দিনরাত তাঁর জন্য করে যাচ্ছে, 'দুই জাহানের রব্ব! তোমার নবী যেমন আমাদের প্রতি বিপুল অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি অসীম ও অগণিত রহমত বর্ষণ করো, তাঁর

মর্যাদা পৃথিবীতেও সবচেয়ে বেশি উন্নত করো এবং আখেরাতেও তাঁকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের তুলনায় অধিক নৈকট্য দান করো'।

উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, 'সাল্লু আলাইহি' অর্থাৎ তাঁর প্রতি দরূদ পড়ো। অন্যটি হচ্ছে, 'ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা' অর্থাৎ তাঁর প্রতি সালাম ও প্রশান্তি দান করো।

'সালাত' শব্দটি যখন 'আলা' অব্যয় সহকারে বলা হয় তখন এর তিনটি অর্থ হয়।

এক. কারো অনুরক্ত হয়ে পড়া, ভালোবাসা সহকারে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়া।

দুই. কারো প্রশংসা করা।

তিন. কারো পক্ষে দোয়া করা।

'সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য বলা হবে তখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, তৃতীয় অর্থটির জন্য এটি বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার অন্য কারো কাছে দোয়া করার ব্যাপারটি একেবারেই অকল্পনীয়। তাই সেখানে অবশ্যই তা হবে শুধুমাত্র প্রথম দু'টো অর্থের জন্য। কিন্তু যখন এ শব্দ বান্দাদের তথা মানুষ ও ফেরেশতাদের জন্য বলা হবে তখন তা তিনটি অর্থেই বলা হবে। তার মধ্যে ভালোবাসার অর্থও থাকবে, প্রশংসার অর্থও থাকবে এবং দোয়া ও রহমতের অর্থও থাকবে। সুতরাং মুমিনদের নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষে 'সাল্লু আলাইহি'-এর আদেশ দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যাও তাঁর প্রশংসা করো এবং তাঁর জন্য দোয়া করো।

'সালাম' শব্দেরও দু'টো অর্থ হয়। এক. সব ধরণের বিপদাপদ ও অভাব অনটন মুক্ত থাকা। এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের এখানে সালামতি বা নিরাপত্তা শব্দের ব্যবহার আছে। দুই. শান্তি, সন্ধি ও অবিরোধিতা। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষে 'সাল্লিমু তাসলিমা' বলার একটি অর্থ হচ্ছে যে, তোমরা তাঁর জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার দোয়া করো। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে যে, তোমরা পুরোপুরি মনে প্রাণে তাঁর আন্দোলনের কাজে সহযোগিতা করো, তাঁর বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর আদেশ পালনকারীতে পরিণত হও।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ) কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, (অর্থাৎ নামাজে 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান নীবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' এবং দেখা সাক্ষাতে আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা) কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পাঠানোর পদ্ধতি কি?

এসব প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সা:) সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন ধরনের দরূদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। বর্তমানে দরূদ সম্পর্কে বেশ কিছু বই-পুস্তক বাজারে দেখা যায় এবং এসব বই-পুস্তকে নানা ধরনের দরূদের উল্লেখ রয়েছে। যেমন দরূদে হাজারী, দরূদে লাখী, দরূদে মুস্তফা, দরূদে আকবর, দরূদে শেফা ইত্যাদি নামে বহু ধরনের দরূদ এবং এসব দরূদের ফযিলত উক্ত বই-পুস্তকে লিখা হয়েছে। হাদীস গবেষকগণ উল্লেখিত দরূদের একটি দরূদও হাদীসের সমগ্র কিতাবেও সন্ধান করে পাননি। তাঁরা বলেছেন, এসব দরূদ ও বর্ণিত ফযিলত সকল কিছুই কল্পিত বৈ আর কিছুই নয়। নবী করীম (সা:) সাহাবায়ে কেরামকে যে সকল দরূদ শিখিয়েছেন তা সকলই হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে এবং আমরা হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে কয়েকটি দরূদ এখানে উল্লেখ করছি।

স্বয়ং আল্লাহর নবীর শেখানো দরূদের যে কি মর্যাদা, তা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এসব দরুদের ফযীলত, কল্যাণকারীতা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ এসব দরূদের ফযীলত ও সওয়াব অফুরন্ত। যে কোনো বিপদাপদে এসব দরূদ পাঠ করলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওপরে অসীম রহমত অবতীর্ণ করবেন এবং নবী করীম (সা:) খুশী হবেন। হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ্ (রা:) কে নবী করীম (সা:) এই দরূদ শিখিয়েছিলেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٌ كَمَا بَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদান কামা বারিকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

এ দরূদটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ্ (রা:) থেকে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর বর্ণনা থেকে ইবনে জারীর হযরত আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَىآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আয ওয়া জিহি ওয়া যুর রিয়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আয ওয়া জিহি ওয়া যুর রিয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (মুআত্তা, ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) থেকে এ দরূদ বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ফিল আলিমিনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহ্‌মাদ, ইবনে জারীর, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে এ দরূদ বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ-

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম। (আহ্‌মাদ, বুখারী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত বুরাইদাতাল খুযাই (রাঃ) থেকে এ দরূদ বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلوٰتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرْكَاتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

আল্লাহুম্মাজ আল সলাতুকা ওয়া রাহমাতিকা ও বারকাতিকা আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা জাআলতাহা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (আহ্‌মাদ, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এ দরূদ বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ওয়া বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ফিল আলিমিনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (নাসাঈ)

হযরত তালহা (রাঃ) থেকে এ দরূদ বর্ণিত হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ– وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (ইবনে জারীর)

উল্লেখিত দরূদগুলোয় শব্দের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সবগুলোর অর্থ একই। এসব দরূদগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে।

প্রথমত এসব দরূদ নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদেরকে পাঠ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ওপরে দরূদ পাঠ করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এ মর্মে দোয়া করো, হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওপর দরূদ পাঠাও'। এক শ্রেণীর স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ ব্যাপারে আপত্তি করে বলে যে, 'এটা তো বড় অদ্ভূত ব্যাপার, আল্লাহ তা'য়ালা তো আমাদেরকে বলছেন, তোমরা নবীর ওপরে দরূদ পাঠ করো, কিন্তু অপর দিকে আমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে বলছি যে, তুমি দরূদ পাঠাও'।

অথচ রাসূল (সাঃ) লোকদেরকে এ কথা বলেছেন যে, 'তোমরা আমার প্রতি সালাতের হক আদায় করতে চাইলেও করতে পারো না। তাই আল্লাহ তা'য়ালারই কাছে দোয়া চাও যেন তিনি আমার প্রতি দরূদ পাঠান'। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা বুলন্দ করতে পারি না। আল্লাহ তা'য়ালাই বুলন্দ করতে

পারেন। আমরা তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারি না। আল্লাহ তা'য়ালাই তার প্রতিদান দিতে পারেন। আমরা তাঁর বাণীসমূহ উচ্চমাপে পৌঁছানোর এবং তাঁর আদর্শকে সম্প্রসারিত করার জন্য যতই চেষ্টা চালাই না কেনো, আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানী এবং তাঁর দেয়া সুযোগ ও সহায়তা ব্যতীত তাতে কোনো প্রকার সাফল্য অর্জন করতে পারি না। এমন কি নবী করীম (সা:) এর প্রতি ভক্তি ভালোবাসাও আমাদের অন্তরে আল্লাহরই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যথায় শয়তান কত রকম প্ররোচনা দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের মন-মস্তিষ্ক বিরূপ করে তুলতে পারে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে তা থেকে হেফাজত করুন।

সুতরাং নবী করীম (সা:) এর ওপর দরূদ পাঠের হক আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাঁর প্রতি সালাত বা দরূদের দোয়া করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বলে সে যেন আল্লাহ তা'য়ালার সমীপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে গিয়ে বলে, হে আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার নবীর ওপর সালাত বা দরূদ পাঠানোর যে কর্তব্য আমার প্রতি দেয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ আমার নেই। আমার পক্ষ থেকে তুমিই তা সম্পন্ন করে দাও এবং তা করার জন্য আমাকে যেভাবে কাজে নিয়োগ করতে হয় তা তুমি নিয়োগ করো।

দ্বিতীয়ত রাসূল (সা:) এর ভদ্রতা ও মহানুভবতার ফলে তিনি কেবল নিজেকেই এ দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং নিজের সাথে তিনি নিজের পরিজন স্ত্রী ও পরিবারকেও শামিল করে নিয়েছেন। 'স্ত্রী ও পরিবার' অর্থ সুস্পষ্ট আর 'পরিজন' শব্দটি নিছক রাসূল (সা:) এর পরিবারের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এসব শব্দের মধ্যে এমন সব লোকও এসে যায় যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে। পরিজন অর্থে মূলে আরবী 'আল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দৃষ্টিতে 'আল' ও 'আহল' –এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির 'আল' হচ্ছে এমনসব লোক যারা হয় তার সাথী, সাহায্যকারী ও অনুসারী, তারা তার আত্মীয় বা অনাত্মীয় হোক বা না হোক অবশ্যই তার আত্মীয়। পবিত্র কুরআনের ১৪ টি স্থানে 'আলে ফেরআউন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো জায়গায়ও 'আলে' অর্থ ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা নয়। বরং এমন সকল লোক যারা হযরত মূসার মুকাবিলায় ফেরাউনের সমর্থক ও সহযোগী ছিল। (দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ৪৯-৫০, সূরা আলে ইমরাণ–১১, আরাফ-১৩০, মুমিনুন-৪৬)

সুতরাং এমন সমস্ত লোকই 'আলে' মুহাম্মাদ (সা:) এর বহির্ভূত হয়ে যায় যারা বিশ্বনবী (সা:) এর আদর্শ অনুসরণ করে না, হতে পারে সে নবীর রক্তের আত্মীয়। পক্ষান্তরে এমন সকল লোকও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা নবী করীম (সা:) এর আদর্শ অনুসরণ করে, কিন্তু তারা নবীর রক্তের কোনো আত্মীয় নয়, তবুও তারা নবীর পরিবারের অন্ত

র্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে নবী পরিবারের এমন প্রত্যেকটি লোক সর্বতোভাবেই 'আলে' মুহাম্মাদ (সা:) এর অন্তর্ভুক্ত হবে যারা তাঁর সাথে রক্তের সম্পর্কও রাখে আবার তাঁর আদর্শও অনুসরণ করে।

নবী করীম (সা:) যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতে অবশ্যই এ কথা রয়েছে যে, তাঁর প্রতি এমন অনুগ্রহ করা হোক যা ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে এক শ্রেণীর লোকদের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একশ্রেণীর লোক এর বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু গবেষকগণ এর কোনো একটি ব্যাখ্যাও গ্রহণ করেননি। তারা ব্যাখ্যা দেন যে, যারা নবুয়্যাত ওহী ও কিতাবকে হেদায়েতের উৎস বলে মেনে নেয় তারা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ:) এর নেতৃত্বের প্রশ্নে একমত। এ ব্যাপারে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সুতরাং রাসূল (সা:) এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ:) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবীর অনুসারীদের নেতায় পরিণত করেছেন, অনুরূপভাবে আমাকেও পরিণত করুন। এমন কোনো ব্যক্তি যে নবুয়্যাত মেনে নিয়েছে সে যেন আমার নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

বিশ্বনবী (সা:) এর ওপরে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। বিশেষ করে নামাযে দরূদ পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে আলেম সমাজ একমত। সমগ্র জীবনকালে নবী করীম (সা:) এর ওপরে একবার দরূদ পাঠ করা ফরজ। এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এরপর দরূদের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রাহ:) বলেন, নামাযে একজন মুসল্লী যখন শেষবার তাশাহুদ পড়ে তখন সেখানে সালাতুন আলান নবী পড়া ফরজ। কোনো ব্যক্তি এভাবে না পড়লে তার নামায হবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা:), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) ও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:), তাবেঈদের মধ্যে থেকে শা'বী (রাহ), ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (রাহ:), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী (রাহ:) ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রাহ:) এবং ফকীহদের মধ্যে থেকে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (রাহ:)ও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। শেষের দিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহ:)ও এ মত অবলম্বন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাহ:), ইমাম মালেক (রাহ:) ও অধিকাংশ উলামা এ মত পোষণ করেন যে, দরূদ সমগ্র জীবনে শুধুমাত্র একবার পড়া ফরজ। এটি কালেমায়ে শাহাদাতের মত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে এবং নবী করীম (সা:)

কে নবী বলে মেনে নিয়েছে সে ফরজ আদায় করেছে। অনুরূপভাবে যে একবার দরূদ পাঠ করেছে সে নবীর ওপর সালাত পাঠ করার ফরজ আদায়ের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। এরপর তার ওপর আর কালেমা পড়া ফরজ নয় এবং দরূদ পড়াও ফরজ নয়।

আলেমদের একটি দল নামাযে দরূদ পড়াকে সকল অবস্থায় ওয়াজিব বলে গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা তাশাহুদের সাথে তাকে শৃংখলিত করেন না।

আলেমদের আরেকটি দলের মতে প্রত্যেক দোয়ায় দরূদ পড়া ওয়াজিব। আরো কিছু চিন্তাবিদ নবী করীম (সাঃ) এর নাম উচ্চারিত হলে দরূদ পড়া ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করেন। আরেক দল আলেমদের মতে এক মজলিশে রাসূল (সাঃ) এর নাম যতবারই উচ্চারিত হোক না কেনো, দরূদ পড়া কেবলমাত্র একবার ওয়াজিব হবে।

শুধুমাত্র ওয়াজিব হবার ব্যাপারে এ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তবে দরূদের ফযীলত ও তা পাঠ করলে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া এবং তার একটি অনেক বড় সৎকাজ হবার ব্যাপারে তো সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্ একমত। এমন প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর থেকেই তো স্বাভাবিকভাবেই দরূদ বের হবে, যার মধ্যে এ অনুভূতি থাকবে যে, বিশ্বনবী (সাঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার পরে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী। মানুষের হৃদয়ে ঈমান ও ইসলামের মর্যাদা যত বেশী হবে তত বেশী মর্যাদা হবে তার হৃদয়ে বিশ্বনবী (সাঃ) এর অনুগ্রহেরও। আর মানুষ যত বেশী এ অনুগ্রহের মর্যাদা দিতে শিখবে তত বেশিই যে নবী করীম (সাঃ) এর ওপরে দরূদ পাঠ করবে। সুতরাং অধিক দরূদ পাঠ করা ঈমানের একটি মাপকাঠি। এটি পরিমাপ করে জানিয়ে দেয় বিশ্বনবী (সাঃ) এর আদর্শের সাথে মানুষের সম্পর্ক কতটা গভীর এবং ঈমানের নিয়ামতের কতটা সম্মান তার অন্তরে আছে। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلوٰةً لَمْ تَزِلُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ–

যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ্)

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا–

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার দরূদ পাঠ করেন। (মুসলিম) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন।

اَولَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلوٰةً–

কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশি হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবেচেয়ে বেশি দরূদ পড়বে। (তিরমিযী)

اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَم يَصَلِّ عَلَيَّ–

আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ। (তিরমিযী)

সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত নবী করীম (সা:) এর প্রতি অধিক দরূদ পাঠ করা। তবে এ দরূদ পাঠই শুধুমাত্র মুক্তির মাধ্যম নয়। মানুষকে অবশ্যই মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালার বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দরূদ পাঠও উপকারে আসবে। আল্লাহ তা'য়ালার বিধান না মেনে বা ইসলামী বিধান ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম না করে শুধু মাত্র দরূদ পাঠ করলে কিয়ামতের দিন যদি রাসূল (সা:) এ কথা বলেন যে, 'যখন আমার আদর্শকে অপমানিত করা হচ্ছিলো, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিলো, ইসলামের সৈনিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কল্পিত অভিযোগ তুলে তাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছিলো, আর তোমরা ঘরের কোণে বা মসজিদে বসে বসে দরূদ পাঠ করছিলে, বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করোনি, আজ তোমাদের ওসব দরূদে আমার কোনোই প্রয়োজন নেই' তখন কি উপায় হবে? ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করা হলো ফরজ, এই ফরজ আদায় করে তারপর যতবেশি দরূদ পাঠ করা যাবে আল্লাহ তা'য়ালাও সন্তুষ্ট হবেন এবং জান্নাত ততবেশি তার কাছে এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

জুলুম- নির্যাতনের কালো অধ্যায়

এ পার্থিব জগতে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে জালিম ও স্বৈরাচারী যখন কোনো ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের প্রতি নির্যাতন করে তখন যদি কেউ প্রতিবাদ না করে তাহলে জালিম ও স্বৈরাচার উৎসাহিত হয়ে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিই করে থাকে, পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে। নবী করীম (সা:) এর মক্কী জীবনে ঠিক এমনটিই ঘটেছিলো। প্রভাবশালী চাচা আবু তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সে সময় বিশ্বনবী (সা:) এর প্রতি শারীরিকভাবে অতটা নির্যাতন কেউ করতে পারেনি। আবু তালিবের অবর্তমানে ইসলামের শত্রুগোষ্ঠী মক্কায় নির্ভীক চিত্তে নবী করীম (সা:) এর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলো। তিনি যে পথ দিয়ে কা'বায় আসবেন সে পথে ময়লা আবর্জনা বা বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে রাখতো দুশমনরা। তিনি কা'বায় নামাজ আদায় করছেন, তাঁকে নানাভাবে বিদ্রুপ করা হতো। নামাজে সিজদা দিয়েছেন এ সময় তাঁর পবিত্র মাথায় উটের পচা গলিত নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো। ছোট্ট মেয়ে ফাতিমা (রা:) পিতার এ অবস্থা দেখে করুণ কণ্ঠে কাঁদতেন আর পিতার মাথার ওপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে মাথা ভার মুক্ত করতেন। তিনি নামাযে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পবিত্র গলায় কাপড় জড়িয়ে দু'দিক থেকে

এমনভাবে টেনে ধরা হতো যে, তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, এতে করে নবী করীম (সাঃ) এর কণ্ঠে দাগ হয়ে যেত। বর্তমান সময়েও যেমন ইসলামের অনুসারী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনিভাবেই নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধেও তৎকালে দুশমনরা কিশোর, তরুণ যুবকদের ব্যবহার করতো। তিনি বাইরে বের হলেই ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিত। তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর পেছনে পেছনে যেত আর তাঁকে বিদ্রুপ করতো।

তিনি নামাযে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর আবু জাহিল তাঁর সাথিদের নিয়ে নবীকে গালাগালি দিতো। তিনি লোকালয়ে গিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান প্রচার করতেন। আবু জাহিল লোকদেরকে ডেকে বলতো, 'তোমরা এই লোকটির কথায় কান দিও না। এই লোকের প্রতারণায় তোমরা নিপতিত হবে না। এ লোক ধোকাবাজ যাদুকর'। (নাউযুবিল্লাহ)

এসব কথা বলে আল্লাহ তা'য়ালার দুশমন আবু জাহিল লোকজনের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার নবীর পবিত্র শরীরে নোংরা কাদা নিক্ষেপ করতো। একদিন নবী করীম (সাঃ) কা'বায় নামায আদায় করছিলেন। শত্রুর দল দূরে বসে তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছিল। হঠাৎ আবু জাহিল বলে উঠলো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন নামাযে সিজদা দেয় তখন তাঁর মাথার ওপর উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দিলে ভালো হয়। তোমরা কি কেউ এ কাজ করতে পারবে?'

ইসলামের দুশমন ওকবা বললো, 'তোমরা দেখো, আমিই মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মাথায় উটের নাড়ি ভুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি'।

এ কথা বলেই সে উটের নাড়ি-ভুড়ি এনে নবী করীম (সাঃ) এর মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তিনি তখন নামাযে সিজদায় ছিলেন, মাথা উঠাতে পারলেন না। নবীর এই কষ্ট দেখে শত্রুর দল অট্ট হাসিতে হেসেছিল। পাঁচ বছরের শিশু মেয়ে ফাতিমা পিতার এই দুরাবস্থার সংবাদ পেয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ছুটে এলেন। কচি হাত দু'টো দিয়ে পরম মমতায় পিতার মাথা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে শত্রুদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে বিচার দিলেন।

নবী করীম (সাঃ) কে নিজেরা তো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতোই সেই সাথে মক্কায় নতুন যারা আসতো, তাদের সামনেও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো আবু জাহিলের অনুসারীরা। মক্কার বাইরের একজন লোক একটি উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবু জাহিল সে উট নিয়ে উটের মালিককে অর্থ না দেয়ার ছুতো খুঁজতে থাকে। লোকটি যখন

বুঝলো আবু জাহিল তাকে অর্থ না দিয়েই উট নিয়ে নেবে তখন সে কা'বাঘরে এসে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে, 'আবু জাহিল আমার উট নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করছে না। সে আমার ওপর জুলুম করছে। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি এই জুলুমের প্রতিকার করবেন? আমার অধিকার আমাকে আদায় করে দিবেন?'

লোকটির কথা শুনে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম (সাঃ) কে হাসির পাত্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করলো। মক্কার বাইরের ঐ লোকটির সামনে আবু জাহিল যেন আল্লাহ্ তা'য়ালার রাসূলকে অপমান করে, এ উদ্দেশ্যে লোকটিকে তারা ডেকে রাসূল (সাঃ) কে ইশারায় দেখিয়ে বললো, 'ঐ লোকটির কাছে যাও, সে তোমার অধিকার আদায় করে দিবে'।

নবী করীম (সাঃ) সে সময় কা'বায় অবস্থান করছিলেন। লোকটি কাফিরদের কথায় বিশ্বাস করে নবী (সাঃ) এর কাছে ঘটনা বিস্তারিত বলে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর বান্দাহ! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা রহমত নাযিল করুন, আপনি আবু জাহিলের কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করে দিন'।

বিশ্বনবী (সাঃ) লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার সাথে এসো, আমি তোমার অধিকার আদায় করে দিচ্ছি'।

কথা শেষ করে নবী করীম (সাঃ) উঠে আবু জাহিলের বাড়ির দিকে গেলেন। লোকটিও রাসূল (সাঃ) এর সাথে গেল। আল্লাহর দুশমন আবু জাহিল কিভাবে নবী করীম (সাঃ) কে অপমান করে তা দেখার জন্যে ইসলামের দুশমনরা একজন লোককে পাঠালো। বিশ্বনবী (সাঃ) আবু জাহিলের বাড়ির দরোজায় আঘাত করলেন। সে ভেতর থেকে জানতে চাইলো আগন্তুকের পরিচয়। নবী (সাঃ) নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি মুহাম্মাদ (সাঃ), দরোজা খুলে বাইরে এসো'।

আবু জাহিল বাইরে এসে বিশ্বনবী (সাঃ) এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার চেহারা এমন ভীতিগ্রস্থ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সে যেন তাঁর সামনে মৃত্যুদূত দেখছে। আল্লাহর নবী (সাঃ) কলিজায় কম্পন জাগানো কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'এই লোকের যে অধিকার রয়েছে তোমার কাছে, তাঁর অধিকার তাকে বুঝিয়ে দাও'।

আবু জাহিল আতংকগ্রস্ত কণ্ঠে বললো, 'এখুনি দিচ্ছি'। এ কথা বলেই সে তাঁর ঘরে গিয়ে দ্রুত অর্থ এনে লোকটিকে দিয়ে দিল। নবী করীম (সাঃ) কা'বায় ফিরে এলেন।

সে লোকটি কা'বায় এসে কাফিরদেরকে বললো, 'মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওপর রহমত নাযিল করুন, তিনি আমার অধিকার আদায় করে দিয়েছেন'।

আল্লাহর দুশমনরা ধারণা করেছিল তাদের নেতা আবু জাহিল বিদেশী লোকটির সামনে নবী করীম (সাঃ) কে অপমান করবে, তা না করে আবু জাহিল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর

কথায় উটের মূল্য পরিশোধ করলো, কারণ কি? ইতোমধ্যে আবু জাহিল সেখানে এলো। তাঁর চেহারা থেকে তখন পর্যন্ত ভয়ের চিহ্ন মুছে যায়নি। অন্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বিষয়টি কি? তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কথায় মূল্য দিয়ে দিলে যে?'

আবু জাহিল বললো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কথায় মূল্য না দিলে সে ভয়ঙ্কর উট আমাকে খেয়ে ফেলতো। আমি দরোজা খোলার পরে দেখলাম মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পেছনে একটি ভয়ঙ্কর দর্শন উট দাঁড়িয়ে আছে। খোদার শপথ! তেমন উট আমি কোথাও দেখিনি। উটের চেহারা বড় ভয়ঙ্কর, আমি ঐ লোকটির উটের মূল্য না দিলে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পিছনে দাঁড়ানো উট আমাকে খেয়ে ফেলতো'। (ইবনে হিশাম)

এভাবেই সেদিন মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদা সমুন্নত রেখে ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র বান্চাল করে দিয়েছিলেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ইসলামের দুশমনরা ঘটিয়েছে। যারা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বনবী (সাঃ) এর সাথে শত্রুতা করেছে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) এর চাচা আবু লাহাব এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল নবী করীম (সাঃ) কে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেছেন। আবু লাহাব যখন জানতে পারলো তাঁর পরিণতি সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সে একটি পাথর নিয়ে নবী করীম (সাঃ) কে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কা'বায় এসে বসে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে কা'বায় এলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আবু লাহাবের চোখ থেকে বিশ্বনবী (সাঃ) কে অদৃশ্য করে দিলেন। আবু লাহাব হযরত আবু বকর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ (সাঃ)? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে। এখন আমি কাছে পেলে এই পাথর দিয়ে তাকে আঘাত করতাম'।

কথা শেষ করে সে চলে গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেল না কেনো?'

নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'সে আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে আমাকে দেখতে না পায়'।

বর্তমান যুগে একশ্রেণীর লোক যেমন নিজেদেরকে সুশিল নামে পরিচয় দিয়ে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায় তেমনি সে যুগেও সুশিলদের এক নেতা উমাইয়া ইবনে খালফ নবী করীম (সাঃ) কে দেখলেই গালাগালি ও হৈচৈ করতো। বর্তমান যুগের একশ্রেণীর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার মতো ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কল্পিত অভিযোগ ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের মতো

ভূমিকা সে যুগের উমাইয়া ইবনে খালফ এবং তার সমর্থকগণ আল্লাহ তা'য়ালার রাসূলের বিরুদ্ধে পালন করতো। ইসলামের দুশমন এ লোকটির অশুভ পরিণতি এবং তার ঘৃণিত স্বভাব সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা হুমাজাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) এর মহান সাহাবী হযরত খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন একজন লৌহকর্মকার। তিনি লৌহজাত অস্ত্র নির্মাণ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে তরবারী কিনেছিল আ'স ইবনে ওয়ায়েল নামক এক কাফির। সম্পূর্ণ অর্থ সে তখন পর্যন্ত পরিশোধ করেনি। হযরত খাব্বাব (রাঃ) তাঁর কাছে তরবারীর মূল্য চাইতে গেলেই সে বিদ্রুপ করে বলতো, 'হে খাব্বাব! তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ) তো প্রচার করে জান্নাতে যারা যাবে তাঁরা ইচ্ছে অনুযায়ী স্বর্ণ রৌপ্য হিরা জহরত ও অসংখ্য দাস-দাসী পাবে। এ কথা কি ঠিক?'

হযরত খাব্বাব (রাঃ) জবাব দিতেন, 'আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর কথা অবশ্যই সত্য'।

আল্লাহ তা'য়ালার দুশমন আ'স ইবনে ওয়ায়েল বিদ্রুপ করে বলতো, 'হে খাব্বাব! তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও! আমি তোমাদের ঐ জান্নাতে গিয়েই তোমার অর্থ পরিশোধ করবো। আমি খোদার শপথ করে বলছি, তুমি আর তোমার মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার তুলনায় অধিক সম্মান পাবে না এবং সৌভাগ্যবানও হতে পারবে না'। (নাউযুবিল্লাহ)

এই কাফির সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা মরিয়মের আয়াত অবতীর্ণ করেন। নাদার ইবনে হারেস ছিলো ইসলামের আরেক ঘৃণিত শত্রু। নবী করীম (সাঃ) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাতেন, ইসলামের সাথে যারা অতীতে বিরোধীতা করে আল্লাহ তা'য়ালার গযবে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, তাদের ইতিহাস শোনাতেন তখন এই কাফির সে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে নীরবে বসে থাকতো। রাসূল (সাঃ) চলে যাবার পরে সে লোকজনকে বলতো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) যা বলে তার কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর বলা কাহিনী সেই প্রাচীন যুগের গল্প ছাড়া আর কিছুই না। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চেয়ে ভালো কাহিনী আমি জানি'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফুরকানের আয়াত অবতীর্ণ করে ঘৃণিত এ লোকটির পরিণতি বর্ণনা করেছেন। আরেকজন কাফির আখনাস ইবনে শুরাইক, সে ছিল তৎকালিন সুশিল সমাজের একজন গন্যমান্য ব্যক্তি। এই লোকটি নানাভাবে নবী করীম (সাঃ) কে অত্যাচার করতো। তাঁকে দেখলেই অশালীন ভাষায় গালাগালি দিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সম্পর্কে সূরা কলমের আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর পরিণতি কত খারাপ হবে তা জানিয়ে দিলেন। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা নামক কাফির বলতো, 'আমি এবং আবু মাসউদের মতো প্রভাবশালী লোক থাকতে মুহাম্মাদ (সাঃ)

এর মতো লোকের ওপরে ওহী নাযিল হলো? আল্লাহ আর লোক পাননি বুঝি?' (নাউযুবিল্লাহ)

সুশিল নামধারী ইসলামের এসব দুশমনদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা যুখরুফের আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের কথার প্রতিবাদ করে নির্মম পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। কাফিরদের ভেতরে উকবা এবং উবাই ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নবী করীম (সাঃ) এক সমাবেশে মানুষদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, সে সমাবেশে উকবা উপস্থিত ছিলো। উবাই এ সংবাদ জানতে পেরে ছুটে এসে তাঁর বন্ধু উকবাকে বললো, 'তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কথা শুনছো? তুমি যদি তাঁকে অপমান না করো তাহলে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্কে থাকবে না'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা উকবা এবং উবাইকে জাহান্নামের অতলে নিমজ্জিত করুন। তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। একদিন উবাই একটি পুরোনো হাড় এনে নবী করীম (সাঃ) কে বললো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! তোমার কি বিশ্বাস হয় এই পচা হাড়কে আল্লাহ আবার জীবিত করবে?' এ কথা বলে সে হাড়টি গুড়ো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

নবী করীম (সাঃ) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাতাসে মিশ্রিত হাড়কে আবার জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে প্রেরণ করবেন'। এই কাফির সম্পর্কে সূরা ইয়াছিনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। মহান আল্লাহ বললেন, 'তাদেরকে বলে দাও, প্রথমবার যখন তাঁরা অস্তিত্বহীন ছিল তখন তাদেরকে কে অস্তিত্ব দান করেছিল? যে আল্লাহ প্রথমবার অস্তিত্বদান করেছিলেন সেই আল্লাহই যতবার খুশী অস্তিত্বদান করবেন'।

আরেকদিন নবী করীম (সাঃ) কা'বাঘর তাওয়াফ করছিলেন, এ সময় কাফির নেতারা বিশ্বনবী (সাঃ) এর কাছে আপোষ প্রস্তাব পেশ করে বললো, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এসো আমরা একটি প্রক্রিয়ায় আমাদের বিরোধ শেষ করে দেই। তা হলো, আমরা তোমার আল্লাহর দাসত্ব কিছুটা করি তুমিও আমাদের প্রতিপালক দেবতাদের দাসত্ব কিছুটা করো। তাহলে আর আমাদের ভেতরে কোনো বিরোধ থাকবে না'।

কাফিরদের কথার জবাবে মহান আল্লাহ সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'হে নবী, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি যার দাসত্ব করি তোমরা তাঁর দাসত্ব করো না। তোমরা যার দাসত্ব করো আমি তাঁর দাসত্ব করি না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন'।

ইসলামে বাতিল শক্তির সাথে আপোষের কোনো ব্যবস্থা নেই। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। যার যার ধর্ম সে সে অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান ইসলামে নেই। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দিয়ে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কথা বলেন তাদের উচিত আয়াতটির পটভূমি দেখা। পৃথিবীর কোনো নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন না। কাফির এবং ধর্মনিরপেক্ষদের সাথেই তাদের সংঘর্ষ হয়েছে। নবীগণের আগমন ঘটেছেই মহান আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। সুতরাং কুরআনের আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যারা পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্রোধ যে কোনো মুহূর্তে অবতীর্ণ হতে পারে।

ইসলামে শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই। ইসলাম তার আকিদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করে না। কারণ বিশ্বাস জিনিসটা কারো ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। একইভাবে, ইসলাম তার আকিদা বিশ্বাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ইবাদাতকেও কোনো ব্যক্তির ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দেয় না। কারণ দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলামের ইবাদত সমূহ অর্থহীন। দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করেই নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদী আদায় করতে হয়। এসব দিকে ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিতে চায়। পক্ষান্তরে ইসলাম এটা সহ্য করতে নারাজ যে, সমাজ ও সভ্যতা পরিচালনাকারী যে আইন ও বিধানের ওপর রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কেউ রচনা করে দিক, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিদ্রোহী মানুষজন আল্লাহর পৃথিবীতে আইনের প্রয়োগ করুক বা বাস্তবায়ন করুক, মুসলিম জনগোষ্ঠী তা পালন করুক এবং তাদের দাস হয়ে থাকুক। এসব ঘৃণ্য সুযোগ ইসলাম দিতে নারাজ।

নবী করীম (সাঃ) যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়ির চারদিকে যারা বসবাস করতো অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের প্রতিবেশী যারা ছিল তাদের ভেতরে একমাত্র হাকাম ইবনে আ'স (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ইসলাম কবুল করেনি। রাসূল (সাঃ) যখন নিজের বাড়িতেই নামায আদায় করতেন তখন প্রতিবেশী উকবা, আদী এ ধরনের অনেকেই তাঁর প্রতি পশুর নাড়ি ভুড়ি ছুড়ে দিত। নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হয়ে দেয়ালের আড়ালে নামায আদায় করতেন। তিনি রান্নার জন্য উনুনে হাড়ি উঠাতেন আর তারা সেই হাড়ির ভেতরেও আবর্জনা ছুড়ে দিত। বিশ্বনবী (সাঃ) নিজ হাতে সেসব আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দুত নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ইসলামের শত্রুরা নির্যাতনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে, কিন্তু শত্রুপক্ষের শেষ রক্ষা হয়নি। তাদের নাম-নিশানা মুছে গিয়েছে। ইনশাআল্লাহ ইসলামের এ যুগের দুশমনদের অস্তিত্বও ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে হারিয়ে যাবে।

শক্তি প্রয়োগে নয়, নবী করীম (সাঃ) এর স্নিগ্ধ সুরভিত আকর্ষণে

নবী করীম (সা:) প্রত্যেক হজ্জের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। নবুয়্যাতের দশম বছর রজব মাসে নবী করীম (সা:) বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন। এ সময় মদীনা থেকে একদল লোক মক্কায় আগমন করেছিল। দলটি ছিল খাজরাজ গোত্রের। মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম আকাবা। বর্তমানে এখানে মসজিদে আকাবা অবস্থিত। এই আকাবাতে তাঁর সাথে লোকগুলোর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তাদের সাথে দেখা হওয়া মাত্র তিনি তাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী হলেন। তাঁরা নিজেদেরকে খাজরাজ গোত্রের লোক বলে পরিচয় দিল। তিনি বললেন, 'যারা ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ আপনারা কি সেই গোত্রের?'

নবী করীম (সা:) এর কথার প্রতি তাঁরা ইতিবাচক জবাব দিল। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আপনারা আমাকে একটু সময় দিলে আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে ইচ্ছুক'।

আগন্তুক দল নবী করীম (সা:) এর কথায় সম্মত হয়ে সেখানে বসলো। তিনি তাদেরকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। মদীনার অধিবাসীরা নানা ধরনের মূর্তির পূজা করতো এবং ইয়াহূদীদের সাথে তাঁরা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তৎকালীন ইয়াহূদীরা কিতাবের মাধ্যমে নবী করীম (সা:) সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবগত ছিল। তাদের কাছ থেকে মদীনার অধিবাসীরাও নবী করীম (সা:) এর আগমন সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিলো।

মদীনার ইয়াহূদী এবং পৌত্তলিকদের মধ্যে মতানৈক্যের সূত্রপাত হলে ইয়াহূদীরা পৌত্তলিকদের ভয় দেখিয়ে বলতো, 'বর্তমানে নবী আগমনের আর দেরী নেই। আমরা ইতোপূর্বে আদ ও ইরাম জাতিকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলাম। এখন যে নবী আগমন করবে সে নবীর নেতৃত্বে তোমাদেরকেও সেই একইভাবে হত্যা করবো'।

ইয়াহূদীদের এ ধরনের ভীতি প্রদর্শনের কারণে মদীনার পৌত্তলিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, নবীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে তাঁরাই ইয়াহূদীদের আগে নবীর অনুসারী হবে। এভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মদীনায় ইসলামের জন্য ক্ষেত্র পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। নবী করীম (সা:) এর দাওয়াত শোনার সাথে সাথে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, যে নবী সম্পর্কে ইয়াহূদীরা তাদেরকে ভয় দেখায় এই মানুষটিই সেই নবী। সুতরাং ইয়াহূদীরা এই নবীর অনুসারী হবার পূর্বেই তাঁরা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হবে এবং সিদ্ধান্ত তাঁরা তৎক্ষণাৎ কার্যকর করেছিল।

ইসলাম কবুল করেই তাঁরা নবী করীম (সাঃ) কে জানালো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা আমাদের গোত্রকে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের গোত্রের সকল লোক আপনার সাথে থাকবে। আমরা আমাদের গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জানাবো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যদি তাদেরকে আপনার সঙ্গী বানিয়ে দেন তাহলে আপনি হবেন সবচেয়ে সম্মানিত এবং শক্তিশালী'।

এই সৌভাগ্যবান মানুষগুলো ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গিয়ে তাদের গোত্রের কাছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি জানিয়ে দেন। ফলে মদীনার সর্বত্র ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠে। এভাবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর কার্যক্রমকে এক যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেন এবং ইসলাম বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছায়।

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে পুনরায় হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হলো। মদীনা থেকে সত্য পিপাসু ব্যক্তিগণ মক্কায় এলেন তাওহীদের সুরা পান করে তৃষ্ণা মিটানোর জন্য। তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত উবাদা (রাঃ) বলেন, 'আমি আকাবার প্রথম বাইয়াতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা মোট ১২ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলাম। আমরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ওয়াদা করেছিলাম, 'আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করবো না। সন্তান হত্যা করবো না। চুরি ডাকাতি করবো না। ব্যভিচার করবো না। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াবো না। ন্যায় সংগত বিষয়ে নবীর সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করবো না'।

আমরা নবী করীম (সাঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পরে তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাথে যে ওয়াদা করলে, তা যদি পালন করো তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত রয়েছে। আর যদি এই ওয়াদার মধ্যে কোনো একটিও অমান্য করো তাহলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহ তা'য়ালার হাতেই অর্পিত থাকবে। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি ও দিতে পারেন এবং ক্ষমাও করতে পারেন'।

'বাইয়াত' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো বিক্রি করে দেয়া। একজন মুসলমান তাঁর জীবনের সকল কিছুই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে বিক্রি করে দেয়। মুসলমানদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ কারণে তাঁরা তাদের জীবন, ধন-সম্পদ সকল কিছুই মহান আল্লাহর কাছে জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। মহান আল্লাহও পবিত্র কুরআনে বলেছেন, আমি তাদের প্রাণ এবং ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। সুতরাং বাইয়াত করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর কাছে নিজের সমগ্র সত্তাকে বিক্রি করে দেয়া।

মদীনায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেখানে এমন একজন প্রশিক্ষকের প্রয়োজন ছিল যিনি মানুষকে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিবেন। নবী করীম (সাঃ) এই অভাব উপলব্ধি করে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে প্রশিক্ষক হিসাবে মনোনীত করে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর এ মহান সাহাবীই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে পতাকা বহনকারী। তিনি মদীনায় আগমন করে হযরত আসয়াদ ইবনে জুরারাহ (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত আসয়াদ (রাঃ) মদীনার একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল।

হযরত মুসআব (রাঃ) একজন দক্ষ সংগঠক এবং ভারসাম্যমূলক মেজাজের অধিকারী ছিলেন। সাবলীল ভাষায় তিনি ইসলামী আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারতেন এবং তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলীর কারণে নবী করীম (সাঃ) তাকেই মদীনায় ইসলামী কার্যক্রম শুরু ও আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য মনোনয়ন দান করেছিলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) মদীনায় গিয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামের পক্ষে জনমত গঠন করেন এবং মদীনার মানুষকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের বিজয় কেতন উড়তে থাকে। তিনি কতটা দক্ষ সংগঠক এবং তাঁর মেজাজ কতটা ভারসাম্যমূলক ছিল, তা একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয়। এক জনসমাবেশে তিনি মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করছিলেন। এমন সময় বনী আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবনে হুদাইর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উত্তেজিতভাবে তাঁর কাছে এলো।

সমবেত মুসলমানগণ লোকটির রণমূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। হযরত মুসআব (রাঃ) তাঁর দিকে মুখে হাসি টেনে তাকিয়ে রইলেন। তিনি নির্ভীকভাবে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলেন। উসাইদ ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'তুমি আমার দেশের লোককে বিভ্রান্ত করছো। তোমার যদি জীবিত থাকার সাধ থাকে তাহলে এই মুহূর্তে মদীনা ত্যাগ করো'।

মুখে মধুর হাসি টেনে হযরত মুসআব (রাঃ) তাকে বললেন, 'আপনি আমার কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আমি চলে যাবো। আপনি দয়া করে একটু বসুন'।

তাঁর কথা যাদুর মতই ক্রিয়া করলো। উসাইদ নীরবে সে বৈঠকে উপবেশন করলো। হযরত মুসআব (রাঃ) প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআনের ব্যাখ্যা পেশ করলেন। উসাইদ তখন মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার কুরআন শুনছেন। তাঁর চেহারায় আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলো। তিনি বললেন, 'তুমি যা বলছো তা অত্যন্ত

সুন্দর এবং যুক্তির কথা। তোমার এই আদর্শ গ্রহণ করতে হলে কি করতে হবে?' হযরত মুসআব (রাঃ) প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার পর তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

আউস গোত্রের নেতার নাম ছিল সাদ ইবনে মায়াজ। সমগ্র গোত্রে তাঁর মতো প্রভাবশালী অন্য কোনো নেতা ছিল না। গোত্রের প্রতিটি মানুষ তাঁর ইশারায় প্রাণদান করার জন্য প্রস্তুত থাকতো। নবী করীম (সাঃ) এর প্রেরিত দূত হযরত মুসআব (রাঃ) তাঁর কাছে গেলেন ইসলামের আদর্শ নিয়ে। সাদ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। হযরত মুসআব (রাঃ) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলেন। কুরআনের প্রভাবে সাদের ভেতরের জগৎ ইসলাম গ্রহণের জন্য উর্বর হয়ে উঠলো। মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে গোত্রের প্রতিটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছিল। (আল্‌বিদায়াতু ওয়ান্‌নেহায়াহ্‌, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৪৯)

হযরত মুসআব (রাঃ) মদীনায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী জনমত গঠন করলেন। ইসলাম এবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ পরিচালনা করবে, সে মুহূর্ত প্রায় সমাগত। ক্ষণিক পরেই যেন বিজয়ের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হবে। সে লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়। হযরত মুসআব (রাঃ) তাঁর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) কে অবগত করার লক্ষ্যে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। পুনরায় হজ্জের মৌসুম সমাগত হলো। মদীনা থেকে লোকজন হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতেই মুসলমান হয়েছিল। হজ্জ আদায় কালে তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে কথা বলে জানিয়ে দিলেন আকাবায় পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, 'মদীনা থেকে আমরা আমাদের গোত্রের অমুসলিমদের সাথে হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যাত্রা করলাম। সে সময় আমরা নামায আদায় করি এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি। আমাদের গোত্রপতি বয়সে প্রবীণ বারা ইবনে মারুর আমাদের বললো, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জানাবো। তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা জানি না। আমি এখন থেকে কা'বার দিকে পেছন ফিরে নামাজ আদায় করবো না, কা'বার দিকে মুখ করেই নামাজ আদায় করবো'।

আমরা তাকে জানালাম, 'আমাদের নবী বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করে থাকেন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করি'।

গোত্রপতি জানালেন, 'তাহলে আমি কা'বা এবং বাইতুল মাকদিস এই উভয় দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করবো'।

আমরা তাকে জানালাম, 'আমরা তোমার মত করবো না। আমাদের নবী যেমন করেন আমরাও তেমন করে নামায আদায় করবো'।

পথে আমরা নবী করীম (সাঃ) এর অনুকরণে নামায আদায় করতাম আর তিনি তাঁর মত অনুযায়ী নামায আদায় করতেন। মক্কায় আসার পরে তিনি আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমাকে নবীর কাছে নিয়ে চলো। তোমাদের কথায় আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো আমি ভুল না ঠিক করেছি'।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, 'আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সন্ধানে বের হলাম। তাঁকে আমরা চিনতাম না। কারণ ইতোপূর্বে আমরা কেউ তাঁকে দেখিনি। মক্কার একজন লোককে আমরা জানালাম, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আমরা চিনি না কিন্তু তাঁর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক'। লোকটি আমাদেরকে প্রশ্ন করলো, আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চাচা আব্বাসকে চিনি কিনা। আমরা তাকে জানালাম, তাঁকে আমরা চিনি। কারণ সে আমাদের গোত্রের পাশ দিয়ে অনেক বার আসা যাওয়া করেছে। লোকটি আমাদেরকে জানালো, মক্কার ঘরে হযরত আব্বাসের পাশে যাকে বসে থাকতে দেখবে সেই হলো তোমাদের কাঙ্খিত ব্যক্তি।

আমরা কা'বাঘরে প্রবেশ করে হযরত আব্বাসকে দেখলাম এবং তাঁর পাশে অপূর্ব সুন্দর একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখলাম। আমরা সালাম দিয়ে তাঁর পাশে বসলাম। নবী করীম (সাঃ) তাঁর চাচাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাচা, আপনি কি এদেরকে চিনেন?'

হযরত আব্বাস বললেন, 'আমি এদেরকে চিনি। এদের একজন হলেন কা'ব ইবনে মালিক আরেকজন হলেন গোত্রপতি বারা ইবনে মারুর'।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, এবার আমার অবাক হবার পালা। নবী করীম (সাঃ) আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনি সেই বিখ্যাত কবি কা'ব ইবনে মালিক!'

আমি কুণ্ঠিত কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আমিই সেই ব্যক্তি'।

এ সময় গোত্রপতি বারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি মক্কায় যাত্রা করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম আমি মক্কাকে পিছনে করে নামায আদায় করবো না। মক্কাকে সামনে করে নামায আদায় করবো। কিন্তু আমার সাথীরা আমার সাথে একমত নন। আমি সন্দেহের মধ্যে আছি। আপনি বলে দিন আমি ঠিক করেছি কিনা'।

নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তুমি একদিকে মুখ দিয়ে নামায আদায় করতে, ধৈর্যের সাথে সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করলে উত্তম হতো'।

এরপর গোত্রপতি বারা আমাদেরকে অনুসরণ করে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকলেন। আমরা হজ্জের অনুষ্ঠান আদায় করে পরবর্তী রাতে নবী করীম (সা:) এর সাথে আকাবায় মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এ সময় আমাদের সাথে মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ছিলেন। আমরা তাঁকেও আমাদের সাথে নিলাম। জাবির নামে আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের সাথে ছিল। আমারা কোথায় কি করতে যাচ্ছি তা কাউকে জানালাম না।

পরে আমি জাবিরকে বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি যে জীবন ব্যবস্থা মেনে চলেন তা ঠিক না। আপনি মৃত্যুর পরে জাহান্নামে যান এটা আমরা চাই না। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন'।

তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাকে আমরা জানালাম, আজ রাতে আমরা নবী করীম (সা:) এর সাথে আকাবায় সাক্ষাৎ করবো। পরে তিনি আমাদের পথ প্রদর্শনকারী হয়েছিলেন। সেই রাতে আমরা আমাদের সাথীদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলাম এবং গভীর রাতে উঠে আমরা আকাবার দিকে গোপনে যাত্রা করলাম। সে সময় আমাদের সংখ্যা দুইজন নারীসহ মোট ৭৩ জন ছিল। আমরা সেখানে সমবেত হয়ে নবী করীম (সা:) এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর চাচা হযরত আব্বাসকে সাথে নিয়ে এলেন। হযরত আব্বাস সে সময় পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করেননি কিন্তু তিনি রাসূল (সা:) এর নিরাপত্তার জন্য তাঁর সাথে থেকে তাঁর কাজে সহায়তা করতেন।

এরপর হযরত আব্বাস সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে সমবেত মদীনাবাসী! আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ (সা:) এর মর্যাদা কতটা উচ্চে। তাঁকে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিপদ থেকে এ পর্যন্ত নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করেছি। তিনি তাঁর এলাকাবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব কর্ম সম্পাদন করেছেন। এ কারণে তিনি আমাদের মধ্যে সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকারী। তবুও তিনি আপনাদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করছেন এবং আপনাদের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ। এখন আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, আপনারা যে ওয়াদা তাঁকে দিচ্ছেন সে ওয়াদা শেষ পর্যন্ত পালন করতে পারবেন কিনা। তাঁর নিরাপত্তাদান করতে পারবেন কিনা। তাঁর সব ধরণের দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা। কারণ তিনি আমাদের মধ্যে নিরাপত্তা এবং সম্মানের সাথেই অবস্থান করছেন'।

হযরত আব্বাস (রা:) এর কথা শেষ হতেই আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমরা সকল কিছুতেই রাজি আছি, আপনি আমাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন'।

নবী করীম (সা:) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে উপস্থিত সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার চাই, তোমরা তোমাদেও পরিবার-পরিজনের যেভাবে দেখাশোনা করো, যেভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো, আমার ক্ষেত্রে তেমনই করবে কিনা'।

আমাদের গোত্রপতি বারা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে নবী করীম (সা:) এর হাত ধরে বললেন, 'যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর নামে শপথ করে ওয়াদা করছি, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের যেভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি সেই একইভাবে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো। আপনি আমাদের যেদিকে পরিচালিত করবেন সেদিকেই আমরা যাবো। আমরা যোদ্ধা জাতি, তরবারীর ছায়ায় আমরা লালিত পালিত। আমরা অস্ত্র এবং যুদ্ধের মধ্যেই জীবিত থাকি। আমরা আপনার অনুগত্য করবো'।

এরপর আরেকজন নেতা আবুল হাইসাম বললো, 'আমরা ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছিলাম এবং সে সম্পর্ক শেষ করে দিতে যাচ্ছি। (অর্থাৎ আপনাকে গ্রহণ করার অর্থই হলো ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্ক শেষ করে দেয়া) আপনার জন্য আমরা ত্যাগ স্বীকার করবো, এরপর আপনি যখন বিজয়ী হবেন তখন আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না তো?'

তাঁর কথা শুনে নবী করীম (সা:) মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তোমাদের জীবন এবং মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখের চিরদিনের সাথী হয়েই তোমাদের সাথে অবস্থান করবো। তোমাদের রক্তকে আমি আমার নিজের রক্ত বলে মনে করবো। আমি চিরকালের জন্য তোমাদের আর তোমরা আমার। তোমরা যার সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো এবং তোমরা যার সাথে আপোষ করবে আমিও তার সাথে আপোষ করবো। যারা তোমাদের শত্রু তারা আমারও শত্রু, আর যারা আমার শত্রু তারা তোমাদেরও শত্রু'।

এরপর নবী নবী করীম (সা:) সমবেত লোকদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে ১২ জন লোককে প্রতিনিধি করে আমার কাছে প্রেরণ করো। তাঁরা তাদের লোকদের কাছ থেকে আমার পক্ষ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করবে'। এরপর তিনি আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন, আমরা যেন নিজেদের অবস্থানে চলে যাই। আমাদের মধ্যে থেকে আব্বাস ইবনে উবাদা বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আপনি আমাদেরকে আদেশ করলে আমরা ইসলামের শত্রুদের ওপরে আক্রমণ করতে পারি'।

নবী করীম (সা:) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে এ ধরনের কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তোমরা নিজেদের অবস্থানে চলে যাও'।

নবী করীম (সাঃ) এর কাছে মদীনার লোকজন যখন বাইয়াত গ্রহণ করছিল, তখন তাদের মধ্য থেকে হযরত সা'দ (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমরা কি জানো তোমরা কোন্ কথার ওপর বাইয়াত করছো? নবীর কাছে বাইয়াত করার অর্থ হলো সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এবং জ্বীনকে নিজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। গোটা দুনিয়াকে নিজের শত্রুতে পরিণত করা'।

সমবেত লোকগুলো সমস্বরে বলে উঠেছিল, 'আমরা জেনে বুঝেই বাইয়াত করছি। এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তিকে আমরা ভয় করি না। আমরা তরবারীর ছায়ায় লালিত পালিত'।

যে ১২ জনকে নবী করীম (সাঃ) আহ্বায়ক নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিল বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি। নিজের সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাদের মতো ব্যক্তিত্ব ইসলামের সহযোগী হওয়ার অর্থই ছিল গোত্রের সকল জনশক্তি ইসলামের পক্ষাবলম্বন করা। পৃথিবীতে মহাসত্য প্রাথমিক অবস্থায় নিঃসঙ্গ থাকে এ কথা সত্য, কিন্তু এ নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটতে খুব একটা সময়ের প্রয়োজনও হয় না। একটি আদর্শের ক্ষেত্রে দশ বিশ বছর তেমন একটা সময় না। এই পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি আন্দোলন বিজয়ী হতে কয়েক যুগ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ চরম প্রতিকুল অবস্থা পাড়ি দিয়ে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করে তারপর সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত হয়েছেন।

ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে হলে দু'টো শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়। প্রথম শর্ত হলো, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত একদল নিষ্ঠাবান সুশৃংখল কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। যারা আদর্শের জন্য যে কোনো ত্যাগ হাসি মুখে স্বীকার করতে পারে। যে কোনো ধরনের নির্যাতন থেকে শুরু করে অর্থ-সম্পদের শেষ তলানিটুকুও নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে প্রাণদানও করতে পারে। যে কর্মী বাহিনী প্রশ্নাতীতভাবে নেতৃ আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে।

দ্বিতীয় যে শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তাহলো, আদর্শের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন থাকতে হবে। কারণ ইসলামী আদর্শ কোনো জাতির ওপরে চাপিয়ে দেয়ার আদর্শ নয় এবং ইসলাম কোনো জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ঘাড়ের ওপরে বসতে মোটেও আগ্রহী নয়। এ কারণে জনসমর্থন যোগাড় বা জনমত গঠনের জন্য এ আদর্শের কর্মীদের প্রতিটি মুহূর্তে তৎপর থাকতে হয়। মক্কা এবং মদীনার ইতিহাসে আমরা এ কথার বাস্তব প্রমাণ দেখতে পাই। নবী করীম (সাঃ) মক্কায় কর্মী গঠন করেছেন। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে যে গুণ এবং মানসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন সে ধরনের কর্মী মক্কাতেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মক্কায় ইসলামের পক্ষে জনমত গঠিত

হয়নি। মদীনায় ইসলামের পক্ষে ক্রমশঃ জনমত গঠন হয়। ফলে যে বিপ্লব হবার কথা মক্কায় তা হয়েছিল মদীনায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রক্রিয়াতেই ইসলামকে বিজয়ী করে থাকেন এবং এটিই নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত।

চাঁদ নয়, আপনিই বেশি সুন্দর

মদীনায় হিজরতকালে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টি এড়িয়ে নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সে পথ ধরেই হযরত যুবাইর (রাঃ) সিরিয়া থেকে ব্যবসায়িক পণ্যসহ মক্কায় ফিরছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত যুবাইর (রাঃ) তাঁদেরকে কয়েকটি কাপড় উপহার দিলেন। সেই দুঃসময়ে অসহায় অবস্থায় ঐ সামান্য কাপড় যেন অসামান্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরে পুনরায় নবী করীম (সাঃ) বাধার মুখোমুখি হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধিরা বিশ্বনবী (সাঃ) কে গ্রেফতার করতে পারলে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে তা দূর-দূরান্তেও প্রচার করে দিয়েছিল। পুরস্কারের লোভে অনেকেই ননবী করীম (সাঃ) এর সন্ধানে বের হয়েছিল। আসলাম গোত্রের প্রধান বারিদা তাঁর অনুগত ৭০ জন সাহসী যোদ্ধাসহ অবরোধ করেছিলো। নবী করীম (সাঃ) সে পথেই মদীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

সামনে একদল অস্ত্রে সজ্জিত লোক দেখে নবী করীম (সাঃ) মধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াৎ করতে থাকলেন। পবিত্র কুরআনের জান্নাতি সুরের তরঙ্গ সম্মুখে দণ্ডায়মান মানুষগুলোর কানে প্রবেশ করে তাদের ভেতরের জগৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিল। যেখানে ছিল অন্ধকার সেখানে পবিত্র কুরআনের সুর মুহূর্তে তাওহীদের পবিত্র উজ্জ্বল শিখা জ্বালিয়ে দিল। আসলাম গোত্র প্রধান বারিদা বিনয়ের ভঙ্গিতে রাসূল (সাঃ) এর দিকে এগিয়ে এলেন।

নবীর পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। এই মানুষটি সম্পর্কে মক্কার আবু জাহিল আর তার দলবল যে মিথ্যে অপবাদ প্রচার করেছে তা যেন গোত্র প্রধান বিশ্বনবী (সাঃ) এর পবিত্র চেহারায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি দেখলেন। পবিত্র চেহারা দেখে তাঁর যেন সাধ আর মিটে না। মানুষটির মুখে সামান্যতম কলংকের আঁচড় নেই। তাহলে আবু জাহিলরা যা প্রচার করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা! আকাশের চাঁদেও সামান্য কালো দাগ আছে, কিন্তু আল্লাহর নবীর চেহারায় তা-ও নেই।

বারিদা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। দীন ভিখারীর মতই বিশ্বনবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে জানালেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের ক্ষমা করুন! অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আপনার বিরুদ্ধে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের আপনি মুসলমানদের দলে স্থান করে দিন’।

একথা বলেই আসলাম গোত্র প্রধান বারিদা কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর সকল সাথী বজ্রকণ্ঠে কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মহান আল্লাহর কি অদ্ভুত ব্যবস্থা! কোথায় নবী করীম (সাঃ) একাকী ছিলেন। মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর কোনো নিরাপত্তার সামান্য ব্যবস্থা ছিল না। আর এখন তাঁর নিরাপত্তায় ৭০ জন বীর যোদ্ধা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রহরা দিচ্ছে। বারিদা (রাঃ) এর সাথের যোদ্ধারা তাদের শিরস্ত্রাণ বর্শার অগ্রভাগে বেঁধে পতাকা বানিয়ে নিয়ে সে পতাকা উড়িয়ে সামনে অগ্রসর হলো। এক বিশাল মিছিল মহাসত্যের বিজয় কেতন উড়িয়ে আল্লাহর নবীকে পরিবেষ্টন করে মদীনা অভিমুখে এগিয়ে চললো।

ইসলামপন্থীদের প্রাণপ্রিয় শ্লোগান 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনীতে দিকদিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠলো। মহাত্রাসে বাতিল শক্তি থরথর করে কেঁপে উঠলো। ইসলাম বিদ্বেষী বন্ধুরা দেখুন, ইসলাম তরবারীর শক্তিতে নয়, কোন্ শক্তির কারণে ইসলাম পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অনুধাবন করে অনুগ্রহ পূর্বক সত্য উপলব্ধি করে উদারতার পরিচয় দিন।

৭০ জন রক্ত পিপাসু ভয়ংকর সন্ত্রাসী কিভাবে কোন্ মায়াবলে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত হলো! যারা নবী করীম (সাঃ) কে হত্যা করে ১০০ উট পুরস্কার গ্রহণ করবে, তাঁরাই তাঁর সামনে এসে নিজেদের ঘৃণ্য সন্ত্রাসী প্রবৃত্তিকে হত্যা করে এমন এক জীবন গ্রহণ করলো, পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে শতকোটি মানুষ পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

৭০ টি ঘোড়ার পিঠে ৭০ জন বীর যোদ্ধা, তাদের হাতের সুতীক্ষ্ম তরবারী সূর্য কিরণে ঝলসে উঠে ইসলামের বিজয় ঘোষণা করলো। বারিদা (রাঃ) সামনে অগ্রসর হচ্ছেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তাঁর সে কবিতার অর্থ হলো, 'শান্তির সম্রাটের আগমন ঘটেছে। মুক্তিদাতা আগমন করছেন। যিনি সন্ধি স্থাপন করবেন তিনি আগমন করছেন। যিনি সত্য এবং ন্যায় স্থাপন করে পৃথিবীতে জান্নাতের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবেন তিনি আগমন করছেন। পৃথিবীবাসীর কাছে আজকের এটাই শুভ সংবাদ'। (ইবনে জওযী, আল ইসাবা, মাদারেজ)

বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনা যাওয়ার সহজ পথ পরিহার করে গোপন পথে যাত্রা করেছিলেন। সে পথ ছিল বড় বন্ধুর। পথ প্রদর্শক তাদেরকে নিয়ে মক্কার নিম্ন অঞ্চল দিয়ে প্রথমে উপকূল এলাকায় গিয়েছিল। সেখান থেকে উসফান এলাকার নিম্ন অঞ্চল দিয়ে আমাজের নিম্ন এলাকা হয়ে কুসাইদ এলাকা অতিক্রম করে খাররার নামক স্থানে এসে

থেমে ছিল। তারপর লেকফ এবং মাদলাজ লেকফ এলাকা অতিক্রম করে মাদলাজ মাহাম নামক স্থানে উপনীত হয়েছিল।

এরপর মারজাহ মাহাজ নামক স্থান, সেখান থেকে মারজাহ যিল গাদাওয়াইন নামক স্থান, সেখান থেকে বাতন যি, কাশর এবং জাদাজিদ, আজরাদ এসে থেমেছিল। তারপর মাদলাজা তিহিন এবং আবাবিদ আল ফাজ্জাহ অতিক্রম করেছিল। এরপর তাঁরা আরজ নামক স্থানে এসে উপনীত হয়েছিলেন।

এই স্থানের অধিবাসীরা নবী করীম (সাঃ) কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পূর্ব হতেই প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিল। এখানে আসলাম গোত্রের হযরত আওস ইবনে হাজার (রাঃ) তাঁর নিজের উটে আরোহন করিয়ে এবং তাঁর এক গোলামকে নবী (সাঃ) এর সাথে দিয়ে মদীনা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এরপর তাঁরা রুকুবার দক্ষিণ পাশ অতিক্রম করে সানিয়াতুল আয়ের পথ দিয়ে বাতনু রিম নামক স্থানে এসে উপনীত হয়েছিল। এখান থেকেই বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনার কুবা এলাকায় বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে এসে পৌঁছেছিলেন। সেদিন তারিখ ছিল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ এবং সময় ছিল প্রখর রোদে ঝলসানো দুপুর। (ইবনে হিশাম এবং ইবনে ইসহাক)

মদীনার নীলিমায় মক্কার সূর্য

মহাকাশের সূর্যের সাথে বাসযোগ্য ক্ষুদ্রগ্রহ এ পৃথিবীর বন্ধন রজ্জু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু ধরা না পড়লেও সূর্য তাপেই পৃথিবী ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। যে স্থান থেকে সূর্য উদিত হয় সে স্থান মেঘমালা আচ্ছাদিত থাকলেও সূর্যের উদয় পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আপন গতি পথেই সূর্য এগিয়ে যেতে থাকে। পূর্বাকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে পশ্চিমাকাশে সূর্য আপন প্রভা বিকিরণ করে। মদীনার সাথে বুঝি নবী করীম (সাঃ) এর নাড়ির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করে মক্কায় অবস্থান করেন কিন্তু তাঁর সে সম্পর্ক কারো দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও তাঁরই প্রভাবে মদীনার আনসাররা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মক্কা থেকে তিনি মহাসত্যের যে তাপ বিকিরণ করতেন, সে তাপে মদীনা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়েছিল।

মক্কার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, মহাসত্যের সূর্য উদিত হলো কিন্তু সে সূর্য ঘন নিকষ কালো মেঘের কারণে মক্কার আকাশে স্বাধীনভাবে তাঁর তাপ বিকিরণ করতে সক্ষম হলো না। দুর্ভাগ্য মক্কাবাসীর। তারপর কালক্রমে মক্কার সে সূর্য মদীনার আকাশে এসে উদিত হয়েছিল। মদীনার মেঘমুক্ত আকাশে মহাসত্যের সে সূর্য স্বাধীনভাবে তাপ বিকিরণ করেছিল। সময়ের ব্যবধানে সে তাপ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

আজ নবী করীম (সাঃ) শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই, তিনি আর কোনোদিন এ পৃথিবীতে মানুষের সামনে শারীরিকভাবে মানুষের জাগ্রত অবস্থায় সবার সামনে আসবেন না। কিন্তু তিনি যে তাপ বিকিরণ করেছেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁরই অনুসারীগণ শত সহস্রগুণ শক্তিশালী করে পৃথিবীময় বিকিরণ করেছিল। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় সে তাপ ছড়িয়ে পড়ার গতি কিছুটা হ্রাস পেলেও মহাসত্যের তাপের গতি যে পুনরায় বৃদ্ধি লাভ করবে তার সকল নিদর্শন পৃথিবীব্যাপী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে শুভ মুহূর্ত আগত প্রায় যখন হেরার রাজ তোরণ পুনরায় বিশ্বব্যাপী প্রজ্জ্বলিত হবে। সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত লিবিয়ার ঘটনাবলী এ কথারই স্বাক্ষর বহন করছে।

হিজরতকালে দীর্ঘ চৌদ্দদিন কুবায় অবস্থান করে একটি মসজিদ নির্মাণের পরে বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি যে পথ দিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছেন সে পথের দু'ধারে উৎসুক জনতা আল্লাহর নবীর পবিত্র চেহারা মুবারক একটি বার দেখার জন্য গভীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে দেখার সাথে সাথে জনতা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল। নবী করীম (সাঃ) উটের পিঠে, ধীর মন্থর পায়ে উট এগিয়ে যাচ্ছে মদীনার দিকে, রাসূলের শেষ বিশ্রামস্থলের দিকে।

সেদিন ছিল পবিত্র জুমুয়াবার। পথে জুমা নামাজের সময় হলে নবী করীম (সাঃ) বনী সালেম গোত্রে জুমা নামাজ আদায় করলেন তাঁর অনুসারী মুসলমানদের জীবনে এটাই ছিল প্রথম জুমা নামাজ। এখানেই তিনি জুমার প্রথম খুত্বাদান করেছিলেন। এই মসজিদের নাম হয়েছে বাতনুল ওয়াদির মসজিদ বা ওয়াদিয়ে রানুনার মসজিদ। নবী করীম (সাঃ) এর প্রথম জুমা নামাজ আদায়ের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ।

বনী সালেম গোত্রের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের হৃদয়ের স্বপ্ন, যদি আল্লাহর রাসূল তাদের মাঝে থাকতেন! তাঁরা দলবদ্ধভাবে এসে নবীর সামনে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের যা কিছু আছে সবই আপনার পবিত্র কদমে উৎসর্গিত। আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য থাকতেন'!

দুর্ভাগ্য তৎকালীন মক্কাবাসীর, কি অমূল্য রত্ন তারা হারালো বুঝতে পারলো না। যখন বুঝলো তখন সে রত্ন হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন সে অমূল্য সম্পদের অধিকারী মদীনাবাসী। আল্লাহর রাসূলের মুখে মধুর হাসি। তিনি বললেন, 'আমার উটকে তোমরা যেতে দাও, মহান আল্লাহ এই উটকে নির্দেশ দান করেছেন কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও রাসূল (সাঃ) কে নিজেদের অধিকারে রাখার জন্যে গোত্রে গোত্রে দাঙ্গা সৃষ্টি হতো। উট এগিয়ে যাচ্ছে, পথে যে গোত্রই পড়ছে সেই গোত্রই

ঐ একই আবেদন পেশ করছে। নবী করীম (সাঃ) মুখে চাঁদের হাসি ফুটিয়ে সবাইকে একই কথা বলছেন। অবশেষে উট তাঁকে বহন করে মদীনা শহরে পৌঁছলো।

পূর্বেই শহরে সংবাদ এসেছিল, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মাদ (সাঃ) আজ এই শহরে তাঁর পবিত্র কদম রাখবেন। মদীনার আনাচে কানাচে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। কুবা থেকে মদীনা শহর পর্যন্ত কোনো একটি স্থান শূন্য ছিল না। পথের দু'পাশে ছিল মানব বন্ধন আর অগণিত জনতার ভীড়। মানুষ উঁচু স্থানে আরোহন করে প্রতিযোগিতা করছিল, কে আগে আল্লাহর নবীকে দেখে নিজের তৃষ্ণার্ত নয়ন সার্থক করবে।

মদীনার অবরোধপুরবাসিনী নারী গোষ্ঠী, শিশু, বালক-বালিকারা গৃহের ছাদে উঠে মধুর কণ্ঠে তালে তালে তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছিল। এ সকল কবিতা ছিল রাসূলের প্রশংসায় নিবেদিত। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ সে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকবে। তাঁরা মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করছিল–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا– مَنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ– وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا– مَادَعَى لِلّٰهِ دَاعِ–

'চন্দ্র হয়েছে উদয় বিদা পর্বতের ঘাঁটি হতে, মোদের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা করা বাধ্যতামূলক, যে পর্যন্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করবে'।

মদীনার বালিকাগণ বিশেষ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র যাকে বলা হয় 'দফ্', এই দফ বাজিয়ে কোরাশ কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছিল–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِىَ النَّجَّارِ– يَا حَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ–

'নাজ্জার বংশের বালিকা আমরা, মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের সর্বোত্তম প্রতিবেশী'।

আল্লাহর নবী (সাঃ) পরম মমতাভরা দৃষ্টিতে শিশু মেয়েদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মধুর কণ্ঠে তাদেরকে বললেন, 'আমাকে কি তোমরা চাও?'

শিশু মেয়েরা আত্মহারা হয়ে উঠলো। তাঁরা সমবেত কণ্ঠে খুশীর আবেগ প্রকাশ করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনাকে আমরা চাই'।

বিশ্বনবী (সাঃ) তাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে বললেন, 'আমিও তোমাদেরকে চাই'।

উট এগিয়ে গেল, সামনে পড়লো বিশ্বনবী (সাঃ) এর মামাদের পরিবার বনী আদী নাজ্জারের গোত্র। এই গোত্রেরই মেয়ে ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর দাদার মাতা সালামা বিনতে আমর। এই গোত্রের লোকজন নবীর উটের সামনে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে আবেদন পেশ করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের সবকিছুই আপনার, আপনি আমাদের সাথে অবস্থান করুন!'

নবী করীম (সাঃ) তাদেরকেও বললেন, 'উটের প্রতিই আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করেছেন, সে আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে। তোমরা উটকে পথ করে দাও'।

উট এবার এগিয়ে গিয়ে বনী মালিক ইবনে নাজ্জারের বাসস্থানের সামনে এসে আস্তে আস্তে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো। মসজিদে নববীর প্রবেশ দ্বার এখানেই বানানো হয়েছিল। সে সময় ঐ স্থানটি ছিল বনী নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল নামক দু'জন ইয়াতিম শিশুর। তাদেরকে লালন পালন করতো হযরত মায়াজ ইবনে আকরা। এ স্থানে বাচ্চা দু'টো তাদের খেজুর শুকাতো।

উট বসে পড়লেও নবী করীম (সাঃ) উট থেকে অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পরে উট উঠে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর উট সেখান থেকে পেছনের দিকে তাকালো যেখানে সে প্রথম বসেছিল। তারপর পুনরায় সে পূর্বের স্থানে ফিরে এসে বসে পড়লো। এবার সে একটু শব্দ করে তার গলা এবং বুক মাটির সাথে স্পর্শ করলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অনুভব করলেন, মহান আল্লাহ উটকে এই স্থানেই থেমে যেতে আদেশ করেছেন।

সামনেই ছিল হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ি। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আইউব খালিদ ইবনে যায়িদ আনসারী (রাঃ)। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে নবী করীম (সাঃ) এর সামান্য আসবাব-পত্র নামিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি তিনিই হলেন যার ঘরে মেহমান হলেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, বর্তমানে যেখানে মাসজিদে নববী অবস্থিত সেখানেই ছিল হযরত আবু আইউব (রাঃ) এর ঘর। এখানে উট এসে পৌছলে রাসূল (সাঃ) কার মেহমান হবেন তা নিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হলো এভাবে যে, উট যার ঘরের সামনে থামবে রাসূল (সাঃ) তাঁরই মেহমান হবেন। উট এসে থেমেছিল হযরত আবু আইউব (রাঃ) এর ঘরের সামনে।

পক্ষান্তরে মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার আনসারদের মধ্যে রাসূলের মেহমানদারী করা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছিলেন, 'আমি বনী নাজ্জার গোত্রে থামবো। কারণ তাঁরা আমার দাদার মামা'।

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) তাঁর আত্মীয়তার সূত্র ধরেই বনী নাজ্জার গোত্রের মেহমান হয়েছিলেন। হযরত আবু আইউব (রাঃ) বনী নাজ্জার গোত্রের একজন ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর তারিখে ছগীরে লিখেছেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁর দাদার আত্মীয়তার কারণে হযরত আবু আইউব (রাঃ) এর মেহমান হয়েছিলেন।

এই বাড়িতে বিশ্বনবী (সা:) প্রায় সাত মাস অতিবাহিত করেন। তাঁরপর মাসজিদে নববী এবং উম্মাহাতুল মুমেনিনের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা হলে তিনি সেখান থেকে মাসজিদে নববীর পাশে চলে আসেন।

হযরত আবু আইউব (রা:) এর বাড়িটা ছিল দোতলা। সে সময় একতলা আর দোতলার মধ্যবর্তী অংশ বর্তমানের দোতলা বাড়ির মত ছিল না। হয়তঃ কাঠ দিয়ে মাঝের অংশ প্রস্তুত করে তার ওপরে মাটির প্রলেপ দেয়া হত। এ কারণে ওপরের অংশে পানি পড়লে সে পানি গড়িয়ে নিচের তলায় পৌঁছতো। হযরত আবু আইউব (রা:) বিশ্বনবী (সা:) এর মর্যাদার দিক লক্ষ্য করে তাঁর কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমার মাতা-পিতা আপনার কদম মুবারকে উৎসর্গিত হোক, আপনি ওপরের তলায় অবস্থান করুন!'

নবী করীম (সা:) তাঁকে বললেন, 'আমার সাথে লোকজন দেখা সাক্ষাৎ করতে আসবে, দোতলায় থাকলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা অসুবিধা হবে। আমি নিচের তলাতেই অবস্থান করি'।

এভাবে তিনি সে বাড়ির নিচের তলাতেই অবস্থান করতে থাকলেন। হযরত আবু আইউব (রা:) তাঁর নিজের অনুভূতির কথা এভাবে বলেন যে, 'আমরা তাঁর জন্য খাবার প্রস্তুত করে সবটুকু খাবারই তাঁর কাছে প্রেরণ করতাম। আল্লাহর রাসূল আহার করে অবশিষ্টাংশ ফেরৎ পাঠাতেন। আমরা লক্ষ্য করতাম খাদ্য পাত্রের কোনো কোনো স্থানে রাসূলের পবিত্র আঙ্গুলের চিহ্ন পাওয়া যায়। যেসব স্থানে চিহ্ন দেখতাম সে স্থান থেকেই আমরা আহার করতাম। আমরা অধিক বরকতের আশায় এমন করতাম। একদিন আমরা খাবার প্রস্তুত করার সময় একটু রসুন বা পিঁয়াজ দিয়েছিলাম। সে খাবার রাসূলের কাছ থেকে যখন ফেরৎ এলো তখন দেখলাম, রাসূলের পবিত্র আঙ্গুলের চিহ্ন নেই খাদ্য পাত্রে। আমরা অনুভব করলাম তিনি খাদ্য আহার করেননি। আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম। জানি না আমাদের দ্বারা এমন কী ভুল হয়ে গেল যে, তিনি আহার করলেন না?

আমি দ্রুত তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আপনার জন্য আমাদের মাতা-পিতা কুরবান হোক! আপনি খাদ্য ফেরৎ পাঠিয়েছেন অথচ আপনার হাতের চিহ্ন নেই। আমরা বরকতের আশায় আপনার হাতের চিহ্ন দেখে সেখান থেকে আহার করতাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের কি অপরাধ!'

নবী করীম (সা:) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পরম স্নেহের স্বরে বললেন, 'অন্য কোনো কারণ নয়, আমি আজ খাবারের মধ্যে একটি গাছের গন্ধ পেয়েছি। তা আহার করলে মুখে গন্ধ

হয়। অনেকের সাথে আমাকে কথা বলতে হয়, মুখ থেকে গন্ধ বের হবে। এ কারণে আমি আহার করিনি। তোমরা আহার করতে পারো'।

হযরত আবু আইউব (রাঃ) জবাবে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! আপনি যা পছন্দ করেন না, আমরাও তা পছন্দ করবো না'। (উসুদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৮১, মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা নং-১৯৮, সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৯)

নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ) সহ অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে ক্ষেত্র বিশেষে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলতেন। এ কারণে তিনি কোনো গন্ধযুক্ত খাবার পছন্দ করতেন না। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর কাছে কোনো ধরনের গন্ধযুক্ত খাদ্য প্রেরণ করা হতো না। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই ঘটনার পর থেকে হযরত আবু আইউব (রাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন রসুন বা পিঁয়াজ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, 'তখন আমরা বাধ্য হয়েই ওপর তলায় অবস্থান করি। একদিন রাতে হঠাৎ করেই পানির পাত্রটা ভেঙ্গে গেল। নিচের তলায় রাসূল (সাঃ) অবস্থান করছেন। পানি এখন গড়িয়ে নিচের তলায় চলে যাবে। আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আমাদের শোবার মত যে কম্বলটা ছিল তা পানির ওপর বিছিয়ে দিয়ে সে পানি শোষণ করালাম। তারপর আমরা ঘরের এক কোণে সমগ্র রাত ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে অতিবাহিত করলাম। সকালে নবী করীম (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত হয়ে আমরা আমাদের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন ওপর তলায় চলে যান। আমাদের অনুরোধে তিনি আমাদের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওপরে চলে গেলেন'। (উসুদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৮১, হায়াতুস সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩২৮-৩২৯, সীরাতে ইবনে হিশাম,প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৮)

বিশ্বনবী (সাঃ) ইসলামের প্রথম শিক্ষক, মুবাল্লিগ, প্রথম দুত হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) এর সাথে হযরত আবু আইউব (রাঃ) এর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের উভয়ের চরিত্রে অপূর্ব সাদৃশ্য ছিল। উভয়ের মধ্যেই প্রাণ প্রাচুর্য এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল অদ্ভুত ধরনের। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৮৪)

বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনায় আগমন করেই হযরত যায়েদ (রাঃ) কে দু'টো উট এবং পাঁচশত দেরহাম দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন পরিবারের সদস্যদের মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাঁর পরিবারের

সদস্যদের নিয়ে মদীনায় চলে আসার জন্য। তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর সাথেই অর্থাৎ নবী পরিবারের সদস্য এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পরিবারের সদস্যগণ একত্রেই মদীনায় আগমন করেন। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) এর এক কন্যা সে সময় আসতে পারেননি। তিনি তাঁর স্বামী হযরত উসমান (রাঃ) এর সাথে সে সময় হাবশায় অবস্থান করছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) কে ঘীরে মদীনার বালক-বালিকাগণ যে কবিতা আবৃত্তি করছিলো, তার মধ্যে 'বদর' শব্দ উল্লেখ রয়েছে। পূর্ণিমার পূর্ণ শশীকে আরবী ভাষায় 'বদর' বলা হয়। সাধারণত চন্দ্রকে আরবী ভাষায় 'ক্বামার' বলা হয়। মদীনায় হিজরতকালে নবী করীম (সাঃ) কে শুধু চাঁদের সাথে তুলনা না করে তাঁরা পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের সাথে তুলনা করে আবৃত্তি করছিলো, 'আজ আমাদের ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হয়েছে'। মদীনায় হিজরতকালে নবী করীম (সাঃ) কে দেখে মদীনার শিশু-কিশোররা যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলো তা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রতিদিন কোথাও না কোথাও আবৃত্তি হতে থাকবে, এটি কখনো পুরনো হবে না।

পূর্ণিমা ব্যতীত চাঁদকে কখনোই পূর্ণ অবয়বে দেখা যায় না, পূর্ণিমার তিথীতেই চাঁদকে পৃথিবীর মানুষ পূর্ণ অবয়বে দেখে থাকে। এ সময় চন্দ্রের কিরণচ্ছটা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। মক্কার একশ্রেণীর মানুষ সে সময় নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে না পারলেও মদীনার ঐ মানুষগুলো ঠিকই উপলব্ধি করেছিলো, এই মহামানবের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, গৃহযুদ্ধ ও সকল প্রকার লাঞ্ছনা, অবহেলা, অমর্যাদা এবং অপমান থেকে মুক্তি। কেবলমাত্র তাঁর অনুসরণই মর্যাদার সুউচ্চ স্থানে আরোহণের সোপান। ইতিহাস কথা বলে, নবী করীম (সাঃ) কে ঘীরে তাঁদের উপলব্ধি, তাঁদের মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, উৎসর্গ কল্পনার কোনো বিষয় ছিলো না, পৃথিবীর ইতিহাসে সকল মানব গোষ্ঠীর মধ্যে মদীনার আনসারগণ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অতুলনীয় সম্মান অর্জন করেছে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর একটি দৃষ্টান্তও নেই।

মদীনার হিজরতপূর্ব ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা অবশ্যই অবগত রয়েছেন যে, গৃহযুদ্ধ আর ইয়াহুদীদের নির্যাতন মদীনার অধিবাসীদের প্রায় নিঃশেষ করে এনেছিলো। নবী করীম (সাঃ) এর আগমন তাঁদের নিঃশেষিত ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্বে প্রাণের সঞ্চার করেছিলো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরতরে মুছে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলো। আর এ জন্যেই বোধহয় তাঁরা সেদিন নবী করীম (সাঃ) কে পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর সাথে তুলনা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মদীনার আনসারদের ওপর রহম করুন, তাঁরা শুধুমাত্র নবীপ্রেম ও আদর্শের কারণে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো একটি জাতির মধ্যে নেই। মক্কা থেকে যেসব অসহায় মুসলমান শূন্য হাতে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তাঁরা এসব অসহায় মানুষদের জন্য নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিয়েছে। যে জাতি নিজের অধিকার ব্যতীত অন্যের অধিকারের ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্য মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিল না, সেই জাতি ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজে অনাহারে থেকে অপরিচিত ব্যক্তিকে খাদ্য দিয়েছে। অন্যের সুবিধার জন্য নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা অর্থ-সম্পদ আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছে। এমনকি নিজের দুইজন স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে তাঁর দ্বীনি ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে।

ত্যাগের এই মহান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে? ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী অমুসলিম বন্ধুগণ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো জাতির ইতিহাস থেকে এ ধরনের একটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারবেন? গর্ভধারিণী মায়ের জন্য রেষ্টুরেন্টে মাত্র একটি ডলার ব্যয় করার মত হৃদয় যাদের নেই, তাদের পক্ষে এমন ধরণের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা কষ্টকরই বৈকি। 'ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে এবং তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছে' এ সব কথা যারা বলেন এবং লিখেন, তাঁরা যে লজ্জার শেষ আবরণ, বিবেকের অবগুণ্ঠন ছুড়ে ফেলেই তা বলেন তাতে সন্দেহ নেই। অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যেই যাদের গৌরব নিহিত ছিল, সেই জাতি কোন্ যাদুর স্পর্শে ত্যাগের অনুপম মহিমায় এমন তুলনাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এ সম্পর্কে অমুসলিম বন্ধুদেরকে ক্ষণিকের জন্য হলেও চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

নবী করীম (সা:) এর মদীনার ভাষণ, মানবতার মুক্তি সনদ

নবী করীম (সা:) হিজরত করে মদীনা পৌঁছার পরপরই সেখানে একটি আদর্শিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। মদীনার সিংহভাগ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর মধ্যেও দু'চারটি গোত্র ছিল যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আউস গোত্রের একটি ছোট অংশ নবী করীম (সা:)-এর আগমনের পরও তাদের ভ্রান্ত আদর্শ আঁকড়ে ধরেছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সকলেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি কিছুটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে নবী করীম (সা:) মদীনার জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ভাষণ পেশ করেছিলেন। ভাষণের সূচনায় তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করে বললেন, 'হে মানুষ! তোমরা আখিরাতের জন্য পুঁজি অর্জন করো। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে হয়তঃ কোনো ব্যক্তি দ্রুতই ইন্তেকাল করবে। তার পশু

সম্পদ পরিচালনা করার মতো কেউ থাকবে না। তখন তাকে তার প্রতিপালক প্রশ্ন করবেন, তোমার কাছে কি আমি রাসুল প্রেরণ করিনি? তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে সকল সম্পদ থেকে তুমি আখিরাতের জন্য কি প্রেরণ করেছো?'

নবী করীম (সা:) বললেন, 'তখন সে ব্যক্তি তাঁর চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। কিন্তু একমাত্র জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত ঐ জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করা। একটি খুরমা দান করে হলেও আখিরাতের পূজি অর্জন করা। যার দান করার মতো কিছুই নেই, তাঁর উচিত ভালো কথা বলে নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। কারণ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালো কাজের পুরস্কার দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেন'। (ইবনে হিশাম)

একটি বিষয় লক্ষনীয়, নবী করীম (সা:) তাঁর প্রথম ভাষণে মানুষকে আখিরাতের কথা বলেছেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর জীবনে আরাম আয়েশ ভোগ করার জন্য মানুষ প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে পরকালের জীবন অনন্ত, যার কোনো শেষ নেই। সে অফুরন্ত জীবনে মানুষ যেন অনাবিল সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে, এ কারণে তিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালার রাস্তায় দান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

যাদের অর্থ-সম্পদ দান করার মতো সামর্থ নেই তাদেরকে বলা হয়েছে, দান সামান্য হলেও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার পুরস্কার বৃদ্ধি করে দিবেন। এভাবে সামান্য কোনো কিছু দান করতে অসমর্থ হলে তার উচিত মানুষকে সৎ উপদেশ দেয়া ও মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। এসবের বিনিময়েও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

পৃথিবীতে মানুষকে সৎ বানানোর কোনো টেক্নোলজি আবিষ্কার হয়নি এবং হবেও না। একমাত্র আখিরাতের ভয় ব্যতীত মানুষ কোনোক্রমেই সৎ হতে পারে না। মানুষের মাথায় যখন এই চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকে যে, তাঁর সকল কাজের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে। তখন সে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৎ হতে বাধ্য। এ কারণেই নবী করীম (সা:) প্রথমে মানুষের অন্তরে আখিরাতের ভয় বা আল্লাহ্ ভীতি প্রবেশ করিয়েছেন। অপরদিকে সমগ্র ত্রিশপারা কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো আখিরাত। আখিরাতের আলোচনা সম্বলিত আয়াতসমূহ একত্রিত করলে তা প্রায় দশ পারার সমান হবে বলে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আলোচনার একটিই উদ্দেশ্য, তাহলো মানুষের মনে পরকালের জবাবদীহী জাগ্রত করে মানুষকে সৎ মানুষে পরিণত করা।

নবী করীম (সা:) তাঁর আরেক ভাষণে বলেছেন, 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার। আমি তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করছি। আমরা যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম এবং আমাদের নফসের প্ররোচনা থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় কামনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন তাকে কোনো শক্তি ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে না। মহান আল্লাহ এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো আইন দাতা, বিধান দাতা, ইলাহ নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। যার অন্তরে কুরআনের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, কুফুরির অন্ধকারের অধিবাসী হয়েও যে ব্যক্তি কুরআনের আলোর অধিবাসী হয়েছে, মানুষের মনগড়া কথা তথা আদর্শ ত্যাগ করে যে ব্যক্তি কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সফল হয়েছে। কারণ কুরআনের আদর্শের তুলনায় ভিন্ন কোনো আদর্শ বা কথা সুন্দর নয়'।

তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'মহান আল্লাহ তা'য়ালা যা পছন্দ করেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসো। আল্লাহ তা'য়ালার কুরআন তিলাওয়াত করো, তাঁকে স্বরণে রাখো, নিজের হৃদয়কে কঠিন হতে দিওনা। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে কাউকে নির্বাচিত করবেন এবং সৃষ্টির সকল কর্ম থেকেও কিছু কর্ম নির্বাচিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেও কিছু বান্দাকে নির্বাচিত করেছেন। মহান আল্লাহ সর্বোত্তম কথা ভালোবাসেন'।

আল্লাহ তা'য়ালার নবী (সা:) আরো বলেন, 'মানুষকে যা কিছু দান করা হয়েছে, তার ভেতরে হালালও আছে এবং হারামও আছে। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁর সাথে কারো শরীক করো না। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো। তোমরা যে কথা বলবে তা কাজে পরিণত করবে। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সত্যবাদী হবে। মহান আল্লাহর রহমত দিয়ে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে তিনি নারাজ হন'।

বিশ্বনবী (সা:) তাঁর ভাষণে একটি কথা এভাবে বলেছেন যে, 'তোমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে তার ভেতর যেমন হালাল আছে এবং হারামও আছে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করো এবং তাঁর সাথে কারো শরীক করো না'। এ কথার তাৎপর্য হলো, হারাম হালাল তথা যাবতীয় বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে বিধান দান করেছেন তাই অনুসরণ করবে। এ ব্যাপারে অন্য কারো বিধান অনুসরণ করবে না। যদি করো তাহলে যার বিধান অনুসরণ করবে তাকে স্রষ্টার আসনে

বসানো হলো, আর এটাই শিরক করা। এই শিরক থেকে মুসলিমগণ নিজেদেরকে অবশ্যই রক্ষা করবে।

নবী করীম (সাঃ) এর হিজরতকালে মদীনায় তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল। মদীনায় এক শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত ছিল যারা মদীনারই অধিবাসী এবং মূর্তিপূজক। অন্য স্থান থেকে ইয়াহূদীরা এসে মদীনায় বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। আর মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানরা এবং মদীনার আনসাররা। যাদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য ছিল না। মূর্তিপূজকদের চিন্তা চেতনা ছিল এক ধরনের, ইয়াহূদীদের চিন্তা ছিল আরেক ধরনের আর মুসলমানদের চিন্তা ছিল সে সময় সমগ্র পৃথিবীর অন্য মানুষদের চিন্তা থেকে ভিন্ন।

এই তিন গোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা এবং বিশ্বের মানচিত্রে একটি অজেয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) মনোনিবেশ করলেন। মদীনায় যে সকল মূর্তিপূজক ছিল তাদের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে আসছিল। কারণ প্রতিদিনই দু'একজন করে ইসলাম গ্রহণ করছিল, ফলে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। ইয়াহূদীরা যদিও ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রু ছিল তবুও তারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে সাহস পেত না।

নবী করীম (সাঃ) ইসলামী বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মূর্তিপূজক এবং ইয়াহূদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বান করে একটি বৈঠক করলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মদীনার ভেতরের এবং আশেপাশের সকল গোত্রপতিদের আহ্বান করেছিলেন সে বৈঠকে। তিনি তাদের কাছে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন এবং অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সকলের সম্মতির ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র বা সনদপত্র প্রস্তুত করা হয়।

সে সনদ পত্রে প্রথমেই লেখা হলো মুহাজির, আনসার ও অন্য মুসলমানদের সম্পর্ক, তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব কর্তব্য, বিচার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন দিক। গুরুত্বসহকারে একটি কথা লেখা হলো, 'সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে নবী করীম (সাঃ) এর এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইখতিয়ারে'।

ইয়াহূদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঘোষণা, সকল গোত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তাদের সম্পদের মালিকানার প্রতি স্বীকৃতি ইত্যাদী বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা করা হলো। সকল গোত্র বা সম্প্রদায়ের ওপর প্রযোজ্য পরিকল্পিত এই সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে সকল গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। আমরা সে ঘোষণাপত্র বা সনদপত্রের বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে উদ্ধৃত করলাম।

বিশ্বনবী (সা:)-এর ঘোষণা পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুহাম্মাদ (সা:), কুরাইশ এবং মদীনার মুসলমানগণ, পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে একাকার হবে, জিহাদে যোগ দিবে তাদের পক্ষ থেকে এটি একটি সনদপত্র। সকল মানব জাতির মধ্যে তাঁরা একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র জাতি বা উম্মাহ। কুরাইশদের মধ্য থেকে যারা এসেছে, তাঁরা ইসলাম গ্রহণের সময় যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তাদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার যে নীতি ছিল তা বহাল থাকবে। তাঁরা বন্দীদেরকে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে একে অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দিতে পারবে।

বনী আউফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার সময় যে অবস্থায় ছিল তাঁরা সে অবস্থাতেই বহাল থাকবে। তাদের একে অপরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পুরোনো নীতি বহাল থাকবে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দেয়ার আইন বহাল থাকবে। বনী সায়েদা গোত্র যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা সে অবস্থাতেই থাকবে। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দেয়া যাবে।

বনী হারেস গোত্র যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা সেই অবস্থার ওপরেই থাকবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার সাবেক নীতি বহাল থাকবে। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দেয়া যাবে। বনী জুশাম গোত্র যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা সেই অবস্থার ওপরেই থাকবে। তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দেয়া যাবে। বনী নাজ্জার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার সময় যে অবস্থায় ছিল তাঁরা সে অবস্থাতেই বহাল থাকবে। তাদের একে অপরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ন্যায়সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দিতে পারবে।

বনী আমর ইবনে আউফ গোত্র যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা সেই অবস্থার ওপরেই থাকবে। তাদের একে অপরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ন্যায়সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দিতে পারবে। বনী নাবিত গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার সময় যে অবস্থায় ছিল তাঁরা সে অবস্থাতেই বহাল থাকবে। তাদের একে অপরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পুরোনো নীতি বহাল থাকবে। ন্যায় সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দিতে পারবে।

বনী আওস গোত্র যে অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাঁরা সেই অবস্থার ওপরেই থাকবে। তাদের একে অপরের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ন্যায়সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীকে মুক্তি দিতে পারবে। মুসলমানগণ তাদের ঋণগ্রস্ত এবং অধিক সন্তানের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ ও মুক্তিপণ দিয়ে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে অর্থ সাহায্য করবে। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের মিত্রের বিরোধিতা করবে না। মুসলমানগণ তাদের বিদ্রোহী, অত্যাচারী, অপরাধী, সমাজ বিরোধি, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, সমাজের ক্ষতিকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধী কার কে তা বিবেচনা করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

ইসলাম বিরোধিদের স্বার্থে এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে হত্যা করবে না। কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমদের অধিকার সমানভাবে নিরাপদ। যে কোনো শ্রেণীর অমুসলিমকে মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে আশ্রয় দিবে। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের মিত্র হয়ে থাকবে। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য নয়।

ইয়াহূদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমানদের আনুগত্য করবে এবং অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার ভোগ করবে। এ ধরনের কোনো ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার হতে দেয়া যাবে না। এ ধরনের ব্যক্তির ওপর কেউ আক্রমণ করলে আক্রমণকারীকে সাহায্য করা যাবে না। মুসলমানদের রক্ষাকবচ সকলের ক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন।

ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সে যুদ্ধে মুসলমান কোনো অমুসলিমের সাথে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তি ব্যতীত আপোষ করবে না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যুদ্ধের এক বাহিনী আরেক বাহিনীকে অনুসরণ করবে। মুসলমানগণ আল্লাহ্ তা'য়ালার আইন অনুসারে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করতে পারবে।

আল্লাহভীরু মুসলমানগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী আদর্শের ওপরে দণ্ডায়মান। মদীনার কোনো অমুসলিম মক্কার কোনো কুরাইশের প্রাণ বা সম্পদের রক্ষাকারী হতে পারবে না। কোনো মুসলমানের ক্ষতি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না বা প্রশ্রয় দিবে না। কোনো মুসলমানকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করলে এবং তা প্রমাণীত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলে প্রাণদণ্ড হবে না। তবে যে কোনো অবস্থায় মুসলমানগণ সবাই মুসলিম হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ

করবে এবং কোনো অবস্থাতেই হত্যাকারীর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে না।

এই সনদপত্রকে যারা গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এমন কোনো মুসলমানের পক্ষে ইসলামের মধ্যে নতুন কোনো প্রথা সংযোজনকারীকে (অর্থাৎ বিদয়াত সৃষ্টিকারীকে) কোনো প্রকার সাহায্য করা বা প্রশ্রয় বা আশ্রয় দেয়া হালাল নয়। বিদয়াত সৃষ্টিকারীকে যে ব্যক্তি কোনো ধরনের সাহায্য করবে বা আশ্রয়- প্রশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার অভিশাপ এবং কিয়ামতের দিন তার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার গযব অবতীর্ণ হবে। তার পক্ষে (বিদয়াত সৃষ্টিকারীর) কোনো সুপারিশ বা পণ গ্রহণ করা হবে না।

তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তোমরা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ('নবী করীম (সাঃ) এর অবর্তমানে কুরআন ও হাদীস থেকে সমাধান গ্রহণ করতে হবে')

মুসলমানরা যতদিন যুদ্ধ পরিচালনা করবে ততদিন ইয়াহূদীরা যুদ্ধের খরচ বহনে অংশগ্রহণ করবে। বনী আওফের ইয়াহূদীরা ও তাদের মিত্ররা মুসলমানদের সাথে একই উম্মাহ বলে পরিগণিত হবে। এ ক্ষেত্রে তারা যার যার ধর্ম পালন করবে। তবে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে সে ব্যক্তি তার এবং তার পরিবার-পরিজনের ধ্বংস ডেকে আনবে।

বনী নাজ্জারভুক্ত ইয়াহূদীদের অধিকার বনী আওফের ইয়াহূদীদের অনুরূপ। এভাবে বনী শুতাইবা, বনী হারেস, বনী সালাবা, বনী সায়েদা, বনী আওস ও বনী জুশামের ইয়াহূদীদের অধিকার বনী আওফের ইয়াহূদীদের অনুরূপ। তবে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে সে ব্যক্তি তার এবং তার পরিবার-পরিজনের ধ্বংস ডেকে আনবে। বনী সালাবার যে কোনো ধরনের প্রকাশ্য বিষয় তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সমপর্যায়ে তাদের প্রাণের মতই সম্মানিত। আনুগত্য এবং অঙ্গিকার পালনে সকলকে যেন পাপের অনুষ্ঠান থেকে হেফাজত করে।

বনী সালাবার মিত্রদের অধিকার তাদের অধিকারের অনুরূপ। ইয়াহূদীদের অভ্যন্ত রীণ বিষয় তাদের প্রাণের মতই সম্মানিত। তবে ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত মদীনার বাইরে গমন করতে পারবে না। প্রতিটি ব্যক্তির স্মরণে রাখা প্রয়োজন, কোনো ধরনের যুক্তিতর্ক দিয়ে আগুন থেকে নিরাপদ থাকা যাবে না। যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো, সে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ধ্বংসের বিনিময়েই তা করলো। তবে নিহত ব্যক্তি যদি

হত্যাযোগ্য অপরাধ করে থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ ক্ষেত্রে ক্ষমা পছন্দ করেন। ইয়াহূদীদের ব্যয়ভার তারা স্বয়ং এবং মুসলমানদের ব্যয়ভার তারা স্বয়ং বহন করবে। অর্থাৎ যার যার ব্যয়ভার সেই বহন করবে।

এই ঘোষণাপত্র যারা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কেউ যুদ্ধরত থাকলে তাকে সবাই সাহায্য করবে, একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে, একে অপরকে পরামর্শ দিবে, একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কোনো অন্যায় বা পাপ কাজে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। নিজের মিত্রশক্তির ক্ষতিসাধন করা ভয়ংকর এবং ক্ষমাহীন অপরাধ, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা সবার দায়িত্ব।

মুসলমানরা যতদিন যুদ্ধ পরিচালনা করবে ততদিন ইয়াহূদীরা যুদ্ধের খরচ বহনে অংশগ্রহণ করবে। (এখানে প্রকাশ থাকে যে, এই সনদপত্র প্রস্তুত করার সময় কোনো অমুসলিমের প্রতি জিজিয়া আরোপ করা হয়নি এমনকি ইয়াহূদীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে গণিমতের সম্পদে অংশ দেয়া হতো। এ কারণে এই সনদপত্রে ইয়াহূদীদের যুদ্ধের খরচে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল) এই সনদ পত্রে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাঁরা মদীনার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রতিবেশী যদি অপরাধী বলে প্রমাণীত না হয় এবং তার দ্বারা কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে তার সকল কিছুই নিজের সকল কিছুর মতই নিরাপত্তার অধিকারী। কারো বাড়ির আঙ্গিনায় বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা যাবে না। এই সনদপত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূলের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পরিপূর্ণ সততা ও সর্বাধিক সতর্কতার সাথে এই সনদপত্রের বাস্ত বায়ন দেখবেন।

আবারো স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, মক্কার কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীকে কোনোরূপ সহযোগিতা করা যাবে না। মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে মুকাবেলা করবে। সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হলে সকলেই তা পালন করবে এবং এ ব্যাপারে মুসলমানগণও বাধ্য। তবে যে বা যারা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তার বা তাদের সাথে কোনো সন্ধি বা মৈত্রী স্থাপন করা যাবে না। সাধারণ কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সে তার প্রাপ্য অংশ তার কাছে থেকেই গ্রহণ করবে, যে তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়েছে।

আওস গোত্রের ইয়াহূদীদের, তাদের মিত্রদের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব এই সনদপত্র গ্রহণকারীদের অধিকার ও দায়দায়িত্বেরই অনুরূপ। তারা এই সনদপত্র প্রস্তুতকারীদের

কাছ থেকে পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গতভাবে লাভ করতে পারবে। কেউ যখন সত্যে ফিরে আসবে তখন তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। কেউ অন্যায় করলে তা তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পরিপূর্ণ সততা ও সর্বাধিক সতর্কতার সাথে এই সনদপত্রের বাস্তবায়ন দেখবেন।

এই সনদপত্র কোনো অপরাধীর রক্ষাকবচ নয়। কোনো ধরনের অপরাধ বা অত্যাচারের সাথে জড়িত না থাকলে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসা বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা লোকও মদীনার সীমানার ভেতরে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি ন্যায়ের পথে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করবে, ইসলামের পথে অটল থাকবে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল সেই ব্যক্তির আশ্রয়দাতা হবেন এবং তাঁর সহায়তা করবেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতির অনুকূলে এই সনদপত্র প্রণয়ন করা হলেও বর্তমান পৃথিবীতে এর উপযোগীতা সমভাবে বিদ্যমান। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ এই সনদপত্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নানা ধরণের ধারা-উপধারায় বিভক্ত করেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কত সুন্দর নীতিই না গ্রহণ করা হয়েছিল মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র যতক্ষণ ক্ষতিকর বলে প্রমাণ না হবে, ততক্ষণ সে রাষ্ট্রের সকল কিছুই নিরাপত্তা লাভ করবে, যে ধরনের নিরাপত্তা ইসলামী রাষ্ট্র তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণ করে থাকে।

কারো বাড়িতে বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা যাবে না। এ কথা দিয়ে যেমন ব্যক্তির বাড়ীকে বুঝানো হয়েছে তেমনি বুঝানো হয়েছে, কোনো রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানো যাবে না। কোনো অপরাধীকে সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে না। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। তবে রাষ্ট্র এবং সমাজ এ সকল দিক পরিচালিত হবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা দেয়া বিধান অনুযায়ী। ইসলামের শত্রুরা মদীনার সনদ দেখেও দেখে না। ইসলামের প্রতি অভিযোগ আরোপ করে, 'ইসলাম অন্য ধর্মকে সহ্য করতে পারে না'। ইসলামের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে যাদের অন্তর মেঘাচ্ছন্ন, তারা ব্যতীত এমন জ্ঞানপাপী সুলভ কথা আর কেউই বলতে পারে না।

নবী করীম (সা:) এর সীরাত ও বিশ্বাসঘাতক জনগোষ্ঠী

মদীনায় ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের বনী কুরাইজা, বনী কাইনুকা ও বনী নজীর, এ গোত্রের বসবাস ছিলো এবং মদীনার শাসন দণ্ড ছিলো তাদেরই আয়ত্বে। মদীনার আনসাররা এক সময় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে তাদের শক্তি এমনভাবে ক্ষয় করেছিল যে, ইয়াহূদীদের কাছে তারা বাধ্য হয়ে মাথানত করে থাকতো। মদীনার ইয়াহূদীরা ছিল ধনিক শ্রেণী। কৃষিকাজের জমি ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ব্যবসাও ছিল তাদেরই অধীনে। নানা ধরনের শিল্পে তারা ছিল অগ্রগামী। বীরত্ব এবং যুদ্ধ বিদ্যাতেও তারা ছিল আনসারদের তুলনায় দক্ষ। এ কারণে তাদের কাছে সামরিক কাজে ব্যবহার করার মতো অস্ত্র বিপুল পরিমাণে মওজুদ থাকতো। স্বর্ণ শিল্প ছিলো ইয়াহূদী সম্প্রদায় বনী কাইনুকার নিয়ন্ত্রণে। স্বর্ণের অলংকার নির্মাণে মদীনায় তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

মদীনার সকল বিষয়ে নেতৃত্বের আসন ইয়াহূদীরাই নিয়ন্ত্রণ করতো। ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য দেয় যে, তারা চিরদিনই কুচক্রি এবং চরিত্রহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নগদ অর্থ মানুষকে ঋণ দিয়ে চারদিকে তারা মাকড়সার জালের মতই ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রাখতো। কৌশলে তারা বিত্তের অধিকারী হয়ে সমাজের গরীব শ্রেণীকে পদানত করে রেখেছিল। নগদ অর্থের বিনিময়ে চড়া সুদে তারা মানুষের সহায় সম্পদের সাথে সাথে সন্তান-সন্তুতি এমন কি তৎকালীন সমাজের নারীকেও বন্ধক রাখতো। ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণ আদায়ে অক্ষম হলে বা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে ঋণ গ্রহীতার অবোধ শিশুকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতো।

ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই ছিল না। তারা তাদের ধনিক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের আইন প্রয়োগ করতো এবং বিত্তহীনদের জন্য আরেক ধরনের আইন প্রয়োগ করতো। বিশেষ করে তাদের নেতাদের কোনো অপরাধের বিচার তারা করতো না। নবী করীম (সা:) এক ইয়াহূদীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমাদের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি কি শুধু দোররা দিয়ে আঘাত করা?'

ইয়াহূদী জবাব দিয়েছিল, 'না, আমাদের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়। সাধারণ মানুষের জন্য আমরা এই শাস্তি দিয়ে থাকি। নেতৃবৃন্দের কারো ব্যভিচার ধরা পড়লে তিনি অপরাধী হিসেবে গণ্য হন না'।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ইয়াহূদী সম্প্রদায় নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছিল। তাদের পাপাচারের পথ রুদ্ধ হওয়া পড়েছিলো। বিকৃত ধর্মীয় প্রভাব ও নেতৃত্বের আসন ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। মদীনার আনসারদের ঋণের জালে বন্দী করে সর্বগ্রাসী শোষণের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মক্কার মুসলমানদের পরামর্শে

আনসাররা পরিকল্পিত উপায়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজেদেরকে ইয়াহূদীদের কাছ থেকে ঋণ মুক্ত করেছিল। ইসলাম মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই ইয়াহূদীরা উপলব্ধি করেছিলো, তাদের নির্যাতনমূলক অর্থ লিপ্সার ব্যবসা চলবে না।

মদীনা সনদে তাদের যাবতীয় মানবিক ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু তারা ধর্মের নামে যে অনাচার করতো, নবী করীম (সা:) এ সম্পর্কে সঠিক পথ অবলম্বনের নির্দেশনা দিতেন। তাদের দাবী ছিলো তারা হযরত মূসা (আ:) কর্তৃক প্রবর্তিত আইন-কানুন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসরণ করতো। বিষয়টি ওহী মারফত অবগত হয়ে রাসূল (সা:) তাদেরকে সংশোধন হওয়ার আহ্বান জানাতেন, এ কারণে তারা নবী করীম (সা:) ও ইসলামের কঠিন শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তাদের রক্তে ছিল মহাসত্যের বাহকদেরকে হত্যা করা এবং নিষ্ঠুরতা ও পাপাচারের প্রবণতা বিদ্যমান। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাদের মজ্জাগত ব্যাপার। বিশ্বনবীর সাথে তারা মদীনা সনদে স্বাক্ষর করলেও গোপনে তারা মক্কার ইসলাম বিরোধী কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে মদীনা থেকে ইসলাম উৎখাতের ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ছিলো।

প্রকাশ্যে নবী করীম (সা:) সম্পর্কে কটুক্তি না করলেও রাসূল (সা:) এর শিখানো পদ্ধতিতে সালাম না দিয়ে বলতো, 'আসসামু আলায়কুম'। অর্থাৎ তোমার ওপরে মৃত্যু পতিত হোক।

হযরত আয়িশা (রা:) এর উপস্থিতিতে একবার এক ইয়াহূদী নবী করীম (সা:) কে ঐ কথা বললে তিনি ইয়াহূদীকে বললেন, 'অসভ্যের দল! তোদের ধবংস হোক'।

নবী করীম (সা:) এ কথা শুনে তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বললেন, 'আয়িশা, মধ্যম পথ গ্রহণ করো'।

হযরত আয়িশা (রা:) বললেন, 'ওরা কি বলে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

তিনি বললেন, 'আমি শুনেছি। তারা যখন ঐ কথা বলে আমিও তাদের কথার উত্তরে বলি, আলায়কুম। অর্থাৎ তোমাদের ওপরেও'।

ইয়াহূদীরা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হবার দাবীদার ছিল, এ কারণে নবী করীম (সা:) পৌত্তলিকদের তুলনায় ইয়াহূদীদেরকে সম্মান করতেন। তাদের কোনো লাশ দেখলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাদের অনাচার নবী করীম (সা:) নীরবে সহ্য করছিলেন। কারণ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। নবীর এই নীরবতাকে তারা দুর্বলতা ভেবে চরম পথ অবলম্বন করেছিল।

বনী কাইনুকা গোত্রের ইয়াহূদীদের মধ্যে কা'ব ইবেন আশরাফ নামক লোকটি ছিল উঁচুস্তরের একজন কবি এবং বিত্তবান। মদীনার আনসারদের সে সুদের ব্যবসায় জড়িত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যক্তি বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের ওপরে নানা ধরণের কবিতা রচনা করে মক্কায় পাঠিয়ে তাদের উত্তেজিত করতো। ইয়াহূদীদের একটি প্রতিনিধি দল গোপনে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সাথে বৈঠক করে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিল। তাদের অঙ্গীকারের কারণে মক্কার কুরাইশরা নব উদ্যোমে ইসলামের বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইয়াহূদী কা'ব ইবনে আশরাফ নবী করীম (সাঃ) কে কৌশলে হত্যা করার জন্য তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে বললেন এবং নবী করীম (সাঃ) দাওয়াতে গেলেন না। কা'ব ইবনে আশরাফ ক্ষুব্ধ হয়ে নবী করীম (সাঃ) এর নামে বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করে মদীনার লোকদের মধ্যে প্রচার করতে থাকলো। এতে মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষোভে উত্তেজিত হলেও রাসূল (সাঃ) তাদেরকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিলেন।

ইয়াহূদীরা ধারণা করেছিলো মদীনায় ইসলামের মূল শক্তি আউস ও খাজরাজ গোত্র। অতএব এই দুই গোত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারলে ইসলাম বিকশিত হতে পারবে না। সে লক্ষ্যে মদীনার আনসারদের মধ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ঘৃণ্য প্রথানুযায়ী বিভেদের বীজ তারা বপনের সূচনা করলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আউস গোত্র খাজরাজ গোত্রের কার কি ক্ষতি করেছিল এবং খাজরাজ গোত্র আউস গোত্রের কি ক্ষতি করেছিল, এসব পুরনো প্রসঙ্গ এই দুই গোত্রের মধ্যে ইয়াহূদীরা জাগিয়ে দিল। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হলো যে, দুই গোত্রের আনসারদের মধ্যে দাঙ্গায় দুইজন আহত হলো এবং উভয় গোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

নবী করীম (সাঃ) যথা সময় সংবাদ পেয়ে উভয় গোত্রে উপস্থিত হয়ে এই দাঙ্গার পরিণতি আদালতে আখিরাতে কি হবে, তা বর্ণনা করে উভয় দলকে শান্ত করে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইয়াহূদীরা ঘৃণ্য মানসিকতা নিয়ে সাময়িক ইসলাম গ্রহণ করতো। দিন কয়েক পরেই তারা ইসলাম ত্যাগ করে মানুষের মধ্যে প্রচার করতো, 'ভালো মনে করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখলাম ইসলামে খারাপ ছাড়া ভালো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ কারণে আবার ইসলাম ত্যাগ করে বাপ-দাদার আদর্শেই ফিরে এলাম'।

এভাবে ইয়াহূদীরা নবী করীম (সাঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াতে থাকলো। মদীনায় রাসূল (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করার পরেও তারা পদে পদে সেই চুক্তির ধারা লংঘন করতে থাকে। তাদের এসব জঘন্য আচরণের কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের ধৈর্যের সুযোগে তারা চরম

হঠকারিতার পরিচয় দেয়া শুরু করেছিল। ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় তারা এমন এক ঘটনার জন্ম দিল যে, মুসলমানদের পক্ষে আর নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব হলো না।

নিরপেক্ষ সকল ঐতিহাসিকই সে জঘন্য ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম পরিবারের এক সম্ভ্রান্ত নারী তাঁর প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হয়েই ইয়াহূদী অধ্যুষিত বনী কাইনুকার বাজারে গিয়েছিলেন। মুসলিম নারীকে দেখে ইয়াহূদীরা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা মুসলিম নারীকে পোষাক পরিত্যাগ করার আদেশ করে। মহিলা নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য এক ইয়াহূদী স্বর্ণকারের দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। একজন ইয়াহূদী ঐ মুসলিম মহিলার পরণের কাপড় তাঁর অলক্ষে এমনভাবে একটা কিছুর সাথে বেঁধে দেয় যে, মহিলা উঠতে গেলেই যেন তাঁর কাপড়ে টান লেগে মহিলা পর্দাহীন হয়ে পড়ে।

মহিলা যখন উঠতে গেল ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা অনুসারে যা হবার তাই হলো। একজন মুসলিম নারীকে পরিকল্পিত উপায়ে ইয়াহূদীরা বে-ইজ্জতি করলো এবং মহিলার আর্তচিৎকার শুনে ইয়াহূদী হায়েনার দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। মহিলা তখন বাধ্য হয়ে চিৎকার করে বলেছিল, 'কে আছো মুসলিম বীর সৈনিক! তোমাদের বোনের সম্মান রক্ষা করো!'

তাঁর আর্তনাদ শুনে একজন মুসলিম নওজোয়ান ছুটে এসে অপরাধী এক ইয়াহূদীকে হত্যা করলো। ইয়াহূদীরাও সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমন করে মুসলিম বীরকে হত্যা করলো। এ সংবাদ নবী করীম (সাঃ) শোনার পরে তিনি ঘটনা স্থলে গিয়ে ইয়াহূদীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ওহে ইয়াহূদী সমাজ! তোমরা যে অপরাধ করেছো তার প্রতিকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করো। তোমরা চুক্তি অনুসরণ করো। আর তা যদি না করো তাহলে তোমাদের ওপরেও বদরের মতই আযাব অবতীর্ণ হবে'।

যা ঘটেছিলো তা ছিল ইয়াহূদীদের পরিকল্পিত। তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে পূর্বেই গোপন চুক্তি করে এসেছিল, কোনো উপলক্ষ্যে তারা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধ শুরু করবে। আর এই সুযোগে মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমন করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিবে। সুতরাং রাসুলের কথায় তারা নমনীয়তা প্রদর্শন না করে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ঘোষণা করলো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! বদরের প্রান্তরে গোটা কতক কুরাইশদের হত্যা করে বেশি অহংকার দেখিয়ো না। আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেখো, যুদ্ধ কাকে বলে আমরা তা দেখিয়ে দিবো'। (সীরাতে ইবনে হিশাম, আত্ তাবারী, তাবাকাতে ইবনে সায়াদ)

ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র এবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। বনী কাইনুকা গোত্র রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে তারা দ্রুত তাদের নির্মিত দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সকল দূর্গ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। ফলে তারা নিরাপদেই দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো এবং তাদের আশা ছিল এ সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে কুরাইশরা মদীনা আক্রমন করবে। তখন তারা দূর্গ থেকে বের হয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলিম নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করবে।

কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হলো না। মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমনের কল্পনাও করতে পারলো না। কারণ তখন পর্যন্ত তারা বদরের ক্ষয়-ক্ষতিই সামলিয়ে উঠতে পারেনি। নবী করীম (সাঃ) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বনী কুরাইজার দূর্গ অবরোধ করলেন। এভাবে পনের দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। ইয়াহুদীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এলে তারা তাদের মুক্তির জন্য মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাদের হয়ে সুপারিশ করার জন্য নবীর কাছে প্রেরণ করেছিল।

মদীনার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এসে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করতে থাকলো। রাসূল (সাঃ) প্রথমে তার কথায় কর্ণপাত করেননি। পরে এই মুনাফিক নেতা তাঁকে এমনভাবে ধরলেন যে, সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূরে কাছে অনুনয় করতে করতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই একরকম জাপটে ধরে বলেছিল, 'আপনি তাদের ব্যাপারে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত না করলে আপনাকে আমি ছাড়বো না'।

হাদীস শরীফে এসেছে, এ সময় নবী করীম (সাঃ) এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর পবিত্র চেহারা ভিন্ন আকার ধারণ করেছিল। অবশেষে রাসূল (সাঃ) অনুনয় রক্ষা করে কতকগুলো শর্তের অধীনে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। ইয়াহুদীরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) এর সাথে ইয়াহুদীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চুক্তি ছিল। ইয়াহুদীরা যখন রাসূল (সাঃ) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, তখন হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) এসে রাসূল (সাঃ) এর সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার মিত্র এবং বন্ধু হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল ও মুসলমানগণ। আমি ইসলামের শত্রুদের মৈত্রী চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের সাথে আমার এখন থেকে আর কোনো ধরনের চুক্তি বলবৎ থাকলো না'।

রাসূল (সাঃ) এর এই সাহাবীর প্রশংসামূলক কাজের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মায়িদার আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) বনী কাইনুকার সকল ইয়াহুদীদের গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুপারিশের কারণে নবী (সাঃ)

তাদেরকে গ্রেফতার না করে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। মদীনার আশেপাশেও তারা থাকতে পারবে না এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইয়াহূদী সম্প্রদায় সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনা ছিল হিজরী দ্বিতীয় সনের শাওয়াল মাসের। তাদের ধন-সম্পদ নবী করীম (সাঃ) বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি গণীমতের সম্পদ থেকে পঞ্চমাংশ গ্রহণ এবং তিনটি তীর, দুটো বর্ম, তিনটি তরবারী ও তিনটি ধনুক গ্রহণ করেছিলেন। (যাদুল মায়াদ, পৃষ্ঠা নং-১৩৭, ১৩৮)

সে সময় ইয়াহূদীরা যে অপরাধ সংঘটিত করেছিল পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্র প্রধান হলে তাদের একটি প্রাণীকেও জীবিত ছেড়ে দিত না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাদের একজনের গায়েও হাত উঠাতে দেননি। এমনকি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুব্যবস্থা করে দেন। মদীনা থেকে তাদের বিদায়ের জন্যে তিন দিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাদের সাথে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

ইসলামের যে যুদ্ধনীতি রয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কিছু ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপিয় কতিপয় লেখক মন্তব্য করেছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে প্রতারণা করেছেন। খ্রিষ্টান লেখকগণ ইয়াহূদী প্রেমে অন্ধ হয়ে বিশ্বনবীকে প্রতারক বলতেও দ্বিধা করেনি। ইয়াহূদীরা খ্রিষ্টানদের সাথে এবং খ্রিষ্টানরা ইয়াহূদীদের সাথে কি জঘন্য আচরণ করেছে, ইতিহাসের পাতায় সেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারা প্রকৃত সত্য উল্লেখ না করে মদীনার ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে যে, নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে তাঁর প্রয়োজনে ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। তারপর তিনি যখন একটু শক্তিশালী হলেন, তখনই তিনি ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করলেন।

ইয়াহূদীরা যে কি ধরনের মন-মাসিকতা সম্পন্ন এবং কতটা কুটিল জাতি, বিশ্বের কোথাও যে তাদের স্থান হয়নি এবং কেনো হয়নি তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন, এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা সূরা ফাতিহার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইউরোপিয় কতিপয় লেখক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ না করেই পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্য বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে থাকে। প্রকৃত ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, দেখা যাবে নবী করীম (সাঃ) যে ব্যবস্থা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং আইনের দৃষ্টিতে বৈধ।

তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি। সে চুক্তির মূল কথা ছিল, উভয় পক্ষের

কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক বা শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। একে অপরের শত্রুদেরকেও কেউ সাহায্য করবে না। এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (রাহ:) লিখেছেন, 'তিনি তাদের সাথে এই শর্তে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধও করবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদেরকেও সাহায্য সহযোগীতা করবে না'। (ফতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩১)

মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীরা এই চুক্তি করার পরে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা তাদের সাথে বন্ধুর অনুরূপ আচরণ করতে থাকে। কিন্তু ইয়াহূদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ করতে থাকে। তারা গোপনে মক্কার কুরাইশদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য পাচার করতে থাকে। মুসা ইবনে উকবা তাঁর মাগাজীতে উল্লেখ করেছেন, 'বনী নজীর গোত্র মক্কার কুরাইশদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানী দিতো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের গোপন তথ্য পাচার করতো'। (ফতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩৩)

ইয়াহূদীরা এখানেই তাদের অপতৎপরতা বন্ধ করেনি। বিশ্বনবী (সা:) কে তারা কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করে। তারা ঈমান আনবে, এ সংবাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে তাদের আওতায় নিয়ে হত্যা করার লক্ষ্যে কয়েকবার প্রস্তুত হয়েছিল। ছাদ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে নবীকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। (আত্ তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৭, আবু দাউদ, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩৩, ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা নং-২৪)

এখানেই ঘটনা শেষ নয়, তাদের উদ্ধত্য এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রকাশ্যে তারা মুসলমানদেরকে হুমকি প্রদর্শন করতো। নবী করীম (সা:) এর ধৈর্যকে তারা দুর্বলতা ভেবেছিল। বাইরের কোনো শত্রু মদীনা আক্রমন করলে ইয়াহূদী আর মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে অস্তিত্বহীন করে দিবে, এ আশঙ্কা তীব্র হয়ে দেখা দিল। গোপনে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে হত্যা করতে পারে এ আশঙ্কাও মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছিল। মদীনার মুসলমানদের ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আশঙ্কা এতটা তীব্র হয়েছিল যে, একজন সাহাবী মৃত্যুর সময় বলে গেলেন, আমার ইন্তেকালের সংবাদ আল্লাহর রাসূল (সা:) কে রাতে দিও না। কারণ তিনি রাতে আমার জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্যে আসবেন আর সেই সুযোগে ইয়াহূদীরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। (উসুদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৭)

ইয়াহূদীদের এই উৎপাতের পরেও ইয়াহূদী প্রেমিকরা কি বলতে চান নবী করীম (সা:) এর জন্য নীরবতা পালন করা বাধ্যতামূলক ছিল? কিন্তু এরপরেও রাসূল (সা:) তাদের ওপরে হঠাৎ আক্রমন না করে দূত মারফত তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, 'আমার সাথে তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছো। সুতরাং তোমরা

দশদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করবে, যদি না করো তাহলে আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবো'।

নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তারা এই সংবাদ পেয়ে মদীনার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলো। মুনাফিক নেতা তাদেরকে অভয় দিয়ে বললো, তোমরা কিছুতেই মদীনা ত্যাগ করবে না। তোমাদের যা সাহায্য সহযোগীতা প্রয়োজন আমরা করবো। ইয়াহূদীরা এটা তলিয়ে দেখলো না যে, মুনাফিকরা সত্যই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে কিনা। তারা কঠিন ভাষায় নবী করীম (সাঃ) কে জানিয়ে দিল, 'আমরা মদীনা ত্যাগ করবো না, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারো'। (আত্ তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৮, ফতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩৩, ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা নং-২৪)

নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে শেষ সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাদের অসহ্য উস্কানী ও চুক্তি ভঙ্গের পরেও উদারতার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়নি। অবরোধের কারণেই ইয়াহূদীরা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'আপনি আমাদেরকে প্রাণে মারবেন না। আমরা মদীনা থেকে বের হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যাবো এবং আমাদের উটের পিটে যা নিতে পারি তাই নিয়ে যাবো। আর যা কিছু থাকে আমরা এখানে রেখে যাবো'।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বালাজুরী ও হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, 'ইয়াহূদীরা আবেদন করেছিল, আমাদের উট যতটা মালপত্র বহন করতে পারে আমরা ততটা নিয়ে যাবে, নবী করীম (সাঃ) তাদের এই আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন। এখানে ইয়াহূদীদের সামান্য পরিমাণ ক্ষতি করা হয়নি। (আত্ তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৮, ফতহুল বুলদান- পৃষ্ঠা নং-২৪, ফতহুল বারী- সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৩২)

বিশ্বনবী (সাঃ) অস্থাবর সম্পদসহ তাদেরকে মদীনা ত্যাগের সুযোগ দিলেন। সুযোগ থাকার পরও তিনি শত্রুদের একান্ত অনুগ্রহে মদীনা ত্যাগের অনুমতি দিলেন কিন্তু তাঁর উদারতা এবং মহত্বের প্রতিদান ইয়াহূদীরা যেভাবে দিয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা মুসলমানদের জন্য খুবই তিক্ত। ইয়াহূদীরা যে সময় মদীনা ছেড়ে যাচ্ছিল, তাদের যাওয়ার অবস্থাও ছিল মুসলমানদের প্রতি উপহাসমূলক। তাদের কয়েকজন নেতা খয়বরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। সেখানেও তারা ষড়যন্ত্র করে নেতৃত্বের পদ দখল করেছিল। মদীনা ত্যাগের সময় তারা বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজিয়ে, গায়িকাদের মাধ্যমে গান পরিবেশন ও নর্তন-কুর্দন করতে করতে মদীনা ত্যাগ করেছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'ইয়াহূদীরা সম্পদসহ যে বিশাল জনবলসহ মদীনা ত্যাগ করেছিল, স্থানীয়

অধিবাসীরা ইতোপূর্বে এ অবস্থা কখনো দেখেনি'। মদীনার আনসারদের মধ্যে যারা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল ইয়াহূদীরা তাদেরকেও নিয়ে যেতে চাইলে আনসাররা বাধা দিয়েছিল। এ সময় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ অবতীর্ণ করা হলো–

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْم بِاللَّه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى ق لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ط أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَع

(আল্লাহর) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কারণ) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি বাতিল (মতাদর্শ)কে অস্বীকার করে, আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তা'য়ালা (সব কিছুই শোনেন) এবং (সবকিছুই) জানেন, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), তিনি (মূর্খতার) অন্ধকার থেকে তাদের (ঈমানের) আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ-ই) হয়ে থাকে তাদের সাহায্যকারী, তা তাদের (দ্বীনের) আলোক থেকে (কুফুরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা আল বাকারা-২৫৬-২৫৭)

খায়বরে যে সকল ইয়াহূদী গিয়েছিল তারাই পরবর্তীতে খায়বর যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এই ইয়াহূদী জাতি পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। মদীনা থেকে তারা বের হয়ে সমগ্র আরবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে তারা ২৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করেছিল। সে সময়ই যদি ইয়াহূদী নামক বিষাক্ত সর্পসমূহের মস্তক চূর্ণ করা হতো তাহলে পরবর্তীতে ইয়াহূদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও খায়বর যুদ্ধের মুকাবিলা করতে হতো না। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) ছিলেন করুণার সিন্ধু। পরাজিত শত্রুর করুণা ভিক্ষামূলক মিনতি তাঁর পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানতেন, এই ইয়াহূদীরা তাঁর জন্য প্রতি পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি করবে। ইসলামী রাষ্ট্র উৎখাতের জন্য তারা সর্বত্র ষড়যন্তের জাল বিস্তার করবে। সুযোগ পেলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে এবং মুসলমানদের

হত্যা করবে। তবুও নবী করীম (সা:) তাদের ক্ষমা করে নিরাপদে মদীনা ত্যাগ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। মদীনা ত্যাগের সময় তারা যে গর্ব-অহঙ্কারের প্রদর্শনী করেছিলো তা কোনো করুণা ভিখারী ও পরাজিত জাতির নিদর্শন ছিল না।

অঙ্গীকার পূরণ, নবী করীম (সা:) এর সীরাত

কিলাব গোত্রের নেতা আবু বারা (রা:) দরবারে নববীতে এসে আবেদন করেছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আমাদের সাথে কিছু লোক দিন, যারা আমাদের গোত্রে গিয়ে ইসলামের শিক্ষা দিবে'।

নবী করীম (সা:) তাকে বলেছিলেন, 'আমি নজদবাসীর দিক থেকে আশঙ্কা বোধ করি। তাদের গোত্র তো কুরাইশদের শুভাকাঙ্খী'।

আবু বারা (রা:) বলেছিল, 'আমরাই সেখানে প্রভাবশালী, আমরা যা বলবো তাই হবে। আমি তাদের জিম্মাদার হচ্ছি'।

আবু বারার আবেদনে সাড়া দিয়ে নবী করীম (সা:) ৭০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল সাহাবী ছিলেন আসহাফে সুফ্ফার দলভুক্ত। সংসার জীবন গঠন করার মতো তখন পর্যন্ত তাদের সুযোগ হয়নি। তাদের নৈতিক চরিত্র ছিল অতি উচ্চস্তরের। এই সাহাবায়ে কেরাম সারা দিন জঙ্গলে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে যা উপার্জন করতেন তা অন্য সাহাবায়ে কেরামের জন্য ব্যয় করতেন এবং নিজের কাজে ব্যয় করতেন। এই লোকগুলো দিবারাত্রি নবী করীম (সা:) এর সাহচর্যে অবস্থান করে ইসলামী জ্ঞান এবং আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যর দিক থেকে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন।

বনী আমের গোত্রের কাছে নবী করীম (সা:) একটি পত্রও প্রেরণ করলেন। বীরে মাওনা নামক স্থানে পৌঁছার পরে উক্ত পত্রসহ একজন লোক বনী আমের গোত্রের নেতা আমের ইবনে তুফায়েলের কাছে গিয়েছিলো। তুফায়েল প্রচলিত সকল নীতি নৈতিকতার প্রতি পদাঘাত করে মুসলিম দূতকে হত্যা করলো এবং বনী সালেম গোত্রের সহযোগীতায় মুসলিম প্রচারকের দলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এলো। যে সাহাবা রাসূল (সা:) এর কাছে মুসলমানদের জিম্মাদার হয়ে তাদেরকে এনেছিল, সেই আবু বারা (রা:) বনী আমের গোত্রের নেতা তুফায়েলকে বারবার অনুরোধ করলো, মুসলমানদেরকে হত্যা না করার জন্য। সে তাদেরকে জানালো যে, সে স্বয়ং জিম্মাদার হয়ে এই মুসলমানদেরকে সাথে এনেছে, সুতরাং তাদের যেন কোনো ধরনের ক্ষতি করা না হয়।

কিন্তু ইসলামের দুশমনরা তাঁর কোনো কথায় কর্ণপাত করলো না। আশেপাশের কুরাইশদের মিত্র গোত্রগুলোর সহায়তায় মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

পৈশাচিকভাবে হত্যা করলো। একজন মাত্র সাহাবী হযরত আমের (রাঃ) কে বনী আমেরের নেতা তাঁর মাথার চুল কিছুটা কেটে এ কথা বলে ছেড়ে দিয়েছিল যে, 'আমার মা একজন দাস মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি আমার মায়ের মানত পূরণ করলাম'। বীরে মাওনার হত্যাকান্ডের সাথে বনী আমের গোত্রকে প্রকাশ্যে দেখা গেলেও এর পেছনে মদীনার এবং মদীনা থেকে বহিষ্কৃত ইয়াহূদীদের চক্রান্ত ক্রিয়াশীল ছিলো, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত রয়েছেন।

প্রাণে বেঁচে যাওয়া সেই সাহাবীর ৬৯ জন সাথীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং সাথীহারা বেদনা বুকে নিয়ে মদীনার দিকে আসছিলেন। পথে হত্যাকারী বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে সামনে দেখেই তাঁর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো এবং তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিলো না, এই দুইজন লোককে নবী করীম (সাঃ) আমান অর্থাৎ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। মাত্র একজন ব্যতীত প্রেরিত সকল মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে, এ সংবাদ জেনে নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তারপরও তিনি হযরত আমের (রাঃ) কর্তৃক বনী আমের গোত্রের যে দু'জনকে হত্যা করেছিলেন তা সমর্থন করলেন না। তিনি তাদের রক্তপণ আদায় করলেন।

এটাই নবী করম (সাঃ) এর ক্ষমা ও উদারতার সীরাত। যে গোত্রের লোকজন মুসলমানদের ৬৯ জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করলো, অথচ তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন না। আর সাহাবা কর্তৃক সেই গোত্রের মাত্র দু'জন লোককে হত্যা করার কারণে তিনি ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন।

তিনি এই ক্ষতিপূরণ না দিলে নিহত গোত্রের করার কিছুই ছিল না। মুসলিমরা দাবী করতে পারতো, 'আমাদের ৬৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর বদলে আমাদের এক ভাই, যাকে তারা হত্যা না করলেও চুল কেটে লাঞ্ছিত করেছে, তিনি মাত্র দু'জনকে হত্যা করেছেন'। মুসলিমরা এমন দাবী করেনি, তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর সীরাতের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এগিয়ে গেলেন তাঁর ওয়াদা পালনের পথে। তিনি ঐ গোত্রের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করলেন, নিহত দু'ব্যক্তির রক্তঋণ আদায় করলেন। নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মর্যাদার যে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনি নিজ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণই করলেন বিশ্বাসঘাতক বনী আমের গোত্রের সাথে। ফল এটাই হলো যে, পরবর্তীতে বনী আমের গোত্রের সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ইসলাম বিদ্বেষী বন্ধুরা, বীরে মাওনার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ইসলাম তরবারীর শক্তিতে পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছে, না তার আপন মহত্ত্বের কারণে পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পরাজিত জনগোষ্ঠী ও নবী করীম (সা:) এর সীরাত

নবী করীম (সা:) অষ্টম হিজরী সনের রমজান মাসের দশ তারিখে মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে বের হলেন। তিনি ইতোপূর্বে এমন বর্ণাঢ্য সাজে কোনো অভিযানেই বের হননি। মক্কা অভিযানে তিনি এমন সুসজ্জিত অবস্থায় বের হলেন, যেন ইসলামের শত্রুদের কলিজায় কম্পন জাগে। দশ হাজার সুসজ্জিত বাহিনী আল্লাহ তা'য়ালার রাসূলের সাথে। রাসূল (সা:) এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মাতৃভূমির দিকে। যেখান থেকে একদিন তিনি অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন। কা'বাঘরের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'হে কা'বা! তোমার নিষ্ঠুর সন্তানরা আমাকে থাকতে দিল না'। তিনি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবার আর জনমানবহীন প্রান্তর দিয়ে নয়, জনপদ দিয়েই তিনি তাওহীদের বিজয় কেতন উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি জনপদ থেকেই পতাকাসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাঁর নেতৃত্বাধীন মিছিলে যোগ দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। বিশাল এক জনসমুদ্র তরঙ্গের ওপরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে মক্কার দিকে প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন গোত্রের দু'একজন তখন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো, তারা চক্ষু বিস্ফোরিত করে তাওহীদের এই তরঙ্গ দেখছে।

নবী করীম (সা:) মক্কার অনতিদূরে মাররুজ জাহরান নামক এলাকায় এসে যখন উপনীত হলেন রাতের নিকষ কালো অন্ধকার সমগ্র পরিবেশের ওপর অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে। সেখানেই তিনি যাত্রা বিরতি করে সৈন্যবাহিনীকে শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলেন। অসংখ্য তাঁবু স্থাপন করা হলো। তিনি আদেশ দিলেন, প্রত্যেক তাঁবুতেই যেন পৃথকভাবে রান্নার আয়োজন করা হয়। এ কারণে প্রতিটি তাঁবুতেই পৃথকভাবে উনুন জ্বালানোর প্রয়োজন হলো। ক্ষণিকের মধ্যেই অগণিত উনুন জ্বলে উঠলো। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বিশাল প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠলো। সে আলোয় মক্কা নগরী যেন উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

ভয়ে আতঙ্কে ইসলাম বিরোধিদের কলিজা যেন কণ্ঠনালী দিয়ে বের হয়ে আসার উপক্রম হলো। নবী করীম (সা:) রাতের অন্ধকারে অধিক সংখ্যক উনুন প্রজ্জ্বলিত করার যে আদেশ দিয়েছিলেন, এর পেছনে ছিল সামরিক কৌশল। ইসলামের শত্রুগণ যেন ধারণা করে লক্ষ লক্ষ বাহিনী মক্কার দিকে এগিয়ে আসছে। ঘটেছিলও তাই, কুরাইশরা দেখতো যেন লক্ষ লক্ষ উনুন জ্বলছে। উনুনের সংখ্যা যখন নিরূপণ করা যাচ্ছে না তাহলে সৈন্য সংখ্যা নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ হবে। চরম আতংকে তাদের নিশ্বাস যেন বন্ধ হবার উপক্রমন হলো।

তারা নবী করীম (সা:) এর বাহিনীর সঠিক সংখ্যা জানার জন্য হযরত খাদিজা (রা:) এর ভাইয়ের সন্তান হাকিম ইবনে হিজাম, বুদাইল ইবনে ওরাকা ও তাদের নেতা স্বয়ং আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করলো। তারা ছদ্মবেশে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলো

প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। ওদিকে বিশ্বনবী (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি মক্কাতেই অবস্থান করতেন। তিনি যেদিন পরিবার-পরিজনসহ মদীনার দিকে হিজরত করলেন, সেদিনই নবী করীম (সাঃ) মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে বের হলেন। পথে চাচা ভাতিজার সাক্ষাৎ হলো। তিনিও মক্কা অভিযানে শামিল হলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যদি এমন কাউকে পেতেন তাহলে তার কাছে সংবাদ প্রেরণ করতেন, সে যেন মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছে বলে, যথা সময়ে এসে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর সাদা খচ্চড়ে আরোহন করে চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সাথে মক্কার বিখ্যাত নেতা আবু সুফিয়ানের দেখা হলো। তিনি তাঁকে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছো তো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসেছেন। মক্কার কুরাইশরা এবার ধূলার সাথে মিশে যাবে'। আবু সুফিয়ান ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, 'আমার মা-বাবা তোমার জন্য কুরবান হোক! এই অবস্থায় কি করতে হবে আমাকে বলে দাও'। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই মুসলিম বাহিনী মাথা কেটে নেবে এতে সন্দেহ নেই। তুমি আমার এই খচ্চড়ের পেছনে উঠে বসো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে চলো। আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি'।

মক্কার ইসলাম বিরোধী কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, যার দাপটে রণভূমি কেঁপে উঠেছে। সেই নেতা আজ নিজের প্রাণের মায়ায় কোনো কথা না বলে রাসূল (সাঃ) এর চাচার পেছনে উঠে বসলো। হযরত আব্বাস (রাঃ) দ্রুত গতিতে খচ্চর ছুটিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত উমার (রাঃ) যে স্থানে উনুন জ্বালিয়ে ছিলেন তার পাশ দিয়েই হযরত আব্বাস (রাঃ) যাচ্ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে দেখে বললেন, 'আল্লাহর শোকর যে তিনি তাঁর দুশমনকে আমাদের মধ্যে এনে দিয়েছেন'।

কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে হলে নবী করীম (সাঃ) এর অনুমতি প্রয়োজন, এ কারণে তিনি দ্রুত উঠে নবী করীম (সাঃ) এর দিকে গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) খচ্চর ছুটিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবু সুফিয়ানের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করলেন। হযরত উমার (রাঃ)ও তাঁকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী করীম (সাঃ) কোনো পক্ষেই সাড়া দিলেন না। হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ) কে বললেন, 'হে উমার! এই লোক যদি তোমার কবিলার হতো তাহলে কি তুমি এতটা কঠোর হতে পারতে?' হযরত উমার (রাঃ) বললেন, 'আপনি এমন করে বলবেন না। আপনি যেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, সেদিন আমি যা আনন্দিত হয়েছিলাম আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম কবুল করলেও এতটা আনন্দিত হতাম না'।

এই সেই আবু সুফিয়ান, যার নেতৃত্বে নবী করীম (সাঃ) এর প্রিয় চাচা হযরত হামজা (রাঃ) কে হত্যা করে তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল আবু সুফিয়ানেরই স্ত্রী হিন্দা। স্বয়ং আবু সুফিয়ান হযরত হামজা (রাঃ) এর পবিত্র দেহে বর্শার আঘাত করে কটুক্তি করেছিল। তাঁর অতীত কর্ম তৎপরতা সকল মুসলমানের সামনে ছিল স্পষ্ট। অজস্র অপরাধে সে অপরাধী। তাঁর প্রতিটি অপরাধই ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। কিন্তু যাঁর সামনে তিনি নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। করুণার মূর্ত প্রতীক হিসাবে যিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। নবী করীম (সাঃ) আবু সুফিয়ানের দিকে পবিত্র গ্রীবা বাড়িয়ে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে অভয় দান করলেন, 'কোনো ভয় নেই, এটা ভয়ের জায়গা নয়'। প্রাণের দুশমনদের প্রতি এটাই ছিলো নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত।

বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রেফতার বরণের পরপরই আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আত তাবারী বলেন, আবু সুফিয়ানের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর কিছু কথা হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই?' আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'আজ যদি অন্য কোনো ইলাহ থাকতো, তাহলে তো আমাদের কাজেই আসতো'। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে আবু সুফিয়ান আমি যে আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল এতে কি তোমার সন্দেহ আছে?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'সামান্য একটু সন্দেহ আছে'।

শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তিনি এক সময় প্রকৃত ঈমানাদার হয়েছিলেন। ইসলামের পক্ষে তিনি যুদ্ধও করেছেন। তায়েফের যুদ্ধে তাঁর একটি চোখ আহত হয়েছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে উক্ত চোখটি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাঃ) আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দিন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি কা'বায় আশ্রয় গ্রহণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি নিজের গৃহের দরোজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে থাকবে তারাও নিরাপত্তা লাভ করবে'। অথচ এই আবু সুফিয়ান ওহূদের ময়দানে নবী করীম (সাঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে হন্যে হয়ে খুঁজে ছিলো। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে এত বেশী মর্যাদা দিলেন যে, তাঁর বাড়িতে যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে তারাও আজকের এই বিজয়ের দিনে নিরাপত্তা পাবে। তদানীন্তন আরবে কারো বাড়িকে নিরাপত্তার স্থল হিসাবে ঘোষণা দেয়ার অর্থ ছিল তাকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা।

নবী করীম (সাঃ) আবু সুফিয়ানের ক্ষেত্রে তাই করেছিলেন। (ইবনে আল জাওযী, আল মুজতবা, পৃষ্ঠা নং-৮৩)

আবু সুফিয়ান (রাঃ) মক্কায় গিয়ে জনগণের মধ্যে নবী করীম (সাঃ) এর ঘোষনা শুনিয়ে দিলেন। তাঁর ঘোষনা শুনে মক্কার কুরাইশরা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তিনি নিজের সম্পর্কে ঘোষনা দিলেন, 'আজ থেকে আমি তোমাদের আর নেতা নই, আমার পরিচয় শোনো, আমি মুসলমান'।

তাওহীদের সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো। নবী করীম (সাঃ) তাঁর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) কে বললেন, 'আবু সুফিয়ানকে উচ্চস্থানে দাঁড় করিয়ে দাও, তাওহীদের সেনাবাহিনীর রূপ চেহারা সে দু'চোখ ভরে উপভোগ করুক'।

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার পথের অকুতোভয় সৈনিকদের নিয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন, কুরাইশরা ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেউ আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলো, কেউ বা কা'বাঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কয়েকজন মক্কা ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। হযরত আব্বাস (রাঃ) নও মুসলিম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাওহীদের বিশাল বাহিনী সমুদ্রের তরঙ্গের মতই মক্কা নগরীতে আছড়ে পড়লো।

এক নয়নাভিরাম বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা হলো। আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের নিজের গোত্রের পতাকা উড়িয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন। প্রতিটি সৈন্যর চেহারায় তাওহীদের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল কুরআনের সৈনিকরা আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বীর দর্পে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম গিফারী গোত্রের মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার পেছনে জুবায়না গোত্র। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা হুদায়বিয়া সন্ধিকে 'ফতহুম মুবিন' অর্থাৎ প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আজ তার বাস্তব অবস্থা মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এরপর বিভিন্ন গোত্রের মিছিল বজ্রকণ্ঠে তাওহীদের শ্লোগানে মক্কা নগরীকে প্রকম্পিত করে এগিয়ে গেল।

নও মুসলিম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) জান্নাতি দৃশ্য দেখতে দেখতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)। সেদিন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর। তিনি চিনতে পারছিলেন না, কোনটা কোন্ বাহিনী। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন বাহিনীর পরিচয় তিনি জেনে নিচ্ছিলেন।

এবার এগিয়ে এলো বিশাল এক মিছিল নিয়ে সেনাপতি হযরত সায়াদ ইবনে উবায়দা (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত এই বিশাল

বাহিনীর পরিচয় কি?' হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'এই বাহিনী মদীনার আনসারদের'।

হযরত উবায়দা (রাঃ) দেখলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর পাশেই রয়েছেন নবী করীম (সাঃ) এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)। তাঁকে দেখে তিনি বললেন, 'হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। কা'বাকে আজ উন্মুক্ত এবং বৈধ করে দেয়া হবে'।

অর্থাৎ আজ কা'বা এলাকায় রক্তপাত করা বৈধ। আবু সুফিয়ান বুঝলেন, আজ মক্কা নগরীতে রক্তের প্লাবন বইয়ে দেয়া হবে। তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন। তাহলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং মক্কার অধিবাসীরা কেউ আজ জীবিত থাকবে না? এমন সময় তিনি দেখলেন নবী করীম (সাঃ) কে পরিবেষ্টন করে সাহাবায়ে কেরাম বিশাল মিছিল সহকারে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন। এই মিছিলের পতাকা ছিল হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) এর হাতে।

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি শুনেছেন, উবায়দা কি বলে গেল!'

আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সাঃ) জানতে চাইলেন, 'কি বলেছে উবায়দা?'

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) জানালেন, 'উবায়দা বলে গেল আজকের দিন রক্তপাতের দিন। কা'বাকে আজ উন্মুক্ত এবং বৈধ করে দেয়া হবে'।

নবী করীম (সাঃ) তাঁকে অভয় দান করে বললেন, 'উবায়দাহ ভুল বলেছে। আজ কা'বা শরীফের মর্যাদা দেয়ার দিন'। অর্থাৎ কোনো রক্তপাত নয়, কা'বাঘরের প্রকৃত যে মর্যাদা আজ সেই মর্যাদা দেয়ার দিন।

পবিত্র মক্কা নগরীতে এক পথে মিছিল প্রবেশ করেনি। বিভিন্ন পথ ধরে মিছিল প্রবেশ করছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল নগরীতে প্রবেশ করছিল। বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজয়ী বীর বিশ্বনবী (সাঃ), যাঁকে এই নগরীর লোকজন অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে। তাদেরই মধ্যে তিনি বিজয়ী বীর হিসেবে প্রবেশ করছেন। অথচ তাঁর চেহারায় গর্ব অহংকারের কোনো চিহ্ন নেই। তাঁর সকল আচরণে ক্ষমা আর মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে। সুললিত কণ্ঠে তিনি সূরা ফাত্হ্ তিলাওয়াত করছেন। সূরা ফাত্হ-এ বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নাজিল হয়েছিল।

ইসলাম সম্পর্কে না জেনে অথবা বিদ্বেষ অন্তরে রেখে যারা বলেন, ইসলাম তরবারীর শক্তিতে প্রচার হয়েছে, তারা আজকের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য কল্পনার দৃষ্টিতে একবার দেখুন, ইসলাম কোন্ শক্তির কারণে বিজয়ী হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে উটের ওপর বসে মধুর কণ্ঠে সুরা ফাত্হ্ পাঠ করতে দেখেছি। হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) বলেন, যদি আমার পাশে লোকজন ভীড় করার আশংকা না থাকতো, তাহলে মুগাফ্ফালের মত আমিও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতাম। (বুখারী)

নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ ছিল, কোনো ধরনের বাধা না এলে কারো প্রতি আঘাত করা যাবে না। কিন্তু কুরাইশদের একটি হঠকারী দল হযরত খালেদ (রাঃ) এর মিছিলের ওপর আক্রমন করলো। তিনজন সাহাবা শাহাদাতবরণ করলেন। বাধ্য হয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) আক্রমণ করলেন। কুরাইশদের বিভ্রান্ত দলের ১৩ জন নিহত হলো। নবী করীম (সাঃ) দূর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে খালেদ (রাঃ) কে তলব করলেন। কৈফিয়ত চাইলেন, কেনো যুদ্ধ শুরু করা হলো। তিনি জানালেন, প্রতিপক্ষ তাদের ওপরে প্রথমে আক্রমন করে তিনজনকে শহীদ করেছে। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা এমনই ছিল'।

নবী করীম (সাঃ) এর পতাকা হাজুন নামক স্থানে রাখা হলো। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আজ কোথায় থাকবেন? আপনি কি আপনার সেই পুরোনো বাড়িতেই থাকবেন?'

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, 'আকীল কি কোনো জায়গা রেখেছে!' তারপর তিনি বললেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি কাফিরদের উত্তরাধিকারী হয় না। আর কাফিরও ঈমানদারের উত্তরাধিকারী হয় না'। (বুখারী)

ইসলামী বিধানে কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। নবী করীম (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব যখন ইন্তেকাল করেছিলেন সে সময় হযরত আলী (রাঃ) এর ভাই আকীল অমুসলিম ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এর এবং তাঁর পিতার সকল সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) নিজের থাকার জন্যে কা'বার ঐ স্থানের কথা বললেন, যেখানে ইসলাম বিরোধিরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করতো। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার উচ্চ এলাকা কাদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি যে উটের আরোহী ছিলেন তাঁর পেছনে বসেছিলেন মূতার

যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা (রা:) এর সন্তান হযরত উসামা (রা:)। বিশ্বনবী (সা:) এর পবিত্র মাথা মুবারকে এ সময় ছিল লোহার শিরস্ত্রাণ।

অধীনস্থ অমুসলিমের ধৃষ্টতা ও নবী করীম (সা:) এর সীরাত

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রত্যক্ষ ফসল ছিলো মক্কা বিজয়। মক্কায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবার অর্থই ছিলো সমগ্র আরব ইসলামের প্রভাবাধীনে আসা। মক্কা বিজয়ের পরে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ এসে ইসলাম গ্রহণ করছিল। আরবে একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মক্কায় আল্লাহর ঘর কোনো মিথ্যাবাদীর নিয়ন্ত্রণে কখনোই যাবে না। নবী করীম (সা:) এর আন্দোলনের প্রতি সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল তারা অপেক্ষায় ছিল, কুরাইশরা পরাজিত হলেই তারা বিজয়ী নবীর আনুগত্য করবে। মক্কা বিজয়ের পরে তারা বিশ্বনবী (সা:) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু হাওয়াজেন গোত্র ও ছাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলো না। তারা ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। তাদের মধ্যে যাদু বিদ্যারও চর্চা ছিল। তারা ধারণা করেছিল, মুহাম্মাদ (সা:) প্রায় সমগ্র আরবই নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। এবার তাদের এলাকা দখল করলে তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব আর থাকবে না। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হিসাবে তারা হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, উভয় গোত্র একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমন করে তাদেরকে পর্যদুস্ত করবে।

নবী করীম (সা:) সংবাদ পেলেন হাওয়াজেন গোত্র ও ছাকিফ গোত্র একত্রিত হয়ে এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে মুসলমানদের ওপর আক্রমন করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে। তিনিও দ্রুত শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। নবী করীম (সা:) এর প্রেরিত লোকজন ছদ্মবেশে প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীর সাথে মিশে গেলো। কয়েকদিন তাদের ভেতরে অবস্থান করে তাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে এসে তাঁরা নবী করীম (সা:) কে সংবাদ জানালেন।

আল্লাহর রাসূল (সা:)ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এই যুদ্ধই ইতিহাসে হুনাইনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। চাপিয়ে দেয়া এই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়লো। সবেমাত্র রাসূল (সা:) মক্কা বিজয় করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে মক্কার কুরাইশদের কাছ থেকে হুনাইন যুদ্ধের খরচ বাধ্যতামূলক ভাবে আদায় করতে পারতেন এবং পরাজিত কুরাইশরা যুদ্ধের খরচ দিতে বাধ্য ছিলো। কিন্তু নবী করীম (সা:) পরাজিত ও নিয়ন্ত্রিত জনগোষ্ঠীর কাছে যুদ্ধের খচর দাবী করেননি। ইসলাম বিদ্বেষী জ্ঞানপাপীরা নবী করীম (সা:) এর এই মহত্ত্বের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে, এসব ইতিহাস তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়।

নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হলেন ঋণ করতে। আবু জাহিলের বৈমাত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রবিয়া ছিল মক্কার ধনাঢ্য লোকদের একজন। রাসূল (সাঃ) তার কাছে থেকে ৩০ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। মক্কার কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, মক্কা বিজয়ের পরেও তখন পর্যন্ত ধনাঢ্য সে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ লোকটির কাছে অস্ত্রের ভাণ্ডার ছিল। নবী করীম (সাঃ) এই অমুসলিমের কাছে গেলেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। বিজয়ী নেতা বিজিত দেশের এক সাধারণ নাগরিকের কাছে গেলেন অস্ত্র ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। তিনি স্বয়ং না গিয়েও লোক মারফত তাকে সংবাদ দিয়ে নিজের কাছে আসতে বাধ্য করতে পারতেন। রাসূল (সাঃ) যা আদেশ করতেন তা মানতে তাকে বাধ্য করতে পারতেন।

কিন্তু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মানবতার মুক্তিদূত নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং পরাজিত সেই অমুসলিমের কাছে গেলেন। তাকে অনুরোধ করলেন, 'আমাকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করো'।

অমুসলিম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর দিকে তাকিয়ে বললো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! তুমি কি আমার অস্ত্র কেড়ে নিতে এসেছো?'

স্মিতহাস্যে আল্লাহর হাবিব বললেন, 'না কেড়ে নিতে আসিনি। আমি তোমার অস্ত্র পুনরায় ফেরৎ দিবো। ঋণ হিসাবে দাও'।

বিজয়ী নেতার সাথে বিজিত দেশের একজন অমুসলিম কি ভাষায় কথা বলছে আর বিজয়ী নেতা কি জবাব দিচ্ছেন, এদিকে দৃষ্টি দিলেও কি ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীদের মনে হয়, নবী করীম (সাঃ) তরবারীর জোরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে হিংসা আর বিদ্বেষ যাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে, তারা কখনোই স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র সীরাত ও ইসলামপন্থীদের মহত্ব দেখতে পায় না। প্রকৃত সত্য আড়াল করার লক্ষ্যে তারা কৌশলী পন্থা অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাদের নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টিভি চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কিভাবে তারা অসত্য প্রচার করছে, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করছে, লেখা ও বলার ক্ষেত্রে ভাষার কৌশলী শব্দ ব্যবহার করছে। সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলিম চেতনা বিদ্বেষী লোকজন মিথ্যা ব্যতীত সততা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে পারেনি। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত

হুনাইনের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত ইসলামের শত্রুদের কয়েক হাজার বাহিনী আওতাস নামক স্থানে এসে জমায়েত হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) দুশমনদের মুকাবেলায় হযরত আবু আমের আশয়ারী (রাঃ) কে কিছু সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন। তিনি আওতাস নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবু আমের (রাঃ) প্রতিপক্ষের হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। এমনকি তাঁর হাতের পতাকা শত্রুদের হাতে চলে গেল।

হযরত আবু আমের (রাঃ) এর চাচাত ভাই হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে শত্রু পক্ষের ওপরে তীব্র আক্রমন করলেন। শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। মুসলমানদের হাতে প্রচুর গণীমাতের সম্পদ জমা হলো। বহু সংখ্যক বন্দীও হলো। এই বন্দীদের মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল। হযরত হালিমা তুসসাদিয়া (রাঃ) এর বড় মেয়ে সায়মাও বন্দী হলেন, তিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর দুধবোন। তাঁকে যখন বন্দী করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দুধবোন। আমি তাঁকে শিশুকালে কোলে রাখতাম'।

এ কথা শোনার পরে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথার সততা প্রমাণের জন্য তাঁকে সম্মানের সাথে নবীর দরবারে উপস্থিত করলেন। সায়মা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আমি আপনার দুধবোন। আপনি যখন শিশু ছিলেন তখন আপনাকে আমি কোলে রাখতাম'।

মানবতার মহান মুক্তিদুত বিশ্বনবী (সাঃ) পলকহীন দৃষ্টিতে সায়মার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তাঁর পবিত্র চোখ দু'টোয় অশ্রু টলমল করছে। স্মৃতিতে ভেসে উঠলো স্নেহময়ী দুধমাতা হযরত হালিমার কথা। আল্লাহর নবী উঠে দাঁড়িয়ে দুধবোন সায়মাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্রদ্ধেয়া বড় বোনকে রেসালাতে নববীর পাশে বসার জন্য নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) মমতা জড়ানো কণ্ঠে সায়মার কুশলাদি জানলেন। বোন সায়মা অবাক হয়ে শিশুকালে যাকে কোলে রাখতেন আর তাঁর প্রশংসা এবং দোয়া করে কবিতা পাঠ করতেন তাঁকে প্রাণভরে দেখলেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর শিশুকালে সায়মা ছিলেন বয়সে কিশোরী। তিনিই শিশুনবীকে কোলে নিয়ে ঘুরতেন। শিশুনবীকে তিনি আদর করতেন আর কবিতা আকারে বলতেন, 'আমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবিত থাক। সে সুন্দর সুঠামদেহী বলিষ্ঠ যুবক হোক, আমরা তাকে দু'নয়নভরে দেখবো। নেতা হয়ে সে যেন ইয়েমেন নিজের অধিকারে নিতে পারে। তাঁর সাথে যারা শত্রুতা করবে তাদের যেন মঙ্গল না হয়। হে আল্লাহ, তাঁকে অসীম সম্মানের অধিকারী করে দাও'।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন সায়মা। তাঁর সেই কিশোরী বয়সের প্রার্থনা মহান আল্লাহ কবুল করেছিলেন! তাঁর দুধভাই আজ আল্লাহর নবী, বিপুল ক্ষমতা এবং অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। তাঁর দুধভাই তাকে ভুলে যাননি। নবী করীম (সাঃ) পরম মমতায় তাঁর বোনকে বললেন, 'বোন, তোমার যদি মন চায় তাহলে আমার কাছে বসবাস করতে পারো। আর যদি তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যেতে চাও তাহলে আমি তোমাকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি'।

সায়মা নিজের পরিবার-পরিজনের কাছেই ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) উপঢৌকন দিয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে দুধবোনকে যথাস্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। শৈশবে যারাই নবী (সাঃ) কে স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেছে তিনি তাদেরকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধের কথা স্মরণ রাখতেন।

মানবতার শত্রু আবু লাহাবের দাসী সুয়ায়বার দুধ তিনি শিশুকালে কয়েক দিন পান করেছিলেন, এ কারণে সে জীবিত থাকা পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) তাঁর প্রতি যত্নের দৃষ্টি রেখেছেন, তেমনি হযরত হালিমার প্রতিও তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে ছিলেন সজাগ। মক্কা ছেড়ে নবী করীম (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখনও তিনি তাঁর দুধ মা সুয়ায়বার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও অর্থ প্রেরণ করতেন। হযরত খাদিজার (রাঃ) এর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরে হযরত হালিমা রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই তিনি নিজের পবিত্র শরীরের চাদর বিছিয়ে বসতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'আসুন আমার আম্মা আসুন!'

হযরত হালিমা (রাঃ) আল্লাহর নবীকে জানালেন, 'আমাদের অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে এবং সে কারণে আমাদের পশু সম্পদ সব নিঃশেষ হয়ে গেছে'। দুধ মায়ের মুখে অভাবের কথা শুনে তিনি ৪০ টি ছাগল এবং একটি উটের ওপরে নানা ধরনের সামগ্রী দিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, হুনাইনের যুদ্ধের সময় নবীর দুধমাতা তাঁর কাছে যখন এসেছিলেন সে সময় রাসূল (সাঃ) নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দিয়েছিলেন। হযরত হালিমা (রাঃ) আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন। (ইবনুল বার-আল্ ইস্তিয়াব)

বনী সাআদ ছিল হাওয়াজেন গোত্রের একটি শাখা। সে সময় হাওয়াজেন গোত্রের খ্যাতি ছিল যে, তারা স্পষ্ট উচ্চারণে আরবী ভাষা বিশুদ্ধভাবে বলে থাকে। ইবনে সাআদ উল্লেখ করেছেন, বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম বিশুদ্ধ ভাষী। কারণ আমি কুরাইশ বংশের লোক এবং আমার ভাষা হচ্ছে হাওয়াজেন গোত্রের ভাষা'।

নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। যদি তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজন আসে, এ জন্য তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। অশেষে হাওয়াজেন গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে করুণ আবেদন জানালো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি কিন্তু আমাদের অপরাধ সীমাহীন। আপনি আমাদের অপরাধের দিকে অনুগ্রহ করে দৃষ্টি দিবেন না। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের মা-বোন ও সন্তানদের ফেরৎ দিন'।

যারা বন্দীদের মুক্ত করতে এসেছিল তারা সকলেই ছিল হযরত হালিমা (রাঃ) এর গোত্রের। এই গোত্রের নেতা জুহায়ের ইবনে সুরাদ (রাঃ) আবেদন করলেন, 'বন্দীদের মধ্যে আপনার দুধমাতার আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ আপনার খালা, ফুফুগণ রয়েছেন। মহান আল্লাহর শপথ! আরবের রাজা-বাদশাহর মধ্যে কেউ যদি আমাদের বংশের কারো দুধপান করতো, তাহলে তার কাছে আমরা অনেক কিছুই আবদার করতে পারতাম। পক্ষান্তরে আমরা আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা সবথেকে বেশি'। তাদের আরেকজন আবেদন জানালো, 'শিশুকালে আপনি আমাদের মাঝেই পালিত হয়েছেন। আজ আপনার অতুলনীয় মর্যাদা! শৈশবের কথা স্মরণ করে আপনার দুধমাতার আত্মীয়দের মুক্তি দিন'।

তাদের কথা শুনে শৈশবের স্মৃতি এসে নবী করীম (সাঃ) কে নাড়া দিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে একদিন অপেক্ষা করতে বললেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে তিনি পরামর্শ করে বললেন, 'আমার গোত্রের যে দাবী আছে বন্দীদের ওপর আমি তা ত্যাগ করছি'।

রাসূল (সাঃ) এর কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, 'আমরাও বন্দীদের প্রতি আমাদের দাবী ত্যাগ করছি'।

দুইজন অমুসলিম তাদের দাবী ছাড়লো না। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের দাবী ত্যাগ করো, তোমাদের যা প্রাপ্য আমি আদায় করবো। আমিই তোমাদের প্রাপ্য শোধ করবো'।

আল্লামা শিবলী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) হাওয়াজেন গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলেন, 'আমি আমার গোত্রের লোকদের নির্ধারিত অংশ ত্যাগ করতে পারি। তোমরা এমন করতে পারো, নামাজ আদায় শেষে সমবেত লোকদের সামনে তোমাদের আবেদন পেশ করো'।

তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী যুহরের নামাজ শেষে আবেদন করলে নবী করীম (সাঃ) নিজের গোত্রের অধিকার ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণা শুনে সকল সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের অধিকার ত্যাগের ঘোষণা দিলেন। কিছুক্ষণের

মধ্যে প্রায় ছয় হাজার নারী, শিশু, বালক-বালিকা মুক্তি লাভ করেছিল। এতগুলো মানুষকে দীর্ঘ প্রায় এক মাস প্রতিপালন করতে গিয়ে মুসলমানদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) কোনো বিনিময় গ্রহণ করলেন না। শুধু তাই নয়, প্রতিটি বন্দীকে নতুন পোষাক দিয়ে তিনি বিদায় করেছিলেন। পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি এমন অপূর্ব ব্যবহার অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে নেই। আধুনিক যুগের গণতন্ত্রের দাবীদাররা সম্পদের লোভে শুধু ভিন্ন দেশ দখলই করছে না, দেশ দখলে যেসকল দেশ প্রেমিকগণ বাধা দিয়েছে, যুদ্ধবন্দীর নামে তাদেরকে গ্রেফতার অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করছে। এরাই লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যবহার করে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অপপ্রচার করছে।

নবী করীম (সাঃ) করুণার সিন্ধু

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র অধিপতি। আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন এসব সকল সৃষ্টির জন্যে তিনি যেমন পরম করুণাময় তেমনি তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বকে সর্বশেষ ও বিশ্বনবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁকেও তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্যে করুণা হিসাবেই প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ–

হে নবী, আমি আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

আক্ষরিক অর্থেই নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য করুণার মূর্ত প্রতীক তথা মহান আল্লাহর অসীম রহমত বিশেষ। মাতৃগর্ভে থাকাকালে পিতাকে হারিয়েছেন, শিশুকালে মমতাময়ী মা'কে হারিয়েছেন, মাত্র আট বছর বয়সে স্নেহদাতা দাদাকে হারিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালেবের স্নেহের ছায়াতলে বড় হয়েছেন। তাঁর সারাটি জীবনই দুঃখ আর কষ্টের বাস্তব উপখ্যান। সকল দুঃখ তিনি ভোগ করেছেন, কিন্তু কখনো কাউকেই সামান্যতম কষ্ট দেননি। কাউকে আঘাত করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, কারো প্রতি কখনো রূঢ় আচরণ করেননি। কখনো কটু কথা পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেননি। কাউকে অভিশাপ বা বদ্‌দোয়া দেননি। অন্যের কষ্ট তিনি ভাগ করে নেননি বরং কষ্টের সবটুকুই তিনি নিজ কাঁধে উঠিয়ে অন্যকে ভারমুক্ত করে সকল কষ্ট লাঘব করেছেন।

নারী সমাজকে অমর্যাদা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে মর্যাদার আসনে আসীন করে দিয়েছেন। ক্রীতদাসদের গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত করে স্বাধীন করে দিয়েছেন। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি করুণার বাহু বিছিয়ে দিয়েছেন। অভাবী দরিদ্রদের খাদ্য

পৌঁছে দিয়ে নিজে অভুক্ত থেকেছেন। অবহেলিত বিধবাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ইয়াতিমদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন। রোগীর সেবা করেছেন এবং অসহায় মানুষের সহায় হয়েছেন। ছোটদের গভীর স্নেহের বাঁধনে বন্ধু বানিয়েছেন এবং বড়দের একান্ত সম্মানে আপ্লুত করেছেন। জীবনের শত্রুকে হাতের নাগালে পেয়েও ক্ষমার অনুপম সাগরে সিক্ত করেছেন। অবলা প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং অন্যদেরকেও প্রাণীর প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণ করতে শিখিয়েছেন। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। নবী করীম (সা:) এর এসব অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্টের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

(হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রাসূল এসেছেন, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তাঁর কাছে দু:সহ, তিনি তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি হচ্ছেন স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। এরপরও যদি এরা (এমন একজন কল্যাণকামী রাসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনি (তাদের খোলাখুলি) বলে দিন, আল্লাহ্ তা'য়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সঙ্কটে আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। (সূরা তাওবা-১২৮-১২৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যান্য যেসকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে নিজ জাতি এমনকি সবথেকে নিকটতম লোকদের কাছ থেকেও অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। কিন্তু নির্যাতন যখন সকল সীমা অতিক্রম করেছে তখন কোনো কোনো নবী-রাসূল মহান আল্লাহর কাছে বদ্‌দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন হযরত নূহ (আ:) নিজ জাতির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছেন–

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُه وَوَلَدُه إِلاَّ خَسَارًا ج وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ج

নূহ বললো, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে, (আমার বদলে) তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন-

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের বিনাশই বৃদ্ধি করেছে, তারা সত্যের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। (সূরা নূহ্-২১-২২)

অবাধ্যতার চরম সীমা অতিক্রম করার পরে হেদায়াতের সকল আশা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে তখন হযরত নূহ (আ:) মহান আল্লাহর কাছে নিজ জাতির ধ্বংস কামনা করে আবেদন করেছেন–

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْآ إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ تَبَارًا ع

নূহ (আরও) বললো, হে আমার মালিক, এ যমীনের অধিবাসী (যালিমদের) একজন (গৃহবাসী)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না, (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফির ছাড়া কাউকেই জন্ম দিবে না। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও, যালিমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না। (সূরা নূহ-২৬-২৮)

এবার নবী করীম (সা:), যাঁকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'করুণার মূর্ত প্রতীক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর জীবনের দিকে লক্ষ্য করি। নিজ জন্মস্থান মক্কায় অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শিয়াবে আবি তালেবে নির্যাতিত হলেন, তায়েফে গেলেন সেখানেও লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হলেন। মদীনার জীবনে ওহূদ ও অন্যান্য স্থানে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হলেন। মক্কায় পবিত্র কা'বা ঘরে তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন, দুশমনরা তাঁর পবিত্র কণ্ঠে রশি পেঁচিয়ে দু'দিক থেকে টেনে ধরেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে চোখ দু'টো কোঠর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। নামাজে তিনি সিজদায় গিয়েছেন, উটের পচা নাড়িভূড়ি তাঁর মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটেছেন সে পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহূদের ময়দানে দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছে, তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন। জীবনের ঐই চরম মুহূর্তেও তিনি নিজ জাতির জন্য আতঙ্কিত হয়েছেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর গযব নাযিল করেন কিনা। এ আশঙ্কায় তিনি মহান মালিকের কাছে নিজ জাতির জন্যে দোয়া করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'হে আমার আল্লাহ্, আমার জাতিকে হিদায়াত দাও, ওরা জানে না'।

অর্থাৎ আমি যে নবী, আমি ওদের কল্যাণকামী তা ওরা বুঝতে পারেনি, এ জন্যেই আমার প্রতি ওরা আঘাত করেছে। ওরা বুঝে না, তুমি ওদের ওপর গযব দিও না।

নবী করীম (সা:) মক্কা বিজয় করলেন। অত্যাচারী জালিমদের আঙ্গিনায় প্রতিশোধের খড়গ কৃপাণ নিয়ে তিনি এবং নির্যাতিত সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় উপস্থিত হননি। এক সময় যারা ছিলেন জালিম অত্যাচারী তাদের আঙ্গিনায় করুণার সিন্ধু প্রবাহিত হলো। যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘর পরিবেষ্টন করেছিল, তারাও সেদিন সেই করুণার সাগরে অবগাহন করার সুযোগ লাভ করলো। ইসলাম পূর্ব আরবে এক ঘৃণ্য প্রথা শতাব্দী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোনো ব্যক্তি যদি নিহত হতো, তাহলে তার গোত্রের লোকজন মনে করতো যে, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে যদি তারা ধরতে না পারতো, তাহলে তার নাম পরিচয় তারা লিখে রাখতো। ক্ষেত্র বিশেষে তারা প্রতীজ্ঞা করতো, হত্যাকারীর মাথার খুলিতে তারা মদ পান করবে। বংশের লোকদেরকে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতো। আরবদের বিশ্বাস ছিল, কেউ কাউকে হত্যা করলে সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির আত্মা সাদা রংয়ের পাখি হয়ে পাহাড়-পর্বতে উড়তে থাকে আর বলতে থাকে, 'আমাকে পান করাও! আমাকে পান করাও!' আবার কারো ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি নিহত হয় তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলে সে ঐ জগতে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে ঐ জগতে সে মরে যায়।

আবার কারো ধারণা ছিল, হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে নিহত ব্যক্তির কবর অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে তার কবর আলোকিত হয়। এই সকল অমূলক বিশ্বাসের কারণে যুদ্ধের আগুন কখনো নির্বাপিত হয়নি। এভাবে যুদ্ধ করা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছিল তাদের কাছে এক সম্মানজনক ব্যাপার।

বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা:) ঘোষণা করলেন, 'এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আজ তিনি তাঁর অঙ্গিকার পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর গোলামকে সাহায্য করেছেন এবং সত্যের শত্রুদেরকে স্তব্ধ করেছেন। সকল অহংকার এবং পূর্বের রক্তের বদলা, রক্তের বাঁধন সবই আমার পায়ের নীচে দলিত হলো। আজ এসব কিছুই আমার পায়ের নীচে কবর দিলাম'।

নবী করীম (সা:) তাঁর ভাষণের সমাপ্তিতে সামনে বিশাল জনসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর পবিত্র সুন্দর চোখ দু'টো যেন করুণার সিন্ধুর মতই হয়ে এলো। তিনি

দেখলেন, ঐ লোকগুলো তাঁর মুখের দিকে আজ অসহায়ের মতই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের ভাষায় ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব আর ক্ষমার আকুতি।

নির্যাতিত নবী দেখছেন, ঐ তো–ঐ লোকগুলোর সাথেই তারা মিলে মিশে আজ একাকার হয়ে তাঁর সামনে বসে আছে, যে লোকগুলোকে সত্য গ্রহণের অপরাধে তারা জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়েছে। হযরত বিলাল (রাঃ) এর গলায় রশি বেঁধে কাঁটা ও পাথরের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে, বিলালের দেহের গোস্ত চামড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। খাব্বাবের শরীরে এখনো সে ক্ষত দগদগ করছে। শিয়াবে আবু তালিবে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করেছে। ঐ তো সেই লোকগুলো। অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রিয় খাদিজা ঐ যে ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব ভেঙ্গে পড়লেন, আর উঠতে পারলেন না। আবু জাহিলের সাথে মিলে সুমাইয়াকে যারা হত্যা করেছিল তারাও তো অবনত মস্তকে বসে আছে।

তাঁর প্রিয় চাচা হামজার কলিজা যারা চিবিয়ে ছিল, তারাও আছে। তাঁর গর্ভবতী মেয়ে যয়নবকে আঘাত করে উটের ওপর থেকে নীচে ফেলে গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছিল, তারাও বসে আছে। তাঁকে যারা সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে তারাও মাথা নীচু করে বসে আছে। তাঁকে যারা হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাঁর সেই প্রাণের শত্রুও অবনত মস্তকে বসে আছে। বদর ওহূদ খন্দকে যারা রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, তারাও তাঁর সামনে বসে আছে।

বিশ্বনবী (সাঃ) তাদের দিকে তাঁর পবিত্র নয়নযুগল- করুণার সিন্ধু প্রবাহিত করলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কি জানা আছে, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?'

সমবেত অপরাধীগণ সমস্বরে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, আমাদের মর্যাদাবান ভাতিজা!'

করুণার সাগরে প্লাবন সৃষ্টি হলো। তরঙ্গের পরে তরঙ্গ আছড়ে পড়লো প্রাণের শত্রুদের ওপর। নবী করীম (সাঃ) মমতা সিক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আজ তোমরা সবাই মুক্ত'।

ইউরোপের লেখকদের চোখে এই দৃশ্য কি ধরা পড়েনি? আপনারা পরাজিত জাতির সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন এবং করেন, পৃথিবীবাসীর তা জানা আছে। যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে আমেরিকা হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে কি করেছে, পৃথিবীর মানুষ সে নৃশংস ঘটনা কি কখনো ভুলে যাবে? বিশ্বনবী (সাঃ) মক্কা বিজয় পর্যন্ত পৌঁছলেন, এর পেছনে কি তাঁর কোনো উচ্চাশা কার্যকর ছিল? আপনাদের একজন

লেখক জোসেফ হেল বলেছেন, 'Thus Mohammad attained the summit of his ambition. অর্থাৎ এভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর উচ্চাকাংখার চরম শিখরে উপনীত হন'।

ইসলাম বিদ্বেষী এ লোকটি কিভাবে নবী করীম (সাঃ) এর উচ্চাশার কথা বললেন, ভাবতে অবাক লাগে। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করলেন মাত্র, এখানে উচ্চাকাংখা এলো কোত্থেকে? তিনি মক্কার লোকদের সাথে যে ব্যবহার করলেন, যে ভঙ্গিতে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন, এগুলো কি একজন উচ্চাকাংখী মানুষের চারিত্রিক অলংকার? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখলাম, রাসূল (সাঃ) বিজয়ী হতে যাচ্ছেন। এ সময়ে তিনি উটের ওপরে বসা অবস্থায় মহান আল্লাহর কাছে এতই কৃতজ্ঞশীল ছিলেন যে, তিনি মাথা নীচু করেছিলেন। তাঁর পবিত্র মাথা এতটাই নীচু হয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি মোবারক উটের পিঠ স্পর্শ করছিলো'। একজন উচ্চাকাংখা পোষণকারী ব্যক্তি বিজিত এলাকায় কখনো এই ভঙ্গীতে প্রবেশ করেন?

তাঁর যদি উচ্চাকাংখাই থাকবে তাহলে তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করলেন কেন? চাচা আবু তালিব জীবিত থাকতেই তো মক্কার নেতৃবৃন্দ তাকে অর্থ বিত্ত, সুন্দরী নারী দিতে চেয়েছিল। তাঁকে দেশের শাসকের পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল। উচ্চাকাংখা থাকলে তখনই তো তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী হতেন। তারা যে জেনে বুঝেই নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এই ধরনের ধৃষ্টতা পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বনবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে ইংরেজি Ambition শব্দ বা বাংলা 'উচ্চাকাংখা' শব্দ ব্যবহার করা চরম ধৃষ্টতার শামিল।

বিজিত মক্কায় নবী করীম (সাঃ) এর অনুপম ব্যবহার

মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পরে অত্যাচারিত হয়ে যারা মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তাদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকজন দখল করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছে করলে তাদের কষ্টার্জিত সে সব বাড়ি ঘর সহায় সম্পদ অধিকার করতে পারতেন। নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আদেশ করেছিলেন, 'তোমরা কোনো কিছুতেই হাত দিবে না'।

সাহাবায়ে কেরাম তাদের সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকালেন না। ইতোমধ্যে হযরত বিলাল (রাঃ) কা'বা ঘরের ছাদে আরোহণ করে আযান দিলেন। সে সময় এমন কিছু লোকজন উপস্থিত ছিল, যারা ছিল একেবারে মূর্খ শ্রেণীর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এদের অন্তরে তাওহীদের আলো প্রবেশ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। হযরত বিলালের কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষণা শুনে আত্তাব ইবনে

উসাইদ বললো, 'খোদা আমার পিতার সম্মান রক্ষা করেছে, সে এই আযানের শব্দ শোনার আগেই পৃথিবী ত্যাগ করেছে'।

কোনো এক মূর্খ বলেছিল, 'কা'বা ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছে! এখন তো আমাদের জীবিত থাকাই উচিত না'।

মক্কার জনগণ যা ভেবেছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার পেয়েছিলো মুসলমানদের কাছ থেকে। ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কারো প্রতি সামান্য শক্তিও প্রয়োগ করা হয়নি। তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। নবী করীম (সাঃ) সাফা পর্বতের উঁচ্চ স্থানে উপবেশন করলেন। চারদিকে মানুষের জোয়ার সৃষ্টি হলো। ঘোষণা করা হলো, প্রথমে পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ শেষ হলে মহিলাগণ আগমন করবে।

পুরুষগণ আগমন করে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র মুবারক হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। আর মহিলাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হলো, রাসূল (সাঃ) পানির পাত্রে নিজের পবিত্র হাত মুবারক ডুবিয়ে উঠিয়ে নিতেন। তারপর মহিলাগণ সে পানির পাত্রে তাদের হাত ডুবাতেন। এভাবে নারীদের বাইয়াত গ্রহণ করালেন। নারীগণ ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করবে, তাদের চরিত্র ভালো রাখবে, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, এ সকল কথার ওপরে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইতিহাসে যে মহিলাকে কলিজা ভক্ষণকারিণী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মহিলার নাম হিন্দা। মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী সে। কারবালায় রাসূল (সাঃ) এর বংশ শেষ করতে ইচ্ছুক ছিল যে ইয়াজিদ, তাঁর দাদী হলো হিন্দা। আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মাতা হিন্দা। পর্দা আবৃতা হয়ে এই নারী নবী করীম (সাঃ) এর সামনে এসেছিল। কারণ সে যে অপরাধ করেছিল তার গুরুত্ব সে অনুধাবন করছিল। এ কারণে তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাকে চিনতে পারলে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর সামনে সে যখন বাইয়াত গ্রহণ করতে এসেছিল, তখন তাঁর আচরণে নমনীয়তা ছিল না। তারা যে আজ পরাজিত, এ ধরণের মনোভাব তার ভেতরে ছিল না। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে তাঁর কথাবার্তাও ভদ্রজনোচিত ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, 'বলো, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না'।

জবাবে হিন্দা বলেছিল, 'আপনি এ ধরনের অঙ্গীকার পুরুষদের কাছ থেকে আদায় করেননি। কিন্তু আমি সে অঙ্গীকার আপনার কাছে করছি'।

বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'অঙ্গীকার করো, কক্ষনো চুরি করবে না'।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বলেছিল, 'আমি আমার স্বামীর অর্থ সম্পদ থেকে মাঝে মধ্যে কিছু এদিক ওদিক করে থাকি। আমার জানা নেই এগুলো হারাম না হালাল'।

নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'বলো, সন্তানদের হত্যা করবে না'।

হিন্দা বলেছিল, 'আমরা বহু কষ্টে বাচ্চাদের লালন পালন করে বড় করেছিলাম। আপনি বদরের প্রান্তরে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। এখন আপনি এবং তারা যা উত্তম তাই বুঝবেন'।

ইসলাম কবুল করার পরে হযরত হিন্দা (রাঃ) ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছেন। মুসলিম বাহিনীকে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। নিজ হাতে অস্ত্রধারণ করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন। সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ অকাতরে মহান আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। অতীতে তিনি না বুঝে যা কিছুই করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ক্ষমা করে তাঁর সৎ কর্মসমূহ করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

প্রিয় চাচা হামজাকে হত্যা করেছিল ওয়াহ্শী। তাঁর বুক চিরে যে নারী কলিজা চিবিয়েছিল, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করেছিল যে নারী, সেই নারী বিশ্বনবী (সাঃ) এর সামনে। শুধু সামনেই নয়, নবীকে অভিযুক্ত করে গর্বভরে কথা বলছে সেই নারী। ধৈর্যের পাহাড় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে কিছুই বললেন না। ইসলাম হুমকি ধমকি দিয়ে প্রসারিত হয়নি, ক্ষমা আর প্রেম দিয়েই ইসলাম দিকদিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মক্কায় এমন দশজন লোক ছিল, যারা ছিল কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা। ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের নাম স্মরণীয় হয়েছিল। তারা মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ওমায়ের ইবনে ওহাব (রাঃ) রাসূলের সামনে এসে নিবেদন করলেন, 'আরবের নেতৃবৃন্দ নিরাপত্তাজনিত কারণে মক্কা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে'।

বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁর পবিত্র পাগড়ী মুবারক দিয়ে দিলেন, যা ছিল নিরাপত্তার প্রতীক। অভয় দান করলেন, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিখ্যাত নেতা সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়া জিদ্দায় পলায়ন করেছিল। আল্লাহর রাসূলের মাথা মুবারকের পাগড়ী দেখে সে ফিরে এলো। হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কার একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেনি। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ছিল তাদের অন্যতম। ইসলাম কবুল করেনি, অথচ তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধেও যোগ দিয়েছিল। তাদেরকে এমন কথা কেউ বলেনি, ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে গমন করা যাবে না।

মক্কার বিখ্যাত কবি আব্দুল্লাহ ইবনে জারয়া আতঙ্কে মক্কা ত্যাগ করে নাজরানে পালিয়েছিল। কবিতার ছন্দে সে বিশ্বনবী (সাঃ) ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে কুৎসা

গাইতো। সে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নবী করীম (সা:) তাঁকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি। ইসলামের ইতিহাস বিখ্যাত শত্রু আবু জাহিলের সন্তান ইকরামা মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেনে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকিম রাসূল (সা:) এর দরবারে এসে মুসলমান হলেন এবং স্বামীর জন্য নিরাপত্তা কামনা করলেন।

করুণার সিন্ধু বিশ্বনবী (সা:) তাকেও নিরাপত্তা দিলেন। তিনি ইয়েমেন গিয়ে স্বামীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। ইকরামা ইসলাম কবুল করে ফিরে এলো। আল্লাহর রাসূল (সা:) তাঁকে দেখে এত খুশী হলেন যে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এ অবস্থায় নবী (সা:) এর শরীর মুবারক থেকে চাদর পড়ে গেল। ইকরামা রাসূল (সা:) এর হাতে বাইয়াত করেছিল। এরপর নবী করীম (সা:) মক্কায় পনের দিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে যান। এ সময় তিনি হযরত মা'য়াজ ইবনে জাবাল (রা:) কে মক্কার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি মক্কার নওমুসলিমদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।

ইকরামা একজন উত্তম মুসলমান হিসাবে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। ইসলামের এ সব বিখ্যাত শত্রুকে ইসলাম গ্রহণ করতে কি,নবী করীম (সা:) বা সাহাবায়ে কেরাম বাধ্য করেছিল? ইউরোপিয় বন্ধুদের লেখা পড়লে মনে হয়, রাসূল (সা:) এবং সাহাবায়ে কেরাম মানুষের ঘাড়ের ওপরে তরবারী ধরে বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবো'।

নবী করীম (সা:) এর অনুপম আদর্শের আকর্ষণ

সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মহল, 'ইসলাম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে এবং সন্ত্রাসই এর মূল লক্ষ্য'। এই আপ্তবাক্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুসলিম দেশ থেকে লুণ্ঠিত অগণিত অর্থ তারা ব্যয় করেছে এবং করছে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তারা উল্লেখিত অবাঞ্ছিত কথাটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, তাদের ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপরে একদিন ইসলামের বিজয় কেতন যে উড়বেই, এ সত্য তারা জানে। সুতরাং যতদিন ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে রাখা যাবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের যৌনতানির্ভর ঘৃণ্য সভ্যতা জীবীত থাকবে।

ইসলাম কিভাবে আপন মহিমায় মানুষের হৃদয়ে নিজের আসন করে নিয়েছে, কতকগুলো ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বিদ্বেষীদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে যায়। নবী করীম (সা:) যখন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন, তখন তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার এবং তাঁকে সহযোগিতা করতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সমগ্র আরব তাঁর

আহ্বানের বিরুদ্ধে শানিত অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে গেল। বিরোধিতার যতগুলো পন্থা ছিল, সবগুলোই তাঁর ওপরে প্রয়োগ করা হলো। কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) ওহীভিত্তিক কৌশল দ্বারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মহাসত্যের আহ্বান জানাতে থাকলেন।

তাদের কৃতকর্মের অসারতা এবং ক্ষতিকর দিকসমূহ তাদের সামনে বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে থাকলেন। তারা যে পথে চলছে, এ পথ যে তাদেরকে চরম এক ক্ষতিকর পরিণতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, তা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি সে সমাজের যাবতীয় অনাচার চিরতরে উৎখাত করতে আগ্রহী হলেন। কিন্তু এই কাজ সম্পাদন করার জন্য যে শক্তি সামর্থ প্রয়োজন, তা তাঁর হাতে তখন পর্যন্ত ছিলো না। তিনি এটাও জানতেন, তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দেয়ার অর্থ হলো চরম নির্যাতন সহ্য করা। এই দাওয়াত যারা কবুল করবে, তাদেরকে যে কোনো ধরনের অত্যাচার সহ্য করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকবে না। জুলুম যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন তা প্রতিহত করার মতো জাগতিক শক্তিও তাঁর নেই। সুতরাং সকল মুসিবত সহ্য করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) যেমন জানতেন এবং যারা তাঁর আহ্বান শুনছেন, তাঁরাও জানতেন ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই হলো নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দেশবাসীকে নিজের শত্রুতে পরিণত করা। নিজের যাবতীয় অধিকার হতে নিজেকে বঞ্চিত করা। যে কোনো ধরনের কঠিন শাস্তিকে বরণ করে নেয়া। এমনকি নিজের প্রাণও চলে যেতে পারে। এ কথা জেনে বুঝেই এক শ্রেণীর মানুষ সে সমাজে নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে সত্যের সন্ধানকারী এক শ্রেণীর মানুষ এসে নবীর দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং নিজের এলাকায় গিয়ে সে দাওয়াত প্রচার করতেন। বিরোধিতার প্রচণ্ড সয়লাব তাদেরকে খড়কুটোর মতই উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইতো। নিজের কষ্টার্জিত সহায় সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতো। লোমহর্ষক নির্যাতন করা হতো। দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হতো। তবুও তারা ইসলাম ত্যাগ করতেন না এবং এই কঠিন অবস্থা দেখেও যে কোনো নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি নিয়েই মানুষ এই সত্য গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসতেন। এসব ইতিহাস রূপকথার গল্প নয়, ইসলামের ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। এই ইতিহাস জীবন্ত থাকার পরেও এক শ্রেণীর ইয়াহূদী আর খ্রিষ্টান তথা অমুসলিমরা কি করে বলেন, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে নিজের আসন পাকাপোক্ত করেছে?

পৃথিবীর কোনো স্বার্থ সামনে উপস্থিত নেই, অথচ চরম কঠিন অবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ স্রোতের মতই এসে রাসূলের পাশে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেছেন। তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই ত্যাগ স্বীকারে তাদেরকে কি নবী শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করেছিলেন? তাঁরা তো কেবলমাত্র অন্তরের চাহিদা

অনুযায়ী পঙ্গপালের মতই নবীর কাছে ছুটে আসতেন এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাদের এই বিশ্বাসের ভেতরে সামান্যতম খাদ ছিল না, কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় সংকোচ ছিল না। স্বতস্ফুর্তভাবে তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে নির্যাতনের লোমহর্ষক তাণ্ডব সহ্য করেছেন অথবা প্রাণদান করেছেন।

কিন্তু কেনো তাঁরা এভাবে তাদের বিশ্বাসের কারণে সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করলেন বা কিসের মোহে তাঁরা নবীর ওপরে বিশ্বাসে অটল ছিলেন? অগণিত মানুষ কেনো এভাবে সকল কিছুই বিলিয়ে দিয়ে একটি বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন? এ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায়, তাদের সবার বিশ্বাসের কারণ এক ও অভিন্ন ছিল না। শুধুমাত্র নবী করীম (সাঃ) এর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কারণেই মানুষ এভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেনি। বরং যাদের মন-মানসিকতা ছিল পরিচ্ছন্ন, চরিত্র ছিল উন্নত, পংকিলতার ভেতরে ডুবে থেকেও মন ও চিত্ত ছিল বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন, তাদের ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নবুয়্যাতের সততার সপক্ষে নানা ধরনের যুক্তি প্রমাণ ও বাস্তবতা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদেরকে মহাসত্যের প্রতি আকর্ষিত করেছে। তরবারী তাদেরকে সত্য গ্রহণে সামান্যতম আকর্ষিত করেনি।

তাঁদের সত্য গ্রহণ করার পেছনে ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) মহাসত্যের আহ্বান শ্রবণ করা মাত্র সত্য গ্রহণ করেছিলেন। সত্য তাঁকে আহ্বান করছে, এ প্রমাণই তাঁর মতো পূত-পবিত্র ব্যক্তির কাছে যথেষ্ট ছিল। কোনো ধরনের প্রমাণের আবশ্যক তাঁর ছিল না। সে সমাজে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা হযরত আবু বকরের অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পবিত্র চরিত্র তাদের সামনে স্পষ্ট ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, আবু বকর (রাঃ)-এর মতো মানুষ যখন একটি বিষয়ের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তখন তা অবশ্যই সত্য।

এদের মাঝে ছিলেন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) ও হযরত ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)। নবীর কাছে এসে তাঁরা তাদের আকাংখা অনুযায়ী এমন কিছু দেখলেন যে, তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। বিশ্বনবী (সাঃ) এর বিশাল হৃদয়, গরীবের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, তাঁর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্য, তাঁর ক্ষমা, দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা এসব দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হলো, এই ধরনের অনুপম চরিত্রের একজন মানুষের ভেতরে কোনো অশুভ শক্তি কাজ করতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) এমন এক চরিত্র অনুসরণ করতে মানুষকে উৎসাহিত করেন, যে চরিত্র অনুসরণ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব হওয়া যায়, এটা দেখে হযরত আমর ইবনে আম্বামা (রাঃ) ও হযরত উনাইস গিফারী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র

কুরআন শ্রবণ করেই হযরত উমার (রাঃ), হাবশার বাদশাহ, হযরত তুফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের ইবনে মুতয়িম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত দ্বাম্মাত ইবনে সালাবা তাবাজুদী (রাঃ) শুধুমাত্র কালিমায়ে তাইয়েবা শ্রবণ করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ছিলেন মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবথেকে জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র চেহারা মুবারক দেখেই উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহর কসম! এমন সুন্দর জান্নাতি চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না'। শুধুমাত্র নবীর চেহারা দেখেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত দ্বাম্মাত ইবনে সালাবা (রাঃ) ছিলেন তাঁর গোত্র বনী সায়াদের নেতা। তিনি একদিন আনমনে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে শপথ দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর রাসূল?'

নবী করীম (সাঃ) জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি সত্যই আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল'।

তিনি দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। মদীনার বিখ্যাত দুই গোত্র আউস এবং খাজরাজ, তাঁরা তাদের প্রতিবেশী ইয়াহূদীদের কাছে শুনেছিলেন, শেষ নবী বর্তমান সময়েই আগমন করবেন। এই কথা তাঁরা বিশ্বাস করে মক্কায় নবী করীম (সাঃ) এর মুখের কথা শুনেই বুঝলেন এই ব্যক্তিই শেষ নবী। তাঁরা কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর মক্কা বিজয়ের পরে মক্কার বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাসের কারণেই। তাদের বিশ্বাস ছিল, কা'বাঘর কোনো মিথ্যাবাদী কক্ষণোই নিয়ন্ত্রণ করবে না। দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধিতা করেও যখন তারা সফল হতে পারলো না, নবী করীম (সাঃ) কা'বার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, তখন তাদের বিশ্বাস হলো এই ব্যক্তি সত্যই আল্লাহ তা'য়ালার নবী।

আরবের অনেক গোত্রই নবী করীম (সাঃ) এর বদান্যতা দেখেই ইসলাম কবুল করেছিল। আরবের জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী এবং কবি সাহিত্যিকগণ পবিত্র কুরআনের বিন্যাস দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যারা ছিল বিখ্যাত যোদ্ধা, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের অলৌকিক বিজয় দেখেও যাদের অন্তরে সামান্য রেখাপাত হয়নি, তারা মুসলমানদের শিষ্টাচার ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের সাথে ইসলাম বিরোধিরা যখন একত্রে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেছিল, তখন তারা ইসলামের বৈশিষ্ট দেখেই ইসলাম কবুল করেছিলেন।

মক্কায় নবী করীম (সাঃ) এর অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। আবু জাহিল অসংখ্য মু'জিযা দেখেছে। কিন্তু তার হৃদয় সত্য গ্রহনের জন্য মুক্ত ছিল না। সত্য সে গ্রহণ

করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত ও বিভিন্ন ধরণের মু'জিযা দেখলো, কয়েকটি যুদ্ধে মুসলমানদের অলৌকিক বিজয় দেখলো, তার মেয়ে উম্মে হাবিবা (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্রা স্ত্রী, মেয়ের ভেতরে বিরাট পরিবর্তন দেখলো, কিন্তু তাঁর অন্তরে কিছুই রেখাপাত করলো না। কিন্তু সে যখন নিজের চোখে দেখলো এবং নিজের কানে শুনলো, রোম সম্রাট নবীর পা ধুয়ে দিতে আগ্রহী, তখন তার চিন্তার জগতে বিপ্লব সাধিত হলো।

খ্রিষ্টানদের নেতা আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) নবীর দরবারে জাঁকজমকের সাথে আগমন করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর দেখা রাজা বাদশাহর মতই তিনি আচরণ করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকজন এলেও তার সাথে তিনি পরম আপনজনের মতই ব্যবহার করেন। তখন তাঁর অন্তর বলে উঠলো, এই ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর নবী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। অনেক ইয়াহূদী, যারা আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করে জেনেছিলেন শেষ নবী কেমন হবেন। তারা নবীর কাছে এসে তাঁকে দেখেই চিনেছেন। কথা বলেছেন। প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কেউ নবীর কাছে এসে দাবী করেছেন, 'ঐ খেজুরগুলো যদি এসে আপনার নবী হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী দেয় তাহলে আমি মুসলমান হবো'।

নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে ইশারা করেছেন, খেজুর কাছে এসে সাক্ষী দিয়েছে, এই মু'জিযা দেখেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ দাবী করেছে, ঐ গাছটি যদি কালেমা পাঠ করে তাহলে আমিও কালেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করবো। নবী করীম (সাঃ) এর কথায় গাছ কালেমা পাঠ করেছে, সে এই অলৌকিক ঘটনা দেখে ইসলাম কবুল করেছে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। পক্ষান্তরে শক্তি প্রয়োগের কোনো একটি দৃষ্টান্তও নেই।

অপরাধিদের প্রতি দণ্ড বিধান

মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম বিরোধিদের মধ্যে কিছু লোকজন এমন গুরুতর অপরাধ করেছিলো, মানবতা ও আইনের দৃষ্টিতে যাদের অপরাধ ছিল মৃত্যুদণ্ড তুল্য। এদের কতজনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল, এ সম্পর্কে হাদীস ও ইতিহাসে মতপার্থক্য বিরাজমান। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) যেদিন মক্কায় প্রবেশ করেন সেদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে যে, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। এভাবেও বলা হয়েছিল যে, তারা যদি কা'বাঘরের গিলাফের ভেতরেও লুকিয়ে থাকে তাহলেও হত্যা করতে হবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

মৃত্যুদণ্ডের আসামীদের ভেতরে বনী আমের গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ নামক এক ব্যক্তি ছিল। এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় দরবারে নববীতে ওহী লেখকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। তারপর সে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় কুরাঈশদের কাছে ফিরে এসে নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে। মক্কা বিজয়ের দিনে সে পালিয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তাঁর দুধভাই। তিনি লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে হযরত উসমান (রাঃ) লোকটিকে সাথে করে নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নিরাপত্তার আবেদন করেন। উসমান (রাঃ) বারবার আবেদন করতে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পরে ইতিবাচক জবাব দান করেন। উসমান (রাঃ) লোকটিকে নিয়ে চলে যাবার পরে রাসূল (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আমি যতক্ষণ জবাব না দিয়ে নীরব ছিলাম, এর মধ্যে তোমরা লোকটিকে হত্যা করতে পারতে'।

একজন আনসারী সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমাকে একটু ইশারা দিলেই পারতেন'।

বিশ্বনবী (সাঃ) বললেন, 'কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি ইশারা দিয়ে কাউকে হত্যা করাবেন'।

বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দিনে নবী করীম (সাঃ) সবেমাত্র মাথা থেকে লোহার শিরস্ত্রাণ খুলেছেন এমন সময় একজন এসে তাঁকে জানালেন, 'ইবনে খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে'।

নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'তাকে হত্যা করো'।

এই ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুল উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পরে তার নাম হয় আব্দুল্লাহ। কিছুদিন পরে সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে আসে। তার দুইজন দাসী ছিল। তারা তার আদেশে নবী (সাঃ) এর কুৎসামূলক গান গাইতো। এই ব্যক্তিকে মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কূপের মাঝামাঝি স্থানে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাকে এ কারণে হত্যা করা হয়নি যে, সে রাসূলকে গালি দিয়েছে বা ইসলামের বিরোধিতা করেছে। বরং তাকে হত্যা করা হয়েছিল কিসাসের কারণে। কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে সে মৃত্যুদণ্ডতুল্য অপরাধ করেছিল। এ কারণেই তাকে হত্যা করা হয়।

বুখারী শরীফে মাত্র একজনকে হত্যা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেজ মোঘলতাই উল্লেখ করেছেন ১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বর্ণনা

হাদীস বিশারদগণ গ্রহণ করেননি। কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে ১০ জন, কেউ বলেছেন ৮ জন, কেউ বলেছেন ৬ জনের কথা। পক্ষান্তরে বুখারীর বর্ণনার সামনে অন্য কোনো বর্ণনা গ্রহণ করা কঠিন। তাছাড়া তাঁরা যে যুক্তি দিয়েছেন, সে যুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। কেউ বলেছেন, অমুক অমুককে হত্যা করা হয়েছিল এ কারণে যে, তারা নবী করীম (সাঃ) কে কষ্ট দিত বা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতো। এ যুক্তি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, এই অপরাধে মক্কার অধিকাংশ লোকই অপরাধী ছিল।

বিশ্বনবী (সাঃ) ব্যক্তিগত কারণে কখনো কারো ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ইসলামের সাথে বিরোধিতা করেছে, নবীর সাথে বিরোধিতা করেছে, এ কারণে কোনো একজন ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়নি। আরেকজনকে হত্যা করার কথা বলা হয়, সে ব্যক্তি হলো মিকয়াস ইবনে সাব্বাবা। এই লোকের ভাই মদীনার একজন আনসারী মুসলমানের হাতে নিহত হয়। আনসারীর অসতর্কতার কারণে সে নিহত হয়েছিল। বিশ্বনবী (সাঃ) এ কারণে রক্তপণ আদায় করেছিলেন।

কিন্তু মিকয়াস ছিল হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। ভাই নিহত হবার বিনিময়ে সে অর্থ আদায় করেছিল। তারপরও সে ইসলাম গ্রহণ করার ছলে মুসলমানদের সাথে মিশে ঐ আনসারীকে হত্যা করেছিল। এভাবে যে তিন চারজনকে হত্যা করা হয়েছিল, তারা সবাই ছিল মৃত্যুদন্ডের আসামী। যারা দশজন, ছয়জন, আটজনের কথা উল্লেখ করেছেন, যে সূত্রে উল্লেখ করেছেন সেই সূত্র ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইতিহাস গবেষকগণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ যারা এই হত্যা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাঁরা দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইমাম বুখারী এ কারণে এ সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনাকৃত হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। খায়বরে নবী করীম (সাঃ) কে যয়নাব নামক ইয়াহূদী একজন নারী গোস্তের সাথে বিষ খাইয়েছিল। রাসূল (সাঃ) তাকেও ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু এই বিষক্রিয়ায় একজন সাহাবা নিহত হলে সে মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। বিশ্বনবী (সাঃ) এর গর্ভবতী কন্যা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পথে তাকে হুরাইরেস ইবনে নুকাইয়্যাদ উটের ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিল। এতে নবী (সাঃ) এর কন্যার গর্ভের সন্তান নিহত হয়। এ কারণে তাকেও হত্যা করা হয়েছিল।

কিন্তু যারা উল্লেখ করেছেন, নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে জঘন্য মন্তব্য করার কারণে তিনি বেশ কয়েকজনকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের বর্ণনার ভিত্তি নেই। এ কারণে তিনি যদি হত্যা করার আদেশ দিতেন তাহলে মক্কার অধিকাংশ লোককে হত্যা করা হতো। মদীনারও বহুলোক ছিল, যারা রাসূলের নিন্দা করতো।

তায়েফ ও খায়বরে ছিল, এ সকল লোককেও হত্যা করা হতো। আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহঃ) এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করে প্রমাণ করেছেন, এ সকল বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া যে দশজনের হত্যার কথা বলা হয়, তাদের মধ্যে সাতজন যে ইসলাম কবুল করেছিলেন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পরে পবিত্র মক্কার বুকে হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এ কথা বলা মারাত্মক অন্যায়।

যুদ্ধ, নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত

হিজরী দ্বিতীয় সালে পবিত্র রমজান মাসে মদীনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে বদর নামক স্থানে সত্য আর মিথ্যার প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধই ইতিহাসে 'বদর' যুদ্ধ নামে খ্যাত। এরপর থেকে শুরু হয় যুদ্ধের ধারাবাহিকতা। পরবর্তীতে নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্বে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে মুসলমানগণ বাধ্য হয়েছিলেন। কেনো নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, ঐ সকল যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধনীতি বা ইসলাম পৃথিবীতে যুদ্ধের ব্যাপারে কি নীতি প্রবর্তন করেছিল আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। আরবের যুদ্ধ এবং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও তার পাশবিক দিক সম্পর্কে ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। আরবের বাইরের দেশগুলোর যুদ্ধ নীতি সম্পর্কেও সচেতন পাঠক মহল অবগত রয়েছেন। তাদের যুদ্ধনীতি স্মরণে রেখে ইসলামের যুদ্ধনীতি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে আরবের যুদ্ধ এবং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং কেনো তারা যুদ্ধে জড়িয়েছেন এ প্রশ্নের জবাব মিলবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির যুদ্ধনীতি এবং মুসলমানদের জন্য ইসলাম যে যুদ্ধনীতি প্রদান করেছে, তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নবী করীম (সাঃ) এমন এক নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, যে সময় যাবতীয় পাশবিকতা মুখ ব্যদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সেই নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আহ্বান জানালেন। প্রচলিত যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন করে দিলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের সামনে এমন এক আদর্শ উপস্থাপন করলেন যা ছিল তাদের কাছে কল্পনার বিষয়।

তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ সংঘাত প্রকৃত অর্থেই এক জঘন্য কর্ম। প্রতিটি মানুষেরই উচিত এসব জঘন্য কর্ম থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীতে যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর কোনো পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়, যখন অত্যাচারিতের ক্রন্দন রোল আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তোলে, অরাজকতা আর বিশৃংখলতায় পৃথিবী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, জালিম দাম্ভিক অত্যাচারীর দল পৃথিবীবাসীর জীবন

দুর্বিসহ করে তোলে, সাধারণ মানুষের শান্তি এবং নিরাপত্তার সামান্যতম নিশ্চয়তা রাখে না, তখন একমাত্র সেই অত্যাচারীর বিপর্যয় এবং ধ্বংস থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে যায়।

এভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করলেও সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, শত্রুকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া বা তার মারাত্মক কোনো ক্ষতিসাধন করা। বরং উদ্দেশ্য হলো, সে যে ধ্বংসসাধন করছে, অত্যাচার করছে, মানুষের ক্ষতি করছে, অর্থাৎ তাকে ক্ষতিকর কর্ম থেকে বিরত রাখা। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) যুদ্ধে এই নীতি প্রবর্তন করলেন যে, যুদ্ধে ঐ পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করাই বৈধ, যতটা শক্তি প্রয়োগ করলে অত্যাচার অনিষ্ট বন্ধ হবে, বিপর্যয় ও যাবতীয় বিশৃংখলা রোধ করা যাবে। যুদ্ধে কোনোক্রমেই বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যুদ্ধে সীমিত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

আর এই সীমিত শক্তিও প্রয়োগ করা যাবে শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যারা অত্যাচারীকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে এবং যারা ক্ষতিকর। এর বাইরে সকল জনশক্তি যুদ্ধের আওতা ও ধ্বংস প্রভাব মুক্ত থাকবে। শত্রুর যে সব ধন-সম্পদ বা বস্তুর সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকবে না বা নেই, সে সব ধন-সম্পদ বা বস্তুর ওপরে কোনো ধরনের আক্রমণ করা যাবে না। আক্রমণের লক্ষ্য হতে হবে একমাত্র শত্রু।

সাধারণতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং এখন পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়েছে, যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা বা নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসব ধারণার সাথে তাঁর সীরাতের কোনো রূপ সামঞ্জস্যতা নেই। তিনি যে যুগে এসেছিলেন সে যুগে যুদ্ধের নানা পরিভাষা প্রচলিত ছিল। সেসব পরিভাষার অর্থও ছিল বড় বিচিত্র। এখানে কতকগুলো পরিভাষার উল্লেখ করা হলো।

আগুন। সে সময় আগুন শব্দ দিয়ে যুদ্ধকে বুঝানো হতো। বেষ্টনী। এই বেষ্টনী শব্দ দিয়েও তারা যুদ্ধকে বুঝাতো। যাঁতা বা চাকি। যাঁতা বা চাকি শব্দ দিয়েও যুদ্ধের কথা বলা হতো। নুতাহ বা মেষের লড়াই। উটের বুক। ওয়াগা, এই ওয়াগা শব্দের অর্থ হলো গোলযোগ করা। তারা ওয়াগা শব্দকে যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করতো। মাগদাবাতুন, এই শব্দের অর্থ ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি। এটাও যুদ্ধের একটি পরিভাষা। শাররুন, এ শব্দের অর্থ অন্যায় বা খারাপ। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হত।

কারিহাতুন। এ শব্দের অর্থ হলো কঠোরতা। এটাও যুদ্ধের একটি পরিভাষা। রওউন। এর অর্থ হলো আতঙ্ক, এটা যুদ্ধের একটি পরিভাষা। হিয়াজ। এর অর্থ হলো আক্রোশ, এটাও যুদ্ধের একটি পরিভাষা। ইহরাব। এর অর্থ হলো দুশমনের ধন-সম্পদ লুঠ করার

লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হতো। হারব। এ শব্দের অর্থ যুদ্ধ, আভিধানিক অর্থ রাগান্বিত হওয়া। মাহরুব। এর অর্থ যার ধন-সম্পদ লুঠ হয়েছে। এটাও যুদ্ধের একটি পরিভাষা। তাহরিব। এ শব্দের অনেকগুলো অর্থ। এর মধ্যে একটি অর্থ অস্ত্র ধার দেয়া। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হতো।

হারিবা। এই শব্দের অর্থ যুদ্ধের সময় যেসব সম্পদ দখল করা হয় বা লুঠ করা হয়। এ শব্দটিও যুদ্ধের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হতো। হারাব। অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা লুঠ করে নেয়া। এটাও যুদ্ধের একটি পরিভাষা। এ ধরনের বহু শব্দ যুদ্ধের প্রতীকি শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কারণ তারা যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো, সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতো তাদের ভাষার মাধ্যমে। নবী করীম (সাঃ) ইসলামের যুদ্ধ নীতির ব্যাপারে তদানীন্তন পৃথিবীতে প্রচলিত একটি ভাষাকেও গ্রহণ করেননি।

মহান আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিলেন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ। কারণ ইসলামে যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' এই শব্দের মধ্যেই সেই উদ্দেশ্য নিহিত। এই শব্দের মধ্যে দিয়েই নবী করীম (সাঃ) এর সকল যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত ধারণা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যেই প্রবিষ্ট করা হয়েছে। জিহাদ আরবী শব্দ, এর অর্থ কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অথবা কোনো কাজ সমাপ্ত করার জন্য চূড়ান্তভাবে চেষ্টা-সাধনা করা। শত্রুতামূলক, সন্ত্রাসমূলক, আক্রমণাত্মক বা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের ধারণা থেকে 'জিহাদ' শব্দ সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষী গবেষক ও লেখকগণ আরবী 'জিহাদ' শব্দের অনুবাদ করেছেন, Holy war. Religious war পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ। জিহাদ শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাদের ঐ অনুবাদ সম্পূর্ণ ভুল। Holy war. Religious war শব্দ দ্বারা আরবী জিহাদ শব্দের শত ভাগের একভাগ অর্থও প্রকাশ পায় না। ইংরেজী ভাষাই শুধু নয়, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার একটি শব্দ দিয়ে আরবী জিহাদ শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ স্বয়ং এই শব্দ চয়ন করেছেন। এই জিহাদ শব্দ যাবতীয় অসৎ ধ্যান ধারণা এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জিহাদ আরবী শব্দ, এর অর্থ কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অথবা কোনো কাজ সমাপ্ত করার জন্য চূড়ান্ত ভাবে চেষ্টা-সাধনা করা। শত্রুতামূলক, সন্ত্রাসমূলক, আক্রমণাত্মক বা প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধের ধারণা থেকে 'জিহাদ' শব্দ সম্পূর্ণ মুক্ত। এই শব্দটির অর্থই জানিয়ে দেয়, একজন মুসলিম যোদ্ধার প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে

যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, অশান্তি, সন্ত্রাস, অত্যাচার, অশ্লীলতা, নোংরামী, জুলুম, অনিষ্ট ইত্যাদী দূরীভূত করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য যতটুকু চেষ্টা-সাধনা, কর্ম তৎপরতা চালানো প্রয়োজন ততটুকুই সে করবে। সীমা লংঘন সে কোনোক্রমেই করবে না।

ইসলামে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের কোনো অবকাশ নেই। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার কোনো অবকাশ নেই। ইসলামে যুদ্ধ হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজের বীরত্ব প্রকাশ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনো চিহ্ন নেই। পবিত্র কুরআন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে একজন মুসলিম যোদ্ধা তাই করে। এ কারণে ইসলাম তার পবিত্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় আইন রচনা করে দিয়েছে। সে আইনে যুদ্ধের নীতিমালা, যুদ্ধের নৈতিক বিধি-নিষেধ, যোদ্ধাদের অধিকার ও কর্তব্য, সামরিক ও বেসামরিক মানুষদের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের অধিকার, চুক্তিবদ্ধদের অধিকার, দূত ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকার, যুদ্ধে যারা জয়ী হয় তাদের অধিকার সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) পৃথিবীতে প্রচলিত যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাতিল করে একটি পবিত্র উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে সময় যুদ্ধের যে পৈশাচিক এবং বিভৎস উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তার কবর রচনা করলেন। তিনি এ লক্ষ্যে যোদ্ধাদের চরিত্র সংশোধন করলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎ আচ্ছন্ন করেছিল, এ কারণে নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটালেন।

ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বপ্রথম বিপ্লব ঘটানো হলো। যা ছিল মানুষের চেতনার অতীত, তাই বাস্তবে করে দেখানো হলো। যুদ্ধের বিষয়টি মানুষের বুদ্ধির অগম্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি নিজের ক্ষমতা প্রকাশের জন্যে না হয়, যুদ্ধ যদি কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে না হয়, যুদ্ধ যদি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে না হয়, যুদ্ধ যদি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে না হয়, যুদ্ধ যদি সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে না হয় তাহলে কেনো নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে এই যুদ্ধ করা হবে?

এ সকল কিছুর উর্ধ্বে এক বিশাল মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে তা ছিল মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধারণা-কল্পনারও অতীত বিষয়। একটি অদৃশ্য স্বার্থের কারণে, অদেখা স্বার্থ অর্জনের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা ঐ জাতির জন্য কোনো সামান্য ব্যাপার ছিল না, যাদের কাছে প্রাণ উৎসর্গ করার অর্থই ছিল ধন-সম্পদ অর্জন বা ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। অথচ সেই মানুষগুলোকেই নবী করীম (সাঃ) এমনভাবে পরিশুদ্ধ করলেন যে, তাদের কাছে সমগ্র

পৃথিবীর ধন-সম্পদের তুলনায় অদেখা আখিরাতের স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজের প্রাণ পর্যন্ত কুরবান করতো।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাহবায়ে কেরামকে আল্লাহর পথে জিহাদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করতে বলেছেন তা তাদের মন-মগজে প্রবিষ্ট করলেন। এ সম্পর্কে একটা হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন লোক এসে নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! একজন যুদ্ধ করে সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে প্রশংসা এবং খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে, একজন যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলো?'

আল্লাহর নবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাযিল করা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে'। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জানতে চাইলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রতিহিংসার কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ করে তাদের জাতিয় আভিজাত্য প্রকাশের লক্ষ্যে। কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধ কি ধরনের যুদ্ধ?'

নবী করীম (সাঃ) জবাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে তাঁর যুদ্ধই আল্লাহর পথের যুদ্ধ'। (বুখারী, মুসলিম)

হজরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আরেকজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জানতে চাইলো, 'হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধি এবং প্রশংসা লাভের জন্য যুদ্ধ করে, এমন লোকের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? সে কোনো সওয়াব অর্জন করবে?'

নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে জানালেন, 'এমন ধরনের লোক কোনো সওয়াব অর্জন করবে না'।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর জবাব শোনার পরে প্রশ্নকারী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। তারপর লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এসে ঐ একই প্রশ্ন করলো। তিনি তাঁকে পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। এভাবে লোকটি চারবার এসে ঐ একই প্রশ্ন করেছিল। শেষের বার নবী করীম (সাঃ) লোকটিকে বলেছিলেন, 'শোন, যতক্ষণ কোনো কাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা না হয় ততক্ষণ সে কাজ আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন না'। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা:) বলেন, নবী করীম (সা:) একদিন বললেন, 'কোনো মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সে এই যুদ্ধ থেকে তাঁর উটকে বাঁধার জন্য রশি সংগ্রহ করবে। সে ব্যক্তি শুধু ঐ রশিই লাভ করবে, কোনো সওয়াব লাভ করবে না'।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, 'যুদ্ধ দুই ধরনের হয়। প্রথম ধরনের যুদ্ধ হলো, একজন কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং নেতার আনুগত্য করে। নিজের উত্তম ধন-সম্পদ সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং কোনো ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না। সে জেগেই থাক বা ঘুমিয়েই থাক, সওয়াব সে অর্জন করবে। আরেক ব্যক্তি প্রদর্শনীর জন্য যুদ্ধ করে, সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করতে চায়, নেতার আদেশ পালন করে না। পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সে কেবলমাত্র শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই ভোগ করবেনা'।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একদিন নবী করীম (সা:) বললেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তার মধ্যে প্রথম ঐ ব্যক্তির বিচার করা হবে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। বিচারের জন্য নিয়ে আসা হলে তাকে মহান আল্লাহ তাঁর দেয়া অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে ব্যক্তি তার স্বীকৃতি দিবে। এরপর মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি আমার জন্য কোনো কাজ করেছো?'

লোকটি জবাব দিবে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণদান করেছি'।

মহান আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি যুদ্ধ করেছিলে বীরত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ যেন তোমাকে বীর হিসাবে আখ্যায়িত করে, তোমার প্রশংসা করে। তুমি তোমার উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছো। এসব কথা বলে আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণনা করেন, একদিন নবী করীম (সা:) বললেন, কিয়ামতের দিন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের হাত ধরে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে এনে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্ন করবেন, তুমি তাকে কেনো হত্যা করেছিলে? লোকটি জবাব দিবে, আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন প্রভুত্ব আপনারই জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, হ্যাঁ, প্রভুত্ব আমারই।

এরপর আরেকজন লোক আরেকটি লোকের হাত ধরে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আবেদন করবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কেনো তাকে হত্যা করেছিলে?

লোকটি জবাব দিবে, আমি কোনো একজনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে হত্যা করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন, প্রভুত্ব শুধু আমারই। অন্য কারো প্রভুত্ব নেই। তারপর তাকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হবে।

নবী করীম (সা:) তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তথা মুসলমানদের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত শিক্ষা এবং চেতনা দান করেছিলেন। এ সব শিক্ষার কোথাও নিজের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব শিক্ষা মানুষের মন থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বের প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের চিন্তা-চেতনা মুছে দিয়েছিল। যুদ্ধ করে গণিমতের সম্পদ অর্জন, বীরত্ব প্রদর্শন, প্রশংসা অর্জন, যুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ বা জাতিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ তথা পার্থিব যাবতীয় উদ্দেশ্যই নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল।

পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে যুদ্ধ করা নবী করীম (সা:) বৈধ করেননি। এসব স্বার্থকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরে শুধু অবশিষ্ট ছিল, পার্থিব স্বার্থের স্বাদ গন্ধহীন আখিরাতের সেই অদৃশ্য স্বার্থ। এই স্বার্থ অর্জনের জন্য যুদ্ধের ফলে কোন ধরনের বিশৃংখলা বা কোনো মারাত্মক ধ্বংসসাধন হবে এমন চিন্তাই করা যায় না। এমনকি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলেও তখনই অস্ত্র ধারণ করা যাবে, যখন অস্ত্র ধারণ না করলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হবার নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ কারণে বিশ্বনবী (সা:) যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি শিক্ষাদান করেছেন, 'শত্রুর সাথে মুকাবিলা যেন করতে না হয় তোমরা এই কামনা করো। মহান আল্লাহর কাছে শান্তির জন্য দোয়া করতে থাকো। কিন্তু যদি শত্রুর সাথে মুকাবিলা করতে তোমরা বাধ্য হও, তাহলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করো। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'য়ালার জান্নাত অবস্থান করছে তরবারীর ছায়ার নীচে'।

যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বনবীর শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে গেল। যুদ্ধ অত্যন্ত খারাপ বিষয়। কারো পক্ষেই যুদ্ধ কামনা করা উচিত নয়। তিনি শিক্ষাদান করলেন, যুদ্ধ যেন করতে না হয় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এমন দোয়া করো। কিন্তু নরপিশাচের দল যদি তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্যই করে, তাহলে তাদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করবে যেন তারা তাদের অত্যাচারের হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যে অশান্তি তারা সৃষ্টি করছে তা যেন আর করতে না পারে। আর এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি যদি শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণদান করো তাহলে মনে রেখো, শত্রুর ঐ অস্ত্রের নীচেই তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর জান্নাত। অত্যাচারী জালিমের জুলুমকে স্তব্ধ করতে যেয়ে তাদের অস্ত্রের আঘাতের ভয়ে পালিয়ে এসো না।

নবী করীম (সা:) এর এই শিক্ষায় শিক্ষিত যোদ্ধাদের আচরণ যুদ্ধের ময়দানে কি ধরনের ছিল এ সকল বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের বুকের ওপর হযরত আলী (রা:) উঠে বসেছেন। ক্ষণিকের মধ্যে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার তরবারী

শত্রুর বুকে প্রবিষ্ট করাবেন। পতিত শত্রু আলী (রাঃ) এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি শত্রুকে হত্যা না করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় শত্রু উঠে দাঁড়িয়ে আলী (রাঃ) এর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'তুমি আমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলে যে?'

আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, 'তোমাকে আমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে, এরপর যদি তোমাকে আমি হত্যা করতাম আর আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করেন, আলী! তোমার মুখে লোকটি থুথু নিক্ষেপ করেছিল, এ কারণে তাকে তুমি হত্যা করেছিলে? আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমি কি জবাব দিবো! এ কারণে আমি তোমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত আলী (রাঃ) এর কথা শুনে লোকটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করেছিল। থুথু নিক্ষেপের কারণে আলী (রাঃ) এর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ জাগতে পারে। এ কারণে তিনি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর শিক্ষায় তাঁরা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, ব্যক্তিগত আক্রোশে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ময়দানেও ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে হত্যা করা যাবে না।

ইসলামের শত্রুরা যখন যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধিসাধন করেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের সেই উত্তপ্ত রক্তঝরা ময়দানেও নবীর শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন। আক্রোশে অন্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা কোনো গর্হিত কাজ করেননি, ইসলামের শিক্ষা বা আদেশের বিপরীত কিছুই করেননি। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন, তার বাইরে তাঁরা এক কদমও নিক্ষেপ করেননি।

যুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমনিভাবে যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আবহমানকাল থেকে যুদ্ধের ময়দানে যে নিয়ম এবং পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করা হতো রাসূল (সাঃ) তার সবকিছুই রহিত করলেন। তদানীন্তন যুগে যুদ্ধ চলাকালে যেসব পৈশাচিক পদ্ধতি বহাল ছিল তিনি সাহাবায়ে কেরামদের জানিয়ে দিলেন, এসব নিষ্ঠুর নির্মম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবেনা। তিনি শত্রু পক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ সামরিক এবং আরেকভাগ বেসামরিক।

সামরিক লোকদের আওতায় তাদেরকেই আনলেন যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, প্রচলিত নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয়। বেসামরিক লোকদের আওতায় আনলেন যারা প্রচলিত

নীতি অনুযায়ী বা সাধারণ বুদ্ধি বিচারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামর্থবান বলে চিহ্নিত হয় না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে রয়েছে শান্তি প্রিয় নিরীহ ধরনের লোকজন। ধর্মস্থানের সেবক, সংসারত্যাগী সন্নাসী, ধর্মস্থান, নারী, শিশু, পর্যটক, পাগল, ভিক্ষুক, আহত, বৃদ্ধ, অসুস্থ রোগী ও অন্ধ, এ ধরনের কোনো লোকজনের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। তিনি এই শ্রেণীর লোকজনকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিলেন। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, কোনোক্রমেই তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না।

একবার যুদ্ধের ময়দান পরিদশর্ন কালে নবী করীম (সাঃ) এক নারীর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই নারী তো সামরিক বাহিনীর লোক ছিল না। তাকে হত্যা করা হলো কেন?'

তিনি সিপাহসালার হযরত খালিদ (রাঃ) কে ডেকে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, 'নারী বা শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না'।

যুদ্ধের ময়দানে নবী করীম (সাঃ) নারী এবং শিশুদের হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'কোনো নারী, শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করো না। গণিমতের সম্পদ (যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে যে সম্পদ দখল করা হয়) অপহরণ করো না। যুদ্ধে যা কিছু হস্তগত হয় তা সব একত্র করো। উত্তম কাজ করো এবং উত্তম আচরণ করো। যারা উত্তম কাজ করে মহান আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন'। কোনো নারী বা বৃদ্ধ যদি মানবতার জন্যে ক্ষতিকর হয় বা তাদের দ্বারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে হুমকি স্বরূপ হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হবে।

মক্কা বিজয়কালে নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 'কোনো আহত মানুষের ওপরে আক্রমণ করবে না। প্রাণের ভয়ে যারা পালিয়ে যাচ্ছে, এমন কোনো মানুষের পেছনে ধাওয়া করা যাবেনা। যারা ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছে তাদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে না'। (ফতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা নং-৪৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কোথাও অভিযানে প্রেরণ করার সময় নবী করীম (সাঃ) সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দিতেন, তাঁরা যেন কোনো ধর্মস্থানের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের তপস্বী বা সাধক সন্নাসীদের হত্যা না করে'।

নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত তথা নীতি হলো, যুদ্ধের সাথে যারা জড়িত নেই তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তিনি ঐসব লোকদেরই শিক্ষা দিলেন, যারা সামান্য কোনো কারণে, অহংকার ও ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য বা যে কোনো তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের সূচনা করে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করতো। প্রতিপক্ষের নারী, শিশু,

রোগী, বৃদ্ধ তথা যে কোনো ধরনের মানুষকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করে আনতো, তাদের পশু সম্পদ, বৃক্ষরাজিসহ যাবতীয় কিছুই ধ্বংস করে দিত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাদের আচরণ নৃশংসতার শেষ পর্যায় অতিক্রম করেছিল, আর ইসলাম গ্রহণের পরে নবী করীম (সাঃ) এর শিক্ষায় তাঁরাই যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করেছে, সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য তাদের আচরণ চিরদিনের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে। বিশ্বনবী (সাঃ) শিক্ষা দিলেন, যুদ্ধে সামরিক ব্যক্তিদের ওপরে আক্রমণ করা যাবে বটে কিন্তু সে আক্রমণের ক্ষেত্রেও নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। অবাধে আক্রমণ করা যাবে না।

সে যুগে আক্রমণের কোনো নিয়ম-নীতি ছিল না। রাতের অন্ধকারে বিশেষ করে শেষ রাতে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকতো, সেই মুহূর্তে তারা হঠাৎ আক্রমণ করতো। নবী করীম (সাঃ) আদেশ জারী করলেন, অতর্কিত আক্রমন করা যাবে না। রাতের অন্ধকারে আক্রমন করা যাবে না। রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষকে ঘেরাও করে রাখলেও তাদের ওপরে কোনো আক্রমণ করা যাবে না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) খয়বর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) কোনো শত্রু গোষ্ঠীর কাছে রাত্রে পৌঁছলেও তিনি সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না'।

সে যুগে যুদ্ধের আরেকটি বীভৎস নীতি ছিল যে, তারা আক্রোশে অন্ধ হয়ে প্রতিপক্ষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতো। এই ঘৃণ্য এবং নৃশংস প্রথা নবী করীম (সাঃ) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, 'আগুনে পুড়ানের শাস্তি শুধু মাত্র আগুনের যিনি মালিক তিনি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না'।

আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যাই শুধু নয়, কোনো প্রাণীকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একবার নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে যুদ্ধে যেতে বললেন। আমাদেরকে তিনি দু'জন লোকের নাম উল্লেখ করে আদেশ দিলেন, তাদেরকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। আমরা যাত্রা করা মাত্র তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের আদেশ দিয়েছিলাম, তাদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করো না। আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া শুধু আল্লাহ তা'য়ালার ইখতিয়ারে। তোমরা লোক দু'টোকে গ্রেফতার করতে পারলে তাদেরকে হত্যা করো'।

হযরত আলী (রাঃ) একবার ইসলামের দুশমন বেশ কিছু নাস্তিককে গ্রেফতার করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে ডেকে নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে

বললেন, আগুন আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি। এই আগুন দিয়ে কোনো মানুষকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে না'।

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করে বা বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। উবায়েদ ইবনে ইয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের সৈন্যরা শত্রু পক্ষের বারোজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) তাদের বেঁধে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এ ঘটনা জানতে পেরে তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) কাউকে বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি মুরগীও বেঁধে জবাই করতে রাজী নই। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে তাঁর ভুলের কাফ্ফারা স্বরূপ চারজন দাস মুক্ত করেছিলেন'।

নবী করীম (সাঃ) আগমনের পূর্বে যুদ্ধের সূচনা করাই হতো লুটতরাজ করার জন্য। আর রাসূল (সাঃ) শিক্ষা দিলেন, যুদ্ধের পরে বিজিত অঞ্চলে কোনো ধরনের লুটতরাজ করা যাবে না। খায়বর বিজিত হবার পরে কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য ইয়াহূদীদের এলাকায় সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইয়াহূদীদের গোত্রপতি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করে রাগত কণ্ঠে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! গাধা হত্যা করা, গাছের ফল ভক্ষণ করা আর নারীদেরকে আঘাত করা আপনাদের জন্য কি শোভা পায়?

এ কথা শোনার সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) কে আদেশ দিলেন, মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্যকে ডাকো।

তিনি 'নামাযের জন্য সমবেত হও' বলে ডাক দিলেন। মুসলিম সৈন্য একত্রিত হলে নবী করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি গর্বিত হয়ে এ ধারণা করেছে নাকি, আল্লাহ তা'য়ালার কুরআন যা নিষেধ করেছে এর বাইরে আর কিছু নিষেধ নয়? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ এবং আদেশ দিয়ে থাকি, যা নিষেধ করে থাকি, এসবও কুরআনের আদেশ-নিষেধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান) বাড়িতে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা, তাদের নারীদের আঘাত বা লাঞ্ছিত করা, অনুমতি ব্যতীত তাদের গাছের ফল খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। কারণ তাদের যেসব জিনিস দেয়া প্রয়োজন ছিল তারা তা দিয়েছে'।

কোনো এক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ছাগল ধরে এনে যবেহ করে রান্না করেছিল। গোস্ত খাবে এমন সময় নবী করীম (সাঃ) জানতে পেরে সেখানে

উপস্থিত হয়ে গোস্তের হাড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'জোরপূর্বক নিয়ে আসা জিনিসপত্র মৃত প্রাণীর গোস্তের মতই হারাম'।

যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে পরাজিত সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তা নিয়মিতভাবে বন্টন করার আগে যদি কেউ তা গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম হবে। কিন্তু বেসামরিক লোকদের কাছ থেকে কোনো কিছু জোরপূর্বক গ্রহণ করা, বিজিত এলাকায় প্রবেশ করে শত্রু দেশের সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়া নবী করীম (সা:) হারাম করে দিয়েছেন। লুটের সামান্য একটি রশিও তিনি হারাম করে দিয়েছেন।

যে জাতি যুদ্ধই করতো লুটতরাজ করার জন্য, তাঁরাই নবী করীম (সা:) এর শিক্ষায় বিজিত এলাকায় এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, শত্রু দেশের জনগণ তাদের পবিত্র চরিত্র এবং সম্পদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তাঁরাও অনুভব করেছে, এদের যুদ্ধের লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করার সময় তাদের ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করা, তাদের বৃক্ষ ধ্বংস করা, তাদের দেশের সম্পদ ধ্বংস করা, কোনো কিছু আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, গণহত্যা করা এসব সে যুগেও যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে। কিন্তু নবী করীম (সা:) এসব নৃশংস আচরণ করতে তাঁর মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এসব নিন্দনীয় কাজকে পবিত্র কুরআন 'ফাসাদ' বা অরাজকতা বলে আখ্যায়িত করেছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ–

সে যখন (আল্লাহ তা'য়ালার যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, তখন সে নানা প্রকারে অশান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করে, যমীনের শস্য ক্ষেত্র বিনাশ করে, (জীবজন্তুর) বংশ নির্মূল করতে চায়; (মূলত) আল্লাহ তা'য়ালা কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারী মানুষদের) পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাকারা-২০৫)

শস্য ক্ষেত্র ও জীবজন্তু দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে, কিন্তু স্বৈরাচারী দল বা ব্যক্তি যখন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে জনগণকে বঞ্চিত করে নিজ দেশের স্বার্থ অন্য দেশের হাতে তুলে দেয় এবং দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে। সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াতে এ ধরনের লোকদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এরা হিংসুক ও ঝগড়াটে প্রকৃতির এবং প্রতিহিংসা পরায়ন।

অথচ এরা কথায় কথায় আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বলে যে, তারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কাজ করছে'।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সিরিয়া এবং ইরাকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার সময় যেসকল নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একথাও ছিল, 'কোনো জনপদ ধ্বংস করা যাবে না। ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করা যাবে না'।

অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করে বা পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতিহিংসামূলকভাবে তা করা যাবে না। ধ্বংসাত্মক মন-মানসিকতা নিয়ে প্রতিপক্ষের সম্পদ বিনষ্ট করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃত করা যাবে না। ইসলাম এ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আনসারী (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সাঃ) লুটের জিনিস গ্রহণ করতে এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন'।

নবী করীম (সাঃ) যখন বাধ্য হয়ে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করতেন, 'অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। গণিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। কোনো লাশের বিকৃতি ঘটাবে না'।

নবী করীম (সাঃ) নির্দেশ দিলেন বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। অথচ সে যুগে বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করা হতো। বর্তমান যুগে কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র, সে যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে বন্দীদের ভিন্ন কৌশলে অত্যন্ত নির্মম পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরে নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কা শহরে প্রবেশ করেন তখন তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারী করেন, 'কোনো আহত মানুষের প্রতি আক্রমন করা যাবে না। যে ব্যক্তি পালিয়ে যাচ্ছে তাকে ধাওয়া করা যাবে না। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে দরোজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তার ওপরে হামলা করা যাবে না'।

মুসলিম ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন বন্দীকে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বন্দী হত্যার অনুমতি দেননি। তবে নিদের্শ দিয়েছেন মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিতে বা ক্ষমা করে দিতে'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর কথা ইসলামের সাধারণ নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক এবং প্রশাসন অবশ্যই এই ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যে, ইসলামের ভয়ঙ্কর শত্রু, মুসলমানদের ওপরে যে ব্যক্তি লোমহর্ষক নির্যাতন করেছে এমন ব্যক্তিকে, চরম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর

কোনো ব্যক্তি, দেশের মারাত্মক সর্বনাশকারী ব্যক্তি ইত্যাদী ধরনের লোকদের বন্দী করে ইসলামের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু উকবা ইবনে আবু মুইয়িতকে ইসলামের বিধান অনুসারে দণ্ড প্রদান করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইসলামী সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা আপোষহীনভাবে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিত্র শক্তিবর্গ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে যে প্রহসন চালিয়েছিল ইসলামে সে প্রহসন চালানোর অবকাশ নেই।

তদানীন্তন যুগে দূত হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করতো না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) প্রতিপক্ষের দূত বা প্রতিনিধিকে হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। সে সময় মিথ্যা নবীর দাবীদার জাহান্নামি মুসাইলামার পক্ষ থেকে উবাদা ইবনে হারিস বিশ্বনবী (সাঃ) এর দরবারে এমন এক নিকৃষ্ট বাণী নিয়ে আগমন করেছিল, যে বাণী দ্বারা নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা ও খত্মে নবুয়্যাতের প্রতি আঘাত করা হয়েছিল।

নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেছিলেন, 'দূত হত্যা করা যদি হারাম না হতো তাহলে আমি তোমার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতাম'।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে তা লংঘন করা যাবে না। প্রতিপক্ষের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, চুক্তিবদ্ধদের সাথে অশোভন আচরণ করা স্পষ্ট হারাম ঘোষনা করেছেন। তিনি ঘোষনা করলেন, 'যে চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। পক্ষান্তরে জান্নাতের গন্ধ ৪০ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে'।

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'চারটি খারাপ গুণ এমন যে, যার ভেতরে তা দেখা যাবে সে সম্পূর্ণ মুনাফিক হয়ে যাবে। সে খারাপ গুণগুলো হচ্ছে, যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা কথা বলবে। যখন অঙ্গীকার করবে তখন তা ভঙ্গ করবে। যখন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তখন তা লংঘন করবে। যখন ঝগড়া করবে তখন অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করবে'। (বুখারী, মুসলিম)

বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রতিটি বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা থাকবে যা তার কর্মফলের প্রতীক হিসাবেই চিহ্নিত হবে। মনে রেখো, যে জননেতা বিশ্বাসঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হতে পারে না'।

রোম সাম্রাজ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) একবার আক্রমন করতে যাচ্ছিলেন। অথচ তার সাথে রোমের চুক্তি বহাল ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সাথে

সাথেই আক্রমন করবেন। কিন্তু আমর ইবনে আম্বাছা (রাঃ) সন্ধির মেয়াদকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রোমের দিকে বাহিনী প্রেরণকে চুক্তি ভঙ্গ হিসাবে আখ্যায়িত করলেন।

তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বললেন, 'সর্বনাশ! আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? চুক্তি মেনে চলুন!'
হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এমন করছেন কেনো, কি হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'যাদের সাথে কোনো জাতির চুক্তি থাকবে তাদের উচিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিতে কোনো পরিবর্তন না করা। যদি প্রতিপক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা থাকে তাহলে সমতা বজায় রেখে চুক্তি শেষ হবার কথা জানানো উচিত'।

সে সময় যোদ্ধাদের একটা অসভ্য নীতি ছিল যে, তারা যে পথ দিয়ে গমন করতো সে পথে যাকে পেত তাকেই উত্যক্ত করতো। যে এলাকায় শিবির স্থাপন করতো সেখানে এমন এক বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করতো যে, পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণ অতিষ্ঠ করে তুলতো। যেখানে সেখানে শিবির স্থাপন করে মানুষের চলাফেরা বন্ধ করে দিত। নবী করীম (সাঃ) একবার তাঁর বাহিনীসহ অভিযানে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে সংবাদ এলো মুসলিম বাহিনীর কিছু লোকজন এমন বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে।

এ সংবাদ শোনা মাত্র তিনি ঘোষণা করলেন, 'যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের বিরক্ত করবে অথবা পথিকদের সম্পদ লুট করবে তার জিহাদ হবে না। তোমাদের এভাবে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া শয়তানের মতো কাজ'।

বিশ্বনবী (সাঃ) এই আদেশের পর থেকে মুসলিম বাহিনীতে এমন সুশৃংখল অবস্থা বিরাজ করতো, তাঁরা কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করলে তাদের সংঘবদ্ধতার কারণে মনে হত যে, একটি চাদর বিস্তার করলে তার নীচে সবাই চলে আসবে। সে সময় যুদ্ধের ব্যাপারে আরেকটা নীতি ছিল, গোটা বাহিনী এক মহাশোরগোল সৃষ্টি করে পথ অতিক্রম করতো এবং যুদ্ধের ময়দানে নিজের খ্যাতি, বীরত্ব প্রকাশ ও শত্রুর প্রতি অশালিন ভাষা প্রয়োগ করে গালি দেয়া হতো।

মুসলিম বাহিনী এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক হলে নবী করীম (সাঃ) তা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষনা করলেন, 'কোনো অবস্থাতেই অহংকার প্রকাশ করা যাবে না। এমন কথাও বলা যাবে না যে কথায় অহংকার প্রকাশ পায়। অবশ্য ইসলাম নিয়ে গৌরব প্রকাশ করা যেতে পারে। অশালিন ভাষা উচ্চারণ করা যাবে না'।

হযরত আবু মুসা আসয়ারী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে অভিযানে বের হতাম। কোনো স্থানে পৌঁছলে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহ তা'য়ালার নাম উচ্চারণ করতাম। এ অবস্থা দেখে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ধীর স্থিরভাবে চলবে। মধ্যম স্বরে আল্লাহ তা'য়ালার নাম ধরে ডাকবে। কারণ যাকে তোমরা ডাকছো তিনি বধির নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন অতি কাছেই আছেন'।

রাসূল (সাঃ) যখন কোনো অভিযানে বাহিনী প্রেরণ কালে বলতেন, 'তোমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করবে। আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিয়ে তাঁর পথে যাত্রা আরম্ভ করো। তাঁকে যারা স্বীকৃতি দেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না। কোনো শিশুকে হত্যা করো না'।

তিনি আরো বলতেন, 'শত্রুর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। ইসলাম গ্রহণ, জিজিয়া প্রদান ও যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কিছুই বলো না। যদি জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হয় তাহলে তাদের কোনো কিছুর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। এ দু'টোর কোনটিই যদি না করে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য কামনা করে যুদ্ধ করবে'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময় যখন সিরিয়াতে অভিযান চালিয়েছিলেন তখন তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে। লাশ যেন বিকৃত না করে। সন্নাসী ও তপস্যাকারীদের যেন অসুবিধা না করে এবং কোনো ধর্মস্থান যেন ভাঙ্গা না হয়। ফসলের ক্ষেতের কেউ যেন ক্ষতি না করে এবং ফলবান গাছ যেন কেউ না কাটে। ফসলের ক্ষেত যেন আগুনে জ্বালানো না হয়। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনবসতীর মধ্যে যেন আতংক ছড়িয়ে সে জনবসতী শূন্য করা না হয়। যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে না এমন কোনো পশুপ্রাণীকে যেন হত্যা করা না হয়। অঙ্গীকার যেন ভঙ্গ করা না হয়। যারা আনুগত্য স্বীকার করবে, তাদের প্রাণ ও সম্পদকে মুসলমানের প্রাণ ও সম্পদের মতই নিরাপত্তা দিতে হবে। যুদ্ধের ময়দান থেকে যেন পালানো না হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যেন আত্মসাৎ করা না হয়'।

সংক্ষেপে এটাই ছিল বিশ্বনবী (সাঃ) এর যুদ্ধ সীরাত। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা তিনি কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে যুদ্ধ করেছেন তা পরিষ্কার হয়েছে এবং তাঁর যুদ্ধ পদ্ধতি কেমন ছিল তাও স্পষ্ট হয়েছে। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মহল যারা নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে সমালোচনা করেন তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামঝি সময়েও জানতেন না যে, কোনো বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে হয়। পক্ষান্তরে রাসূল (সাঃ) সেই সপ্তম শতাব্দীতেই দিক নির্দেশনার সর্বোন্নত নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি যা ছিল, বর্তমানকালেও তাই রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যের হীনতা ও নিকৃষ্ট নির্মম পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অতিতেও লুটপাট ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে তারা যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে বর্তমান বিশ্বেও তারা সেই একই নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

বর্বর যুদ্ধবাজদের বিপরীত উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি কেবলমাত্র নবী করীম (সাঃ) বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন। আর এমন এক জাতির মাধ্যমে তিনি তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছিলেন, যাদের কাছে ছিল না কোনো ধরনের নিয়ম-নীতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন। যুদ্ধই ছিল যাদের জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম মাধ্যম। অপরের সম্পদ লুট করে নেয়ার মধ্যে যারা গৌরব বোধ করতো। নারী শিশু অসহায় বৃদ্ধদের হত্যা করে যারা পৈশাচিক আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতো। তাদের মাধ্যমেই তিনি মানুষের কল্পনার অতীত নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করেছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) এর যুদ্ধনীতি অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি যুদ্ধকে যাবতীয় নারকীয়তা ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে তখন হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল যুদ্ধের এক অবিচ্ছেদ্য নীতি। শোরগোল ও অশালীন ভাষায় গালাগালি সহকারে যুদ্ধ করা, সৈন্যদের অরাজকতা বিশৃংখলা, সেনাপতির আদেশ অমান্য করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, অঙ্গীকার রক্ষা না করা, লুটতরাজ করা, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা, চুক্তিবদ্ধদের হত্যা করা, দূত হত্যা করা, আহতদের হত্যা করা, বেসামরিক লোকদের হত্যা করা, লাশ বিকৃত করা, লাশের অবমাননা করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, রাহাজানি করা, ফসল বৃক্ষ তরু-লতা ধ্বংস করা, যুদ্ধরত নয় এমন জনপদের ক্ষতিসাধন করা এ সবই নিষিদ্ধ করা হলো।

এভাবে যুদ্ধের একমাত্র পরিচয় অবশিষ্ট থাকলো, একজন বীর সৈনিক দুশমনের সবচেয়ে কম ক্ষতিসাধন পূর্বক তার পক্ষ থেকে অকল্যাণ বা ক্ষতিরোধ করে যে কাজের মাধ্যম, তাই হলো যুদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) এর দশ বছরের সামরিক জীবনে তিনি প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার শাসক হয়েছিলেন। এই বিশাল এলাকা তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রতিপক্ষের মাত্র ২৫১ জনকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে শাহাদাতবরণ করেছিলেন মাত্র ১২০ জন মুজাহিদ।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধান করলেও মানুষের প্রাণের প্রতি এমন নির্মল সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো অনেক দূরের ব্যাপার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসন টিকিয়ে রাখার জন্যে পুলিশ বাহিনী দিয়েই

শাসকগণ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে অসংখ্য নিরীহ জনগণকে হত্যা করছে। পরাশক্তি ও তাদের মদদপুষ্ট দেশগুলো প্রতি নিয়ত নিরীহ মানুষকে পাখির মতোই হত্যা করছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করলে বা তাদের দাঙ্গা মারামারির ঘটনা পত্রিকার পাতায় পাঠ করলে ঘৃণায় দেহ-মন কুঞ্চিত হয়ে যায়।

নবী করীম (সা:) এর জীবনকালে গাজওয়া-সারিয়াহ্

নবী করীম (সা:) তাঁর সমগ্র জীবনকালে কতগুলো যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন বা সাহাবায়ে কেরামকে কতগুলো অভিযানে প্রেরণ করেছেন, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এমনকি অভিযানের কারণসমূহ ও সন তারিখ নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এ সম্পর্কে সন তারিখসহ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং যে যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন ঐতিহাসিকগণ সেগুলোকে গাজওয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আর যে যুদ্ধে বা কোনো অভিযানে তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ না করে কোন সাহাবীর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেছেন, ঐতিহাসিকগণ সেগুলোকে সারিয়াহ নামে চিহ্নিত করেছেন। সারিয়াসমূহের সংখ্যা প্রচুর। কোনো বর্ণনায় তা প্রায় ৫৭ টি উল্লেখ করা হয়েছে। সন তারিখ ইত্যাদী সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। সারিয়াসমূহের নামকরণ অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর প্রতি অর্পণ করা হয়েছে তাঁর নামে বা স্থানের নামেও পরিচিতি লাভ করেছে।

নবী করীম (সা:) কতটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে ২৯ টি। আবার কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে ২৭ টি। পক্ষান্তরে বোখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯ টি। প্রকৃত বিষয় হলো, এমন কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনো ঘটেছে, যা কোনো ঐতিহাসিক বা বর্ণনাকারী ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় হিসাবে গণনা করেননি। এ কারণে সংখ্যার তারতম্য ঘটেছে। তায়েফ অভিযান বা গাজওয়ায়ে তায়েফ অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরী অষ্টম সনের শাওয়াল মাসে। নবী করীম (সা:) তাঁর জীবনের শেষ সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছিলেন তাবুকের ময়দানে বা গাজওয়ায়ে তাবুকে। এ ঘটনা ছিল হিজরী নবম সালের রজব মাসে।

বিদায় হজ্জে নবী করীম (সাঃ) ঐতিহাসিক ভাষণ

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করার লক্ষ্যে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদেরকে বিশেষ দায়িত্ব ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। দায়িত্ব পালন শেষে তাঁরা এই পৃথিবীতে অতিরিক্ত সময় অবস্থান করবেন না কুদরতের এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর জীবন হতে তাদের কাছে ঐ পবিত্রজগৎ ছিল অধিক প্রিয়। ঐ জগতে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হবার জন্য তাঁরা ব্যাকুল থাকতেন। কোনো নবীকে যখন আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মিলিত হবার কথা জানানো হয়েছে, তাঁরা সামান্যতম দ্বিধা না করে অতি দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তিনি তা পালন করলেন। এমন লোক যখন প্রস্তুত হলো যে লোকগুলো স্বেচ্ছায় অন্তরের তাগিদে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান সমুন্নত রাখবে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে নিজের জান-মাল কুরবান করবে, যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করবে, তখন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিজের সান্নিধ্যে নেয়ার ইচ্ছা তাঁর হাবীবকে জানিয়ে দিলেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) হিজরতের পরে ফরজ হজ্জ আদায় করার সুযোগ পাননি। হিজরতের পূর্বে তিনি দুই বার হজ্জ আদায় করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো বর্ণনায় একবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দশম হিজরীতে নবী করীম (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ আদায় করার নিয়ত করলেন। জিলকদ মাসে ঘোষণা করা হলো তিনি হজ্জ আদায় করতে যাবেন। এই ঘোষণা সমগ্র আরবে বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। দূরে অবস্থানরত মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন নবী করীম (সাঃ) এই বছর হজ্জ আদায় করতে যাবেন। যার সামান্য সামর্থও আছে সে ব্যক্তিও হজ্জ আদায় করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

তাছাড়া এমন অনেক গোত্র ছিলো যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। হজ্জ আদায় উপলক্ষ্যে নবীকে দেখা যাবে, এ কারণেও অনেকে হজ্জ আদায়ের নিয়ত করেছিলেন। বিশ্বনবী (সাঃ) জিলকদ মাসের শনিবারের দিন গোসল করে তহবন্দ এবং চাদর পরিধান করলেন। যুহরের নামাজ আদায় করে তিনি পবিত্র স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন।

মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে জুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে প্রথম রাত অতিবাহিত করলেন। এই স্থান থেকেই মদীনাবাসীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। নবী করীম (সাঃ) এখানে গোছল করলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজ হাতে প্রিয় নবী (সাঃ) এর পবিত্র শরীর মুবারকে আতর মাখিয়ে দিলেন। তারপর দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করে উটের ওপর আরোহণ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। এই উট ছিল স্ত্রী জাতিয়

এবং নাম ছিল ক্কাসওয়া। ইহরাম বেঁধেই তিনি বিনয় অবনত চিত্তে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকলেন–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ– لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ– اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ–

হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি উপস্থিত হয়েছি! হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি উপস্থিত হয়েছি! হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি উপস্থিত হয়েছি এবং ঘোষণা করছি, তোমার কোনো অংশীদার নেই। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি উপস্থিত হয়েছি! নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং নিয়ামত আপনারই জন্য নির্দিষ্ট এবং আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আপনারই জন্য, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

নবী করীম (সা:) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ আদায় করতে চলেছেন। প্রিয় সঙ্গী সাথী এ সংবাদ তখন পর্যন্ত কেউ-ই জানেন না, আর মাত্র কিছুদিন পরেই প্রিয় নবী তাদের মধ্যে থাকবেন না। আগামী বছর নবীর সাথে হজ্জ করার ভাগ্য তাঁদের আর হবে না। রাসূল (সা:) এগিয়ে চলেছেন মক্কার দিকে। জনতার ঢল নেমেছে চারদিকে। রাসূলের দুই দিকে অগণিত জনতা। নবী করীম (সা:) এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে লাব্বাইকা ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে উচ্চারিত হচ্ছে।

পথের পাশের বৃক্ষ তরু-লতা তথা সকল অনু পরমানু যেন রাসূলের সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবার ঘোষণা দিচ্ছে। লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা। আমি উপস্থিত হয়েছি! হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি উপস্থিত হয়েছি! সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতই অগণিত জনতা মধুর গুঞ্জন তুলে এগিয়ে যাচ্ছেন। মক্কা বিজয়কালে তিনি যেসব স্থানে অবস্থান করেছিলেন প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম সেসব স্থানে পরম শ্রদ্ধাভরে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

নবী করীম (সা:) সেসব মসজিদে যাত্রা বিরতি করে নামাজ আদায় করলেন। পথের পাশের অগণিত জনতা তাঁকে দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাঁরাও হজ্জ আদায় করার জন্য কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। কাফেলা এক সময় সরফ নামক স্থানে উপনীত হলো। নবী করীম (সা:) সেখানে যাত্রা বিরতি করে গোছল করলেন। তারপর তিনি জিলহজ্জ মাসের চার তারিখে ফজরের নামাজের সময় পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করলেন। মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছতে তাঁর নয় দিন সময় লেগেছিল।

নবী করীম (সা:) মক্কায় এসেছেন, এ সংবাদ শোনার পরে দলে দলে মুসলমানগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। বিশেষ করে তাঁর নিজের গোত্র বনী হাশেমের শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহর নবী শিশুদেরকে ভালোবাসতেন। তিনি শিশুদেরকে উটের সামনে পিছনে বসিয়ে এগিয়ে গেলেন কা'বার

দিকে। কা'বার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে বললেন, 'হে আল্লাহ তা'য়ালা! এই ঘরের সম্মান মর্যাদা আপনি বৃদ্ধি করে দিন'।

এরপর তিনি কা'বা তাওয়াফ করলেন। মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করলেন। তারপর সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে বললেন, 'সাফা এবং মারওয়া পাহাড় আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত'। এরপর কা'বা ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের উপযোগী কেউ নেই। কেউ তাঁর অংশীদার নেই। সকল ক্ষমতা তাঁরই, তাঁরই জন্য সকল ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সকল কিছুর ওপরে তিনিই শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল গোত্রকে পরাজিত করেছেন'।

আরববাসীরা হজ্জের সময় ওমরাহ করতো না। সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করে তিনি সায়ী শেষ করলেন। যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তাদেরকে তিনি ইহরামমুক্ত হবার নির্দেশ দিলেন। কোনো কোনো নতুন সাহাবী অতীতের অভ্যাস অনুয়ায়ী রাসুলের নির্দেশ পালনে দ্বিধা করছিল। নবী করীম (সা:) তাদের অবস্থা অনুভব করে বললেন, 'যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থকতো তাহলে আমিও তাই করতাম'।

কুরাইশরা প্রথা বানিয়ে নিয়েছিল যে, তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ধারণা করে অন্য হাজীদের মত আরাফাতে অবস্থান না করে মুজদালিফায় অবস্থান করতো। এই মুজদালিফা ছিল কা'বা শরীফের সীমানায় অবস্থিত। তারা হজ্জের সময় কা'বার সীমানা অতিক্রম করতো না এ কারণে যে, অন্যদের আর তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। পার্থক্য বজায় রাখতে তারা অনুরূপ করতো।

নবী করীম (সা:) এই কু-প্রথার কবর দিলেন। তিনি সকল বিভেদ এবং অহংকারের মাথায় পদাঘাত করলেন। তিনি সাধারণ হাজীদের সাথে আরাফাতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা নিজেদের পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থান করো। কারণ তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষ ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচিত'। (বুখারী ও আবু দাউদ)

আরাফাতে অবস্থান করা হযরত ইবরাহীম (আ:) এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত। তিনিই এই স্থানকে হাজীদের অবস্থানের জন্যই নির্বাচন করেছিলেন। এই জায়গার একটি স্থানের নাম নামিরাহ, পরবর্তীতে সেখানে এক সুদৃশ্য বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নবী করীম (সা:) এখানে অবস্থান করলেন এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরে তিনি আরফাতের ময়দানে গেলেন। এই ময়দানেই তিনি তাঁর উটনী ক্বাসওয়ার ওপরে বসে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষন দিয়েছিলেন। তিনি যে উঁচু স্থানে উটের পিঠে বসে ভাষণ দিয়েছিলেন সে স্থানে একটি সাদা পিলার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিশ্বনবী (সা:) ভাষণে বললেন, হে জনমণ্ডলী! আজ আমি তোমাদের যে কথা বলবো তা মনোযোগ দিয়ে শুনো। আমার ধারণা, আর বোধহয় তোমাদের সাথে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ নাও হতে পারে। জেনে রেখো, জাহেলী যুগের সকল অন্ধ বিশ্বাস, প্রথা, অনাচার, কুসংস্কার আমার পায়ের নীচে দলিত মথিত হলো। অজ্ঞতার যুগের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ আজ থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। আমি সর্বাগ্রে আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারিসের রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করলাম। সে যুগের সুদ প্রথাও রহিত করলাম। আমি প্রথমে আমার বংশের আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের দাবী নাকচ করে দিলাম। (আরবে প্রথা ছিল, কেউ কাউকে নিহত করলে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে। এই প্রতিশোধের পালা বংশ পরম্পরায় চলতো। রাবিয়া ইবনে হারিসের সন্তান আরেক গোত্রের হাতে নিহত হয়েছিল। বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু নিজেরা আইন হাতে উঠিয়ে নিতে পারবে না। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের ব্যবসা ছিল। তিনি অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ আদায় করতেন। তখন পর্যন্ত আরবের অনেক লোকের কাছেই তিনি সুদের অর্থ পেতেন)

একজন অপরাধ করলে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া তথা পিতার অপরাধের কারণে সন্তানকে বা সন্তানের অপরাধের কারণে পিতাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। (এই নিষ্ঠুর প্রথা সে সময় সমগ্র আরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপরাধীকে ধরতে না পারলে তার নির্দোষ আত্মীয়কে শাস্তি দেয়া হতো) যদি কোনো নাক কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে যদি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশ পালন করবে।

সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। এই সীমা লংঘনের কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে উপস্থিত হতে হবে এবং সকল কর্মের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে কাফিরদের মতো একে অপরের রক্তপাত করো না। সাবাধান! তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ পরস্পরের কাছে আজকের পবিত্র দিনের মতো, এই পবিত্র মাসের মতো এবং এই পবিত্র মক্কার মতোই পবিত্র।

জেনে রেখো, আরবদের ওপরে অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদের ওপরে আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকলেই আদমের সন্তান আর আদম হলো মাটি থেকে সৃষ্টি। মনে রেখো, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমানদের নিয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য সমাজ। হে মানুষ! আমার পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। তোমাদের পরে আর কোনো নতুন উম্মাহ্ সৃষ্টি হবে না। এই বছরের পরে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়তো আর হবে না। সুতরাং জ্ঞান বিলীন হবার পূর্বেই আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

বিশেষ করে চারটি কথা ভালো করে স্মরণ রেখো, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করো না। ন্যায়ের ভিত্তি ব্যতীত তোমরা কাউকে হত্যা করো না। অপরের দ্রব্য আত্মসাৎ করো না। ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব এবং আমার প্রদর্শিত পথ রেখে যাচ্ছি। (অর্থাৎ তাঁর সুন্নাত)

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! শয়তান হতাশ হয়েছে। কারণ আরবে সে আর কখনো পূজা পাবে না। কিন্তু সাবধান! তোমরা যাকে ছোট মনে করো, তার ভেতর দিয়েই শয়তান তোমাদের মহাক্ষতি সাধন করে। তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হও। নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার আযাবকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার জিম্মাদারীতে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাদেরকে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের স্ত্রীর ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে তেমনি তাদেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে। মনে রেখো, তোমরাই তাদের আশ্রয়।

আমি তোমাদেরকে তোমাদের দাস-দাসী সম্পর্কে সাবধান করছি। তাদের প্রতি কোনো ধরনের নির্যাতন করবে না। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো না যে, তারা মনে আঘাত পায়। তোমরা যা আহার করবে, তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তাই আহার ও পরিধান করাবে। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, আমার কাছ থেকে যা শুনলে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে তা পৌঁছে দিও। তাদের ভেতরে কেউ কেউ শ্রোতাদের থেকেও অধিক স্মৃতি ও বোধ শক্তিসম্পন্ন হতে পারে।

নবী করীম (সাঃ) এর ভাষণ একত্রে পাওয়া কষ্টকর। কারণ যিনি যতটুকু শুনেছেন এবং স্মরণে রেখেছেন ততটুকুই তিনি বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন হাদীসে ভাষণের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বনবী (সাঃ) এর ভাষণ একত্রে উপস্থিত সকল মানুষ শুনতে পায়নি। কারণ বর্তমান সময়ের মতো সে যুগে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ঘোষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা রাসূলের ভাষণ উপস্থিত মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

এরপর নবী করীম (সাঃ) আরাফাত এবং মিনায় উপস্থিত মানুষদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি কিনা, এ সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্ন করবেন। তখন তোমরা কি সাক্ষ্য দিবে?

লক্ষ মানুষের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার বাণী আপনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই সাক্ষ্য দিবো।

নবী করীম (সাঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আপনি সাক্ষী থাকুন'। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ, কানযুল উম্মাল, আত্ তাবারী, ইবনে কাসীর)

এরপর নবী করীম (সাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে আযান দিতে বললেন। তারপর যুহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করলেন। নামাজ শেষ হলে তিনি নিজের অবস্থানের কাছে এসে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করে সূর্য অস্ত গেলে তিনি যাত্রা করলেন। এ সময় তাঁর উটনীর পেছনে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বসেছিলেন। বিশাল এক জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি ইশারা করছিলেন আর মৃদু কণ্ঠে বলছিলেন, হে জনমণ্ডলী! শান্তির সাথে।

বারবার এই কথাটি বলছিলেন। অর্থাৎ কোনো বিশৃংখলা যেন না হয়। পথে এক সময় তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তাঁকে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! নামাজের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

নবী (সাঃ) জানালেন, নামাজ আদায়ের জায়গা সামনে আসছে।

তিনি মুজদালিফায় এসে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের জিনিস পত্র খুলবেন এমন সময় ইশার নামাজের আযান হলো। অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজের মধ্যে সেদিন সময়ের তেমন ব্যবধান ছিল না। সেদিন রাতে নবী করীম (সাঃ) বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য রাতের ন্যায় রাত জেগে নামাজ আদায় বা আল্লাহ তা'য়ালা সমীপে সিজদায় থাকেননি। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এই একটি মাত্র রাতই নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেননি।

ইতোপূর্বে কুরাইশরা সূর্য উদয়ের পরে মুজদালিফা ত্যাগ করতো। নবী করীম (সাঃ) সে প্রথা রহিত করে সূর্য উদিত হবার পূর্বেই মুজদালিফা ত্যাগ করলেন। এ সময় তাঁর সাথে তাঁর চাচাত ভাই হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন। এই দিনটি ছিল জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ শনিবার। তারপর তিনি মীনায় জামরার কাছে উপস্থিত হয়ে কিশোর বালক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে পাথর কুড়িয়ে আনতে বললেন। তিনি পাথর এনে দিলে নবী করীম (সাঃ) পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি মীনায় গেলেন। সাথে তাঁর লক্ষ জনতা।

তিনি অগণিত জনতার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। নয়ন বোধহয় তাঁর বারবার অশ্রু সজল হয়ে উঠছিল। এই লোকগুলোকে ইসলামের পথে নিয়ে আসতে তাঁকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম অর্থ-সম্পদ কুরবানী দিয়ে অবশেষে প্রাণও দান করেছেন, প্রিয় জীবন সঙ্গিনী খাদিজা (রাঃ) নিজের সহায়-সম্পদ কুরবানী

দিয়ে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। ওহূদের ময়দানে তাঁর দাঁত মুবারক শাহাদাতবরণ করেছে, তাঁর পবিত্র শরীরে কাফিররা আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করেছে। প্রিয় চাচার কলিজা ছিন্ন হয়েছে। সীমাহীন যন্ত্রণা আর অসীম ত্যাগের কিনারাহীন সাগর পাড়ি দেয়ার পরে আজ এই লোকগুলো এখানে সমবেত হয়েছে।

নবী করীম (সা:) আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। এরপর তিনি কুরবানী দিয়ে মাথা মুড়ালেন। পবিত্র চুল মুবারক তাঁর নির্দেশে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হলো। এরপর তিনি মক্কায় গিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে জমজমের পানি পান করলেন। পানি পান করার পূর্বে তিনি নিজ বংশের লোকদেরকে ডেকে বললেন, আমার যদি এই ভয় না হতো যে, আমাকে এমন করতে দেখে লোকেরা তোমাদের হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে পানি উঠিয়ে পান করবে, তাহলে আমি নিজ হাতে পানি উঠিয়ে পান করতাম।

হযরত আব্বাস (রা:) পানি উঠিয়ে দিয়েছিলেন। নবী করীম (সা:) কা'বা শরীফের দিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন। এরপর সেখান থেকে মীনায় গিয়ে যুহরের নামাজ আদায় করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন মক্কাতেই যুহরের নামাজ আদায় করেছিলেন। বিশ্বনবী (সা:) হজ্জ আদায় করলেন। তাঁর উম্মতদের তিনি বারবার দেখছিলেন। তাদের প্রতি নবী করীম (সা:) শেষবারের মতোই করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বিদায়! বন্ধুগণ বিদায়!' এই হজ্জই ছিল নবী করীম (সা:) এর পবিত্র জীবনের শেষ হজ্জ।

নিজ প্রাণের শত্রুদের প্রতি নবী করীম (সা:) এর আচরণ

কতিপয় অমুসলিম লেখক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লিখেছে, মুহাম্মাদ (সা:) খায়বার, বনী নজীর ও বনী কুরাইজার ইয়াহূদীদের ওপরে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) সকল সীরাত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, রাসূল (সা:) কারো ওপরে ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। হযরত আয়িশা (রা:) বলেন, নবী করীম (সা:) ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো ওপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার আইনের সাথে কেউ বেয়াদবি করলে তাকে ক্ষমা করতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

দুশমনরা তাঁকে অসহনীয় কষ্ট দিয়েছে, ঐ মানুষগুলো যখন তাঁর সামনে এসেছে তিনি হাসি মুখে তাদেরকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছেন। তায়েফের মানুষগুলো তাঁকে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি। তায়েফের যুদ্ধের সময় তাঁরা ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল। ঐ তায়েফবাসীর কল্যাণের জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন।

তায়েফবাসী যখন তাদের প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেছিল, নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে মসজিদে নববীতে স্থান দিয়ে তাদেরকে পরম আদোরে বরণ করে কোমলতা এবং স্নেহের বাহু বিছিয়ে দিয়েছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

মক্কা বিজয়ের পরে তিনি ঘোষণা করলেন, 'সকল মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি'। অর্থাৎ কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই এক ও অবিচ্ছিন্ন। কেউ কারো ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি হবে বেশি সম্মানিত এবং মর্যাদাবান, আল্লাহ তা'য়ালাকে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভয় করে। যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তা'য়ালার আইন পালন করে। লম্বা জুব্বা আর লম্বা দাড়ি থাকলেই অধিক সম্মান লাভ করবে বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হতে পারলে বা শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী হতে পারলে তাকেই অধিক সম্মান করতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে সম্মান আর মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে আল্লাহভীতির ওপরে। নামের পূর্বে চার পাঁচটা ডিগ্রী থাকলেই সম্মান লাভ করা যাবে না।

প্রিয়তম স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ওপর ভয়ংকর অপবাদ দিয়েছিল মদীনার মুনাফিকরা, তাতেও রাসূল (সাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। মদীনায় ইয়াহূদী লবীদ ইবনে আসাম নবী (সাঃ) এর ওপরে যাদু করেছিল, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যায়েদ ইবনে সানা নামক একজন ইয়াহূদীর কাছ থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ঋণ পরিশোধের তারিখ তখন পর্যন্ত আসেনি। অকারণে সেই ইয়াহূদী অপমান করার জন্য লোকজনের মধ্যে নবী (সাঃ)-এর জামা টেনে আপত্তিকর দৃশ্য ঘটিয়ে বলেছিল, 'হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা সব সময় ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নানা বাহানা করো'।

অথচ ঋণ পরিশোধের তারিখ তখন পর্যন্ত আসেনি। রাসুল (সাঃ) কে এভাবে অপ্রস্তুত করতে দেখে হযরত উমার (রাঃ) প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর শত্রু! তুই আল্লাহর রাসূলের সাথে বেয়াদবি করিস!'

হযরত উমার (রাঃ) কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মুখে হাসি টেনে বললেন, 'হে উমার! আমি তোমার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার আশা করিনি। তাকে তাগাদা করার ধরন বুঝিয়ে দেয়া দরকার ছিল। যাও, তার ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা করো এবং বেশি দিয়ে দাও'।

নবী করীম (সাঃ) এর একটি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছিলো। তা ঘামে ভিজে আরো ভারি হয়ে যেত। হযরত আয়িশা (রাঃ) জানতে পারলেন, সিরিয়া থেকে একজন ইয়াহূদী কিছু কাপড় আমদানী করেছে। তাঁর কাছ থেকে তিনি কাপড় ঋণ হিসাবে গ্রহণের জন্য আল্লাহর রাসূলকে বললেন। রাসূল (সাঃ) সে ইয়াহূদীর কাছে কাপড়ের জন্য একজন লোক প্রেরণ করলেন। ইয়াহূদী তাঁর সাথে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে বলেছিল,

'তোমাদের উদ্দেশ্য আমার কাছ থেকে বিনামূল্যে কাপড় গ্রহণ করা। কোনদিনই তোমরা এর মূল্য দিবে না'।

লোকটি ফিরে এসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে ঘটনা জানালে তিনি বলেছিলেন, 'লোকটি জানে আমি সবচেয়ে আমানতদার এবং ঋণ আদায়কারী'। অর্থাৎ জেনে বুঝেই লোকটি অপমান করার জন্য এমন অশোভনীয় আচরণ করেছে।

মদীনার মাসজিদে নববীতে একদিন এক বেদুঈন এসে তাদের অভ্যাস মতো দাঁড়িয়ে প্রসাব করা শুরু করেছিল। তখন পর্যন্ত সে মাসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সাহাবায়ে কেরাম ছুটে এলেন তাঁকে মারধর করার জন্য। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, 'যাও, এক পাত্র পানি এনে সেখানে ঢেলে দাও। মনে রেখো, মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রেরণ করেননি। বরং মানুষের কাজ সহজ সরল করে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন'। (বুখারী)

মক্কার কুরাইশরা বিশ্বনবী (সাঃ) এর নাম মুবারক বিকৃত করেছিল। মুহাম্মাদ অর্থাৎ অতি প্রশংসিত। তারা বলতো মুজাম্মাম অর্থাৎ ধিকৃত। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরাইশদের গালির জবাব কিভাবে দিচ্ছেন তা ভেবে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছো! তারা মুজাম্মামকে গালি দেয়, অভিশাপ করে। আর আমিতো মুহাম্মাদ, প্রশংসিত। (মিশকাত)

ফুরাত ইবনে হাইয়ান নামক একজন লোক নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করতো। সে লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে ইয়ামামাতে একটি বিশাল জমি দান করেছিলেন। যার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে চার শত দিরহাম। তিনি নিজের ঘরে অভাব রেখে শত্রুর অভাব এইভাবেই মোচন করেছেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির সময় প্রায় ৮০ জনের একটি সশস্ত্র দল তাঁকে হত্যা করার জন্য গিয়েছিল। তারা সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলো। নবীর সামনে তাদেরকে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। একজন শত্রু তাঁর ওপর আক্রমন করেছিল। তিনি শত্রুর দিকে তাকানো মাত্র তার হাত থেকে তরবারী মাটিতে পড়ে গেল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

মক্কায় শিয়াবে আবু তালিবে মক্কার শত্রুরা মুসলমানদের দীর্ঘ তিনটি বছর বন্দী করে রেখেছিল। ক্ষুধার্ত সাহাবায়ে কেরাম গাছের পাতা, মৃত পশুর চামড়া আহার করেছেন। অনাহারে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যখন করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করেছে, শত্রুরা অট্টহাসি হেসেছে। মক্কায় খাদ্য শস্য সরবরাহকারী ইয়ামামা মুসলমান হলেন। তিনি মক্কায় যাওয়ার

পরে ইসলামের শত্রুরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিল। তিনিও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের অনুমতি ব্যতীত একদানা খাদ্য শস্য মক্কায় সরবরাহ করা হবে না।

ফলে অচিরেই মক্কায় তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল। কুরাইশরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মদীনায় করুণার সিন্ধুর দিকে হস্ত প্রসারিত করলো। আল্লাহর রাসূল বিষয়টি জানতেন না। তিনি শোনা মাত্র ইয়ামামা (রা:) কে আদেশ দিলেন, অতি দ্রুত যেন মক্কায় খাদ্য সরবরাহ করা হয়। নবীর আদেশে মক্কায় দ্রুত খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হলো। (বুখারী)

বনী হানিফা গোত্র আল্লাহর রাসূলের প্রাণের শত্রু ছিল। তাদের নেতা সাম্মামা ইবনে আসাল মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, তাকে মাসজিদের সাথে যেন বেঁধে রাখা হয়। রাসূল (সা:) মাসজিদে যাবার সময় তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার কাছে কি ধরনের ব্যবহার আশা করো?

গোত্রপতি সাম্মামা ইবনে আসাল বললো, হে মুহাম্মাদ (সা:)! যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। আর যদি আমাকে মুক্তি দেন, তাহলে আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। আর যদি মুক্তিপণের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দিতে চান তাহলে আমি তা আদায় করতে পারি।

নবী করীম (সা:) তার কথার জবাব না দিয়ে নীরব রইলেন। দ্বিতীয় দিনও নবীর সাথে তার একই কথাবর্তা হলো। তৃতীয় দিনও একই কথাবার্তা হলো এবং রাসূল (সা:) সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নির্দেশ দিলেন, তাকে মুক্ত করে দেয়া হোক। মুক্তি লাভ করে সে একটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে গোছল করলো। তারপর মাসজিদে নববীতে এসে রাসূলের হাতে হাত রেখে মুসলমান হলো।

ইসলাম গ্রহণ করার পরে সে বললো, 'পৃথিবীতে আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম, এখন এই পৃথিবীতে আপনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার চেয়ে প্রিয়জন আমার কাছে আর কেউ নেই। আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম ইসলামকে। এখন আমার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয় হলো ইসলাম। আপনার শহর ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণার, এখন আপনার শহরের তুলনায় আমার কাছে এতো প্রিয় শহর আর একটিও নেই'। বিশ্বনবী (সা:) তাঁর অনুপম আদর্শ দিয়ে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, তরবারীর শক্তিতে অবশ্যই নয়।

অমুসলিমদের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর আচরণ

নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বানিয়েছিলন। যার আঙ্গুলী হেলনে লক্ষ তরবারী মুহূর্তে কোষমুক্ত হতো। সে সময় তিনি অমুসলিম এবং শত্রুদের সাথে কি ধরণের আচরণ করেছেন, তা অমুসলিম লেখকদের চোখে পড়লেও তারা স্বভাবসুলভ কারণে চোখ বন্ধ করে তাঁর প্রতি কল্পিত অভিযোগ দাঁড় করিয়েছেন।

ইসলামের শত্রুদের যদি শ্রেণী বিন্যাস করা হয় তাহলে দেখা যাবে, কপট বা মুনাফিকদের থেকে ইসলামের বড় শত্রু আর দ্বিতীয়টি নেই। বর্তমানেও সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের এই করুণ অবস্থার মূলে রয়েছে মুনাফিক শ্রেণীর কূটিল ষড়যন্ত্র। বলা বাহুল্য বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম দেশসমূহের নেতৃত্ব রয়েছে ঐ শ্রেণীর লোকজনের হাতে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের যোগ্য প্রতিনিধি নয়, যাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি মমত্ববোধ নেই।

মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিকদের নেতা। বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে না এলে মদীনাবাসী তাকেই মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করতো। মূলত সে ছিল কাফিরের তুলনায় জঘন্য। কিন্তু তার বাইরের অবয়ব ছিল মুসলমানের মতো। ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান এবং মক্কার কুরাঈশদের সাথে তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিলো। মদীনার মুসলমানদের সকল সংবাদ সে ইসলামের শত্রুদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে মুসলমানদের ধ্বংসসাধন করার ব্যাপারে তৎপর ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এমন কোনো চেষ্টা নেই যা সে করেনি।

মদীনা থেকে মক্কার মুহাজির মুসলমানদের বের করে দেয়ার জন্য মদীনার আনসারদের সে উস্কানী দিয়েছে। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ওপরে সে অপবাদ দিয়েছে। নবী (সাঃ) এর সম্মুখে অপমানজনক কথা বলেছে। যুদ্ধের ময়দানে সে তার সাথীদের নিয়ে নবী (সাঃ) কে ত্যাগ করেছে। বিশ্বনবী (সাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। হযরত উমার (রাঃ) এই লোকগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য নবী (সাঃ) এর কাছে বারবার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু দয়ার সাগর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনকি সে মারা গেলে তিনি তাঁর নিজের শরীরের পবিত্র জামা দিয়েছেন কাফনের জন্য।

আবু বাসরাহ নামক একজন কাফির নবী (সাঃ) এর ঘরে মেহমান হলো। গোটা পরিবারের জন্য রাতের খাবার যা ছিল আবু বাসরাহ তা খেয়ে শেষ করে দিলো। নবী (সাঃ) স্বয়ং এবং তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ রাত অনাহারে কাটিয়ে দিলেন। (মুসনাদে ইবনে হাম্বল)

বিশ্বনবীর সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হিজরতকালে পবিত্র মক্কা থেকে মদীনায় আসার সময় তাঁর মা'কেও সাথে করে এনেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল হযরত মাইমুনাহ অথবা উমাইমাহ (রাঃ)। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তান আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন পযর্ন্ত তিনি ইসলাম কবুল করেননি। সন্তান আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন অল্পবয়স্ক বালক সে সময় তিনি বিধবা হন। তারপর তিনি আর বিয়ে করেননি। সন্তানকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন পার করতেন। এ কারণে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মায়ের প্রতি খুবই অনুগত ছিলেন।

সন্তান ইসলাম কবুল করেছিল, এ জন্য তাঁর মা মনের দিক দিয়ে চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন। মা ইসলাম গ্রহণ করছে না- শিরকের কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে, এ কারণে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁর মা'কে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাতেন। তাঁর মা ইসলামের নাম শুনলেই ভীষণ রেগে উঠতেন। বিশেষ করে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র নাম মুবারক তাঁর কানে যাওয়া মাত্র তিনি জ্বলে উঠতেন।

এভাবে একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মা'কে ইসলাম এবং বিশ্বনবী (সাঃ) সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলেন। তাঁর মা কোনো কথাই শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনকি সেদিন তিনি বিশ্বনবী (সাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করে সন্তানকে প্রহার করলেন। মা মেরেছে- এ কারণে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মনে সামান্য প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে পানির ধারা নেমে এলো।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে দরবারে রেসালাতের দিকে রওয়ানা দিলেন। আল্লাহর হাবিব দেখলেন তাঁর প্রিয় সাহাবী আবু হুরায়রা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসছে। কাছাকাছি এলে তিনি জানতে চাইলেন, আবু হুরায়রা! তুমি কাঁদছো কেনো?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমাকে মেরেছে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, মা মেরেছে আর তুমি আমার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? তোমার মা মেরেছে তা আমি কি করতে পারি?

আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মা মেরেছে আমি সে কারণে কোনো অভিযোগ করছি না। আমার মনে বড়ই যন্ত্রণা, আমার মা এখনও ইসলাম কবুল করলেন না! আপনি দোয়া করুন, আমার মা যেন ইসলাম কবুল করেন।

আল্লাহর নবী (সাঃ) তৎক্ষণাত দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আবু হুরায়রার মা'কে হেদায়েত করুন।

হযরত আবু হুরায়রা (সাঃ) নিজের বাড়ির দিকে দ্রুত ছুটলেন। পথে লোকজন তাকে ধরলো, আপনি এমন করে ছুটে যাচ্ছেন কেনো?

তিনি জবাব দিলেন, আমাকে যেতে দাও, আমি দেখতে চাই! আমি বাড়িতে পৌঁছানোর আগে আমার নবীর দোয়া পৌঁছলো কি না!

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বাড়ির দরোজা বন্ধ। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মা গোছল করছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মা বের হয়ে এসে সন্তানকে বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, এবার তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হলো। তিনি আবার ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে। আনন্দে বিগলিত হয়ে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করেছেন, আমার মা ঈমান এনেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে তাঁর মায়ের এক অপূর্ব সম্পর্ক ছিল। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে তিনি নবীর দরবারে এলেন। এ সময় সেখানে আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে কিভাবে এলে?

তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

নবী করীম (সাঃ) খেজুরের কাঁদি আনালেন এবং উপস্থিত সবার হাতে দু'টো করে দিয়ে বললেন, এই খেজুর দু'টো খাও এবং তারপর পানি পান করো। এই দু'টো খেজুরই আজকের জন্য তোমাদের যথেষ্ট হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি রেখে দিলেন। বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) দেখেছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, আবু হুরায়রা! খেজুর রেখে দিলে কেনো?

তিনি লাজনম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের জন্য রেখেছি।

আল্লাহর নবী (সাঃ) বললেন, তুমি খেয়ে নাও, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দু'টো খেজুর দিচ্ছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) খেজুর খেলেন। নবী (সাঃ) তাঁকে আরো দু'টো খেজুর দিলেন তাঁর মায়ের জন্যে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মেয়ে হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে

আসলেন। আমি তখন নবী (সা:) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি আমার মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যবহার করবো?

আল্লাহর নবী (সা:) বললেন, 'অবশ্যই করবে'।

ইবনে উয়াইনা (রা:) বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তারই ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল করেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী ব্যবহার করতে নিষেধ করছেন না, যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করে না। (বুখারী)

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন–

لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ- إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তা'য়ালা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'য়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং (একই কারণে) তোমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, (এরপরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই জালিম। (সূরা মুমতাহিনা -৮-৯)

মুসলমানদের যারা ধ্বংস করে দিতে চায় এবং এই কুকর্মে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না। যারা সম্পর্ক রাখবে তারাই আল্লাহ্ তা'য়ালার দৃষ্টিতে জালিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। মহান আল্লাহর এই কথা শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়- সমগ্র বিশ্বের যে কোনো দেশের মুসলমানদের সাথে যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র অন্যায় ব্যবহার করে, তাদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের রক্ত ঝরায় তাহলে সে সকল রাষ্ট্র ও অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে যদি কোনো মুসলিম নামধারী নেতা সম্পর্ক রাখে, আল কুরআনের দৃষ্টিতে সে অবশ্যই জালিম।

কিন্তু অমুসলিমের সাথে অকারণে কোনো ধরনের খারাপ আচরণ করা যাবে না। তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইসলাম স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু হারামই ঘোষণা করেনি, আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, যে মুসলমান কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয় বা যন্ত্রণা দেয় সে যেন আমাকে যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন মহান আল্লাহকে যন্ত্রণা কষ্ট দিল। (তাবারাণী)

বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বাহক আল্লাহর নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ তা'য়ালার আদালতে মামলা দায়ের করবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলায় লড়াই করবো। (আল খতীব)

আল্লাহর নবী (সাঃ) বসেছিলেন। লোকজন একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ওটা তো ইয়াহূদীর লাশ, আপনি সে লাশের সম্মানে দাঁড়ালেন?'

মানবতার নবী (সাঃ) বললেন, 'কেনো, ইয়াহূদী কি মানুষ নয়!'

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিলো। তা দেখে নবী করীম (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এটা তো একজন ইয়াহূদীর লাশ। তিনি বললেন, তোমরা যখনই কোনো জানাযা দেখবে তখনই দাঁড়িয়ে যাবে। (বুখারী হাদীস নং ১২২৬)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রাঃ) বর্ণনা করেন, সহল ইবনে হুনাইফ এবং কায়েস ইবনে সা'য়াদ কাদেসিয়াহ নামক এক স্থানে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিলো, তা দেখে উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো, এ হচ্ছে যিম্মির (অমুসলিমের) জানাযা। তাঁরা বললেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিলো। তা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেউ তাঁকে বলেছিলো যে, এ তো ইয়াহূদীর জানাযা। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তবে সেটা কি মানবদেহ নয়? (বুখারী হাদীস নং ১২২৭)

একমাত্র ইসলামই অসাম্প্রদায়িক আদর্শ, যে আদর্শে মানুষকে মানুষ হিসেবেই সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো আদর্শ নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ইসলাম ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতামুক্ত কোনো আদর্শ পৃথিবীতে নেই।

তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, একজন কাফির নবী করীম (সাঃ) এর মেহমান হলো। তিনি লোকটির সামনে ছাগলের দুধ পেশ করলেন। লোকটি দুধ পান করলো। এভাবে সে সাতটি ছাগলের দুধ পান করলো। বিশ্বনবী (সাঃ) সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। পরের দিন সকালে সে ইসলাম কবুল করলো। মুসলিম অবস্থায় সে একটি ছাগলের দুধের অধিক দুধ পান করতে পারলো না। বিশ্বনবী (সাঃ) যখন অসীম ক্ষমতাধর, তখনও তাঁকে অমুসলিমরা গালাগালি দিয়েছে, তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন কিন্তু কখনো সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

ইসলাম তখন সমগ্র আরব শাসন করছে। মসজিদে নববী থেকে বিশ্বনবী (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। সেই মাসজিদে নববীর সম্মানিত মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল (রাঃ)। যিনি বিশ্বনবী (সাঃ) এর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতেন। তদানীন্তন বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁকে অমুসলিমদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হতো। নবী পরিবারের খরচ চালানোর জন্য তিনি এক পৌত্তলিকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।

ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় তখন পর্যন্ত আসেনি। হযরত বিলাল (রাঃ) সবেমাত্র আজান দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় সেই পৌত্তলিক এসে বিদ্রুপ করে হযরত বিলাল (রাঃ) কে বললো, হে কালো মায়ের সন্তান!

ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাত সে পৌত্তলিকের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যেত। কিন্তু বিশ্বনবী (সাঃ) এর আদর্শের অনুসারী হযরত বিলাল বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, আমি উপস্থিত, আমাকে কিছু বলবে?

নির্লজ্জ লোকটি উদ্যতভাবে বললো, আমার পাওনা পরিশোধ করার আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকী আছে। যথা সময়ে আমার পাওনা যদি পরিশোধ না করো, তাহলে তোমাকে দিয়ে আমি ছাগল চরিয়ে নেব।

হযরত বিলাল (রাঃ) এর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। তিনি ইশার নামাজ আদায় করে নবী করীম (সাঃ) কে ঘটনা জানালেন। ঋণ পরিশোধ করার পূর্বদিন রাতে তিনি নবী (সাঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আগামী কাল তার ঋণ পরিশোধের দিন। এদিকে ঘরে কিছুই নেই। সেই লোকটি এসে আমাকে অপমান করবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি কোথাও চলে যাই। তারপর ঋণ পরিশোধ করার মতো ব্যবস্থা হলে আমি ফিরে আসবো।

নবী করীম (সাঃ) কোনো মন্তব্য করলেন না। হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর সামান্য জিনিসপত্র বেঁধে মাথার কাছে নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফজরের নামাজ আদায়

করে তিনি বের হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। এমন সময় রাসূল (সাঃ) এক লোকের মারফত বিলাল (রাঃ) এর কাছে সংবাদ প্রেরণ করলেন। তিনি রাসূলের ঘরের সামনে গিয়ে দেখলেন, খাদ্য-শস্য বোঝাই চারটি উট দাঁড়িয়ে রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, বিলাল, আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করো। ফদকের সর্দার এগুলো প্রেরণ করেছে। এগুলো বিক্রি করে ঋণ আদায় করো।

হযরত বিলাল (রাঃ) সেগুলো বিক্রি করে সকল ঋণ পরিশোধ করে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সকল ঋণ আদায় করা হয়েছে। (আবু দাউদ)

একবার একজন ইয়াহূদী মদীনার বাজারে প্রকাশ্যে ঘোষনা করলো, ঐ মহান আল্লাহর শপথ! যিনি সকল নবীদের মধ্যে আমাদের নবী হযরত মুসা (আঃ) কে অধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন।

একজন সাহাবী এ কথা শুনে বললো, নবী করীম (সাঃ) এর চেয়েও কি অধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন?

ইয়াহুদী বললো, অবশ্যই বেশি মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এ কথা শুনে সাহাবী রাগে অধির হয়ে ইয়াহূদীর গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিল। ইয়াহূদী বেচারীর চোখ থেকে পানি বের হয়ে এলো। সে জানতো নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে এই নালিশ জানালে তিনি ন্যায় বিচার করবেন। ইয়াহূদী এসে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে ঘটনা জানালো। বিশ্বনবী (সাঃ) উক্ত সাহাবীকে শাসন করেছিলেন। (বুখারী)

একজন ইয়াহূদীর সন্তান অসুস্থ হয়েছে, তদানীন্তন পরাশক্তি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের অধিপতি এ সংবাদ পেয়ে সেই ইয়াহূদীর সন্তানকে দেখতে গেলেন। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তার অসুস্থ সন্তানকে দেখতে এসেছেন! ইয়াহূদী অবাক হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) সেই অসুস্থ সন্তানকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। সন্তান তার পিতার মুখের দিকে তাকালো। পিতা সন্তানকে ইশারা দিলেন, নবী যেদিকে তোমাকে ডাকছে তুমি সেদিকে যাও। ইয়াহূদীর অসুস্থ সন্তান ইসলাম গ্রহণ করলো। (বুখারী)

ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানগণ নবীর দরবারে এসেছে, তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে স্থান দিয়েছেন। তারা নিজের প্রথা অনুযায়ী সেই মাসজিদের ভেতরেই তাদের ধর্ম পালন করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বাধা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে বলেছেন, বাধা দিও না। (মুসলিম)

বিশ্বনবী (সাঃ) খিষ্টান ও ইয়াহূদীদেরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। মদীনার সিনাই পাহাড়ের কাছে (Saint Catharin) সেন্ট ক্যাথারিন নামক মঠের ধর্ম যাজকদেরকে লিখিত সনদ দান করেছিলেন। এই সনদে

তাদেরকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দান করে আদেশ জারি করেছিলেন, কোনো মুসলমান খৃষ্টানদের সাথে এই সনদের বিপরীত কোনো কাজ করলে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

বিশ্বনবী (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, তারা সাহায্য প্রার্থী হলে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ বা কোনো ধরনের লোভ লালসা দেখিয়ে ধর্ম ত্যাগ করানো যাবে না। তাদের কোনো ধর্ম নেতাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না। কোনো তীর্থযাত্রীকে বাধা প্রদান করা যাবে না। কোনো ধর্মনেতাকে তার মঠ থেকে বিতাড়ন করা যাবে না। কোনো গির্জা ধ্বংস করে সেখানে কোনো মুসলমান কিছু করতে পারবে না। তাদের ধর্ম তারা স্বাধীনভাবে পালন করবে।

নবী করীম (সাঃ) এর এই সনদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, It is a monument of enlightened tolerance. অর্থাৎ এই সনদ অসাধারণ পরধর্মসহিষ্ণুতার কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ।

অমুসলিম লেখকগণ বিশ্বনবী (সাঃ) এর প্রতি যে অভিযোগ করেছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে সদ্ব্যবহার করেছেন সত্য কথা। কিন্তু তিনি ঐ পর্যন্ত সদ্ব্যবহার করেছেন, যখন তিনি ছিলেন দুর্বল অসহায়, একেবারে ক্ষমতাহীন। যখনই তিনি ক্ষমতা হাতে পেলেন, তখন তাঁর আসল রূপ প্রকাশ পেল, শত্রুদের ওপরে তিনি নির্মমভাবে আঘাত করলেন। (নাউযুবিল্লাহ) এ সকল কথা সত্যের চরম অপলাপ বৈ আর কিছু নয়। হিংসা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে তারা এ ধরনের বহু কষ্ট কল্পনা করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) নিজের কাজ নিজেই করতেন

নবী করীম (সাঃ) তাঁর নিজের কাজ নিজেই করতেন। সেবকদের ওপর কোনো কাজ তিনি চাপিয়ে দিতেন না। নিজের কাজ নিজেই সমাধা করার বিষয়টি ছিল তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন, কখনো অলস বসে থাকেননি। নিজের হাতে নিজের জামা সেলাই করতেন। জামায় বোতাম লাগাতেন। বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনতেন। পানি উঠানো বালতিতে রশি লাগাতেন। তিনি নিজে উট বাঁধতেন।

অথচ তাঁর বাড়িতে গোলামের অভাব ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজ করে দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। কিন্তু তাঁর কাজ অন্য কেউ করবে, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। নিজের পশুর যত্ন নিতেন। পশুকে খেতে দিতেন। রুটি বানানোর জন্য আটা মাখিয়ে দিতেন। নবী (সাঃ) তাঁর উটের শরীরে নিজেই তেল মাখিয়ে দিতেন।

একদিন মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখলেন, কোনো এক ব্যক্তি নাক থেকে সর্দি ফেলে রেখেছে। তিনি এ কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন না, এ কাজ কে করেছে। কাউকে আদেশ দিলেন না, এটা পরিষ্কার করো। তিনি নিজেই পরিষ্কার করে বললেন, মসজিদে এসব নিক্ষেপ করা যাবে না।

মাসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি নিজে পাথর বহন করেছেন। মাটি খনন করেছেন। কোনো এক সফরের সময় রান্নার আয়োজন করা হলো। সবাই কাজে লেগে গেল। নবী করীম (সাঃ) কে কেউ কোনো দায়িত্ব দিল না। তিনি নিজেই দায়িত্ব উঠিয়ে নিলেন। বললেন, আমি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনবো।

সাহাবায়ে কেরাম বাধা দিলে তিনি বললেন, আমি এ ধরনের শ্রেণী বৈষম্য পছন্দ করি না।

একদিন ভ্রমণকালে তাঁর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। তিনি নিজের হাতেই তা মেরামত করতে থাকলেন। একজন সাহাবা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দিন, আমি মেরামত করে দিচ্ছি।

আল্লাহর নবী জবাব দিলেন, এটাও এক ধরনের শ্রেণী বৈষম্য যা আমি পছন্দ করি না।

তিনি শুধু নিজের কাজ যে নিজেই করতেন তা নয়, অন্যের কাজ পর্যন্ত করে দিতেন। মদীনার দাস-দাসীগণ নবীর কাছে এসে আপনজনের মত আবেদন করতো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অমুক কাজ পড়ে রয়েছে।

তিনি তাঁর সাথে গিয়ে তাঁর সে কাজ শেষ করে দিয়ে তবেই আসতেন। মদীনায় একজন পাগলী দাসী ছিল। সে একদিন নবী করীম (সাঃ) এর হাত ধরলো। তিনি তাঁকে বললেন, হে নারী! তুমি আমাকে যে রাস্তায় নিয়ে যেতে চাও আমি সেখানে গিয়েই তোমার কাজ করে দেব।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাথে এক রাস্তায় গেলেন এবং তাঁর কাজ শেষ করে তবে ফিরলেন। একদিন তিনি নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে তাঁর কাপড় ধরে টেনে বললো, আমার কিছু কাজ রয়েছে, এমন যেন না হয় যে আমি তা ভুলে যাই। আপনি প্রথমে আমার কাজ করে দিন।

নবী করীম (সাঃ) মাসজিদ থেকে বের হয়ে তাঁর সাথে গিয়ে কাজ শেষ করে এসে নামাজ আদায় করলেন। হযরত জুন্নাব (রাঃ) যুদ্ধে গমন করলেন। তিনি ব্যতীত তাঁর বাড়িতে অন্য কোনো সক্ষম পুরুষ ছিল না। নবী (সাঃ) প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে যেতেন এবং উটের দুধ দুইয়ে দিয়ে আসতেন। আবিসিনিয়া থেকে মেহমান এলে সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, তাঁরা এই মেহমানদের সেবা-যত্ন করবেন। তিনি বললেন, তাঁরা আমার বন্ধুদের খেদমত করেছে। এ কারণে আমি তাদের খেদমত করবো।

তায়েফ অবরোধের সময় তায়েফের সাকিফ গোত্রের লোকজন নবী করীম (সা:) এর পবিত্র কদম মুবারক আহত করেছিল। তাঁরা যখন তাঁর কাছে এলো তখন তিনি তাদেরকে মাসজিদে নববীতে অবস্থান করতে দিলেন এবং নিজে তাদের মেহমানদারী করলেন। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, যুরকানী, মুসনাদে ইবনে হাম্বল, ইবনে সায়াদ, আবু দাউদ, দারেমী)

সেবকদের প্রতি নবী করীম (সা:) এর আচরণ

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। নবীর সামান্য কোনো কাজ, কে কার আগে করবে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো। তবুও তিনজন ব্যক্তি এমন ছিলেন যে, তাঁরা রাসূল (সা:) এর একান্ত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে হযরত বিলাল (রা:) নবী পরিবারের দায়িত্ব পালন করতেন।

আরো যে দু'জন নবীর একান্ত কাজ করতেন, তাঁরা হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:)। স্বয়ং নবী (সা:) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) সম্পর্কে বলেছেন, কেউ যদি কুরআন যেমনভাবে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনভাবে পাঠ করতে চায় তাহলে সে যেন তাঁকে অনুসরণ করে।

মক্কার জীবনে কিশোর বয়সে তিনি সারা দিন পাহাড়ে ছাগল চরাতেন। নবী করীম (সা:) হযরত আবু বকর (রা:) কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার সময় সেই কিশোরের কাছে গিয়ে বললেন, এই ছাগল থেকে আমাদের কিছু দুধ দুইয়ে দাও, আমরা পিপার্সিত। দুধ পান করে পিপাসা নিবারণ করি।

বালক জবাব দিল, এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, আমি ছাগলগুলোর মালিক নই। আমি এদের রাখাল। অপরের সম্পদ আমি কি করে দিতে পারি?

বালক আল্লাহর নবীকে চিনতো না। নবী (সা:) বালকের সততা দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি এমন একটি ছাগল দেখিয়ে দাও, যে ছাগল এখন পর্যন্ত কোনো বাচ্চা দেয়নি বা পাঁঠার সংস্পর্শে আসেনি।

বালক একটি ছোট্ট ছাগল দেখিয়ে দিল। নবী করীম (সা:) সে ছাগলের ওলানে আল্লাহর নাম নিয়ে পবিত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দুধ দুইয়ে তিনি এবং আবু বকর (রা:) পান করলেন এবং বালককেও পান করতে দিলেন। বালক এমন অবাক কান্ড জীবনে কখনো দেখেনি। অবাক হয়ে সে এই দৃশ্য দেখলো। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই সে নবীর পরিচয় লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি নিজেকে নবী (সা:) এর খাদেম হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন। যে বালক ছিল ছাগলের রাখাল, সে হয়ে গেল সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বিশ্বনবী (সা:) এর একান্ত খাদেম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেই কিশোর বয়স থেকেই নবী করীম (সাঃ) এর কাছে অবস্থান করতেন। আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাঁর অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। নবী পরিবারের অনেক বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবুস্সির' বা নবীর গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হতো। নবী করীম (সাঃ) কোনো স্থানে গমন করলে তিনি রাসূলের ঘুমানোর, অজুর ব্যবস্থা করতেন এবং রাসূলের মিসওয়াক রাখতেন।

রাসূল (সাঃ) পথ চলতে থাকলে তিনি লাঠি হাতে আগে আগে যেতেন। নবীর পায়ে জুতা পরিয়ে দিতেন এবং রাসূল (সাঃ) জুতা খুলে রাখলে তা উঠিয়ে নিজের বোগলে রাখতেন। রাসূল (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেই আবার সে জুতা পরিয়ে দিতেন। তিনি নবীর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর সমগ্র চরিত্র রাসূলের অনুকরণে গড়ে উঠেছিল। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ছিলেন তাঁর মহান শিক্ষক। তাঁর মতো জ্ঞানী এবং কুরআন বুঝার অধিকারী সাহাবী খুব কমই ছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) যখন আল্লাহর নবীর কাছে এলেন তখন তিনি ছিলেন একেবারে শিশু। তাঁর মা তাঁকে নবীর খেদমতে উৎসর্গ করে গেলেন। সেই শিশু বয়স থেকে তিনি দীর্ঘ দশ বছর নবীর কাছে কাটিয়ে দিলেন। আল্লাহর নবীর বহু কাজ তিনি করতেন। বিভিন্ন লোকজনকে ডেকে আনা বা সংবাদ দেয়া, অজুর পানি ভরে রাখা ইত্যাদি কাজ তিনি করতেন। তিনিও নবী পরিবারের একজন হয়েছিলেন।

শিশু বয়সে কতভাবে তিনি নবী করীম (সাঃ) কে বিরক্ত করতেন। কিন্তু আল্লাহর হাবিব কখনো তাঁর সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা বলেননি বা তাঁকে এ প্রশ্ন করেননি, কেনো তুমি এই কাজ করলে? নবীর চেহারা মুবারকে তাঁরা হাসি ব্যতীত আর কিছুই দেখেননি। কখনো কৌতুক করে তিনি হযরত আনাস (রাঃ) কে 'হে দুই কানওয়ালা' বলে ডাকতেন। কারণ হযরত আনাস (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের এতই ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর কান সব সময় সজাগ থাকতো, কখন কোন্ কাজের জন্য আল্লাহর রাসূল তাঁকে আহ্বান করেন।

একদিন কিশোর বালক হযরত আনাস (রাঃ) কে বিশ্বনবী (সাঃ) কোথাও যাবার জন্য বললেন। তিনি কিশোরসুলভ চপলতার প্রকাশ ঘটিয়ে বলেছিলেন, আমি যেতে পারবো না।

নবী করীম (সাঃ) তাঁকে কিছু না বলে নীরব রইলেন। হযরত আনাস (রাঃ) ঘরের বাইরে চলে যেতে উদ্যত হলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) পেছন থেকে তাঁর ঘাড়ে হাত দিলেন। তিনি রাসূলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে মুখে রাগের প্রকাশ নেই। পূর্ণিমার চাঁদের হাসি পবিত্র মুখে তরঙ্গ তুলেছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি যে কাজের কথা বলেছিলাম, এখন সে কাজে যাবে তো!

হযরত আনাস বলেছেন, আমি দীর্ঘ সাত বছরযাবৎ আল্লাহর রাসূলের খেদমতে অবস্থান করেছি। তিনি কখনো সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করে বলেননি, কেনো তুমি এই কাজ করলে? (মুসলিম, আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) কে দেয়া হয়েছিলো ঝিনুকের মাঝে মহাসমুদ্র

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্যে যাঁকে মুক্তির দুত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁকে অকল্পনীয় দৃষ্টিনন্দন শ্রুতিমধুর অলঙ্কারে সুসজ্জিত করেই সমগ্র সৃষ্টির সম্মুখে প্রেরণ করেছিলেন। ভাষাগত ক্ষেত্রে তাঁকে এমন অতুলনীয় অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়েছিলো যে, তিনি ব্যাপক অর্থবোধক ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়াদি অতি অল্প কথায় সহজে বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এই অতুলনীয় যোগ্যতা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে দেয়াও হবে না। পৃথিবীতে ভাষা ও বৈয়াকরণগণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বহু বিষয়াদি স্বল্প কথায় প্রকাশযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক্য তৈরী করেছেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) স্বল্প ভাষায় ক্ষুদ্র বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক যে সকল বাক্য মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তা অতুলনীয় এবং অলঙ্কার মণ্ডিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদের পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা করেও এমন একটি বাক্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ যোগ্যতা দান করেছিলেন আরবী ভাষায় যাকে বলা হয়, 'জাওয়া মিউল কালিম'। এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) বলেছেন, (আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে) আমাকে 'জাওয়া মিউল কালিম' দান করা হয়েছে। (মুসলিম)

ক্ষুদ্রতম শব্দে, স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক অথচ সহজে বোধগম্য বাক্যকে 'জাওয়া মিউল কালিম' বলা হয়। হাদীসের কিতাবসমূহে অনুসন্ধান করলে এমন অসংখ্য অগণিত ক্ষুদ্রতম বাক্য পাওয়া যাবে যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সহজে বোধগম্য। অর্থাৎ ভাষাগত ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের লক্ষ্যে কুল-কিনারাহীন অগাধ জলধী সমুদ্র মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্রতম একটি ঝিনুকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে নবী করীম (সাঃ) কে দান করা হয়েছিলো। আমরা হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদাপূর্ণ বাক্য এখানে তুলে ধরছি। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ–

'যে অবস্থায়ই থাকো আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো'।

নবী করীম (সাঃ) সমগ্র মানব মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলছেন, যেখানে যে অবস্থায়ই অবস্থান করো না কেনো, সর্বাবস্থায় ঐ সত্তাকে ভয় করো যিনি তোমার অবস্থা দেখছেন এবং তোমার ভেতর বাইরের সকল বিষয়ে অবগত রয়েছেন। এমনকি তোমার মনের গহীনে যে কল্পনার উদ্রেক হচ্ছে আবার তা পানির বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে, সে

সম্পর্কেও তিনি পূর্ণমাত্রায় অবগত আছেন। পরিবার পরিজন পরিবেষ্টিত থাকো, একাকী থাকো, বিপুল জনসমাবেশে থাকো, নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের কোনো নিভৃত গুহায় অবস্থান করো, মহাশূন্যের কোনো গ্রহে থাকো অথবা মহাসাগরের অতল তলদেশের কোনো পর্বতের গুহায় শৈবালদাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় একাকী থাকো, সর্বাবস্থায় মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করো। তিনি তোমার সকল কিছুই দেখছেন। এ কারণেই হযরত আলী (রা:) বলেছেন, 'তুমি যখন একাকী থাকবে তখন আল্লাহকে সবথেকে বেশি ভয় করবে। কারণ তুমি একাকী অবস্থায় যে কাজ করবে তার সাক্ষীও আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং বিচারকও মহান আল্লাহ'। নবী করীম (সা:) বলেছেন–

مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ–

'যে অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহ পায় না'।

অনুগ্রহ বা করুণা প্রদর্শন শুধুমাত্র অন্যের প্রতি নয়, নিজের প্রতিও অনুগ্রহ করার বিষয়টি উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে শামিল রয়েছে। নিজের প্রতি অনুগ্রহ করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করে নিজেকে ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ না করা এবং স্বাস্থ্য সচেতন থেকে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা। উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলসহ অন্য সকল মানুষের ক্ষেত্রে অনুগ্রহের বাহু বিছিয়ে দেয়া। সুতরাং যে মানুষ অনুগ্রহ করে সে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের দৃষ্টি লাভে ধন্য হয়। নবী করীম (সা:) বলেছেন–

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ–

'উত্তম কথা বলাও সৎকর্ম সম্পাদনের অন্তর্গত'।

كُلُّ ذِىْ نِعْمَةٍ مَّحْسُوْدٌ–

'প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়'।

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ–

'জনগণের যে সেবা করে সেই তাদের নেতা'।

أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ–

'মানুষ যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের ময়দানে সে তার সাথেই অবস্থান করবে'।

أَسْلِمْ تَسْلَمْ–

'মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে'।

নবী করীম (সা:) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা, বাদশাহ্, সম্রাট তথা শাসকবৃন্দের কাছে পবিত্র কুরআনের আহ্বান পৌঁছানোর লক্ষ্যে দুতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে তিনি যে পত্র

প্রেরণ করেছিলেন, সেই পত্রে তিনি লিখিয়েছিলেন, 'মুসলিম হও তাহলে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে'।

মুসলিম আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে যারা তা অনুসরণ করে মাছ যেমন প্রশান্তিতে পানিতে বাস করে তেমনি তারাও শান্তিতে জীবন যাপন করে। এ জন্যই রোম সম্রাটের কাছে নবী করীম (সাঃ) যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন উক্ত পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, মুসলিম হও (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করো) শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবে।

لَيْسَ لِلْعَمَلِ مِنْ عَمَلِه إلاَّ مَانَوَا-

'যে কাজ করে সে কেবল (নিজ কাজের) উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফলাফল লাভ করে'।

انَّمَا الأَعْمَالُم بِالنِّيَّات-

'নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফল পাবে'।

اَلْحَرْبُ خدْعَةٌ-

'যুদ্ধ একটি কৌশল'।

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَة-

'দেখা ও শোনা সমপর্যায়ের বিষয় নয়'।

اَلْمَجَالِسُ بِالأَمَنَة-

'একান্ত বিশ্বস্ততা বৈঠকের পূর্ব শর্ত'।

تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ-

'অসৎ কর্ম বর্জন করাও একটি সৎকর্ম'।

ব্যাপক অর্থবোধক ও সহজে বোধগম্য এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা করতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। সংক্ষিপ্ত বাক্য সম্বলিত এসব হাদীস মানব জীবনকে সুন্দর সপ্নীল করার জন্যে যথেষ্ট, যদি বর্ণিত এসব হাদীসের আদেশ উপদেশ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা হয়।

নবী করীম (সা:) এর ভাষণের নমুনা

নবী করীম (সা:) জনগণের উদ্দেশ্যে পথনির্দেশনামূলক ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণ কখনোই এতটা দীর্ঘ হয়নি যে, শ্রোতাবৃন্দের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করবে অথবা এমন সংক্ষিপ্তও হয়নি যে, শ্রোতাবৃন্দ সঠিক বিষয়টি বুঝতে অক্ষম হবে। তাঁর পবিত্র মুখ নি:সৃত বাণীসমূহের প্রতিটি শব্দই ছিলো দুস্প্রাপ্য মণি-মুক্তা সদৃশ। প্রত্যেকটি শব্দই ছিলো ব্যাপক অর্থবোধক অথচ সহজে বোধগম্য। ভাষণে তিনি কখনোই অনর্থক একটি শব্দও ব্যবহার করেননি। ভাষণ দানকালে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী শব্দসমূহ চয়ন করতেন যা শ্রোতাবৃন্দের হৃদয়স্পর্শ করতো। শ্রোতাবৃন্দের বুঝার সুবিধার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যসমূহ তিনবার উচ্চারণ করতেন। নবুয়্যাতি জীবনে তিনি যতবার ভাষণ দিয়েছেন, তা হাদীসের কিতাব ও ইতিহাসের পাতায় স্বার্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর ভাষণসমূহ থেকে কিছু বাক্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

فَإِنَّ اصَدَقَ الْحَدِيْث كِتَابُ اللّٰه-

'কথার মধ্যে সর্বোত্তম সত্য কথা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কুরআন'।

وَ اَوْ شَقَ الْعُرى كَلِمَةُ التَّقْوى-

'সর্বোত্তম নির্ভরতার বিষয় হচ্ছে তাকওয়ার বিষয় অর্থাৎ আল্লাহভীতি'।

وَ خَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّة إِبْرَاهِيْمَ-

'সকল মিল্লাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হলো মিল্লাতে ইবরাহীম'।

وَ خَيْرُ السُّنَنِ سُنَّة مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-

'সকল পন্থার মধ্যে সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মাদ (সা:) এর পন্থা'।

وَ اَشْرَفُ الْحَدِيْث ذِكْرِ اللّٰه-

'সকল কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হলো মহান আল্লাহর স্মরণমূলক কথা'।

وَ اَحْسَنُ الْقَصَصِ هٰذَا الْقُرْآن-

'সকল বর্ণনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর বর্ণনা হলো এই কুরআনুল কারীম'।

وَ خَيْرُ الأُمُوْرِ عَوَازِمُهَا-

'সুচিন্তিত ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কর্ম'।

وَ شَرُّ الأَمْرِ مُحَدِّثَا تُهَا-

'বিদয়াত ও বানোয়াট কথাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ'।

وَ اَحْسَنُ الْهُدى هُدى الأَنْبِيَاء-

'আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক প্রদর্শিত পথই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্রান্ত পথ'।

وَ اَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ-

'দ্বীনের পথে শহীদদের মৃত্যুই সর্বাধিক মর্যাদাকর মৃত্যু'।

وَ اَعْمى الْعَمى الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الْهُدى–

'সবথেকে বড় অন্ধত্ব হলো সেই পথভ্রষ্টতা যা সত্য সঠিক পথ দেখার পরও মানুষ গ্রহণ করে না'।

وَ خَيْرُ الأَعْمَال مَا نُفعَ–

'সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম সেটাই যার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় বা মানুষ উপকৃত হয়'।

وَ خَيْرُ الْهُدى مَا تُبِعَ–

'সত্য সঠিক পথ সেটাই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মানুষ যে পথের অনুসরণ করতে পারে'।

وَ شَرِّ الْعَمى عَمى الْقَلْب–

'সর্বাধিক নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব হচ্ছে হৃদয়ের অন্ধত্ব'।

وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَد السُّفْلى–

'উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাতের (গ্রহীতার হাত) তুলনায় উত্তম'।

وَ مَاقلَّ و كَفى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَالْهى–

'স্বল্পতম সম্পদ যা প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট তা ঐ বিশাল সম্পদের তুলনায় উত্তম, যা মানুষকে (আল্লাহর দাসত্ব থেকে) অমনোযোগী করে দেয়'।

وَ شَرِّ الْمُعْذَّرَةِ حِيْنُ يَحْضَرُ الْمَوْتَ–

'সর্বাধিক নিকৃষ্টতম তাওবা বা ওজর আপত্তি হচ্ছে তাই যা মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে করা হয়'।

وَ شَرِّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'কিয়ামতের ময়দানে যে লজ্জা অনুভূত হবে এবং যে অনুশোচনা জাগবে সেটাই হলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট লজ্জা ও অনুশোচনা'।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ لاَّيَأتِيْ الْجُمُعَةَ الأَدْبَرًا–

'কোনো কোনো মানুষ জুমুআর নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আসে কিন্তু তাদের হৃদয় মন (নামাজে স্থির থাকে না) পড়ে থাকে পেছনে'।

وَ مِنْ لاَّ يَذْكُرُ اللّهَ إِلاَّ هَجْرًا–

'কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে যারা (নিজ স্রষ্টা) মহান আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে'।

وَ مِنْ اَعْظَمِ الْخَطَايَا اَللِّسَانُ الْكَذَّبِ–

‘পাপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ হলো মিথ্যা বলা’।

خَيْرُ الْغَنِىْ غَنِى النَّفْسِ–

‘আত্মার প্রাচুর্যতাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচুর্যতা’।

وَ خَيْرُ الزَّاد التَّقْوى–

‘মানুষের জন্যে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি’।

وَ رَأسُ الْحكْمَة مُخَافَةُ اللّه عَزَّ وَّ جَلَّ–

‘জ্ঞানীদের মাথার শ্রেষ্ঠ মুকুট হচ্ছে আল্লাহভীতি’।

وَ خَيْرُ مَا وَقرفى الْقُلُوْب الْيَقيْنَ–

‘মনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে বিশ্বাস’।

وَ الإرْتيَابُ منَ الْكُفْرِ–

‘সন্দেহ সংশয় হচ্ছে কুফুরীর শাখা’।

وَ النِّيَاحَةُ منْ عَمَلِ الْجَهليَّة–

‘মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা জাহেলী যুগের অনুকরণ’।

وَ الْخُلُوْلُ منْ حَرِّ جَهَنَّم–

‘খিয়ানত করা জাহান্নামের আগুন বিশেষ’।

اَلسُّكَرُ كَيْرٌ مِّنَ النَّارِ–

‘নেশা করা আগুনের দাগ (লাগানোর শামিল)’।

وَ الشَّعر منْ إبْلِيْسِ–

‘অশ্লীল অশালীন কাব্য চর্চা করা শয়তানের কর্ম’।

اَلْخَمْرُ جمَاعَ الإثْمِ–

‘মদ সকল গোনাহের উৎস’।

وَ شَرُّ الْمأكُلِ مَالُ الْيَتيْمِ–

‘জঘন্যতম খাদ্য হচ্ছে ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা’।

وَ السَّعيْدُ مَنْ وُعظَ بغَيْره–

‘সৌভাগ্যবান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে’।

وَ الشَّقىْ مَنْ فى بَطْنِ اُمِّه–

‘প্রকৃত হতভাগ্য সে, যে তার মাতৃগর্ভেই দুর্ভাগা থাকে’।

وَ مَلاَكُ الْعَمَلِ خوَاتمه–

'মানুষের কর্মের পুঁজি হচ্ছে তার উত্তম পরিণতি'।

وَ شَرُّ الرُّؤْيَا رُؤْيَا الْكَذِبِ-

'নিকৃষ্ট স্বপ্ন হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন'।

وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ-

'যে ঘটনা ঘটবে তা অতি নিকটবর্তী'।

وَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُه كُفْرٌ-

'মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফুরী'।

وَ اَكْلُ لَحْمَةٍ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰه-

'মুমিনের গোস্ত খাওয়া (অর্থাৎ তার গীবত করা) নিকৃষ্ট গোনাহের মধ্যে অন্যতম'।

وَ حُرِّمَتْ مَالُه كَحُرْمَةِ دَمِّه-

'মুমিনের সম্পদ অন্যের জন্য ঠিক সেই রকম হারাম যেমন হারাম তার রক্ত'।

مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ-

'যে দয়া করে না তাকেও দয়া করা হয় না'।

وَ مَنْ يَّغْفِرُ يُغْفَرُ لَه-

'যে কাউকে ক্ষমা করে তাকেও ক্ষমা করা হয়'।

وَ مَنْ يَّعْفُ يَعْفَ اللّٰهُ عَنْه-

'যে অন্যকে ক্ষমা করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করেন'।

وَ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَأجِرُهُ اللّٰهُ-

'যে রাগ সংবরণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পুরস্কৃত করেন'।

وَ مَنْ يَّصْبِرُ عَلَى الرَّزِيَةِ يَعُوْضُهُ اللّٰهُ-

'যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরও ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন'।

وَ مَنْ يَّتَّبِعُ السَّمَعَةَ يَسْمَعُ اللّٰه-

'যে অন্যের দোষত্রুটি ছড়িয়ে বেড়ায় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অপমানিত করেন'।

وَ مَنْ يَّصْبِرُ يُضْعَفُ اللّٰهُ لَه-

'যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অনেকগুণ বেশি দান করেন'।

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ يُعَذِّبُهُ اللّٰهُ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হয় তিনি তাকে শাস্তি দেন'।

(সূত্রঃ যাদুল মায়া'দ, ২য় খণ্ড- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম)

নবী করীম (সা:) এর অতুলনীয় আচরণ

এ বিষয়টি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, সমগ্র মানব জাতি যাঁকে একমাত্র আদর্শ ও একমাত্র অনুকরণীয় নেতা হিসাবে মেনে নিলে জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে, তিনি নবী করীম (সা:)। কারণ তিনি সকল দিক থেকে এতোই মহান যে, এই মহানত্বের কোনো সীমারেখা নেই এবং তলদেশও নেই। আর তলদেশ থাকলেও তা পরিমাপ করার মতো কোনো উপকরণ মানুষের হাতে নেই। তাঁর চরিত্র কেমন ছিলো, এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম হযরত আয়িশা (রা:) এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে হযরত আয়িশা (রা:) বলেছিলেন, 'তোমরা কি কুরআন তিলাওয়াত করো না, কুরআনই তাঁর চরিত্র'।

অর্থাৎ তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন বা কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পবিত্র কুরআন যে মহান আদর্শ পেশ করেছে সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা ছিলেন নবী করীম (সা:)। তাঁর নবুয়্যাতের ২৩ বছরের জীবনই ৩০ পারা কুরআন। পৃথিবীর সকল শ্রেণী ও বয়সের মানুষই তাঁর পবিত্র জীবনধারায় নিজের অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ দেখতে পাবে। তাঁর আদর্শ যুগ বা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, তাঁর আদর্শ কালোত্তীর্ণ, কালজয়ী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম আদর্শের বাস্তব নমুনা। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান চরিত্র সম্পর্কে এভাবে সনদ দিয়েছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ–

নি:সন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন)। (সূরা কালাম-৪)

আরবী ভাষায় প্রশস্ততাকে বুঝানোর জন্য عريض শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং গভীরতাকে বুঝানোর জন্য عميق শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দু'টো শব্দ যে গভীরতা ও প্রশস্ততা পরিমাপ করা যায় সে গভীরতা ও প্রশস্ততার ক্ষেত্রে শব্দ দু'টো ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু যে প্রশস্ততা পরিমাপ করা যায় না বা যে গভীরতার কোনো সীমারেখা নেই, যা পরিমাপ করা যায় না বা যে গভীরতার তলদেশ স্পর্শ করাও যায় না, ক্ষেত্র বিশেষে সেই গভীরতা বা প্রশস্ততাকে বুঝানোর জন্য আরবী عظيم শব্দ ব্যবহার হয়। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা:) এর মহান চরিত্র সম্পর্কে যে সনদ দান করেছেন সেই সনদের মধ্যে عظيم শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সমগ্র মানব জাতি কল্পনাও করতে পারবে না মহান আল্লাহ তা'য়ালা মর্যাদার কোন্ উচ্চস্তরে নবী করীম (সা:) কে উপনীত করেছেন। তাঁর চরিত্রের মহানত্ব এতই গভীর যে, যার তলদেশ কখনো স্পর্শ করা যাবে না এবং পরিমাপও করা যাবে না।

নবী করীম (সা:) এর চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্বের অনুপম আকষর্ণ এতই মধুর, চিত্তাকর্ষক ও প্রশান্তিদায়ক ছিলো যে, কোনো মানুষ যখন তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করতো, তখন সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে নবী করীম (সা:) এর দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকতো। অগণিত মানুষ সমবেত হয়ে তাঁর পবিত্র মুখের কথা শুনতো। এমন তন্ময় হয়ে কথা শুনতো যে, তাদের দেহের স্বাভাবিক স্পন্দনও অনুভব করা যেতো না। জড়পদার্থের ন্যায় অনড় অবিচল হয়ে সমবেত লোকজন বসে থাকতো। মাথার ওপর কোনো পাখী এসে বসলেও তাঁরা অনুভব করতো পারতো না। নবী করীম (সা:) এর মমতা ও প্রেমময় ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া যে, আপনি এদের সাথে ছিলেন কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীতে) যদি আপনি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের (মানুষ) হতেন, তাহলে এসব লোক আপনার আশপাশ থেকে সরে যেতো, অতএব আপনি এদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিন, এদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজকর্মের ব্যাপাওে এদের সাথে পরামর্শ করুন, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সঙ্কল্প একবার যখন নিয়ে নিবেন তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহর ওপর ভরসা করুন; অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরাণ- ১৫৯)

মানুষের সামান্যতম অসুবিধা দেখলে যাঁর নয়ন দু'টো অশ্রুসজল হয়ে উঠতো, যিনি ক্ষুদ্র প্রাণীর কষ্টও বরদাস্ত করতে পারতেন না, সেই করুণার সিন্ধু সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

(হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রাসূল এসেছেন, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তাঁর কাছে দু:সহ, তিনি তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি হচ্ছেন স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা-১২৮)

নবী করীম (সা:) স্বয়ং নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِنَّمَا بُعِثْتُ لاتمم مكارم الأَخْلاَقُ-

নবী করীম (সা:) বলেন, অনুপম চরিত্রকে তার পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়ার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, একদিন নবী করীম (সা:) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। এক অমুসলিম গ্রাম্য লোক, যারা বেদুঈন নামে পরিচিত। লোকটি এ দৃশ্য দেখে বিস্ময় অনুভব করলো, একজন মানুষ কথা বলছে আর এতগুলো মানুষ পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে তাঁর কথা শুনছে, এমন অবাক করা দৃশ্য তো জীবনে কখনো দেখিনি!

এ কথা চিন্তা করে লোকটি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো নবী করীম (সা:) কি বলছেন তা শোনার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার রাসূলের পবিত্র কণ্ঠ নি:সৃত অমীয় বাণী শুনে নীরব নিথর হয়ে গেলো। পর্বতের মতো স্থির হয়ে সে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মুবারকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনতে থাকলো। অনেকক্ষণ পর লোকটি অনুভব করলো তাকে মুত্র ত্যাগ করতে হবে। পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সে সকলের সম্মুখেই মসজিদের ভেতরে দেয়ালের দিকে ফিরে মুত্র ত্যাগ শুরু করলো।

সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখে লোকটিকে প্রহার করতে উদ্যত হতেই নবী করীম (সা:) সাহাবায়ে কেরামকে থামিয়ে দিয়ে নিজে এগিয়ে গেলেন। মুত্র ত্যাগ শেষ হলে রাসূল (সা:) মধুর সম্ভাষণে লোকটিকে বললেন, 'দেখো, এটি মসজিদ। এখানে আমরা মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজদা দেই, এ কারণে এটি পবিত্র স্থান। ভবিষ্যতে তুমি এ ধরনের পবিত্র স্থানে ঐ কাজটি করো না যা তুমি এই মাত্র এখানে করলে। এবার তুমি যেতে পারো'।

লোকটি দেখেছিলো উপস্থিত লোকজন তাঁর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়েছিলো শুধু মাত্র নবী করীম (সা:) ব্যতীত। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সা:) এর অনুপম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকটির মুখ থেকে নির্গত হলো–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى وَ مُحَمَّدًا وَّ لاَ تَرْحَمْ مَّعَنَا اَحَدًا-

হে আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদ (সা:) এর প্রতি রহম করো, আর আমাদের দু'জনের বাইরে এদের কাউকে রহম করো না। কারণ এরা আমাকে প্রহারে উদ্যত হয়েছিলো'।

লোকটির দোয়ায় কার্পণ্যতা দেখে নবী করীম (সা:) এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর দন্ত মুবারকের উজ্জ্বলতা বিকশিত হয়েছিলো। লোকটি বিদায় নেয়ার পর তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন–

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ–

সহজ করো, কঠিন করো না। তোমাদের পাঠানোই হয়েছে সহজ করার জন্য। যাও, এখন ঐ মুত্র ত্যাগের স্থানে পানি ঢেলে দাও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) কর্কশ স্বভাব বা সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না। তাঁর পবিত্র জবান থেকে কখনো অশোভনীয় কথা বেরোতো না। কারও দোষ তিনি কখনো খুঁজেন নি। তিনি তর্কে বিতর্কে জড়াতেন না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না যদি তা শরীয়ত সম্মত হতো। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো ওপরে কক্ষণো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি এবং শাস্তিও দেননি। তাঁর সাথে কেউ অশোভন আচরণ করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় বিনয়ী এবং দয়ার্দ্র প্রকৃতির। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতো তখন তিনি নির্ঘুম থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নামাজ আদায় করতেন। নামাজে দাঁড়িয়ে ও সিজদায় তিনি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত করতেন। নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পবিত্র কদম মুবারক ফুলে যেতো।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে একদিন জানতে চাইলাম, 'আপনি কেনো এত কষ্ট স্বীকার করেন, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার পূর্বাপর, অগ্র-পশ্চাৎ সকল কিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন'।

নবী করীম (সাঃ) স্মিত হেসে আমাকে বলেছেন, আমি কি মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাহ্ হবো না! (বুখারী, মুসলিম)

তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারক ছিলো সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং কথা ও কাজে ছিলো অপূর্ব সমন্বয়। এক কথায় সর্বোন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের সকল গুণাবলীর সমাবেশ ছিলো নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যে। ইতোপূর্বেও পৃথিবীতে তাঁর কোনো তুলনা ছিলো না এবং কিয়ামত পর্যন্তও তাঁর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন মানুষের আবির্ভাব এ পৃথিবীতে ঘটবে না। কোনো একদিন হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর কাছে তাঁর রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে জবাবে তিনি বললেন–

اَلْمَعْرِفَةُ رَأْسِ مَلِيَ– অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় লাভ আমার পূঁজি'।

اَلْعَقْلُ اُصُلُ دِيْنِى– অর্থাৎ 'পরিশুদ্ধ জ্ঞান আমার দ্বীনের ভিত্তি'।

اَلْحُبُّ أَسَاسِى– অর্থাৎ 'ভালোবাসা আমার মূলনীতি'।

اَلشَّوْقُ مَرْكَبِى– অর্থাৎ 'আগ্রহ আমার বাহন'।

أَلذِّكْرُ اَنِيْسِى– অর্থাৎ 'মহান আল্লাহর স্মরণ আমার সঙ্গী'।

اَلشَّقَةُ كَنْزِى– অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'য়ালার ওপর নির্ভরতা আমার ভান্ডার'।

اَلْحُزْنُ رَفِيْقِى– অর্থাৎ '(স্বজাতীর মুক্তির জন্য) হৃদয়ে কষ্টবোধ আমার সাথী'।

اَلْعِلْمُ سَلاَحِى– অর্থাৎ 'জ্ঞান আমার হাতিয়ার'।

اَلصَّبْرُ رِدَائِى– অর্থাৎ 'ধৈর্য আমার ভূষণ'।

اَلرِّضَا غَنِيْمَتِى– অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি আমার জন্য গণীমাত'।

اَلْعِجْزُ فَخْرِى– অর্থাৎ 'বিনম্রতা আমার গৌরব'।

اَلزُّهْدُ حُرْفَتِى– অর্থাৎ 'পার্থিব বস্তু নিচয়ের প্রতি অনাগ্রহ আমার পেশা'।

اَلْيَقِيْنُ قُوَّتِى– অর্থাৎ 'বিশ্বাস আমার শক্তি'।

اَلصِّدْقُ شَفِيْعِى– অর্থাৎ 'ন্যায়-পরায়ণতা আমার সহচর'।

وَالطَّاعَةُ حَسْبِى– অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের মধ্যেই আমার মর্যাদা'।

وَالْجِهَادُ خُلُقِى– অর্থাৎ 'সত্যের পথে সংগ্রাম আমার প্রকৃতি'।

وَ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلٰوةِ– অর্থাৎ 'নামাজের মধ্যেই রয়েছে আমার দৃষ্টির প্রশান্তি'।

নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত একজন মানুষের মধ্যেও সর্বোত্তম চরিত্রের সকল গুণাবলীর সমাবেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের সকল গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে ছোট্ট শিশু পর্যন্ত কেউই কখনো নবী করীম (সাঃ) কে প্রথমে সালাম জানানোর সুযোগ পায়নি। যে কোনো বয়সের মানুষকে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। শিশুদের সালাম জানিয়ে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে গভীর মমতায় আদোর জানাতেন। এ কারণে মুসলিম ও অমুসলিম শিশুরাও নবী করীম (সাঃ) এর পাশে ভীড় জমাতো। নবী করীম (সাঃ) শিশুদের আদোর জানিয়ে চুমু দিচ্ছেন দেখতে পেয়ে একজন সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আপনার নাতীসহ সকল শিশুদের আদোর করে চুমু দেন। আমার বেশ কয়েকটি বাচ্চা, আমি তাদের একজনকেও চুমু দিই না'।

নবী করীম (সাঃ) শিশুকে আদোর করতে করতে বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়ামায়া তুলে নেন তাহলে আমি কি করতে পারি!'

নবী করীম (সাঃ) কিশোর, তরুণ ও যুবকদের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রতি গভীর মমতা পোষণ করতেন। কারণ এই কিশোর, তরুণ ও যুবকরাই আল্লাহর যমীনে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অবতীর্ণ করা জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভোগ বিলাসের জীবনে লাথি মেরে তাঁরা সীমাহীন কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে এবং দলে দলে শাহাদাত বরণ

করেছে। নবী করীম (সাঃ) বক্তব্য রাখছেন, অগণিত মানুষের সমাবেশে বসার কোনো স্থান নেই। রাসূল (সাঃ) দেখলেন তরুণ সাহাবী হযরত জারীর (রাঃ) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছেন।

তাঁর দিকে গভীর মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল (সাঃ) নিজের চাদর মুবারক উঠিয়ে তরুণ সাহাবী হযরত জারীর (রাঃ) এর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'জারীর, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো! এই নাও, আমার চাদরের ওপর বসো'।

হযরত জারীর (রাঃ) দ্রুত হাত বাড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর চাদর মুবারক দু'হাতে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বার বার চাদরে চুমু দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি কি পারি আপনার চাদরের ওপর বসতে! আপনার মর্যাদা কত বিশাল!'

নবী করীম (সাঃ) কিশোর, তরুণ ও যুবকদের কথা উল্লেখ করে লোকদেরকে বলেছেন–

أُصِيْكُمْ بِالشَّبَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ عَرَقٌ أَفْئِدَةً لَقَدْ بَعْثَنِى اللّٰهُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ سَمْحًا مَحَالَفَنَ أَلشَّبَابِ وَ خَالَفَنَ الشُّيُوْخُ–

'আমি তোমাদের তরুণদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হবার জন্য নসীহত করছি। তাদের হৃদয় কোমল, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আল্লাহমুখীতা ও উদারতা সহকারে প্রেরণ করেছেন। এ কাজে তরুণরা আমাকে সহযোগিতা করেছে আর বৃদ্ধরা করেছে বিরোধিতা'।

ইতিহাস কথা বলে, নবী করীম (সাঃ) নবুয়্যাত লাভ করার পরে যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করলেন তখন চরম প্রতিকুল পরিবেশে সকল প্রকার ভোগ বিলাসের মাথায় পদাঘাত করে কিশোর, তরুণ ও যুবকরাই প্রথমে সাড়া দিয়ে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। এ সময় সকলের বয়স ছিলো ৪০ বছরের নীচে এবং ৮ বছর, ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সের কিশোর তরুণদের ভীড় জমেছিলো নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র সান্নিধ্যে। আর যারা বিরোধিতা করেছিলো তাদের প্রায় সকলের বয়স ছিলো ৪০ এর উর্ধ্বে।

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদার সীমা অতিক্রম না করা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। মানুষের মধ্যে সকল নবী-রাসূলকে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং সকল নবী-রাসূলের মধ্যে নবী করীম (সাঃ) কে সবথেকে বেশি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এ বিষয়ে আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করেছি। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা এ কথাও আলোচনা করেছি যে, নবী করীম (সাঃ) কে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং সৃষ্টি কোনোক্রমেই স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে না। স্বয়ং স্রষ্টার যে মর্যাদা ও আসন, সে মর্যাদায় কোনো সৃষ্টি কক্ষণোই উন্নীত হতে পারে না।

নবী ও রাসূলগণ কোন্ ধরনের সৃষ্টি ছিলেন এবং তাঁরা মানব জাতির বাইরে কোনো সৃষ্টি ছিলেন না, এ কথা পবিত্র কুরআনে একাধিকবার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁরা অবশ্যই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁদেরকে পরিচালনা করা হতো এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজন অনুসারে ফিরিশতা প্রেরণ করা হতো। এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করতো, কোনো মানুষ কখনোই নবী-রাসূল হতে পারে না এবং তাঁরা মানুষের ন্যায় আচরণও করতে পারেন না। নবী-রাসূলকে হতে হবে অবশ্যই বিশেষ কোনো সৃষ্টি এবং তাঁরা হবেন মানব জাতির বাইরের কোনো সৃষ্টি বিশেষ। এ কারণে প্রেরিত নবী- রাসূল সম্পর্কে তাঁরা নানা ধরনের অযৌক্তিক ও উদ্ভট প্রশ্ন তুলেছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'মানুষদের মধ্য থেকেই নবী-রাসূল নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনিও মানুষ এবং নবুওয়্যাত-রিসালাতের জন্য আমি যাকে খুশী তাকেই নির্বাচিত করি'।

মানুষ নবী-রাসূল হতে পারে এ বিষয়টি পথভ্রষ্ট লোকদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে এবং এ কারণেই তারা নবী-রাসূলদের সম্পর্কে অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছে। হযরত নূহ (আঃ) যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করে মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্বের দিকে আহ্বান জানালেন তখন জাতির পথভ্রষ্ট নেতারা সমকালীন জনগণকে বলেছিলো–

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰئِكَةً ج مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ آبَائِنَا الأَوَّلِيْنَ–

তখন তার জাতির নেতারা, যারা (আগে থেকেই) কুফরী করছিলো- (এ কথা শুনে অন্যদের) বললো, এ (ব্যক্তি) তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়; আল্লাহ তা'য়ালা যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন

তাহলে ফিরিশতাদেরই (নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের যামানায়ও (ঘটেছে বলে) শুনিনি। (সূরা মুমিনুন- ২৪)

হযরত নূহ (আ:) এর পরে আবার যাঁকে নবী-রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং তিনি যখন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন, তখন সমকালীন পথভ্রষ্ট নেতারা প্রশ্ন তুললো মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে? তাদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لا مَا هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ص لا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُوْنَ لا

(নবীর কথা শুনে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে, (সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগ সামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম, তারা (অন্য লোকদের) বললো, এ ব্যক্তিটি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে, (এমতাবস্থায়) তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নবী মনে করে তার কথা) মেনে চলো; তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুমিনুন- ৩৩-৩৪)

মানুষকে পথ দেখানোর জন্য মানুষই প্রয়োজন এবং মানুষের অনুভূতি অনুভব করার জন্য অনুরূপ মানুষই প্রয়োজন। এ কারণে পথভ্রষ্ট লোকদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন-

قُل لَّوْ كَانَ فِى الأَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً-

(হে নবী,) আপনি (তাদের) বলে দিন, (যদি এ) যমীনে ফিরিশতারাই (বসবাস করতো এবং তারা এখানে) নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফিরিশতাকেই নবী করে পাঠাতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৫)

এ সম্পর্কে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বহু সংখ্যক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) কে জানিয়েছেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ- وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ-

আপনার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমরা যদি (বিষয়টি) না জানো তাহলে (আগের) কিতাবওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। আমি তাদের এমন সব দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করিনি যে, তারা খেতে পারতো না, (তা ছাড়া) তারা কেউ (এ দুনিয়ায়) চিরস্থায়ী হয়েও থাকেনি! (সূরা আল আম্বিয়া-৭-৮)

নবী করীম (সাঃ) কে যে ভূখণ্ডে প্রেরণ করা হয়েছিলো সেখানে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বর্তমান ছিলো এবং তাদের কাছে বিকৃত অবস্থায় পূর্বে অবতীর্ণ করা আসমানী কিতাবও ছিলো। সে কিতাবে নবী-রাসূলদের মানুষ হওয়া বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিলো বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, 'যারা আপনার মানুষ হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে তাদেরকে বলুন, পূর্বে যাদের নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাদের প্রতি যেসকল কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাও তো মানুষই ছিলেন এবং বিষয়টি কিতাবে উল্লেখ রয়েছে'।

নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন এবং মানুষকে যে সকল বৈশিষ্ট মণ্ডিত করা হয়েছে সেসকল বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তবে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নীতি অবলম্বন করতেন না। তাঁরা মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে ও ক্ষেত্রে তাদের মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট, আবেগ-উচ্ছাস, দুঃখ-বেদনা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা- অনিচ্ছা, শক্তি-বীরত্ব ইত্যাদি প্রয়োগ ও প্রকাশ করতেন। তাঁরা সংসার জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط

(হে নবী,) আপনার পূর্বেও আমি (অনেক) রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও বানিয়েছিলাম। (সূরা আর রা'দ- ৩৮)

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যাঁকে সর্বাধিক মর্যাদায় মহান আল্লাহ ভূষিত করেছেন, যিনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, অযত্ন ও অবহেলাভরে যাঁর নাম উচ্চারণ করাও নিষেধ এবং করলে আল্লাহ তা'য়ালা নারাজ হন, জীবিত থাকাকালে যাঁর সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে কথা বলা ছিলো নিষেধ এবং ইন্তেকালের পরও যাঁর রাওজা মুবারকের আশেপাশে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ, তাঁকেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবীয় বৈশিষ্ট দিয়ে মানুষ হিসাবেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সমকালীন পথভ্রষ্ট লোকজন যখন প্রশ্ন তুললো–

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الأَسْوَاقِ ط لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَه نَذِيْرًا–

ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রাসূল যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে? (সূরা ফুরকান- ৭)

এসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে বলতে বললেন–

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَدًا ع

(হে নবী,) আপনি (এদের) বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন (রক্ত মাংসের) মানুষ, তবে আমার ওপর ওহী অবতীর্ণ হয় (আর সে ওহীর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের মা'বুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন (সর্বদা) সৎ কাজ করে, সে যেন কখনো তার মালিকের দাসত্ব করতে গিয়ে অন্য কাউকে শরীক না করে। (সূরা আল কাহাফ- ১১০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং তাঁর নবীকে বলছেন, 'আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, আমি তোমাদেরই অনুরূপ একজন মানুষ'। নবী করীম (সা:) মানুষ ছিলেন এ কথা অবশ্যই সত্য তবে তিনি ছিলেন অসাধারণ মানুষ। মানব তবে সাধারণ মানব নন, মহামানব। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি অতিমানব ছিলেন না বা মানবীয় গুণ-বৈশিষ্টের সীমার বাইরেরও কিছু ছিলেন না।

কিন্তু এ কথা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কথায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, তিনি মানুষ ছিলেন তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। আমরা যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড করতে পারি, যে কোনো ধরনের পাপের কাজে জড়িত হতে পারি। মুখে যে কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারি। আমাদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-উচ্ছাস, দু:খ-যন্ত্রণা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা, শক্তি-বীরত্ব ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। আমরা তাড়িত হই আমাদের চিন্তাধারা দিয়ে এবং সকল ক্ষেত্রে ভুল করতে পারি। আমরা যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করে পাপে জড়িত হতে পারি। আমরা নিদ্রা অবস্থায় পৃথিবীর সকল অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টির বাইরের কিছুই দেখি না।

কিন্তু নবী করীম (সা:) এ সকল কিছুর উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বেও সামান্যতম পাপের কাজে কখনো জড়িত হননি এবং নবুয়্যাত লাভ করার পরে তো প্রশ্নই উঠে না। তাঁর নিদ্রা অবস্থাতেও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অনুভূতিহীন করেননি এবং দৃষ্টির বাইরের সকল কিছুই আল্লাহ তাঁকে প্রয়োজন অনুযায়ী দেখা ও অনুভব করার শক্তি দান করেছিলেন। মানবীয় সকল গুণ-বৈশিষ্ট তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি

অর্জনের পথে ও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। সার্বক্ষণিকভাবে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে আপন হেফাজতের চাদরে আবৃত রেখেছেন।

নবী করীম (সাঃ) কে মানুষ বলা যাবে না, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি বরং কায়া পরিবর্তন করেছেন, তিনি অতি মানব ছিলেন বা নূরের তৈরী ছিলেন। তিনি আপন শক্তিবলে অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন, তিনি নিজস্ব শক্তিবলে যা খুশী তাই করতে পারতেন, অন্যের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো, ইন্তেকালের পরও তাঁর উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হন, এ সকল ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস শুধু কুরআন-হাদীসের বিপরীতই নয়, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক।

নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা নিরুপণ করতে হবে কুরআন ও হাদীস দিয়ে, আবেগ-উচ্ছাস ও প্রেম-ভালোবাসার ওপর নির্ভর করে তাঁর মর্যাদা নিরুপণ করা যাবে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেন, কথা-বার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্পর্কে যে সীমারেখা অঙ্কন করা হয়েছে, তা অতিক্রম করা যাবে না। আবেগ- উচ্ছাস, ভক্তি-ভালোবাসার আতিশয্যে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে এমন কোনো কথা মুখে উচ্চারণ দূরে থাক চিন্তার জগতেও স্থান দেয়া যাবে না, যা শুধুমাত্র মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

সকল নবীর চাওয়া-পাওয়া ছিলো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছে

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন নবী-রাসূলদের। সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে কাউকে কাউকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ মর্যাদা দানে ধন্য করেছেন। নবী-রাসূলের সংখ্যা যতই হোক না কেনো, মর্যাদাবান নবী-রাসূলের কথা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে জানিয়েছেন এবং তাদের প্রসঙ্গ পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যেনো নবী-রাসূলদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, (প্রকৃত কারণ মহান আল্লাহই ভালো জানেন) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেক নবী রাসূলই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, বিপদ-আপদে নিপতিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন এবং কাউকে বিরোধিরা হত্যা পর্যন্ত করেছে।

সাধারণ মানুষ ইসলামের বিধান অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করবে এবং করতে পারবে বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে

কোনোক্রমেই নবী-রাসূলের মর্যাদায় নিজেকে উন্নীত করতে পারবে না। নবী-রাসূলদের যে মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো, তার কোটি ভাগের এক ভাগও অর্জন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, নবী-রাসূলগণের যেসকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, তাদের পবিত্র পায়ের ধূলির সমমর্যাদা অর্জনও সম্ভব নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের দানের মর্যাদা আমার মদীনার আনসারদের এক মুষ্ঠি দানের মর্যাদাও অর্জন করতে পারবে না'। (বুখারী)

সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম সকল মানুষ, মুমিন, মুসলিম ও মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনকারী (আউলিয়া নামে পরিচিত) লোকদের তুলনায় উত্তম। আবার সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদা সর্বাধিক। এখন আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানার চেষ্টা করবো সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম সকল বিষয়ে কার দরবারে ধর্ণা দিয়েছেন।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ, প্রথম নবী-রাসূল এবং প্রথম বিজ্ঞানী হযরত আদম (আঃ) বিপদগ্রস্থ হয়ে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিয়েছেন। ইবলিশ শয়তানের প্রতারণার জালে প্রতারিত হয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) উভয়েই মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীদের দরবারে ফরিয়াদ জানালেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

হে আমাদের মালিক, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে যাবো। (সূরা আল আ'রাফ-২৩)

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) তাঁর এই আবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর অনাগত মানুষকে শিক্ষা দিলেন, সকল প্রয়োজনে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর দরবারেই আবেদন করতে হবে। হযরত নূহ্ (আঃ), যাঁকে অনেকেই বলে থাকেন 'ছানায়ে আদম' অর্থাৎ দ্বিতীয় আদম। এ কথা বলার কারণ হলো, মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ্ (আঃ) থেকেই মানব সভ্যতার যাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছিলো। তিনি তাঁর অবাধ্য জাতিকে সত্য পথে আনার লক্ষ্যে সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করার পরেও সে জাতি যখন মহান আল্লাহর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলো না বরং আল্লাহর নবী হযরত নূহ্ (আঃ) এর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধিই করে চললো, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ফায়সালা এসে গেলো। তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন–

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْآ إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ تَبَارًا ع

নূহ্ বললো, হে আমার মালিক, এ যমীনের অধিবাসী (জালিমদের) একজন (গৃহবাসী)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না, (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফির ছাড়া কাউকেই জন্ম দিবে না। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে- তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও, জালিমদের জন্যে তুমি চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না। (সূরা নূহ্- ২৬-২৮)

নিজ জাতির কল্যাণ অকল্যাণ করার কোনো ক্ষমতা হযরত নূহ্ (আঃ) এর ছিলো না এবং একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত এ ক্ষমতা কারোই নেই। ঠিক এ কারণেই মহান নবী হযরত নূহ্ (আঃ) যা কিছু আবেদন করা প্রয়োজন তা মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা সমীপেই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার করুণা, রহমত ও ক্ষমা ব্যতীত একজন নবী-রাসূলের পক্ষেও মুহূর্তকাল টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না। নিজ সন্তানকে অথৈ পানিতে ডুবতে দেখে পিতা হিসাবে হযরত নূহ্ (আঃ) এর অন্তর পিতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে গেলো। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করছে–

وَنَادى نُوحٌ رَّبَّه فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِىْ مِنْ أَهْلِىْ ج وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ-

নূহ্ (তার ছেলেকে ডুবতে দেখে) তার মালিককে ডেকে বললো, হে আমার মালিক, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের এক সদস্য, (আমার আপনজনদের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমিই হচ্ছো সর্বোচ্চ বিচারক। (সূরা হূদ-৪৫)

ইসলামের বিপরীত দলের অন্তর্ভুক্ত নিজের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের পরিবারের একজন বলে উল্লেখ করা মহান আল্লাহর পছন্দ হয়নি। হযরত নূহ্ (আঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন–

قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ج إِنَّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ز فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ط إِنِّىْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ-

আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, হে নূহ্, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো হলো এক অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ো না; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে কোনো অবস্থায় জাহিলদের দলে শামিল করো না। (সূরা হূদ-৪৬)

নিজের অবস্থান উপলব্ধি করে হযরত নূহ্ (আ:) সাথে সাথে মহান মালিক আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন–

قَالَ رَبِّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِه عِلْمٌ ط وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْ أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ-

সে বললো, হে আমার মালিক, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই; তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (সূরা হূদ- ৪৭)

নিজের সন্তানের কল্যাণ অকল্যাণ করার কোনো ক্ষমতাই হযরত নূহ্ (আ:) কে দেয়া হয়নি এবং সে ক্ষমতা কেবলমাত্র মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَنُوْحًا إِذْ نَادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَه فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَه مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ج

নূহ্ যখন আমাকে ডেকেছিলো, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়া-৭৬)

আল্লাহর নবী হযরত হূদ (আ:) এর বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু করলো। বিষয়টি অনুভব করে হযরত হূদ (আ:) তাদেরকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন–

إِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُم ط مَّا مِنْ دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌم بِنَاصِيَتِهَاط إِنَّ رَبِّىْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

আমি তো আল্লাহ্ তা'য়ালার ওপরই ভরসা করি, (যিনি) আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক; বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের মুঠোয় নয়; অবশ্যই আমার মালিক সঠিক পথের ওপর রয়েছেন। (সূরা হূদ- ৫৬)

শত্রু পক্ষের অপতৎপরতা দেখে হযরত হূদ (আ:) পৃথিবীর কোনো শক্তির ওপর নির্ভর করেননি বা কোনো শক্তিধর মানুষের কাছেও সাহায্য চাননি। তিনি শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, 'তোমরা যা খুশী তাই করতে পারো, আমার ও তোমাদের যিনি মালিক আমি

কেবলমাত্র তাঁরও ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি'। হযরত সালেহ (আ:) নিজ জাতিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রেরিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের জন্যে আহ্বান জানালেন। তাঁর জাতি তাঁকে ইসলামী বিধান ত্যাগ করে নিজের আবিষ্কৃত মতবাদ-মতাদর্শের অনুসরণ করার আহ্বান করলো। হযরত সালেহ (আ:) নিজ জাতিকে জানিয়ে দিলেন-

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّىْ وَآتَانِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ عَصَيْتُه قف فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ-

সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি এ বিষয়টি নিয়ে একটুও চিন্তা করে দেখোনি যে, যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, (তা সত্ত্বেও) যদি আমি কোনো গোনাহ্ করে বসি তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহ তা'য়ালার মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে অন্যায় আবদার করে) তোমরা আমার ক্ষতির (পরিমাণই) শুধু বৃদ্ধি করছো? (সূরা হূদ-৬৩)

হযরত সালেহ্ (আ:) প্রকৃত সত্য তুলে ধরে এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউই কল্যাণ অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং আল্লাহর গ্রেফতারীর মোকাবেলায় কেউই সাহায্য করতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ:), মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাঁকে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হিসাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। নিজ পিতাকে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'আপনি যার গোলামী করছেন, নিজের আশা আকাঙ্খার কথা যার কাছে প্রকাশ করছেন, অকল্যাণ থেকে যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন, আমি কিন্তু তা করি না'। সন্তানের মুখ থেকে এ কথা শুনে পিতা হুমকি প্রদর্শন করলো, 'আমি যার গোলামী করি তুমি যদি তাকে না মানো তাহলে আমি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবো'। এবার ইবরাহীম (আ:) নিজ পিতাকে জানিয়ে দিলেন-

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَأَدْعُوْا رَبِّىْ ز عَسَى أَلاَّ أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا-

আমি তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তা'য়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের সবার কাছ থেকে (পৃথক হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার মালিককেই ডাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না। (সূরা মারইয়াম-৪৮)

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই ডেকেছেন এবং সকল আবেদনও তাঁর কাছেই করেছেন। পবিত্র কা'বা শরীফ

নির্মাণকালে নিজেদের উদ্দেশ্য ও শ্রম কবুল করার জন্যে তাঁরা পিতা-পুত্র মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে আবেদন জানালেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

হে আমাদের মালিক, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল করো, একমাত্র তুমিই সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো। (সূরা বাকারা-১২৭)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজেদের কল্যাণ কামনায় উভয়ে সম্মিলিতভাবে মহান মালিকের কাছে এভাবে দোয়া করেছেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ط إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

হে আমাদের মালিক, আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে আমাদের মালিক), তুমি আমাদের (তোমার দাসত্বের) আনুষ্ঠানিকতাসমূহ দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, কারণ তুমি অত্যন্ত দয়াপরবশ ও পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা-১২৮)

কোনো নবী-রাসূলই শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়ার অধিকারী ছিলেন না, বরং তাঁরাই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করেছেন–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ–

(স্মরণ করো), যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার মালিক, এ (মক্কা) শহরকে (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মূর্তিপূজা করা থেকে দূরে রেখো। (সূরা ইবরাহীম-৩৫)

অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করার ক্ষমতা, রিযকের ব্যবস্থা করা এবং মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর কাছে এভাবে আবেদন করেছেন–

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ–

হে আমাদের মালিক, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে–হে আমাদের মালিক, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) এমন ব্যবস্থা করো যেনো মানুষদের অন্তর এদের দিকে অনুরাগী হয়, তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রিযকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা তোমার (নিয়ামতের) শোকর আদায় করতে পারে। (সূরা ইবরাহীম-৩৭)

সন্তান দেয়ার মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা, প্রার্থনা কবুল করার মালিকও মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং কিয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে সাহায্যও করতে পারেন কেবলমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোনো পীর বা বুযুর্গ নিজেদের অনুসারীদের বাঁচানো দূরে থাক, নবী-রাসূলও নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা নিজের অনুসারীদের কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'য়ালার গ্রেফতারী থেকে বাঁচাতে পারবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে যদি কাউকে এ অধিকার দান করেন তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) মহান মালিক আল্লাহর কাছে এভাবে আবেদন জানিয়েছেন–

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحٰقَ ط إِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ- رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ- رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

হে আমাদের মালিক, আমরা যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা সব জানো; আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। সব প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্যে, যিনি আমাকে আর (এ) বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (তুল্য দুটো নেক সন্তান) দান করেছেন; অবশ্যই আমার মালিক (তাঁর বান্দাদের) দোয়া শোনেন। হে আমার মালিক, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা বানাও), হে আমাদের মালিক, আমার দোয়া তুমি কবুল করো। হে আমাদের মালিক, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের (তোমার অনুগ্রহ দ্বারা) ক্ষমা করে দিয়ো। (সূরা ইবরাহীম- ৩৮-৪১)

রোগাক্রান্ত হলে, বিপদে নিপতীত হয়ে বা মনের আশা পূরণের জন্যে একশ্রেণীর মানুষ পীর, বুযুর্গ বা মৃত কোনো মানুষের কবরে গিয়ে প্রার্থনা করে। কেউ কেউ মনে করে অমুক মাজারে মানত করলে জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বা পরীক্ষায় সফল হওয়া

যাবে। আবার কেউ মনে করে অমুক পীর সাহেব কিয়ামতের দিন আমাকে উদ্ধার করবেন। অথচ দেখুন নবী-রাসূলগণের সীরাত কি ছিলো এবং তাঁরা কোন্ মহাশক্তির কাছে আবেদন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ:) মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে কী বলছেন এবং কিভাবে আবেদন করছেন দেখুন–

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ لا وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِلا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ لا وَالَّذِىْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ط رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ لا

তিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অত:পর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন, তিনিই আমাকে আহার্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় সরবরাহ করেন, আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন, তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দিবেন, শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (অত:পর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার মালিক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো। (সূরা আশ শুয়ারা-৭৮-৮৩)

নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার কোনো ক্ষমতা নবী-রাসূলেরই ছিলো না, তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী। হযরত ইবরাহীম (আ:)-কে যখন শত্রুপক্ষ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো সে আগুনের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিলেন–

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ لا

আমি (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও। (সূরা আল আম্বিয়া-৬৯)

নবী-রাসূলগণ নিজ আত্মীয়-স্বজন, অনুসারী ও সমকালীন সকল লোকদের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই এবং মহান মালিক আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে রক্ষা করার অধিকার তাদের নেই। ইবরাহীম (আ:) নিজ পিতাকে বললেন–

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ–

আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছে থেকে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই ইখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার

অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের মালিক, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং (আমাদের) তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল মুমতাহানা-৪)

নবী-রাসূলগণ জালিমের জুলুম থেকে নিজেদের হেফাজত করতে পারতেন না, বরং তাঁরা মহান মালিকের কাছে বিপদমুক্ত থাকার জন্যে আবেদন করেছেন। হযরত ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহর কাছে এভাবে আবেদন করেছেন–

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফিরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের গোনাহ্ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী। (সূরা আল মুমতাহানা-৫)

হযরত লূত (আ:) এর জাতি মহান আল্লাহর গযবে নিপতীত হবার মতো গর্হিত কর্মে লিপ্ত ছিলো এবং তাদের ওপর যখন গযব নেমে এলো সে গযব থেকে মুক্ত থাকার কোনো ক্ষমতাই তাঁর ছিলো না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁকে হেফাজত করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيْنَ لا

আমি লূতকেও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, তাকেও আমি এমন একটি জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গোনাহ্গার জাতি। (সূরা আল আম্বিয়া-৭৪)

পাহাড়-পর্বত ও পাখ-পাখালী হযরত দাউদ (আ:) এর অনুগত ছিলো কিন্তু এসব কিছুকে নিজের অনুগত রাখার কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে এসব ক্ষমতা তাঁকে দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন–

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ج وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ–

আমি পাহাড়-পর্বত এবং পাখ-পাখালীকেও দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যেনো তারাও (তার সাথে) আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারে; আর আমিই (এসব কিছু) ঘটাচ্ছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়া-৭৯)

তিনি হাতের সাহায্যে লোহার মতো কঠিন ধাতব পদার্থ গলিয়ে লৌহজাত দ্রব্য নির্মাণ করতে পারতেন। এ ক্ষমতাও তাঁকে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছিলেন–

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاودَ مِنَّا فَضْلاً ط يَا جِبَالُ أَوِّبِىْ مَعَه وَالطَّيْرَج وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَلا أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِىْ السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاط إِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

আমি দাউদকে আমার কাছ থেকে (অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম; (এমনকি আমি পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করো, (একই আদেশ আমি) পাখীকুলকেও দিয়েছিলাম, আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম, (তাকে আমি বলেছিলাম, সে বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করে, (কিন্তু এ শিল্পগত কলাকৌশলের পাশাপাশি) তোমরা তোমাদের নেক কাজও অব্যাহত রাখো; তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, আমি তার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করি। (সূরা আস সাবা-১০-১১)

বাতাস হযরত সুলাইমান (আ:) এর অনুগত ছিলো, তামার খনি ছিলো ছিলো তাঁর আয়ত্বে। তিনি কোনো কিছুর ওপর উপবেশন করে বাতাসকে আদেশ দিতেন বাতাস তাঁকে নিয়ে মুহূর্তেই হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে চলে যেতো। অগণিত জ্বীন তাঁর অনুগত ছিলো এবং তাদের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য কর্ম সম্পাদন করতেন। কিন্তু এসব ক্ষমতা কি তাঁর নিজস্ব ছিলো? মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِأَمْرِه إِلَى الأَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَالِمِيْنَ– وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَه وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَلِكَ ج وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ لا

আমি প্রবল হাওয়াকে সুলাইমানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি। শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু (জ্বীন অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো, তার জন্যে এ ছাড়াও এরা বহু কাজ আঞ্জাম দিতো, তাদের রক্ষক তো আমিই ছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়া-৮১-৮২)

বাতাসকে ব্যবহার করে তিনি কত দূর যেতেন এবং জ্বীনদের দ্বারা তিনি কোন্ ধরনের কাজ করাতেন, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌج وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ الْقِطْرِ ط وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه بِإِذْنِ رَبِّه ط وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ- يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ ط إِعْمَلُوْا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ-

এমনিভাবে আমি সুলাইমানের জন্যে বাতাসকে (তার) অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাত:কালীন ভ্রমণ ছিলো এক মাসের পথ, আবার সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণও ছিলো এক মাসের পথ, আমি তার জন্যে (গলিত) তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম; তার মালিকের অনুমতিক্রমে জ্বীনদের কিছু সংখ্যক (কর্মী) তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো (আমি বলেছিলাম,) তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো। সুলাইমান যা কিছু চাইতো তারা (জ্বীনরা) তার জন্যে তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, (বড় বড়) পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার ওপর স্থাপন করার (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) বৃহদাকারের ডেগ; আমি বলেছি, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকরস্বরূপ নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই (তাদের মালিকের) শোকর আদায় করে। (সূরা আস সাবা- ১২-১৩)

হযরত আইয়ুব (আ:) ভয়ঙ্কর ধরনের চর্মরোগে আক্রান্ত হন এবং ঘটনাক্রমে নিজ পরিবার-পরিজন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। জীবনের এই চরম মুহূর্তে একান্ত অসহায় অবস্থায় তিনি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে তিনি এভাবে আবেদন করলেন–

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادٰى رَبَّه أَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

(স্মরণ করো,) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (আমায় তুমি) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল আম্বিয়া-৮৩)

একশ্রেণীর মানুষ রোগাক্রান্ত হলে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা বাদ দিয়ে বিভিন্ন মাজার বা পীর সাহেবের কাছে ধর্ণা দেয়, অথচ নবী-রাসূলগণের সীরাত হলো তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারেই নিরাময় কামনা করেছেন। হযরত ইউনুস (আ:) ত্রীবিধ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মহাবিপদে নিপতীত হলেন। এ অবস্থায় তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এভাবে সাহায্য কামনা করেছেন–

لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ك إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ج

হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। (সূরা আল আম্বিয়া-৮৭)

আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করে কেউই কখনো নিরাশ হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইউনুস (আ:) সম্পর্কে বলেন–

فَاسْتَجَبْنَا لَه لا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَالِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

অত:পর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি মুমিন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি। (সূরা আল আম্বিয়া-৮৮)

সন্তান না হলে অনেককেই দেখা যায় তারা পীর সাহেবের দরবারে ধর্ণা দেয় অথবা মৃত মানুষের কবরে গিয়ে মানত মেনে সন্তান কামন করে। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণের সীরাত হলো তাঁরা সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। হযরত যাকারিয়া (আ:) এর স্ত্রী ছিলেন সন্তান ধারণে অক্ষম তথা বন্ধ্যা। হযরত যাকারিয়া (আ:) মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কিভাবে ফরিয়াদ জানালেন পবিত্র কুরআন বলছে–

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادى رَبَّه رَبِّ لاَ تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَج

আর (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে একা (নি:সন্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী। (সূরা আল আম্বিয়া-৮৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী হযরত যাকারিয়া (আ:) এর ডাকে কিভাবে সাড়া দিলেন দেখুন–

فَاسْتَجَبْنَا لَه ز وَوَهَبْنَا لَه يَحْيى وَأَصْلَحْنَا لَه زَوْجَه ط إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ-

অত:পর আমি তার জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহইয়া এবং তার (মনের আশা পূরণের) জন্যে আম তার স্ত্রীকে (বন্ধ্যাত্বমুক্ত করে সম্পূর্ণ) সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; (আসলে) এ লোকগুলো (সর্বদাই) সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো আমার অনুগত (বান্দা)। (সূরা আল আম্বিয়া-৯০)

সন্তানহীন হযরত যাকারিয়া (আ:) মহান মালিক আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীকে সন্তান ধারণে সক্ষম বানিয়ে পুত্র সন্তান দান করলেন, সন্তানের নামকরণও তিনিই করলেন 'ইয়াহ্ইয়া' এবং সেই সন্তানকে নবী হিসাবেও নির্বাচিত করে তাঁর ইতিহাস পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে তাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সাহায্য কামনা, নবী করীম (সা:) এর সীরাত

নবী করীম (সা:)ও সকল অবস্থাতে এবং সকল কিছুর জন্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছেই সাহায্য চেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে মানুষদের জানিয়ে দিতে বলেছেন–

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْ رَبِّىْ وَلاَ أُشْرِكُ بِه أَحَدًا–

(এদের) আপনি বলে দিন, আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি, আর আমি তো (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (সূরা জ্বীন- ২০)

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেন- নবী করীম (সা:) বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেনো এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোনো পরিবর্তন ঘটবে?' এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোনো প্রাণও থাকে না।

পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কুরআনের ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ

করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়াই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোনো অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لا يرد القَضاء إلاّ الدعاء–

দোয়া ব্যতীত আর কোনো কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না। (তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোনো কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের একমাত্র উপায়ই হলো দোয়া, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مِنْ اَحَد يَدْعُوْ بِدُعَاءِ إِلاَّ أَتَاهُ اللّٰهُ مَاسَأَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِه مَالَمْ يَدْعُ بِاَهِمْ اَوْ قَطِيْعَةُ رَحْمٍ–

বান্দাহ্ যখন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন, যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে। (তিরমিযী)

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يدْعُوْةَ لَيْسَ فِيْهَا اثْمٌ وَّلاَ قَطِيْعَةُ رَحْمٍ إِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ احْدَى ثَلث– امَّا اَنْ يَجْعَلُ لَه دَعْوَتَه– وَامَّا اَنْ يَّدَّ خِرُهَا لَه فِى الآخِرَةِ وَامَّا اَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلُهَا–

একজন মুসলমান যখনই কোনো দোয়া করে তা যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোনো এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোনো বিপদ আসা বন্ধ করা হয়। (আহ্‌মাদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন–

اذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ- اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ- اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ- وَلِيَعْزِمْ مَسْئَلَتَه-

তোমাদের কোনো ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো। (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এভাবে আদেশ দিয়েছেন–

اُدْعُوْااللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالاِ جَابَةِ-

আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন–

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةُ رِحْمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجَلْ- قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰه مَا إلا سْتَعْجَالَ- قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرُيُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ-

যদি গোনাহ্ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূল (সাঃ) এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোনো দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন–

يَسْأَلُ اَحَدُكُمْ رَبَّه حَاجَتَه كُلُّه حَتّٰى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِه اذَا انْقَطَعَ-

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব্ব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ شَئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ–

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে উমার ও মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন–

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَّلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ–

যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহ্ তা'য়ালার বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

سَلُوْا اللّٰهَ مُفْضَلَه فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَسْأَلَ–

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। (তিরমিযী)

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোনো বিষয়ে মানুষের চেষ্টা-সাধনা, তদবীরই আল্লাহ তা'য়ালার রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতীত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহ্ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহ

তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

যে কোনো ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে। আল্লাহর রাসূল (সা:) কে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সিজদা দেয় তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল। অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্জাহান নামাজ শেষে দু'হাত তুলে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোনো কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোনো নিবেদন না করে ফিরে যায় না, কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেনো? ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌছা মাত্র সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোনো ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেনো চলে যাচ্ছিলে?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের মতো মহান আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, সম্রাট কাঁদে যে

সম্রাটের কাছে আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

দোয়া- নবী করীম (সা:) এর সীরাত

নবী করীম (সা:) সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং সর্বাবস্থায় কেবলমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন। তিনি জীবিতাবস্থায় যতো দোয়া করেছেন তা সবই হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে তিনিই সকলের তুলনায় সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী, তবুও তিনি কিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে আবেদন-নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি করেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করি।

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَهْدِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَعَفِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ-

হে আল্লাহ্ তা'য়ালা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার প্রতি রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সকল ক্ষতির পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং তুমি আমাকে রিযিক দান করো ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا- وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

হে আল্লাহ্ তা'য়ালা, আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশি যুলুম করেছি, আর তুমি ব্যতীত গোনাহসমূহ কেউ-ই ক্ষমা করতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম করো, তুমিই ক্ষমাকারী দয়ালু। (বুখারী, মুসলিম)

أَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَاصُنِعَ لَه وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَه-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি আশ্রয় চাই কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আর আশ্রয় চাই বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। (বুখারী ফতহুলবারী)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّ عَمَلاً مُّتَقَبَّلاً-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য কর্ম প্রার্থনা করি। (ইবনে মাজাহ্)

أَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ أَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ أَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَكْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চক্ষুতে নিরাপত্তা প্রদান দান করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, কুফুরী এবং দারিদ্রতা হতে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (আবু দাউদ, আহ্মাদ)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ-

আল্লাহ তা'য়ালার পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর কাছে আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুসলিম, তিরমিযী, আহ্মদ)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَلِىْ أَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ وَ آمِنْ رَوْعَاتِىْ أَللّٰهُمَّ حْفِظْنِىْ مِنْم بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ক্ষমার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি আমার গোপন দোষত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখো, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে

দাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উর্ধ্ব জগতের গযব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বুখারী-ফতহুলবারী)

أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِ هِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, হাকেম)

أَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ- أَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وِ زَلْزِلْهُمْ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, কিতাব নাযিলকারী, ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত করো, তাদেরকে দমন ও পরাজিত করো, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম)

أَللّٰهُمَّ اكْفِيْنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি। এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল কিছু হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। তুমি ছাড়া যেনো আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী)

أَللّٰهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَّ أَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً-

হে আল্লাহ তা'য়ালা! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করোনি, যখন তুমি ইচ্ছা করো দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য করতে পারো। (ইবনে হিব্বান, ইবনে সুন্নী)

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমি তোমার কাছে এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

اَللّٰهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়, দ্রুত যা আসবে, বিলম্ব করবে না। (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ أَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ-

হে আল্লাহ তা'য়ালা, তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। (তিরমিযী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَا رْزُقْنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَ لاَقُوَّةَ-

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলো না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়-উদ্যোগ, ছিলো না কোনো শক্তি সামর্থ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, আহ্মদ)

اَعُوْذُبِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ-

যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং আমি যার আশঙ্কা করছি তা হতে আমি আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদা এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

চাইতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই কাছে

একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনোই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ তা'য়ালা এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা একেবারেই জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন, তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই

সামনে আনুগত্যের মাথা নত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী। কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোনো ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোনো কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়, কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনো ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই। এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোনো ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সকল বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সকল কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ– لَه مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ع

আল্লাহ তা'য়ালাই হচ্ছেন সব কিছুর (একক) স্রষ্টা, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর ওপর নেগাহবান। আসমানসমূহ ও যমীনের মূল চাবি তো তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬২-৬৩)

যিনি সকলকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহ তা'য়ালারই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ–

(হে নবী) আপনি এদের বলে দিন, হে মূর্খরা, তোমরা কি এরপরও আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী বরণ করে নিতে বলছো? (সূরা আয যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সকলকিছুর একচ্ছত্র অধিকারী, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ع

তোমাদের মালিক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো; যারা অহঙ্কারের কারণে আমার দাসত্ব থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা আল মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায়কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোনো ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই, অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সকল কিছুই শোনেন, দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যেকোনো অবস্থায়ই দোয়া করি না কেনো, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন'। মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়- উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোনো প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোনো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সেসময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোনো কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান

অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুকনা কেনো, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোনো জটিলতা থাকে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্‌কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে প্রচণ্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক, তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোনো ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তাই সর্বশক্তিমান, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্বজগতে দ্বিতীয় এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোনো কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি, তিনি

মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোনো রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেনো করছো, আমার কাছে কেনো প্রার্থনা করছো, কেনো আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই, তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও'। বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহ তা'য়ালার যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও'।

সুতরাং সকল নবী-রাসূলেরই চাওয়া পাওয়া ছিলো কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই এবং সকল নবী-রাসূলের সাহাবায়ে কেরামের চাওয়া পাওয়া ছিলো শুধু মাত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেই। তাঁরা কখনো তাদেরই অনুরূপ আরেকজন মানুষের কাছে বা মৃত মানুষের কবরে গিয়ে সাহায্য কামনা করেননি, যে কাজ বর্তমানে একশ্রেণীর মানুষ করে থাকে। মানুষ তারই অনুরূপ আরেকজন মানুষের কাছে গিয়ে ঐ ধরনের সাহায্য কামনা করবে যে ধরনের সাহায্য করতে পারেন কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা, নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে বাদ দিয়ে আরেকজন জীবিত বা মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া মানবীয় মর্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত। বড় ধরনের গোনাহ ও মর্যাদাহানীকর সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়ে সাহায্য কামনা করে নিজেকে মুমিনের মর্যাদায় উন্নীত করাই মুসলমানদের কাজ।

মানুষদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র তাঁর দাসত্ব না করে অন্যান্য শক্তিরও দাসত্ব করে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে তাদের ধারণা একটু ভিন্ন ধরনের। এই ভিন্ন ধারণাই তাদেরকে বিরাট এক ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত করে রেখেছে এবং তারা শিরক-এ লিপ্ত রয়েছে। এই শ্রেণীর লোকগুলোর বিশ্বাস হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা হলেন এই পৃথিবীর রাজা-বাদশা এবং সম্রাটদের অনুরূপ। পৃথিবীর শাসকরা যেমন দেশের সাধারণ জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বহুদূরে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করে ভোগ-বিলাসে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যেমন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। তাদের সামনে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তাদের কাছে কোনো দরখাস্ত প্রেরণ করতে হলে তাদের সভাষদ, হোমড়া-চোমড়া, শাসকবৃন্দের যারা প্রিয়জন বা তাদের কোনো নিকট আত্মীয়দের দ্বারস্থ হতে হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ কারো দরখাস্ত যদি শাসকদের কাছে পৌঁছে যায় তবুও শাসকগণ সে দরখাস্তের আবেদন সম্পর্কে স্বয়ং ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কোনো কর্মচারীকে বা নিজের অধীনস্থ কাউকে দায়িত্ব প্রদান করেন যে, আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করা যায় কিনা তা দেখা হোক। এক শ্রেণীর মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেও পৃথিবীর এই শাসকদের মতই মনে করেছে এবং এর ফল হয়েছে অত্যন্ত মারাত্মক।

পৃথিবীর এক শ্রেণীর কৌশলী মানুষ উল্লেখিত ধারণা অনুসরণকারী মানুষদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, সকল শাসকের শাসক, সকল সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন, সাধারণ মানুষের নাগাল হতে তিনি বহুদূরে। একজন সাধারণ মানুষের আবেদন সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কোনোক্রমেই পৌঁছতে পারে না। তাঁর কাছে সাধারণ মানুষের প্রার্থনা পৌঁছা এবং তার জবাব লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোন প্রার্থনা পেশ করতে হলে এবং তার জবাব পেতে হলে কি করতে হবে? ওসীলা অনুসন্ধান করতে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৩৫ নম্বর আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিল, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোনো প্রার্থনা পৌঁছাতে হলে অবশ্যই কোনো ওসীলা ধরতেই হবে। সে ওসীলা আবার কি? এই ওসীলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নানাজন নানা ধরনের ওসীলার প্রবর্তন করে সাধারণ মানুষকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রেখে শোষণ শুরু করলো।

কেউ বললো, ওসীলা মানে হলো ঐ সকল পবিত্র আত্মা যারা পৃথিবীতে আল্লাহর ওলী বা কামেল নামে পরিচিত ছিল। তাদের মাজারই হলো সেই ওসীলা। মাজারে গিয়ে সিজদা দিয়ে হোক বা দু'হাত তুলে হোক, মাজারে শায়িত ব্যক্তির কাছে আবেদন করতে হবে, তিনি যেন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তার দরখাস্ত পৌঁছে দেন। এখন মাজারে শায়িত ব্যক্তি তো আর খালি মুখে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তোমার দরখাস্ত পৌঁছাবেন না। পৃথিবীর শাসকের কাছের কোনো লোক শুধু হাতে কোনো আবেদন যেমন পৌঁছায় না, ঘুষ দিতে হয়, তেমনি এই মাজারেও ঘুষ দিতে হবে। তাহলে তোমার আবেদন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পৌঁছে দিবেন।

সে ঘুষের ধরণ হলো, নগদ অর্থ থেকে শুরু করে পৃথিবীর কোনো নিম্ন মূল্যের বস্তুও হতে পারে। হতে পারে তা মুরগীর বাচ্চা, উট, গরু, ছাগল, গাছের ফল ইত্যাদী। এ ধরনের বস্তু বা নগদ অর্থ মাজারে মানত করতে হবে। তাহলে তিনি তোমাদের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবেন। এসব বস্তু এবং নগদ অর্থ মাজারের সেবক যারা আছেন তারা ভোগ করবেন। মাজারের খাদেমগণ ভোগ করার অর্থই হলো মাজারে শায়িত ব্যক্তির ভোগ করা।

আরেক ধরনের ধুরন্ধর লোক ওসীলা বলতে কি বুঝায় তা এভাবে বুঝিয়ে দিল যে, যারা ওসীলা বলতে মাজারে শায়িত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে তারা আসলে ধান্দাবাজ। ওরা ধান্দাবাজি করে তোমাদের পকেটের টাকা নিজের পকেটে ঢোকাতে চায়। তোমাদের পশু সম্পদ ও গাছের ফলমূল খেতে চায়। কারণ মাজারে যিনি শুয়ে আছেন তিনি মৃত। আর মৃত মানুষ কি কোনো কিছু খেতে পারে? তাহলে তোমরা কেনো মৃত মানুষের কবরে এসব জিনিস দান করো? টাকাই বা কেনো দাও? মৃত মানুষের তো টাকা দরকার হয় না। টাকা দরকার হয় জীবিত মানুষের।

সুতরাং ওসীলা হলো তোমাদের চোখের সামনে নাদুস-নুদুস নূরানী চেহারার অধিকারী পীর নামক ব্যক্তিগণ। এদের কাছে রয়েছে ওপরের জগতে যাবার সিঁড়ি, যখন খুশী তখনই এরা ওপরের জগতে যাতায়াত করতে পারে, এদের সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ক খুবই উষ্ণ। তিনি তোমার যে কোনো আবেদন আল্লাহ তা'য়ালার

কাছে পৌঁছে দিবেন। পীরের মুরীদ হয়ে যাও এবং পীরকে সন্তুষ্ট রাখো। পীর সাহেব তোমার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট রাখবেন।

এখন পীরকে সন্তুষ্ট রাখার পথ কি? পথ ঐ একটিই। এতদিন তোমরা মাজারে যা দিতে তা এখন পীর সাহেবকে দিতে হবে। তবে সাবধান! পীর সাহেবকে সরাসরি কিছুই দেয়া যাবে না। তার যারা লোকজন রয়েছে, তাদের মাধ্যম দিয়ে দাও, তিনি পীর সাহেবকে গিয়ে তোমার কথা জানাবেন, তারপর পীর সাহেব তোমার দরখাস্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবেন।

আরেক দল চালাক লোক বললো, এসব পীর মাজার সব কিছুই বাতিল। এগুলো কোনো ওসীলাই না। আসলে ওসীলা বলতে বুঝায় হলো, নিজের হাতে মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতে হবে বা কোনো মূর্তির ছবি অঙ্কন করতে হবে। তারপর সেই মূর্তির সামনে দু'হাত ভরে দান করতে হবে। তবে এই দানের কাজও তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের কাছে কোনো কিছু দান করার অধিকার হলো আমাদের। তোমরা আমাদের কাছে তোমাদের দান পৌঁছে দিবে, আমরা তা পৌঁছে দিবো মূর্তির সামনে। তিনি তা পৌঁছে দিবেন স্বয়ং স্রষ্টার কাছে।

এভাবেই মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হবার ফলে বান্দাহ ও আল্লাহ তা'য়ালার মাঝখানে অসংখ্য ছোট বড় রব্ব, ইলাহ আর মাবুদ ও সুপারিশকারীর এক বিশাল দল নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। সেই সাথে পাদ্রী ও পুরোহিত তন্ত্রের একটি বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাদের মাধ্যম ব্যতীত কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীরা তাদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে পারে না।

নবী করীম (সা:) কি গায়েব জানতেন?

একশ্রেণীর লোক প্রচার করে থাকে নবী করীম (সা:) গায়েব জানতেন অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের সংবাদ অবগত ছিলেন। নবী-রাসূলদের জীবনে ঘটে যাওয়া অগণিত ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজন অনুযায়ী নবী-রাসূলদের অদৃশ্যের সংবাদ অবহিত করেছেন। কোনো নবী-রাসূলকেই এমন কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি যে, তারা অদৃশ্যের সংবাদ রাখবেন। অর্থাৎ অদৃশ্যকে জানার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা কোনো নবী-রাসূলেরই ছিলো না। আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু তাদেরকে জানিয়েছেন ততটুকুই তাঁরা জানতেন।

সকল মর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে নবী করীম (সা:) কে। তিনি কি গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা পবিত্র কুরআন মাজীদে সন্ধান করি, কুরআন কি বলে তা প্রথমে জেনে নেই। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যাঁকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন, তাঁকেই তিনি ঘোষণা দিতে বলছেন–

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ ط وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ-

(হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানে না; তারা এও জানে না, কবে তাদের আবার (কবর থেকে) উঠানো হবে! (সূরা আন নাম্ল- ৬৫)

যারা প্রচার করে থাকেন যে, নবী করীম (সাঃ) গায়েবের সংবাদ জানতেন, পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত তাদের কাছে প্রশ্ন করছে, নবী করীম (সাঃ) কি আসমানসমূহ ও যমীনের বাইরের কোনো শক্তি? সমগ্র সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেউই গায়েব জানে না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে ঘোষণা করতে বলছেন–

قُلْ لاَّ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّىْ مَلَكٌ ج إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ ط أَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ ع

(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, আমি তো তোমাদের (এ কথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তা'য়ালার বিপুল ধনভাণ্ডার রয়েছে, না (এ কথা বলি,) আমি গায়েবের কোনো সংবাদ রাখি! আর এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল করা হয়। (সূরা আল আনয়াম- ৫০)

অন্য কোনো নবী-রাসূল দূরে থাক, স্বয়ং নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেও আল্লাহ তা'য়ালা নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা প্রদান করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বলতে বলেছেন–

قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ ج إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ع

(হে রাসূল) আপনি (আরো) বলুন, আমার নিজের ভালো- মন্দের মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই হয়; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (নিজের জন্যে সে জ্ঞানের জোরে) অনেক ফায়দাই হাসিল করে নিতে পারতাম এবং (এ কারণে) কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি

তো শুধু (একজন নবী, জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা আমার ওপর ঈমান আনে। (সূরা আল আ'রাফ- ১৮৮)

পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, নবী করীম (সা:) গায়েব জানতেন না। গায়েবের সংবাদ কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণে। তিনি যদি গায়েব জানতেন তাহলে তায়েফে যাবার সময় ঐ রাস্তা তিনি পরিহার করে চলতেন, যে রাস্তায় তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিলো। গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে ওহুদের যে স্থানে তিনি গুরুতর আহত হলেন, সে মর্মান্তিক ঘটনা তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। খায়বরে এক ইয়াহূদী নারী তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো, গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে তিনি উক্ত বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেয়ে তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতেন না।

বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সা:) পবিত্র কদম মুবারকের মোজা খুলে রেখেছিলেন। একটি বিষধর বিচ্ছু উক্ত মোজার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। তিনি প্রয়োজনে মোজা পরিধান করতেই বিচ্ছু তাঁর পবিত্র কদমে দংশন করলে তিনি যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এ বিচ্ছু আল্লাহ তা'য়ালার নবীকেও দংশন থেকে বিরত থাকে না'। গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে বিচ্ছু তাঁকে দংশন করতে পারতো না। তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত হামজা (রা:) ওহুদে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাতবরণ করলেন। গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে তিনি আপন চাচাকে সাবধান করতেন। ইয়ারমুকের ময়দানে আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রা:) শাহাদাতবরণ করলেন। গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে তিনি নিজ ভাইকে সতর্ক হতে বলতেন।

গায়েবের সংবাদ জানা থাকলে তিনি নিজ সন্তান-সন্ততি, প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা:) ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর সংবাদ আগেই পেতেন। পরম প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা:) এর ওপর যখন ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করা হলো, নবী করীম (সা:) স্ত্রীকে প্রায় এক মাসের জন্যে পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখন প্রকৃত বিষয় ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবগত করলেন তখন তিনি প্রকৃত সত্য জানতে পারলেন। তিনি যদি গায়েব জানতেন তাহলে প্রিয় স্ত্রীর বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করতেন না। তিনি গায়েব জানতেন না বিধায় নিকটাত্মীয়দের এভাবে সাবধান করেছেন–

لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا–

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবো না'। একই কথা তিনি নিজ ফুফু হযরত সাফিয়্যা (রা:) ও প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা:) কেও বলেছেন। (বুখারী)

নবী করীম (সাঃ) কে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি যে, তিনি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করবেন অথবা নিজেরই কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করবেন। মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে ঘোষণা করতে বলছেন-

قُلْ إِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لاَ رَشَدًا- قُلْ إِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ لا وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِه مُلْتَحَدًا لا

আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের কোনো ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না। আপনি (তাদের) বলে দিন, (কোনো সঙ্কট দেখা দিলে) আমাকেই বা আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থলও তো আমি (খুঁজে) পাবো না। (সূরা জ্বীন- ২১-২২)

নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলতে বলছেন, 'আপনি মানুষদের জানিয়ে দিন, আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাকে গ্রেফতার করতে চান তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যার প্রতি নির্ভর করা যায়'। এটাই যখন বাস্তব অবস্থা তাহলে এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, 'আমি অমুক পীরের মুরীদ, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন'!

নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং জানেন না কিয়ামতের ময়দানে তাঁর সাথে কেমন আচরণ করা হবে-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلاَ بِكُمْ ط إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, রাসূলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সতর্ককারী বৈ কিছুই নই। (সূরা আল আহ্কাফ- ৯)

কিয়ামত কবে কখন সংঘটিত হবে এ সংবাদও নবী করীম (সাঃ) জানতেন না। তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা যতটুকু জানিয়েছেন ঠিক ততটুকুই তিনি সাধারণ মানুষকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বলতে বলছেন-

قُلْ إِنْ أَدْرِىْ أَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ أَمْ يَجْعَلُ لَه رَبِّىْ أَمَدًا- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أَحَدًا لا إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّه يَسْلُكُ مِنْم بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِه رَصَدًا لا

(হে নবী,) আপনি (এদের) বলে দিন, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কিয়ামত দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার প্রতিপালক তার (আগমনের) জন্যে কোনো (দীর্ঘ) মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন। তিনি (সমগ্র) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না, অবশ্য তাঁর রাসূল ছাড়া- যাকে তিনি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আগে পিছেও তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সূরা আল জ্বীন- ২৫- ২৭)

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, 'আপনি এ কথা সকল মানুষকে জানিয়ে দিন, ইতোপূর্বে যে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন আমি তাদের থেকে ভিন্ন কোনো কিছু নই বা আমিই এই পৃথিবীতে প্রথম রাসূল নই। এ পৃথিবী থেকে এমন বহু রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন যারা পানাহার করতেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন যাপন করেছেন। তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাঁরা কর্মের মাধ্যমে জীবীকাও অর্জন করেছেন। আমি আলেমুল গায়েব নই বা গায়েবের কোনো সংবাদ আমি জানি না। তোমাদের কারো ভবিষ্যৎ জানা তো দূরের কথা, আমার নিজের ভবিষ্যৎ আমার জানা নেই। আমাকে ওহীর মাধ্যমে যে জিনিস সম্পর্কে অবহিত করা হয় বা যে জ্ঞান দান করা হয় আমি শুধু সেটুকুই জানি। এর থেকে বেশি কিছু জানার দাবী আমি কখনো করিনি। হারানো বস্তুর সন্ধান জানানো, রোগী সুস্থ হবে না ইন্তেকাল করবে, কখন ইন্তেকাল করবে বা মাতৃগর্ভে পুত্র না কন্যা রয়েছে এসব গায়েবী কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই'।

গায়েবের সংবাদ জানা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ–

যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (এই সৃষ্টিরাজির মধ্যে) একটি পাতা কোথাও ঝরে না যার (খবর) তিনি জানেন না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই- নেই কোনো তাজা সবুজ, (বা ক্ষয়িষ্ণু) শুকনো (কিছু), যার (পূর্ণাঙ্গ) বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই। (সূরা আল আনয়াম- ৫৯)

সুতরাং নবী করীম (সা:) এর প্রতি ভালোবাসার আবেগে তাঁর প্রতি এমন কোনো শব্দ, বিশেষণ, উপনাম প্রয়োগ করা যাবে না যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই জন্যে প্রযোজ্য। মুসলিম হিসাবে বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) কে প্রয়োজন অনুসারে অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়ে দিতেন, এর বাইরে স্বয়ং রাসূল (সা:) গায়েব জানতেন না। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে যে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে মর্যাদার গণ্ডী অতিক্রম করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبرِ سَمِعْتُ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ يَقُوْلُ لاَ تَطْرُوْنِى كَمَا أطْرَتِ النَّصَارَى إبْنِ مَرْيَمَ فَإنَّمَا أنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُه-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উমার (রা:) কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী করীম (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, (সাবধান) আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা সম্পর্কে করেছিলো খ্রিষ্টানরা। আমি একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার বান্দাহ্। তবে তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলবে, আল্লাহর বান্দাহ্ তাঁর রাসূল। (বুখারী, ৩ খণ্ড, হাদীস নং ৩১৯০- আধুনিক প্রকাশনী)

নবী করীম (সা:) কর্তৃক দূরের সংবাদ পরিবেশন

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা:) কে প্রয়োজন অনুসারে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেছেন এবং তিনি তা সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি সকল অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখতেন বা গায়েবের সংবাদ তাঁর জানা ছিলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি এবং অদৃশ্যের সংবাদও প্রকাশ করেননি। শরাব নিষিদ্ধকালে সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সা:) এর কাছে জানতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। মহান মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন ওহী অবতীর্ণ করেছেন তখনই তিনি শরাব নিষিদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব সম্পর্কে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ط إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوْحى لا

তিনি কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না, বরং তা হচ্ছে 'ওহী' যা (তাঁর কাছে) পাঠানো হয়। (সূরা আন নাজম-৩-৪)

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّه ج فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ج إِنِّىْ مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ع

আপনি তাদের বলে দিন, গায়েব সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছে। (সূরা ইউনুস-২০)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ط

আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে)। সূরা আন নাহল-৭৭)

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ ج إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ع

আপনি বলে দিন, আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই হয়; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (নিজের জন্যে সে জ্ঞানের জোরে) অনেক ফায়দাই হাসিল করে নিতে পারতাম এবং (এ কারণে) কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি তো শুধু (একজন নবী, জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা আমার ওপর ঈমান আনে। (সূরা আল আ'রাফ-১৮৮)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أَحَدًا لا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّه يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِم يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه رَصَدًا لا

তিনি (সমগ্র) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না, অবশ্য তাঁর রাসূল ছাড়া-যাকে তিনি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তার আগে-পিছেও তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সূরা আল জ্বিন-২৬-২৭)

হাদীসে জিবরাঈল নামে খ্যাত একটি বহুল পরিচিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত জিবরাঈল (আ:) নবী করীম (সা:)-এর কাছে জানতে চাইলেন, 'কিয়ামত কোন্‌দিন অনুষ্ঠিত হবে?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'যার কাছে এ প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর তুলনায় অধিক অবহিত নন। তবে আমি কিয়ামতের আলামতসমূহ আপনাকে বলতে পারি'। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গায়েব জানতেন সে মিথ্যুক'। (বুখারী)

কোনো একদিন কিছু সংখ্যক বালিকা নবী করীম (সাঃ)-এর পাশেই কবিতা আবৃত্তি করছিলো, তাদের একজন আবৃত্তি করলো, 'আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী রয়েছেন যিনি আগামী দিনের কথা জানেন'। নবী করীম (সাঃ) এ কথা শুনে দ্রুত তাদেরকে এমন কথা বলতে নিষেধ করলেন। (বুখারী)

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) গায়েবের যেসকল সংবাদ জানিয়েছেন তা সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জানিয়েছেন বলেই তিনি প্রকাশ করেছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্যের বা ভবিষ্যতে ঘটিতব্য যে সকল বিষয় তাঁকে জানানো ও প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তা তিনি জানিয়েছেন এবং সে সকল বিষয় থেকে এখানে আমরা কতিপয় ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করছি।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, বিশ্বনবী (সাঃ) এর সমগ্র জীবনই দুঃখ আর যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। মায়ের গর্ভে যখন ছিলেন তখন থেকেই তাঁর জীবন থেকে একের পর এক প্রিয়জন হারিয়ে যাচ্ছিলো। ইন্তেকালের সময় পর্যন্তও এই প্রিয়হারানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। বদরের যুদ্ধে জয়ী হয়ে এলেন মদীনায়, দেখলেন তাঁর কলিজার টুকরা বড় মেয়ের দাফন কাফনের আয়োজন চলছে, তাঁর কলিজার টুকরা কন্যার ইন্তেকালের মর্মান্তিক সংবাদ পথিমধ্যে আল্লাহ তাঁকে জানাননি। ওহূদের ময়দানে প্রিয় চাচা হামজা (রাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের একটি অংশকে হারাতে হবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এ ঘটনা তাঁকে পূর্বে জানানো হয়নি।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনেক বছর পর তিনি পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করার সুযোগ পেলেন, আল্লাহ তা'য়ালার ঘর তাওয়াফ ও নামাজ আদায়ের সুযোগ পেলেন। এ ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়-মন আনন্দে ভরপুর পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু এই আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হলো না। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। নবী করীম (সাঃ) এই যুদ্ধে প্রিয় ভাই জাফরকে হারালেন। শিশুকাল থেকে যে যায়িদকে তিনি লালন পালন করে বড় করেছেন, সেই যায়িদকে হারালেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মত প্রিয়জনকে হারালেন। এ সংবাদ তাঁকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো।

মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে নবী করীম (সাঃ) বেশ কয়েকটি দেশের নেতার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রোম সম্রাটের অধীনে বেশ কয়েকজন নেতা শাসন কাজ পরিচালনা করতো। বালক্কা এলাকায় যে নেতা শাসন করতো তার নাম ছিল শোরহাবিল। নবী করীম (সাঃ) এর দূত হারিস ইবনে ওমায়ের (রাঃ) নবীর পত্র নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন। বর্তমানেই শুধু নয়, সে সময়েও দূত হত্যা করা সকল দেশেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু

শুরহাবিল আন্তর্জাতিক সকল রীতি-নীতি ভঙ্গ করে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের দূতকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো।

এই ঘটনার কিসাস হিসাবে নবী করীম (সাঃ) তিনহাজারের এক মুসলিম বাহিনী সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। রোম সম্রাট নবীর পত্র পেয়ে সাময়িকের জন্য ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল বটে, কিন্তু বৈষয়িক স্বার্থের কারণে ইসলামের কঠিন শত্রুর ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়েছিল। তার অধীনস্ত নেতা শুরহাবিলকে মদীনা আক্রমনের উৎসাহ সে-ই দিয়েছিল। উদিয়মান ইসলামী শক্তিকে অঙ্কুরে ধ্বংস করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কারণ তার বেশ কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র ইসলামের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। অনেকে ইসলাম কবুল করেছিল। তার সাম্রাজ্য কখন ইসলামের শক্তির কাছে নত হয়ে যায় এই ভয়েই সে ছিল কম্পমান।

তার শাসনাধীন সিরিয়ার মায়ান প্রদেশের গভর্ণর ফারুয়া ইতোমধ্যেই ইসলাম কবুল করেছিল। ফারোয়াকে সে তার দরবারে ডেকে নিয়ে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখালো ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় খ্রিষ্টান হবার জন্য। তিনি ইসলাম ত্যাগ করলেন না। তারপর তাকে প্রলোভন দেখানো হলো। তবুও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তারপর তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল রোম সম্রাট হোরাক্লিয়াস। তার শাসনাধীন এলাকার নেতারা যদি ইসলাম কবুল করতে থাকে, তাহলে তো তার সাম্রাজ্যই টিকবে না। সুতরাং শোরহাবিলকে সে উৎসাহ দিল, সৈন্য বাহিনী যা প্রয়োজন আমার কাছে থেকে গ্রহণ করো, তবুও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করতেই হবে।

বিশ্বনবী (সাঃ) এবার ভিন্ন ধরনের ব্যাবস্থাধীনে ইসলামের সেনাবহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মাত্র তিন হাজার সেনা সদস্য। সকলেই তাওহীদের অতন্দ্র সিপাহ্সালার। এক সময়ের ক্রীতদাস, হযরত যায়িদ (রাঃ), যাকে রাসূল (সাঃ) নিজের সন্তানের মতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তাঁকেই এই বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হতো। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাবাহিনী রাসূল (সাঃ) নিযুক্ত করলেন। বিষয়টি ছিলো অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রমধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) কে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কে।

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সেও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে'।

কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইয়াহূদী নবী করীম (সাঃ) এর কথা শুনে মন্তব্য করেছিল, 'খোদার শপথ! এই তিনজনই আজ শাহাদাতবরণ করবে'।

হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা (রাঃ) কে প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করায় কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের ভেতরে জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল। একজন দাস শ্রেণীর লোককে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রমাণ করে দিলেন, আল্লাহর বিধানের সামনে উচ্চনীচ আর মনিব এবং দাসের ভেতরে মানুষ হিসাবে কোনো প্রভেদ নেই। মানুষের সম্মান আর মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় একমাত্র আল্লাহ্ ভীতির দ্বারা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যতো বেশি ভয় করে, সে ততবেশি মর্যাদাবান।

সেনাবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) সাথে সাথেই যাচ্ছেন। তিনি সেনা প্রধানকে বললেন, 'প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে তাহলে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা অগ্রসর হবে ঐ পর্যন্ত যেখানে হারিস তাঁর মহান কর্তব্য পালন করার সময় শাহাদাতবরণ করেছে'।

নবী করীম (সাঃ) সানিয়াতুল বিদা পর্বত পর্যন্ত গিয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করে মদীনায় তিনি ফিরে এলেন। সেনাবাহিনী সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী মদীনা হতে বের হয়েছে, এ সংবাদ গুপ্তচর মাধ্যমে শুরহাবিল জানতে পেরে এক লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলো। রোম সম্রাট এবং আরব গোত্রগুলোর ভেতর থেকে আরো প্রায় এক লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখলো। প্রথম এক লক্ষ ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় এক লক্ষের দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়া হবে।

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনীত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মুকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মুসলিম বাহিনী সেখানেই যাত্রা বিরতি করে নিজেদের ভেতরে আলোচনায় বসলেন। সেনাপতি হযরত যায়িদ (রাঃ) বললেন, 'এ অবস্থায় সামনের দিকে আর অগ্রসর না হয়ে এখানেই অবস্থান করা উচিত। মদীনায় সংবাদ প্রেরণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি'।

শাহাদাতের আকাংখায় উদ্দীপ্ত মুসলিম বাহিনী তাদের সেনাপতির কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার পথে শাহাদাতবরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। শাহাদাতের মধ্যেই রয়েছে জীবনে পরম সাফল্য। শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসাবেই এসে থাকে। এই নিয়ামত সবার ভাগ্যে হয় না। আর সংখ্যা বিচারে মুসলমানগণ বিজয়ের আশা করে না। বিজয় দানের মালিক মহান আল্লাহ্'।

আল্লাহ্ তা'য়ালার পথের নির্ভীক সৈনিক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এর তোজোদৃপ্ত কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর ভেতরে শাহাদাতের অদম্য কামনা তীব্র হয়ে উঠলো। তাঁরা বীরদর্পে সামনের দিকেই এগিয়ে গেলেন। এ ধরনের একটি ঘটনা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এর জীবনে একবার ঘটেছিল। এই সিরিয়াতেই তিনি রোমক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। রোমান সেনাপতি ক্লিভাস সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীসহ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল। মদমত্ত ক্লিভাস তার সুশিক্ষিত রণকৌশলি বিপুল বাহিনী নিয়ে বড় গর্ব করছিল। মহাসত্যের পতাকাবাহী তৌহিদের নিশানবরদার হযরত খালিদ (রাঃ) তাঁর স্বল্প সংখ্যক বাহিনী নিয়ে দামেস্ক নগরী অবরোধ করেছিলেন।

ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী বীর কেশরী খালেদ (রাঃ) সত্যের উজ্জ্বল শিখায় আলোকিত করার ইচ্ছায় কয়েকজন সাথীকে নিয়ে ক্লিভাসের প্রাসাদে গমন করলেন। বাতিল শক্তির প্রতিভূ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গর্বিত সেনাপতি শক্তির দর্পে তার দোভাষীর মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসের বীর সম্রাট তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী ইসলামের বিপ্লবী সিপাহসালার বীর কেশরী খালিদকে ভীতি প্রদর্শন করছিল। কালিমার আওয়াজ বুলন্দ করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে খালিদ আগমন করেছেন দামেস্কে।

ক্লিভাসের দোভাষী জারজিসের কথা শুনে আল্লাহর তরবারী খালিদ (রাঃ) আহত সিংহের মতই গর্জন করে উঠলেন, 'ঐ আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করেই ঘোষনা করছি, তোমাদের সৈন্য সংখ্যাকে আমরা ঐ ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের সাথেই তুলনা করি, শিকারী যে ঝাঁক ধরে খায়। শিকারী কখনো পাখির বৃহৎ ঝাঁক দেখে ভয় পায় না বরং আনন্দিত হয়। পাখির বিশাল ঝাঁক শিকারীর মনে আনন্দ বৃদ্ধি করে। পাখির ঝাঁকের চারদিকে জালের বেষ্টনী দিয়ে শিকারী অনায়াসে সে পাখি ধরে ফেলে। হে জারজিস! তুমি তোমার সেনাপতি ক্লিভাসকে জানিয়ে দাও! তাওহীদের সেনাবাহিনী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা শাহাদাতবরণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত মনে করে যুদ্ধের ময়দানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাহাদাত নামক নিয়ামতের জন্য এই বাহিনী কতটা ব্যাকুল তা তোমরা একটু পরেই নিজের চোখে দেখতে পাবে। তাঁরা শাহাদাতের অলিন্দে জীবনের সফলতার সন্ধান লাভ করে। সত্যের পতাকাধারীদের সিদ্ধান্তই শাহাদাতবরণ করা। তাঁরা শাহাদাতের মৃত্যুকে হন্যে হয়েই খুঁজে ফিরে। মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য তাদেরকে তোমরা মৃত্যুর ভয় দেখাও? শাহাদাতবরণ করার জন্যই যারা যুদ্ধের ময়দানে আগমন করেছে, পৃথিবীতে জীবিত থাকা তাদের কাছে একটি আপদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাও, তুমি তোমার সেনাপতিকে আমার কথাগুলো জানিয়ে দাও'।

সেই খালিদ (রাঃ)ও মূতার প্রান্তরে এসেছেন। যদিও তিনি সামান্য কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত যায়িদ (রাঃ) দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর (রাঃ) পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষের এক বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। ময়দানের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। হযরত জাফর (রাঃ) এর ঘোড়া আহত হলো।

তিনি পদাতিক অবস্থায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে ফেললে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে ফেললে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডীন রাখলেন। শত্রু পক্ষ তাঁকে শহীদ করে ফেললো। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তাঁকে জান্নাতে এমন দু'টো পাখা দান করা হয়েছে যে, সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন'।

এ কারণে হযরত জাফর (রাঃ) এর উপাধি হয়েছে, তাইয়্যার। অর্থাৎ যে উড়ে বেড়ায়। চাচাত ভাই জাফরকে নবী করীম (সাঃ) খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর শাহাদাতে নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলেন। তিনি বেদনাহত হয়ে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এসে তাঁকে জানিয়েছিলেন, মহিলাগণ হযরত জাফরের জন্য মাতম করছে। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে সেই জাহেলি প্রথায় মাতম করতে নিষেধ করেছিলেন।

এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। প্রচণ্ড বেগে সে সময় যুদ্ধ চলছে। তরবারী চালনা করতে করতে তিনি বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে একটুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এইটুকু খেয়ে তরবারী চালনা করুন'।

গোস্তের টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরো ফেলে দিয়ে বললেন, 'এ পৃথিবীতে আমার খাবারের কোনো প্রয়োজন আর নেই'।

ছুটে গেলেন তিনি রণাঙ্গনে। এক সময় তিনিও শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। মূতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির অধীনে হযরত খালিদ (রাঃ) জেনারেলের সকল অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। পরপর তিনজনই যখন শাহাদাতবরণ করলেন তখন হযরত সাবিত ইবনে আকরাম

(রাঃ) যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে নিলেন, যেন মুসলিম বাহিনীর ভেতরে কোনো ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

পতাকা হাতে তিনি ছুটে এলেন হযরত খালিদ (রাঃ) এর কাছে। তিনি বললেন, 'হে খালিদ! এই পতাকা তুমি ধরো'।

দুই লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই হাজার সৈন্য। যাদের ভেতরে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এই বাহিনীতে শামিল রয়েছেন। তাদের ওপরে নও মুসলিম খালিদের যে নেতৃত্ব দেবার কোনো অধিকার নেই এ কথা হযরত খালিদের থেকে আর কে ভালো বুঝতো! তিনি আপত্তি জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে বললেন, 'অসম্ভব! আমি এ পতাকা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনি বদর ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনিই এই পতাকার যোগ্যতম ব্যক্তি'।

হযরত সাবিত (রাঃ) বললেন, 'আমি এই পতাকা তোমার জন্যই উঠিয়ে এনেছি। আমার থেকে তোমার সামরিক দিক দিয়ে যোগ্যতা অধিক। তুমি এ পতাকা ধরো'।

এবার হযরত সাবিত (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজি আছো?'

সমবেত বাহিনী সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'অবশ্যই আমরা রাজি আছি'।

হযরত খালিদ (রাঃ) জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার মুসলিম বাহিনী দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) বলেন, 'সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে সাতটি তরবারী ভেঙ্গেছিল। সর্বশেষে একটি ইয়েমেনী তরবারী টিকে ছিল'।

বুখারীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে আটটি তরবারীর কথা। নবী করীম (সাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ) এর উপাধি দান করেছিলেন, সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন ছিলেন ইসলামের কট্টর শত্রু, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে হয়েছিলেন ইসলামের পরম বন্ধু। (উসুদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৪, রিজানুল হাওলার রাসুল, পৃষ্ঠা নং-২৮৬-২৮৭, আল ইসাবা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪১৩)

হযরত জাফর (রাঃ) এর গোটা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁর শরীরে তরবারী এবং বর্শার ৯০টি আঘাত দেখেছি। সকল আঘাতগুলো ছিল সামনের দিকে'।

এই যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ নবী করীম (সাঃ) কে মদীনাতেই ফেরেশতার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিলো। কে কখন শাহাদাত বরণ করছেন, নবী করীম (সাঃ) সে সংবাদ অবগত হয়ে তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে শোনাচ্ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী

করীম (সাঃ) এর সামনে যেন মূতার প্রান্তর তুলে ধরা হয়েছিল। যুদ্ধের দৃশ্য দেখে দেখে তিনি বর্ণনা করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন হযরত ইয়ালী ইবনে মাম্বাহ (রাঃ)। তিনি সংবাদ বলার আগেই নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'তুমিই সংবাদ বলবে না আমি তোমাকে শোনাবো ?'

সংবাদ আনয়নকারী সাহাবী আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে যুদ্ধের ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনি বাড়িয়েও বলেননি কিছু কমও বলেননি'।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) শাহাদাতবরণ করার পরে মুসলিম বাহিনীর ভেতরে কিছুটা বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে কিছু সংখ্যক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে মদীনায় চলে এসেছিল। মদীনাবাসী তাদেরকে ময়দান ত্যাগ করে চলে আসার জন্য লজ্জিত করেছিল। নবী করীম (সাঃ) আরো সৈন্য সংগ্রহ করে মূতার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে প্রেরণ করেছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম দিনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হলো। হযরত খালিদ (রাঃ) নতুন এক কৌশলে পরের দিন সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। তাঁর এই কৌশলের কারণে রোমক বাহিনী ধারণা করেছিল, মদীনা থেকে বহু সৈন্য মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। ফলে তাদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়ে তারা ময়দান ত্যাগ করে পালিয়েছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) প্রচুর গণীমতের সম্পদসহ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মদীনায় আগমন করেছিলেন।

যারা ময়দান ত্যাগ করে মদীনায় চলে এসেছিল, তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, 'এরা পলাতক নয়, আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় এরা পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করবে'। (বুখারী)

কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এই মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু এই বর্ণনা ঠিক নয়। কারণ, যে সময় মূতার প্রান্তরে যুদ্ধ চলছে, সে সময় নবী করীম (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার তরবারী খালিদ এই মাত্র মুসলিম বাহিনীর পতাকা ধারণ করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম বাহিনীকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করেছেন'। (বুখারী)

নবী করীম (সা:) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী

নবী করীম (সা:) যখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তখন নবী পরিবারের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব পালন করতেন হযরত বিলাল (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ্ হাওজানী (রা:) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালার রাসূল (সা:) এর পারিবারিক ভরণ-পোষণের অবস্থা কেমন ছিল?'

হযরত বিলাল (রা:) তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'নবী করীম (সা:) এর পারিবারিক যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব আমার ওপরে অর্পিত ছিল। আল্লাহ্র নবীর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। কোনো মেহ্মান এলে আমাকে আদেশ করা হতো তাকে আপ্যায়নের জন্য। আমি ঋণ করে হলেও সে ব্যবস্থা করতাম। পরে আবার সে ঋণ পরিশোধ করে দিতাম'। (আবু দাউদ)

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, নবী করীম (সা:) যখন ১২ বছর বয়সে সর্বপ্রথম চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন করেন সে সময় হযরত বিলালের জন্ম। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, নবী করীম (সা:) এর নবুয়্যাত লাভের ২৮ বছর পূর্বে হযরত বিলাল (রা:) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তবে এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, হযরত বিলাল (রা:) বিশ্বনবী (সা:) এর থেকে ১২ বা ১৪ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর পিতা রাবাহ্ ছিলেন হাবশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে মক্কায় এসে কুরাইশদের বনী জুমাহ্ বংশের দাসত্বের জীবনে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। হযরত বিলাল (রা:) যে সময় পৃথিবীতে চোখ মেলে ছিলেন, সে সময় পৃথিবী ছিল শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মক্কার উমাইয়া ইবনে খালফ ছিলো নৃশংতা ও নির্মমতার প্রতীক। হযরত বিলাল (রা:) ছিলেন এই লোকটির কৃতদাস, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁর ওপরে উমাইয়া লোমহর্ষক নির্যাতন করেছিলো। এ লোকটি ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের অন্যতম একজন ছিল। মানব ইতিহাসে সে যুগে যতগুলো কঠোর হৃদয়ের মানুষের আগমন ঘটেছিল, উমাইয়া ছিল তাদের একজন। হযরত বিলাল (রা:)-এর জীবনের ২৮ টি বছর এই উমাইয়া ইবনে খালফের কাছেই দাসত্ব করে কাটিয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে জন্মগতভাবেই সর্বোত্তম স্বভাব চরিত্র দান করেছিলেন। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার মত প্রকৃত জ্ঞান তাঁর ছিল। ইসলাম পূর্ব জীবনেও তাঁর চরিত্রে খারাপ কিছু স্পর্শ করতে পারেনি। এ কারণে সমাজের উত্তম চরিত্রের লোকগুলোর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নবী করীম (সা:) এর সাথেও হযরত বিলাল (রা:) এর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

এ কারণে তিনি নবী করীম (সা:) কে অত্যন্ত কাছ থেকে জানার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফল এই হয়েছিল যে, রাসূল (সা:) নবুয়্যাত লাভ করে মহাসত্যের দিকে মানুষকে গোপনে আহ্বান করার প্রাথমিক দিকেই হযরত বিলাল (রা:) সাড়া দিয়েছিলেন। প্রথম যে ভাগ্যবান সাত ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন হযরত বিলাল (রা:) ছিলেন তাদের একজন। এ কারণে ইসলামের ইতিহাস 'সাবিকুনাল আওয়ালিন' এর মত বিশাল মর্যাদার উপাধি তাঁকে দান করেছে। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ঘৃণ্য কর্মধারা ছিলো, সমাজের অর্থ, বিত্তহীন দুর্বল শ্রেণী যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি অত্যাচার করলেই তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করবে এবং ভয়ে আর কেউ মুহাম্মাদ (সা:) এর সাথে থাকবে না। বর্তমান যুগেও ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রে সেই একই ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে ইসলাম বিরোধিরা। সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, রাষ্ট্র বিরোধী ও সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ইসলামপন্থী লোকগুলোর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়, যেনো আর কেউই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে।

উমাইয়া ইবনে খালফ যখন জানতে পারলো তাঁরই দাস বিলাল তাঁকে না জানিয়ে মুহাম্মাদ (সা:)-এর আদর্শ গ্রহণ করেছে। তখন সে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে পড়লো। তাঁকে ডেকে সে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আমি জানতে পারলাম তুমি মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ গ্রহণ করেছো?'

তাওহীদের নির্ভীক সেনানী হযরত বিলাল (রা:) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ গ্রহণ করেছি'।

কোথায় কার সামনে কি ঘোষণা দিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। সামান্যতম ভীতিও তাঁকে স্পর্শ করলো না। এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে কি পরিণতি ঘটবে তাও তাঁর অজানা ছিল না। সবার ওপরে মহান আল্লাহই একমাত্র সত্য, ঈমানের এই দৃপ্ত প্রত্যয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর রব একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো শক্তির দাসত্ব করছেন না। হযরত বিলালের নির্ভীক উচ্চারণ উমাইয়ার অপবিত্র শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। সে তাঁর চেহারা বিকৃত করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললো, 'তুমি আমাদের আদর্শ ত্যাগ করতে পারো না। এখনো সময় আছে মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের আদর্শে ফিরে এসো। আর যদি না আসো তাহলে জেনে রেখো, ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করতে হবে'।

একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত যাঁর হৃদয়ে আর কারো ভয়ের কোনো স্থান নেই, সে কি আর উমাইয়ার মতো এক পাপীষ্ঠের হুমকির মুখে ইসলাম ত্যাগ করতে পারে!

তাওহীদের প্রেম সুধায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিলাল (রা:) জড়তাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমার এই রক্ত মাংসে গড়া দেহটির ওপর তোমার শক্তি কার্যকর হতে পারে। কিন্তু আমার হৃদয় দিয়েছি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) কে। সেখানে তোমার শক্তি কার্যকর হবে না। আমি এক আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি। তোমাদের হাতের বানানো মাটির মূর্তির সামনে আমি মাথানত করতে পারি না'।

সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থ বিত্তহীন সামান্য গোলামের দুঃসাহসী উচ্চারণে উমাইয়া প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। পরক্ষণেই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় গর্জন করে হযরত বিলাল (রা:) এর কালো দেহটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নির্যাতনের এক পর্যায়ে অবশেষে নির্যাতক নিজেই ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শুরু করলো চাবুকের আঘাত। কঠিন চাবুকের প্রতিটি আঘাতে বিলাল (রা:) এর কালো শরীরটা রক্তের আলপনায় লাল হয়ে গেল। তিনি অবিশ্রান্তভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাম উচ্চারণ করতে থাকলেন। আল্লাহ তা'য়ালার নাম যেন তাঁর সকল যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ মুছে দিচ্ছে। উমাইয়া তাঁকে আঘাতের পর আঘাত করেও যখন মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ ত্যাগ করাতে ব্যর্থ হলো, তখন সে লোহা আগুনে পুড়িয়ে তা হযরত বিলাল (রা:) এর পবিত্র শরীরে ছ্যাঁকা দিতে লাগলো।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হযরত বিলাল (রা:) এর দেহ থেকে রক্ত ঝরছে, দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে উমাইয়া বেঁধে রাখলো। খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে দিলো। সমগ্র রাত তাঁকে বেঁধে রেখে পরের দিন সকালে দু'হাত রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো মক্কার মরু প্রান্তরে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে বালুকা রাশির ভেতর থেকে যেন অনল প্রবাহিত হচ্ছে। আগুনের মতো উত্তপ্ত বালুর ওপরে হযরত বিলাল (রা:) এর রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহটা চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হলো। তিনি যেন নড়তে না পারেন, তাঁর বুকের ওপরে বিশাল পাথর খন্ড চাপা দেয়া হলো। শরীর বালির উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে, বুকের ওপরে পাথর চাপা, শ্বাস গ্রহণ করা যাচ্ছে না। প্রাণভরে একবার শ্বাস নেয়ার জন্য বুকের ভেতরটা খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতই ছটফট করছে। দেহের ক্ষতগুলো আগুনের মতই জ্বলছে। এক ফোটা পানির জন্য বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত বিলাল (রা:) কে জীবনের এই কঠিন মুহূর্তেও উমাইয়া প্রস্তাব দিল, 'এখনো মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ ত্যাগ কর, অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবি'।

হযরত বিলাল (রা:) তাঁর জীবনের এই চরম মুহূর্তেও ব্যথায় জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত হাতটি কোনো মতে উঁচু করে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'আহাদ, আহাদ, আহাদ'। সমগ্র দিন তাঁর ওপরে এই লোমহর্ষক নির্যাতন

করে শেষ বিকেলে উমাইয়া মক্কার উশৃংখল যুবকদের হাতে আল্লাহর এই সাহাবীকে উঠিয়ে দিল। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, হযরত বিলাল (রাঃ) কে মক্কার সন্ত্রাসী যুবকরা তাঁর গলায় রশি বেঁধে কন্টকাকীর্ণ ও পাহাড়ী পথ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। উটের পায়ের সাথে তাঁকে বেঁধে উটকে তাড়ানো হতো। ফলে তাঁর দেহের গোস্ত ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতো। এভাবে দিনের পর দিন তাকে অনাহারে রেখে তাঁর ওপরে বর্ণনাতীত নির্যাতন করা হয়েছে কিন্তু তাঁকে আদর্শচ্যুত করা যায়নি।

ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) এর এ করুণ অবস্থা জানতে পেরে তিনি উমাইয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে উমাইয়া! তুমি এই নির্দোষ দাসটির উপরে অত্যাচার করছো কেনো? সে যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আল্লাহর দাসত্ব করে এতে তোমার কোনো ক্ষতি সে করছে না। তুমি যদি তাঁর ওপরে দয়া করো তাহলে আখিরাতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার প্রতি দয়া করবেন'। আল্লাহ্ তা'য়ালার দুশমন জালিম উমাইয়া বিদ্রুপ করে বললো, 'আমার দাস তাকে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো। এতে কারো কিছু বলার নেই। আমি ঐ আখিরাত বিশ্বাস করি না'। হযরত আবু বকর (রাঃ) উমাইয়ার কথার জবাবে বললেন, 'দেখো, তুমি একজন শক্তিশালী নেতা। এটা তোমার পক্ষে শোভা পায় না যে তুমি একজন অসহায় মানুষের ওপরে নির্যাতন করবে। এটা তোমার সম্মানের বিপরীত কাজ'।

এ কথায় উমাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে বললো, 'হে আবু বকর! তোমার দেখছি এই দাসটির প্রতি দারুণ মমতা! একে তুমি কিনে নিলেই পারো'। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ সুযোগই কামনা করছিলেন। তিনি দ্রুত বললেন, 'আমি প্রস্তুত আছি। বলো এর বিনিময়ে তুমি কি চাও?' উমাইয়া জানালো, 'তোমার দাস ফুসতাতকে আমাকে দাও আর একে নিয়ে যাও'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। জালিম উমাইয়া অবাক হয়ে গেল। কারণ হযরত আবু বকরের দাস ফুসতাত অত্যন্ত মান সম্পন্ন দাস ছিল। মক্কার লোকদের কাছে তাঁর সুনাম ছিল। উমাইয়া ধারণা করেছিল, আবু বকর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হবে না। একটি দক্ষ এবং বিশ্বস্ত লোকের সাথে বিলাল (রাঃ)-কে বিনিময় করতে রাজী দেখে উমাইয়ার লোভ বৃদ্ধি পেলো। সে জানালো, 'ফুসতাতকে দেবে আর চল্লিশ আওকিয়া রৌপ্য দিতে হবে'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এতেও রাজী হলেন। শুধু বিলাল (রাঃ) কেই নয়, তিনি দাসত্বের বন্ধনে বন্দী নির্যাতিত অনেক মুসলমানকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। উমাইয়া আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললো, 'আবু বকর! তোমাকে আমি একজন বুদ্ধিমান

হিসাবেই জানতাম। তোমার স্থলে আমি হলে এই দাসটিকে সামান্য পয়সা দিয়েও কিনতাম না'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে সাথে নিয়ে উমাইয়াকে বললেন, 'তুমি আসলে এর মূল্য জানো না। প্রয়োজনে আমি এই মানুষটিকে কিনে নেয়ার জন্য আমার সকল সম্পদ দিয়ে দিতাম। আমি যদি ইয়েমেনের বাদশাহ হতাম, সে বাদশাহীর বিনিময়েও আমি এই দাসকে গ্রহণ করতাম'।

তিনি হযরত বিলালকে সাথে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে সকল ঘটনা জানালেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) খুশী হয়ে বললেন,'তুমি আমাকেও এই কাজে অংশীদার বানিয়ে নাও'। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিলালকে মুক্ত করে দিয়েছি'। হযরত বিলাল (রাঃ) নবীর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) মদীনায় মসজিদ নির্মাণ করে হযরত বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

মদীনার আউস গোত্রের প্রভাবশালী নেতা হযরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) মক্কায় উমরা করার উদ্দেশ্যে এসে আল্লাহর দুশমন উমাইয়ার মেহমান হয়েছিলেন। তার সাথে হযরত সায়াদ (রাঃ) এর পূর্ব থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় গেলে হযরত সায়াদ (রাঃ) এর মেহমান হত আর সায়াদ (রাঃ) মক্কায় এলে উমাইয়ার মেহমান হতেন। হযরত সায়াদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরে প্রথম মক্কায় এসে উমাইয়ার মেহমান হলেন। তিনি উমাইয়ার সাথে কা'বাঘর তাওয়াফ করার জন্য বের হলেন। আবু জাহিল তাকে দেখে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার সাথের লোকটির পরিচয় কি?' উমাইয়া পরিচয় দেয়ার পরে আবু জাহিল রুক্ষ্ম কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমরা আদর্শ ও দেশদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছো, বিষয়টি আমাদের কাছে অসহনীয়। এ অবস্থায় তোমরা মক্কায় আসবে এটাও আমরা পছন্দ করি না। খোদার কসম! তুমি যদি উমাইয়ার সাথে না থাকতে তাহলে জীবিত ফিরে যেতে না'।

হযরত সায়াদ (রাঃ) নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তোমরা যদি আমাদেরকে মক্কায় হজ্জ আদায় করতে আসতে না দাও, আমরাও তোমাদের ব্যবসার পথ অর্থাৎ সিরিয়া যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিব'। উমাইয়া ইবনে খালফ তার বন্ধু হযরত সায়াদকে বললো, 'সায়াদ, আবু হাকামের (আবু জাহিল) সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো, কারণ সে এখানের নেতা'। হযরত সায়াদ (রাঃ) উমাইয়াকে বললেন, 'উমাইয়া, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আবু জাহিল তোমার হত্যাকারী'। উমাইয়া আতঙ্কিত কণ্ঠে জানতে

চাইলো, 'সে কি আমাকে মক্কায় হত্যা করবে?' হযরত সায়াদ (রাঃ) বললেন, 'রাসূল (সাঃ) এ কথা বলেননি কোথায় সে তোমাকে হত্যা করবে'।

এ কথা শুনে উমাইয়া ইবনে খালফ আতঙ্কে বিচলিত হয়ে পড়লো। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য প্রমাণীত হয় তা মক্কার লোকগুলো ইতোপূর্বেও প্রমাণ পেয়েছে। এ কারণে ভয়ে সে কথাটা তার স্ত্রীকেও জানালো। উমাইয়া শপথ করেছিল, মক্কার বাইরে সে যাবে না। কিন্তু মক্কার বাইরে সে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। আবু জাহিল তাকে বদরের যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছিলো। প্রথমে সে যেতে রাজী হয়নি, কিন্তু আবু জাহিল তাকে আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে কিছু কথা বলার পরই সে তার মৃত্যুস্থান বদরের প্রান্তরে গিয়েছিলো অর্থাৎ উমাইয়াকে চম্বুকের মতোই মৃত্যু সেখানে টেনে নিয়েছিলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শত্রুপক্ষের নেতৃবৃন্দ বদরের প্রান্তরে কে কোন্ স্থানে নিহত হবে। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা দেখেছি নবী করীম (সাঃ) যেসব স্থান দেখিয়েছিলেন ঐসব স্থানেই তাদের লাশ পড়েছিলো। (মুসলিম)

বদরের প্রান্তরে ইসলামের দুশমনরা বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো। সমগ্র জীবন উমাইয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলো, বিশাল বপু আর স্থুল দেহের অধিকারী ছিলো আল্লাহর এই দুশমন। আত্মরক্ষার্থে উমাইয়া বদরের প্রান্তর থেকে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। হযরত বিলাল (রাঃ) এ সময় মুসলিম বাহিনীর আহারের জন্য ময়দা পিষছিলেন। তাঁর চোখেই পড়েছিল, উমাইয়া পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। তাছাড়া ইসলামের বিখ্যাত শত্রুগুলোর নাম মদীনার অলি গলিতে ছড়িয়েছিল। হযরত বিলাল (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে মদীনার আনসারদেরকে উমাইয়ার কথা জানিয়ে দিলেন। আল্লাহর নবীর সাহায্যকারীরা শাণিত অস্ত্র হাতে উমাইয়ার দিকে উল্কার বেগে ছুটে গেল, মদীনার আনসাররা আল্লাহর দুশমন উমাইয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলো। বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত ইসলাম বিরোধীদের লাশ বদরের প্রান্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল এবং প্রচণ্ড রোদে বিকৃত দেখাচ্ছিল। উমাইয়ার শরীরে ছিল যুদ্ধের মূল্যবান পোষাক। তা খুলে নেয়ার জন্য সাহাবীরা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই এই জালিমের লাশ পচে ফুলে দেহের পোষাকের মধ্যে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, দেহ থেকে পোষাক খুলতে গেলে উমাইয়ার শরীরের গোস্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। পরে সাহাবায়ে কেরাম তাকে ঐ অবস্থাতেই মাটি ও পাথর দিয়ে চাপা দিয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

নবী করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী, নিহত পারস্য সম্রাট

নবী করীম (সাঃ) এর পত্র নিয়ে পারস্য সম্রাটের দরবারে পত্র গিয়েছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজায়ফা (রাঃ)। পারস্য সম্রাটের দরবারের নিয়ম ছিল সম্রাট যতক্ষণ আদেশ না করতেন ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি মাথা উঠাতো না। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) দরবারে প্রবেশের সময় এই নিয়ম তাঁকে একজন জানিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'আমার পক্ষে মাথানত করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা এক আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত আর কারো কাছে মাথানত করি না'।

প্রহরী তাঁকে জানালো, এই নিয়ম পালন না করলে সম্রাট কারো পত্র গ্রহণ করেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজায়ফা (রাঃ) দরবারে প্রবেশ করলেন। সম্রাট দরবারে প্রবেশ করে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। উপস্থিত সকলেই নত মস্তকে রয়েছে কিন্তু একজন লোক মাথা সোজা রেখে গর্বিত ভঙ্গীতে বসে আছে। তিনি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। তাকে বলা হলো, লোকটি এসেছে সেই আরব থেকে। আপনার জন্য সে একটি বার্তা এনেছে।

সম্রাট তাঁকে কাছে আসতে বললেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কাছে এসে তাকে সালাম জানিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর পত্র তার হাতে হস্তান্তর করলেন। নবী করীম (সাঃ) সম্রাটের কাছে লিখেছিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর কাছে। যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত আর কেউ দাসত্ব পাবার উপযুক্ত নয় এবং আমি তাঁর প্রেরিত রাসূল। জীবিত মানুষকে সতর্ক করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমার প্রতি আমার আহ্বান, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তোমার ওপর আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হবে। যদি না করো তাহলো তোমার শাসিত প্রজাদের যাবতীয় অন্যায় কাজের জন্য তুমি দায়ী হবে।

পত্রের শেষে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র নাম মুবারক সীলমোহর করা ছিল। অর্থাৎ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (সাঃ) সীল মোহর করা ছিল। পারস্যের সম্রাট খসরু ছিল চরম পাপাচারী। পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ তার সমমর্যাদার হতে পারে, এ বিষয়টি সে মানতো না। নবী করীম (সাঃ) এর পত্র পাঠ করার সাথে সাথে সে অহঙ্কারে গর্জে উঠলো। চিৎকার করে বললো, 'এতবড় সাহস কার! আরবের সামান্য একজন মানুষ আমাকে বলে আমার আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য? তারপরে সে আমার নামের পূর্বে নিজের নাম লিখেছে?'

চরম অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে সে নবী করীম (সা:) এর পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো। তার ধৃষ্টতার এখানেই শেষ হলো না। ইয়েমেনের গভর্ণর বাজানকে আদেশ দিল, 'আরবের সেই মুহাম্মাদ (সা:) কে গ্রেফতার করে তার দরবারে প্রেরণ করা হোক'।

নবী করীম (সা:) কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে পারস্য সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী বাজান দুইজন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় প্রেরণ করলো। নবী করীম (সা:) এর দরবারে তারা উপস্থিত হয়ে রাসূল (সা:) কে জানালো, 'আমরা পারস্য সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। আপনি স্বেচ্ছায় যদি আমাদের সাথে না যান তাহলে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য হবে'।

নবী করীম (সা:) তাদেরকে অত্যন্ত সমাদর করে মেহমানদারী করলেন। রাসূল (সা:) এর সাথে তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার দেখে পারস্য রাজের কর্মচারীবৃন্দ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। তারা পুনরায় জানালো, 'আপনি যদি আদেশ অনুসারে উপস্থিত হন তাহলে ইয়েমেনের গভর্ণর আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। আর তা যদি না করেন তাহলে আপনার শহর তিনি মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন'।

আল্লাহর নবী (সা:) তাদেরকে জানালেন, 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি আগামী কাল দিব'।

তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মেহমান খানায় রাখা হলো। তারা অবাক হলো, পারস্য সম্রাটের আদেশে মানুষ থরথর করে কাঁপে। অথচ এই মানুষটির মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া নেই। পরের দিন তারা নবী করীম (সা:) এর দরবারে এলেন। আল্লাহর রাসূল (সা:) তাদেরকে জানালেন, 'তোমাদের সম্রাট আর এই পৃথিবীতে জীবিত নেই। তার সন্তান তাকে গতরাতে নিহত করেছে। তোমাদের গভর্ণর বাজানকে বলবে, পারস্য সম্রাট যেমন আমার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা পারস্য সাম্রাজ্যকে তেমনি টুকরো টুকরো করে দিবেন। বাজানকে বলবে, সে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাকে আমি তার পদেই বহাল রাখবো। কারণ অচিরেই ইসলাম পারস্যের সিংহাসনে বসবে'।

পারস্যের দূতগণ অবাক হয়ে ইয়েমেনে ফিরে গেল। সেখানেই তারা জানতে পারলো সম্রাট খসরুর সন্তান সিরওয়াহ্ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছে। সে বাজানের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেছে, দ্বিতীয় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আরবের সেই নবীর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। ইয়েমেনের গভর্ণর তার দূতের মুখে নবী করীম (সা:) সম্পর্কে সংবাদ শুনে সে এবং রাজ দরবারের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছু দিন পর ইয়েমেনের গভর্ণর বাজানের মনে পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, জীবনের বাকী দিনগুলো সে

নবী করীম (সাঃ) এর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিবে। এ কারণে সে গভর্ণরের পদ হতে পদত্যাগ করে মদীনার পথে যাত্রা করেছিল। পথে তিনি এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। ইতিহাস সাক্ষী, নবী করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হতে বেশি দেরী হয়নি।

সুরাকা, সেদিন তোমাকে কতই না সুন্দর দেখাবে!

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। ইসলামের দুশমনরা সার্বক্ষণিক প্রহরার ব্যবস্থা করলো যাতে মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করতে না পারেন। এমনকি জালিমের দল আল্লাহর নবীকে হত্যার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে মদীনার পথে নিয়ে গেলেন। দুশমনরা নবী করীম (সাঃ) কে না পেয়ে ঘোষণা করেছিলো, তাঁর সন্ধানদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের লোভে নির্বোধ কিছু মানুষ আল্লাহর নবীর সন্ধানে বের হয়েছিল। সুরাকা ইবনে মালিক (রাঃ), তিনি মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, একদিন আমি আমার গোত্রের পরামর্শ সভায় বসে আছি, এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, 'আমি এই মাত্র একটি দলকে দেখে এলাম তাঁরা মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমার মনে হয় উক্ত দলে মুহাম্মাদ (সাঃ) আছেন'।

এ কথা আমার কানে প্রবেশ করতেই আমি তাকে ইশারা দিলাম সে যেন বিষয়টি আর কাউকে না বলে। তারপর আমি সেখান থেকে উঠে বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সাথে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে পড়লাম। একস্থানে গিয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কোনো ক্ষতি আমি করতে পারবো কিনা।

আমি 'না' বোধক চিহ্ন দেখতে পেলাম। তবুও আমি বিরত না হয়ে তাদের পিছনে ছুটলাম। অবশেষে তাঁরা আমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে গেল। এ সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিক্ষেপ করলো। আমি আবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারেও অকৃতকার্যতার চিহ্ন বের হলো। তবুও আমি তাদেরকে ধরার জন্য অগ্রসর হলাম।

এবার আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটো নীচে বসে গেল। আমি ঘোড়ার পা উঠাতেই সে গর্ত থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকলো। তখন আমি বুঝলাম মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ধরা যাবে না। তারপর তাদেরকে আহ্বান করে বললাম, খোদার শপথ! তোমাদের সম্পর্কে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। আমি জুসুমের সন্তান সুরাকা। আমি তোমাদের ক্ষতির কারণ হবো না। তোমরা একটু থামো, তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে।

নবী করীম (সা:) হযরত আবু বকর (রা:) কে বললেন, তাঁর কাছ থেকে জেনে নাও সে আমাদের কাছে কি চায়?

হযরত আবু বকর (রা:) জানতে চাইলেন আমি তাদের কাছে কি চাই। আমি বলেছিলাম, আমাকে কিছু লিখে দিন, যা আমার এবং আপনার মধ্যে একটা প্রমাণ হয়ে থাকবে।

তারপর আমি তাদেরকে মক্কার লোকদের ঘোষনা সম্পর্কে জানালাম। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা:) নবী (সা:) এর নির্দেশে 'মুক্তিনামা' লিখে দিয়েছিলেন। আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে হযরত আবু বকর (রা:) এর গোলাম তা লিখে দিয়েছিলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সা:) সে সময় সুরাকাকে বলেছিলেন, 'সে সময় তোমাকে কতই না সুন্দর দেখাবে যখন পারস্য সম্রাটের অলংকারাদি তোমার দেহে শোভা পাবে'।

বিশ্বনবী (সা:) এর সেদিনের কথা বাস্তবে রূপলাভ করেছিল হযরত উমার (রা:) এর শাসনামলে। পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার পরে হযরত উমার (রা:) পারস্য সম্রাটের অলংকারসমূহ হযরত সুরাকাকে পরিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। নবী করীম (সা:) আর হযরত আবু বকর (রা:) সে সময় পৃথিবীতে ছিলেন না। প্রায় তের চৌদ্দ বছর পূর্বের সে কথা স্মরণে এলে হযরত সুরাকা (রা:) এর আনন্দের পরিবর্তে তাঁর দু'চোখ অশ্রু সরোবরে প্লাবিত হয়ে পড়েছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস

হযরত ছাওবান (রা:) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা:) বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের জন্য এমন একটি সময় আসবে যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের দিকে।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য থাকবো যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হবে?

নবী করীম (সা:) বললেন- না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা হবে প্রচুর। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানির ফেনা সমতুল্য। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তোমাদের মনে তাদের ভয় প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি দেখা দেয়ার কারণ কী হবে?

নবী করীম (সা:) বললেন, যেহেতু সেদিন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

উল্লেখিত হাদীসে স্পষ্ট যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা বর্তমান মুসলমানদের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন। নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত লোকের সংখ্যা হবে অগণিত। কিন্তু তাদের ঈমানী শক্তি থাকবে না, তারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিবে। ইসলামের শত্রুদের আনুগত্য করে হলেও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামের দুশমনরা সংখ্যায় অল্প হলেও তারাই মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করবে, মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করাকে মুসলমানরা পসন্দ করবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকবে যে, তাদের চোখের সামনে অন্য মুসলিম নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারা মৌখিক প্রতিবাদও করবে না। মুসলমানরা নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-মত্তা ইসলামের দুশমনদের অধীন করে দিবে। নিজেদের অর্থ-সম্পদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা মুসলমানদের থাকবে না, যদিও তারা সংখ্যায় হবে বিপুল।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইয়াহূদীদের সাথে মুসলমানদের বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। সে যুদ্ধে ইয়াহূদীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। এমনকি তারা পর্বত, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে। সে সময় পর্বত, বৃক্ষ ও পাথর খন্ড থেকে আওয়াজ উত্থিত হবে, হে মুসলিমগণ, এদিকে এসো, এখানে ইয়াহূদী আত্মগোপন করে আছে। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হতে খুব একটা দেরী নেই ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ ইয়াহূদীদের সহযোগিতা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে তাদের ধ্বংসের মঞ্চ প্রস্তুত করছে।

খন্দকের যুদ্ধে পরীখা খননকালে বিশাল একটি পাথরখণ্ড পরীখা খননে বাধা সৃষ্টি করছিলো। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই উক্ত পাথরখণ্ড ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে নবী করীম (সাঃ) শাবলের আঘাতে পাথরখণ্ডটি চূর্ণ করলেন। তিনি তিনবার পাথরখণ্ডে আঘাত করেছিলেন। প্রত্যেক আঘাতেই লৌহ আর পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছিলো। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি যখন প্রথম আঘাত হানলাম তখন আমাকে পারস্যের রাজধানী ও তার পরিপার্শ্বের এলাকা দেখানো হলো এবং আমার দু'চোখ দিয়ে তা দেখলাম।

সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! দোয়া করুন এসব এলাকা যেনো আমার জয় করতে পারি'। নবী করীম (সাঃ) দোয়া করার পর বললেন, 'আমি যখন দ্বিতীয় আঘাত করলাম তখন রোম সম্রাটের রাজধানী ও তার পরিপার্শ্বের

এলাকা দেখানো হলো'। সাহাবায়ে কেরাম উক্ত এলাকা বিজয় করার জন্যে দোয়ার আবেদন জানালে তিনি দোয়া করে পুনরায় বললেন, 'আমি যখন তৃতীয় আঘাত করলাম তখন আমাকে আবিসিনিয়ার রাজধানী ও তার আশেপাশের এলাকা দেখানো হলো। তবে আবিসিনিয়ার লোকজন তোমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না এলে তোমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অগ্রসর হয়ো না। আর তুর্কীদেরকে তোমরা অবকাশ দিবে যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে অবকাশ দেয়'। (মুসলিম, নাসাঈ)

নবী করীম (সাঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণীও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত উসমান (রাঃ) এর শানসামলে দেশে কতিপয় লোকজন বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এ সংবাদ রাসূল (সাঃ) পূর্বেই তাঁকে জানিয়েছিলেন। মদীনার একটি খেজুর বাগানে নবী করীম (সাঃ) বসেছিলেন। সেখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) এলে তিনি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানালেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে হযরত উমার (রাঃ) এলে তাঁকেও তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। এরপর হযরত উসমান (রাঃ) সেখানে এলে তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তিনি নানা ধরনের বিশৃংখলা ও কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হতে খুব বেশী দেরী হয়নি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদীনার একটি পাহাড়ে উঠলেন। পাহাড়টি অকস্মাৎ কাঁপতে থাকলো। নবী করীম (সাঃ) পবিত্র কদম মুবারক দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে বললেন, 'হে পাহাড়! শান্ত হও। তোমার উপরে রয়েছেন একজন রাসূল, একজন সিদ্দীক এবং দুই জন শহীদ'। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

নবী করীম (সাঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো। হযরত উমার (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) উভয়েই শাহাদাতবরণ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'আমার পরে কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী লোক নিজেদেরক নবী হিসাবে দাবী করবে'। (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

নবী করীম (সাঃ) এর পরে এ পর্যন্ত প্রায় উনত্রিশ জন মিথ্যাবাদী নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদীয়ানী। আবহমান কাল থেকে ইসলামের চির দুশমন ইয়াহূদী-খ্রিষ্ট-মুশরিকরা মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে থাকে। আর একাজে তারা কখনো নিজেরা প্রকাশ্যে আসে না। পর্দার আড়ালে থেকে মূল কলকাঠি নাড়তে থাকে। নামধারী কোনো

মুসলমানকে নির্বাচিত করে তার মাধ্যমেই অমুসলিমরা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার কাজে তারা মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীকে নির্বাচিত করে মুসলমানদের খত্মে নবুয়্যাত বিষয়ক আকিদা-বিশ্বাসের ওপরে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। এই লোকটির মাধ্যমে নবুয়্যাতের দাবী উত্থাপন করে তারা এক নতুন ফেত্না সৃষ্টি করেছে। নবুয়্যাতের দাবী করার কারণে পৃথিবীর সকল মুহাক্কিক আলিম-ওলামা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কাদিয়ানীরা কাফির–তারা মুসলমান নয়।

কাদিয়ানীদের পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশেই সরকারীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ-বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তাদেরকে সারকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। তবে এব্যাপারে এদেশের আলিম-ওলামা ও সচেতন মুসলমানরা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু বাম-রামপন্থী নাস্তিক, মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মহীন গোষ্ঠী কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছে। মির্জা গোলামের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী সে ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিলো দখলদার ইংরেজদের রাজকর্মচারী ও তাদের অনুগত ভৃত্য। এই গোলাম আহ্মাদ নামক লোকটি প্রথমে ইসলামের একজন প্রচারক হিসেবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করলো। কিছুদিন পর নিজেকে মুজাদ্দীদ হিসেবে দাবী করলো। তারপর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী হিসেবে দাবি করলো। এরপর সে নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম বলে ফতোয়া দিলো। মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী তার শরীয়াতের ভিত্তি স্থাপন করলো ইংরেজদের শর্তহীন আনুগত্যের ওপরে। ইংরেজদের অর্থপুষ্ট এই জাহান্নামী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা আলিম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে নানা ধরনের বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করলো এবং তার রচিত বইপত্রে সে ইংরেজদেরকে এদেশে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত হিসেবে ঘোষণা করলো।

তার অপপ্রচারে যারা প্রলুব্ধ হতো, তাদেরকে ইংরেজ রাজশক্তি অর্থ-বিত্ত দিয়ে, উচ্চপদে চাকরীসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো। ইংরেজ সৃষ্ট ফেত্না মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীর অনুসারীরাই কাদিয়ানী নামে পরিচিত। ইসলামের দুশমন চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হাইফা শহরেই কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হয় তাদের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম। লন্ডনেও তাদের বিশাল কেন্দ্র রয়েছে। তাদের পৃথক টিভি চ্যানেল রয়েছে। বিজ্ঞাপন ব্যতীত টিভি চ্যানেল-এর

কার্যক্রম চালু রাখা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এ,এমটিভি চ্যানেল বিজ্ঞাপন ব্যতীতই বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাদিয়ানীদের টিভি চ্যানেল এ,এমটিভি ইসলামের দুশমনদের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এদের আখ্ড়া রয়েছে। ঢাকায় এদের কেন্দ্র বখ্শী বাজারে। কাদিয়ানীরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে নিয়োজিত।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, অত্যন্ত দ্রুত এমন সময় সম্মুখে আসবে যে, এমন কোনো মানুষ থাকবে না যে সুদের সাথে জড়িত হবে না। যদিও সে প্রত্যক্ষভাবে সুদ গ্রহণ করবে না, তবুও সুদ জড়িত ধুলো-বালি বাতাসের সাথে উড়ে এসে তার নাকে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনীতি সুদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক লেনদেন সুদের মাধ্যমে ব্যতীত সম্ভব নয়। শিল্প, কলকার-খানা যা কিছু উৎপাদন করছে এর সকল কিছুই কোনো না কোনোভাবে সুদের সাথে জড়িত। বৈদেশকি ঋণ সুদ ব্যতীত পাওয়া যায় না এবং বিদেশ থেকে কোনো কিছু আমদানী-রফতানী করতে গেলেও সুদ ব্যতীত সম্ভব নয়। পোষাকের প্রতিটি সুতা এবং খাদ্যের প্রত্যেক কণার সাথেও সুদ জড়ানো হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন ব্যতীত সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সুদের অভিশাপ থেকে সকলকে মুক্ত রাখার পরিবেশ দান করুন।

মক্কা অভিযান, গোপন পত্রের সংবাদ

মহান আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। অভিযানের প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনে সম্পাদন হচ্ছিল। নবী করীম (সাঃ) তাঁর পরিকল্পনার কথা কাউকে জানলেন না। যুদ্ধ বা রক্তপাত ছিল তাঁর পবিত্র স্বভাবের বাইরে। তিনি তাঁর পবিত্র অন্তর থেকে কামনা করতেন মক্কা বিজয় যেন কোনো ধরণের রক্তপাত ব্যতীতই সমাপ্ত হয়। তিনি জানতেন, মক্কাবাসী তাঁর সাথে শত্রুতা করলেও তারা তাঁর পরম আপনজন। তারা বোঝে না, সত্য চিনে না, না বুঝে তাঁর সাথে শত্রুতা করে। সুতরাং কোনো ধরনের যুদ্ধ ব্যতীতই তিনি মক্কা জয়ের আশা পোষণ করছিলেন। গোপন পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন। মিত্র গোত্রদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেনো কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে বলা হলো, তারা তা জানতে পারলেন না। এমনকি হযরত আয়িশা (রাঃ)ও জানতেন না, নবী করীম (সাঃ) কোনদিকে যাবেন। শত্রু পক্ষের গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন। সকল বাহিনী মদীনায় একত্রিত করে মদীনা থেকে সবাই একত্রে যাত্রা করবেন বিষয়টি এমন ছিল না। পথে যেন তারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে নিজের গোত্রের

পতাকা আর বাহিনী নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হয় সে ব্যবস্থা করা হলো। কোনো অভিযানের ব্যাপারে সাধারণত তিনি এতটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন না।

মদীনা থেকে বের হয়ে কেউ মক্কার দিকে যাবে, এমন পথসমূহে তিনি প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুলসুম (রাঃ) কে দায়িত্ব দিলেন, নবী করীম (সাঃ) মদীনায় অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি যেন মদীনার শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় বিশ্বনবী (সাঃ) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হাতিব ইবনে আবি বুলতায়া (রাঃ) মানবীয় দুর্বলতার কারণে একটি অনাকাঙ্খিত কাজ করলেন।

এই সাহাবী মক্কাতেই প্রথম দিকে ইসলাম কবুল করে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেছেন। সহায় সম্পদ ত্যাগ করে মাতৃভূমি থেকে হিজরত করেছেন। বদরের যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। মিশরের বুকে ইসলামের আহ্বান নিয়ে রাসূলের দূত হিসাবে তিনি গমন করে শাসকদেরকে ইসলামের পথে এনেছিলেন। ইসলাম বিরোধিদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়ায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। অর্থাৎ তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী।

তবুও তিনি মানুষই ছিলেন। মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি মেজাজের দিক দিয়ে কিছুটা উগ্র ছিলেন। তাঁর এক দাস একদিন রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করেছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার মনিব হাতিব নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবে'।

নবী করীম (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো, যারা বদরের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়াতে (বাইয়াতুর রিদওয়ানে) অংশগ্রহণ করেছে, তাঁরা জাহান্নামে যাবে না'।

হযরত হাতিব সে সময় মদীনাতে বাস করলেও তাঁর আপনজন সকলেই ছিল মক্কায়। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তিনি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। মক্কা অভিযানের সময় যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে তাঁর পরিবার-পরিজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিনা, এ চিন্তায় তিনি চিন্তিত হয়ে মক্কা অভিযানের গোপন প্রস্তুতির সংবাদ সম্পর্কে এক পত্র লিখলেন। সে পত্র মুযাইনা গোত্রের এক মহিলাকে দিয়ে মজুরির বিনিময়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের এই প্রিয় সাহাবীর মনের প্রকৃত অবস্থা এবং গোপনে প্রেরিত পত্রের বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে নবীকে জানিয়ে দিলেন।

নবী করীম (সাঃ) মহিলার কাছ থেকে পত্র উদ্ধার করার জন্য হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবাইর(রাঃ) ও হযরত মিকদাদ (রাঃ) কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা দ্রুতগামী বাহনে আরোহন করে রাওদাতু খাক নামক স্থানে গিয়ে মহিলাকে গ্রেফতার করলেন। প্রথমে তার বাহনে অনুসন্ধান করে তাঁরা কোনো কিছুই পেলেন না। হযরত আলী (রাঃ) মহিলাকে বললেন, 'আমি ঐ মহান আল্লাহর নামে শপথ করে

বলছি, রাসূল (সাঃ) কে মিথ্যা সংবাদ দেয়া হয়নি। তিনিও আমাদেরকে মিথ্যা সংবাদ দেননি। এখন তুমি নিজের ইচ্ছায় পত্র বের করে দাও, নতুবা আমরা তোমাকে বস্ত্রহীন করে পত্র অনুসন্ধান করবো'।

হযরত আলী (রাঃ) এর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মহিলা বললো, 'তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, আমি পত্র বের করে দিচ্ছি'।

সাহাবায়ে কেরাম সরে দাঁড়ালেন। মহিলা তার মাথার চুলের বেণীর ভেতর থেকে হযরত হাতিব (রাঃ) এর লেখা পত্র বের করে তাদের হাতে হস্তান্তর করলেন। তাঁরা পত্রটি নবী করীম (সাঃ) এর সামনে পেশ করলেন। পত্রের বিষয় জেনে তিনি হযরত হাতিব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাতিব, তুমি এমন কাজ কেনো করলে?'

হযরত হাতিব (রাঃ) জানতেন, তাঁর এই অপরাধের শাস্তি কি। তিনি বিনয়ের সাথে নবী করীম (সাঃ) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার সম্পর্কে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। যদিও আমি কুরাইশদের কেউ নই তবুও ইসলাম গ্রহণের পুর্বে তাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মক্কা থেকে যারা মদীনায় আগমন করেছে তাঁরা সকলেই তাদের মক্কার আত্মীয়দেরকে সাহায্য করে থাকে। আমার ধারণা হলো, কুরাইশরা আমার পরিবার-পরিজনদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করে থাকে, এ জন্য তাদেরকে আমি কিছু প্রতিদান যদি দিতে পারি! এ কাজ আমি মুরতাদ হয়ে বা ইসলাম ত্যাগ করে বা ইসলামের ওপর কুফরকে প্রাধান্য দিয়ে করিনি'। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাতিব (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার পরিবার-পরিজন তাদের মধ্যে অবস্থান করছে, বিষয়টি ক্ষতিকর হবে না আমি এ ধারণা করেই এই পত্রটি লিখেছি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে আমার মনে সামান্যতম প্রশ্ন সৃষ্টি হয়নি। মক্কায় আমার মা, ভাই ও সন্তান রয়েছে। এ কারণেই আমি এই পত্র লিখেছি'। (হায়াতুস সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪২৫, আল ইসাবা প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩০০)

নবী করীম (সাঃ) হযরত হাতিব (রাঃ) এর বক্তব্য সমর্থন করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'হাতিব সত্য কথা বলেছে। কেউ যেন তাঁর সম্পর্কে কটুক্তি না করে'।

হযরত উমার (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! হাতিব আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কাজ করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এই মুনাফিকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেই'।

নবী করীম (সা:) বললেন, 'উমার! তুমি এমন করে বলো না। হাতিব বদর যুদ্ধের সৈনিক। আল্লাহ তা'য়ালা বদর যুদ্ধের সৈনিকদের পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা খুশী করো, তোমাদের জন্য অবশ্যই জান্নাত রয়েছে'। (বুখারী)

আল্লাহর রাসূল (সা:) এর এ কথা শুনে হযরত উমার (রা:) এর দু'চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা মুমতাহিনার আয়াত অবতীর্ণ করে জানালেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ق تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ–

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না (এটা কেমন কথা), তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো, (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে, তারা আল্লাহর রাসূল ও তোমাদের (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে শুধু এ কারণে, তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জিহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব পাতাতে পারো, তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো, আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজটি করে, তাহলে (বুঝতে হবে) সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (সূরা আল মুমতাহিনা-১)

নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্যের মধ্যেই শান্তি ও মুক্তি

নবী করীম (সাঃ) এর জীবনী সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা রয়েছে, তারাও এ কথা অবগত রয়েছে যে, তিনি কোন্ সমাজে এবং কি বিভৎস-বিভিষীকাময় পরিবেশে আগমন করেছিলেন। সে সমাজের লোকদের জান্-মাল, ইয্যত-আব্রু, সহায়-সম্পদ কোনো কিছুর নিরাপত্তা ছিলো না। খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা ও নিরাপত্তার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছিলো না। জোর যার মুলুক তার– এটাই ছিলো সেই সমাজের রীতি। যেখানে নিয়ম পরিণত হয়েছিলো অনিয়মে আর অনিয়ম পরিণত হয়েছিলো নিয়মে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ শান্তির আশায় হাহাকার করছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই অবস্থায় বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত মানব মুক্তির মহানায়ক মুহাম্মাদুর (সাঃ) কে প্রেরণ করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি আদিষ্ট হয়ে মানুষকে তাঁর আনুগত্য করার আহ্বান জানালেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে যারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলো এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো।

যে সমাজ থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার শেষ রেশটুকু বিদায় গ্রহণ করেছিলো, ইতিহাস সাক্ষী– সেই সমাজ ভেঙে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতে নতুন করে যে সমাজ গড়া হলো, সেই সমাজে নেমে এলো শান্তির ঝর্ণাধারা। অনৈক্যই যে সমাজে ছিলো সাধারণ নিয়ম, সে নিয়ম পরিবর্তন হয়ে সেখানে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে উঠলো। একমাত্র নিজের স্বার্থ ব্যতীত পরের উপকার শব্দটি ছিলো যাদের কাছে অপরিচিত, তারাই পরের উপকারের জন্য নিজের সঞ্চিত ধনরাশি উন্মুক্ত অবারিত হস্তে বিতরণ করে দিলো। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ কণ্ঠনালীর কাছে চলে এসেছে, সমুদ্রসম তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সেই কঠিন মুহূর্তেও তাঁরা পানির পেয়ালা সামনে পেয়েও পানি পান না করে আরেকজনের দিকে পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছেন। যারা ছিলো নারীর ইয্যতের যম, তারাই হয়ে গেলো নারীর সতীত্বের হেফাজতকারী। মিথ্যা ছিলো যাদের জীবনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, তারাই হয়ে গেলো মহাসত্যের নিশানবরদার।

রাসূলের আনুগত্য ভিত্তিক সমাজে মানুষ লাভ করলো জান্-মাল, ইয্যত-আব্রু, সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা। মানুষ বুঝে পেলো তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ। এটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়– রাসূলের আনুগত্য ভিত্তিক সমাজের চিত্র সোনালী অক্ষরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানবতার মুক্তি, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের বিকল্প নেই। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার অর্থই হলো মহান আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা।

নবী করীম (সা:) এর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শান্তি, কল্যাণ ও ঐক্য। আর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অশান্তি, অনৈক্য ও অকল্যাণ। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলকেই নেতা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য করলো, প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহরই আনুগত্য করলো। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভবে আল্লাহর বিধান অস্বীকার বা অমান্য করলে যেমন অশান্তি, অনৈক্য, অকল্যাণ ও গযব নেমে আসে, অনুরূপভাবে রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করলেও অশান্তি, অনৈক্য, অকল্যাণ ও গযব নেমে আসবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ ব্যপারে মানব জাতিকে সতর্ক দিয়ে বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে এ বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য যে, তারা মহাবিপদগ্রস্ত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রেফতার করবে। (আল কুরআন)

রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করে শান্তি, মুক্তি, ঐক্য ও কল্যাণের প্রত্যাশা করা বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। অতএব দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে, নির্জনে-একাকী, গোপনে-প্রকাশ্যে তথা সর্বাবস্থায় রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। তাহলেই কাঙ্খিত শান্তি-মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা যাবে। রাসূলের আনুগত্য করাকেই পবিত্র কোরআনে ইত্তেবায়ে রাসূল বলা হয়েছে। ই'ত্তেবা আরবী শব্দ। এ শব্দের অর্থ হলো অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, তাঁবেদারী করা, কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করা, কারো পিছে পিছে চলা। রাসূলের ই'ত্তেবা করার অর্থ হলো, রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ পবিত্র কুরআনে এসেছে, সেসব আয়াতেও 'ই'ত্তেবা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরও ভালোবাসবেন; তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (সূরা আলে ইমরাণ-৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'ই'ত্তেবা' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করার কথা বান্দাদের জানিয়ে দিলেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, শান্তি, স্বস্তি, ঐক্য ও কল্যাণের প্রত্যাশা করে– তাহলে তাকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর প্রেরিত রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার, শান্তি ও কল্যাণ লাভ করার– এ ছাড়া

আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলকে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভালোবাসবেন অর্থাৎ তাদের ওপরে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তারা অবশ্যই শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

নবী করীম (সা:) এর সুন্নাতই ইসলামী শরীয়াত

সুন্নাহ্ আরবী শব্দ। এই সুন্নাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে, তরীকা, পথ-রাস্তা, রীতি-নীতি। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনেও সুন্নাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তাঁর নিয়মকে সুন্নাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً–

তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি এ হলো তাদের ব্যাপারে সুন্নাত এবং তুমি কখনও আল্লাহর সুন্নাতে (নিয়মে) কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (সূরা বনি ইসরাইল-৭৭)

সূরা 'ফাতাহ্'–এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً–

আল্লাহর সুন্নাত, (চিরন্তন নিয়ম) যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ সুন্নাতে- নিয়মে কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্-২৩)

সূরা ফাতির–এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন–

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً–

তুমি আল্লাহর সুন্নাতে (বিধানে) কোনো পরিবর্তন না, না কখনো তুমি আল্লাহর বিধান নড়াচড়া অবস্থায় (দেখতে) পাবে। (সূরা ফাতির-৪৩)

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতে যে সুন্নাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, মুফাস্সীরগণ ও আরবী ভাষাবীদগণ এর অর্থ করেছেন, 'পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আল্লাহ তা'য়ালার কর্মকুশলতার বাস্তব পদ্ধতি, আল্লাহর নিয়ম'।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে পদ্ধতি ও নিয়মের অধীনে তাঁর সৃষ্টিসমূহ পরিচালিত করছেন, তা হলো আল্লাহ তা'য়ালার সুন্নাত এবং তাঁর সুন্নাতে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দৃষ্টি দান করেছেন দর্শন করার জন্য। শ্রবণশক্তি দান করেছেন শোনার জন্য। মস্তিষ্ক দান করেছেন চিন্তা-গবেষণা করার জন্য। মাথা দিয়ে যেমন চোখের কাজ চলে না, হাত দিয়ে যেমন কানের কাজ চলে না, পা দিয়ে মুখের কাজ চলে না। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাই আল্লাহর সুন্নাত এবং তাঁর এ সুন্নাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সুন্নাতে নববী এবং ই'ত্তেবা-ই সুন্নাত হলো রাসূলের নিয়ম এবং তাঁর অনুসরণ করা। হাদীস গবেষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অর্থ করেছেন, 'শরীয়াত'। এই অর্থে ই'ত্তেবা-ই সুন্নাতের অর্থ হলো, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান লাভ করেছেন তা অনুসরণ করা।

এই অর্থে সুন্নাত হলো সেই মৌলিক আদর্শ, যে আদর্শ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীবাসীর অনুসরণ-অনুকরণের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। যে আদর্শ আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবনে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের বিশাল বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন এবং মানব জাতিকে অনুসরণ করার আহ্বান করেছেন। রাসূলে করীম (সাঃ) অনুসরণ করেছেন আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি। তিনি বলেছেন–

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحى إِلَىَّ ط

আমি কারো কোনো আদর্শই অনুসরণ করি না, আমি তাই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। (সূরা আল আনয়াম-৫০)

ইসলামে সুন্নাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণের ভাষায়, 'রাসূল (সাঃ) এর মৌখিক বক্তব্য, তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আর অন্য কারো কথায় বা কাজে তাঁর সমর্থন। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন অথবা অন্য কারো কাজে বা কথায় যেসব বিষয়ে তিনি সমর্থন দান করেছেন, এগুলোর সমষ্টিই হলো ইসলামী শরীআত। এ অর্থে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো ইসলামী শরীয়াতের আনুগত্য করা'।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ أَحَبَّنِى وَ مَنْ أَحَبَّنِى كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّة–

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে প্রকৃত অর্থে আমাকেই ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।

এখানেও সুন্নাতকে শরীয়াত বা নবী করীম (সাঃ) এর পরিপূর্ণ জীবনাদর্শকেই বুঝতে হবে। এক কথায় ইসলামী শরীয়াতই সুন্নাতে রাসূলের পরিপূর্ণ রূপ তথা ইসলামের গোটা অবয়ব। এদিক থেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জুমুআ, ঈদ ও কোরবানী ইত্যাদি ইবাদাত পর্যায়ের বিষয়াদি–আর শরীয়াত মোতাবিক বিয়ে-শাদী, লেন-দেন, বিচার কার্য পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি মুআমালাত পর্যায়ের বিষয়াবলী সব কিছুই সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী আইন বিশারদগণ তথা ফোকাহায়ে কেরাম

কর্তৃক কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদী পর্যায়ভুক্ত যেকোন প্রকারের বিষয়াদি মূল সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত।

এদিক থেকে ইসলামী শরীয়াত ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) একই জীবনাদর্শের দু'টো নাম। সুন্নাতে রাসূলকে এ ধরনের ব্যাপক অর্থের ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হলে, তখন এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণই হেদায়াতের বাস্তব রূপ, আর সুন্নাতে রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করাই হলো পথভ্রষ্টতা তথা দালালাত বা গোমরাহী। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ–

তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাতকে (জীবনাদর্শকে) প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

সিরাতুল মুস্তাকিম বা হেদায়াতের পথে চলা শুধুমাত্র কুরআনের ওপরে নির্ভর করে না। এ পথে চলতে হলে অবশ্যই রাসূলের সুন্নাতকেও অনুসরণ করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنِّى تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ هِمَا أَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَ سُنَّتِى وَ لَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ–

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দু'টো জিনিসের অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিসের একটি হলো আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুন্নাত এবং কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টো জিনিস কখনো একটির সাথে থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৩)

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দান কালেও আল্লাহর রাসূল তাঁর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তা অনুসরণের জন্য মানব জাতিকে তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

يَآ أَيُّها النَّاسُ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ إِعْتَصَمْتُمْ بِه فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا أَمْرًا م بَيْنًا كِتَابُ اللّٰهِ وَ سُنَّةُ نَبِيِّه–

হে মানব গোষ্ঠী! আমি তোমাদের কাছে এমন এক অমূল্য সম্পদ রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি সে সম্পদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে সম্পদ হলো আল্লাহর কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমেও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে অনুসরণ করার জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوْا ج

এবং (আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর-৭)

রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও সঠিক পথ। তাঁর সুন্নাত ব্যতীত সহজ-সরল পথ লাভ করা কল্পনার অতীত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط

যদি তোমরা তাঁর (রাসূলের) কথা মতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে। (সূরা আন্ নূর-৫৪)

রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ পালন করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

مَّنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ج

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে-ই যথার্থ অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করলো। (সূরা আন নিছা-৮০)

রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ না করলে তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানলে, তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

যারা রাসুলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর যে কোন বিপদ-মুসিবত আসতে পারে অথবা কোন কঠিন আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করতে পারে। (সূরা আন্ নূর-৬৩)

রাসূলের সুন্নাতের সাথে সামান্যতম দ্বিমত পোষণ করা, তাঁর সুন্নাতের ব্যাপারে কোন সংশয়-সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার কারো কোনো অধিকার নেই। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর ইত্তেবা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ط

যখন আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর অধিকার নেই যে, তারা সে

ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম ইখতিয়ার খাটাবে; (মূলত) যে কেউই আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। (সূরা আল আহযাব-৩৬)

আল্লাহর রাসূলকে কোন মুসলমান অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক হলে সে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলো, যদি তা না করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না। (সূরা আলে ইমরাণ-৩২)

সুন্নাতে নববীর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ যেমন আদেশ-নিষেধ দান করার ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন–সম্পূর্ণ স্বাধীন, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে রাসূলও তেমনি স্বাধীন। আদেশ-নিষেধ দানের ক্ষেত্রে তিনি কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী নন। মুসলিম পরিচয় দানকারী ব্যক্তি রাসূলের আদেশ-নিষেধ তথা তাঁর সুন্নাত অনুসরণে বাধ্য। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করলে মানুষ যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, কাফির হিসেবে চিহ্নিত হয়, রাসূলের আদেশ-নিষেধের সাথে দ্বি-মত পোষণ করলেও মানুষ পথভ্রষ্ট ও কাফির হয়ে যাবে।

আরেকটি ব্যাখ্যানুসারে সুন্নাত হলো, নেক কর্মসমূহের একটি বিশেষ স্তর। ইসলামী শরীয়াতের বিধি-নিষেধ পালনের সুবিধার্থে, ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য করণীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মোস্তাহ্সান ইত্যাদি স্তরসমূহের বিভক্তি দেখিয়েছেন। অপরদিকে বর্জনীয় বিষয়াদিকে হারাম, মাকরুহে তাহ্রিমী ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। আবার শরীয়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়নি এমন ধরনের বিষয়াদিকে মুবাহ্ বা হালালের স্তরে রেখেছেন।

শরীয়াতের এ ধরনের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনবীদগণ তথা ফকীহ্গণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় বহু বিষয়াদিকে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ের করণীয় নেক কাজগুলো ফরজ ও ওয়াজিবের ক্ষতি পূরণের পক্ষে সহায়ক। ফকীহ্গণ ফরজ ও ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলোকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত ঃ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ অর্থাৎ এমন ধরনের সুন্নাত কাজ যা পালন করার জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে।

জামায়াতের সাথে ফরজ নামায আদায় করা, মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা, গোঁফ খাটো করা, পুরুষের খাত্না করা, যথা সময়ে হাত-পায়ের নখ কাটা, পুরুষের নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা, বোগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা; নারীর উভয় ক্ষেত্রে উপড়ানো, মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করা, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে একের প্রতি অন্যের সালাম আদান-প্রদান করা, মুসাফাহ্ করা, মাথায় টুপি রাখা ইত্যাদি কাজগুলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পর্যায়ের। রোযা পূর্ণ করে সুর্যাস্তের পর ইফ্তার করা, আর রোযা রাখার জন্য সেহ্রী খাওয়াও সুন্নাত। তবে সুবহে সাদেক হয়ে গেলে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না। বরং তখন কিছু খেলে বা পান করলে রোযা হবে না।

এক মুষ্ঠিরও কম পরিমাণ দাড়ি কেটে ছোট করা মাকরুহে তাহরীমী। দাড়ি শুধু নীচের দিকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে মুখের দু'পাশ থেকে কেটে ছোট করাও মাকরুহে তাহরীমী। দাড়িকে বৃদ্ধি লাভ করতে দেয়া আর গোঁফ খাটো করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَزُوْا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوْا اللُّحَىِّ–

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফ খুব ছোট করবে আর দাড়ি লম্বা করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

দাড়ি সম্পর্কে আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَزُوْا لِشَوَارِبَ وَاَرْخُوْا لِلُّحَىِّ خَالِفُوا الْمَجُوْسَ–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের গোঁফগুলো খুব খাটো করবে, আর দাড়িগুলো লম্বা করে রাখবে। (এ ব্যাপারে) অগ্নি পূজকদের বিপরীত করবে। (মুসলিম শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১২৯)

অর্থাৎ যারা আগুনের পূজা করে তারা গোঁফ বড় করে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে অথবা দাড়ি একেবারেই কেটে ফেলে। এ জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

আবার অন্য হাদীসে মুখের দু'দিকের ও নীচের দিকের দাড়ি কেটে ছোট করে রাখার কথা রয়েছে। দাড়ি লম্বা করে রাখা এবং কেটে ছোট করে রাখা– উভয় পর্যায়ের হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর আমল সম্পর্কীত হাদীসটি সনদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রদ্দুল মোহতার কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'দাড়ি সম্পর্কে

উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি এক মুষ্ঠি থেকে অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নিতেন'। তবে এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী এক শ্রেণীর ভোগবাদী লোক ষ্টাইল হিসেবে যেমন ছোট ছোট দাড়ি রাখে, তাদেরকে অনুসরণ করা ইসলামী আইন বিশারদগণের কেউ বৈধ বলে মনে করেননি। এক মুষ্ঠি দাড়ির অতিরিক্ত দাড়ি ছেটে নেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব বাজলুল মাজহুদের প্রথম খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর তা এভাবে করতে হবে যে, পুরুষ লোক তার নিজ দাড়ি হাতের মুঠোয় ধরবে, তারপর মুঠোর বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলবে। এমন ধরনের পদ্ধতির বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) থেকে কিতাবুল আসারে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করা ও গায়ে লম্বা জামা পরিধান করা সুন্নাতে যায়েদাহ্ বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাগড়ী ও লম্বা জামা পরিধান করেছেন বলে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। সুতরাং লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহার করতে পারলে উত্তম। কিন্তু নিজে লম্বা জামা ও পাগড়ী ব্যবহারও করবে না এবং যারা ব্যবহার করবে তাদেরকে বিদ্রুপ করবে, এটা বৈধ হবে না। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল এসব ব্যবহার করেছেন, সুতরাং এ ধরনের বিদ্রুপ করা থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর রাসূলের যে কোনো সুন্নাত–তা হতে পারে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পর্যায়ের, তার প্রতি সামান্যতম অবহেলা-অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যাবে না। এ ব্যাপারে তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমনভাবে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

এবং (আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর-৭)

কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, রাসূলের নির্দেশের মধ্যে ফরজ আর ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়গুলোই অনুসরণ করতে হবে আর সুন্নাতগুলো অনুসরণ না করলেও চলবে। বরং আল্লাহর এ নির্দেশের মধ্যে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলের সুন্নাতকে অবহেলা করার অর্থই হবে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা।

শরহে ফিকহে আকবর নামক কিতাবের ২২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হানাফী ফকীহ্গণ ঐ ব্যক্তির প্রতি কুফরী ফতোয়া আরোপ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলের

কোনো সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে সব সময় পরিহার করে থাকে। তবে যারা সুন্নাতকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে না, বরং সুন্নাতকে পালনীয় সওয়াবের কাজ বলে গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে স্বীকার করে, কিন্তু অলসতা বশতঃ অথবা অন্য কোনো কারণে সুন্নাত পালন করতে পারে না, অথবা সুন্নাত ছুটে যায় এবং এ কারণে অন্তরে অনুশোচনা করে, এমন লোকদের ওপর উল্লেখিত কঠোর ফতোয়া নিপতিত হবে না। কেননা, সুন্নাতের বিরোধী হওয়া এক ব্যাপার আর মাঝে মধ্যে কোনো কারণে ছুটে যাওয়া ভিন্ন ব্যাপার।

সুন্নাত পরিহার সংক্রান্ত বিষয়ে মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যামূলক কিতাব মিরকাতুল মাফাতীহ– প্রথম খণ্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, অলসতা বশতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রমাণ্য সুন্নাত পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে তিরস্কৃত হবে। আর অবজ্ঞা বশতঃ সুন্নাত পরিহার করা হলে সুন্নাত পরিহারকারী ব্যক্তি গুনাহের অভিযোগে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সুন্নাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে ফকীহ্ ইমামগণের উল্লেখিত মতামত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের যথাযথ আনুগত্যের প্রশ্নে অত্যন্ত গভীর ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা–এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পরিপূর্ণ আমলেই পরিপূর্ণ শান্তির আশা করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া-কর্মকেও সুন্নাত ও হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃত অর্থে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ক্রিয়া কর্মের মানদণ্ড ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

মিশকাতুল মাসাবীহের শরাহ মিরকাতুল মাফাতীহ–অষ্টম খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠা–(১) কিতাবুল ওয়াফা (২) ইবনে মাজাহ্ (৩) জামেয়ে সগীর (৪) ও, মুস্তাদরিকে হাকেম ইত্যাদি হাদীসের কিতাবাদি থেকে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) টাখ্নুর ওপর পর্যন্ত লম্বা কামিস পরিধান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কাছ থেকে যা শুনতেন, নবীকে করতে দেখতেন, এসব বিষয় তাঁরা অন্যকে অবগত করা এবং পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁরা তা নিজেদের জীবনে বাস্তবে রূপদান করতেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন কোনো আকীদা ও নিছক তত্ত্বমূলক কথা বলেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা নিজেদের স্মৃতিতে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) যখন কোনো আদেশ-নিষেধমূলক কথা বলেছেন, কোনো আইন জারী (Bring a law into force) করেছেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে তা কাজে পরিণত করেছেন। রাসূলের

আদেশ-নিষেধ ও জারী করা আইনকে যতক্ষণ প্রতিদিনের জীবনে নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তা চর্চা ও অভ্যাস করার ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ দশটি আয়াত শিখতো, তখন তার অর্থ অত্যন্ত ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং সে অনুসারে কাজ করার পূর্বে সে আর দ্বিতীয় কিছু শেখার জন্য চেষ্টা করতো না। (জামেউল বায়ান)

অর্থাৎ যা শেখা হলো, তার মমার্থ অনুধাবন না করে এবং তা বাস্তব জীবনে কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না করে সাহাবায়ে কেরাম আরো কিছু শেখার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। শেখা হলো অনেককিছু কিন্তু আমল করা হলো না, সাহাবায়ে কেরামের জীবন এমন ছিলো না। ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ (Fundamental law of Islam) সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করছে কিনা, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি ইসলামের ব্যবহারিক নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। ইসলামের মৌলনীতিসমূহ যেন মুসলমানদের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়, এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ-

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখো, ঠিক অনুরূপভাবে নামায আদায় করবে। (বুখারী)

একইভাবে হজ্জের ব্যাপারে তিনি বলেছেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكَكُمْ-

আমার কাছ থেকে তোমরা হজ্জ পালন করার নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করো। (মুসলিম)

পবিত্র কুরআনে নামায আদায়, রোযা রাখা ও যাকাত আদায়ের আদেশসহ অন্যান্য বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব আদেশের বিস্তারিত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের বিস্তারিত দিক জানতে ও অনুসরণ করতে হলে তা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকেই জানতে হবে এবং রাসূল (সাঃ) যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করেছেন সেভাবেই অনুসরণ করতে হবে। কারণ তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য শিক্ষক। প্রত্যেকটি কাজের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য রাসূল (সাঃ) স্বয়ং সে কাজ বাস্তবে করে

মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সে নিয়মেই কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন।

ইসলামী বিধানের নিয়ম-পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে পালন করছেন, রাসূল (সাঃ) সেদিকে লক্ষ্য করতেন। কারো কোনো ভুল হলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মসজিদে নববীতে একদিন লক্ষ্য করলেন, একজন সাহাবীর নামায আদায় পদ্ধতি যথাযথভাবে সম্পাদিত হলো না। নামায সমাপ্ত করে সাহাবী যখন তাঁর কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, তোমার নামায যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি, যাও নামায যথাযথ নিয়মে আদায় করো।

সাহাবী সাথে সাথে চলে গেলেন নামায আদায় করার জন্য। রাসূল (সাঃ) আবার বললেন, এবারও তোমার নামায আদায় পদ্ধতি ঠিক হলো না। সাহাবী পুনরায় নামায আদায় করলেন। এভাবে চারবার করার পরেও যখন সাহাবীর নামায আদায়ের নিয়ম ঠিক হলো না, তখন নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং নামাযে দাঁড়িয়ে উক্ত সাহাবীকে নামায আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে ইসলামের আদর্শিক, নীতিগত ও বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে তা শুনে মুখস্থ করে নিতেন এবং সে আয়াতের মর্ম তাঁরা রাসূলের কাছ থেকেই জেনে নিতেন।

শুধু তাই নয়, সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি স্পন্দনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বুখারী ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তি হযরত খাব্বাব ইবনুল আরিত (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নবী করীম (সাঃ) যুহরের নামায আদায় করার সময় কি কুরআন তিলাওয়াত করতেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'কুরআন তিলাওয়াত করতেন'। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনারা তো পিছনে থাকতেন, বুঝতেন কিভাবে যে তিনি কুরআন তিলওয়াত করছেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা আল্লাহর নবীর দাড়ির কম্পন দেখেই অনুভব করতে পারতাম'।

মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন–নবী করীম (সাঃ) যুহর ও আসরের নামাযে দাঁড়িয়ে কতটুকু সময় ব্যয় করতেন তা আমরা অনুমান করে দেখতাম। আমরা দেখতাম, তিনি প্রথম দুই রাকা'আতে তিন আয়াত কুরআন তিলাওয়াতের সমান সময় এবং শেষ দুই রাকাআতে তার অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

মুসনাদে আহ্মাদে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক হযরত উমার (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কুরআনে শুধু ভয়কালীন নামায ও নিজের বাড়িতে থাকাকালীন নামায সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু ভ্রমণকালে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে, তা

দেখতে পাই না। কেনো দেখতে পাই না?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালা অনুগ্রহ্ করে মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আমাদের জন্য রাসূল হিসাবে পাঠালেন। সুতরাং এখন আমরা তাঁকে যেভাবে দ্বীনের কর্মসমূহ্ সম্পাদন করতে দেখি অনুরূপভাবে তাই করতে থাকি'।

সাহাবায়ে কেরাম এমন অনেক কাজেও রাসূলের করা কাজের হু-বহু অনুসরণ-অনুকরণ করতেন, যে কাজ অনুসরণ করা শরীয়াত অনুসারে অপরিহার্য নয়। তবুও সাহাবায়ে কেরাম তা আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের এমন অনুসরণের মাধ্যমেই নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দিকও সংরক্ষিত হয়েছে, বর্তমান যুগের মানুষ তা জানতে পারছে। সুতরাং আল্লাহর নবীর সুন্নাত হিসেবে আমাদের সামনে যা রয়েছে, তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আহার করে আমাদের যখন জীবন ধারণ করতেই হয়, তাহলে সে আহারের পদ্ধতিটা নবীর কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। দাড়ি যখন রেখেছি. তখন তা রাসূলের অনুসরণেই রাখা উচিত। এভাবে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণে সচেতনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে হবে।

যে নবী ও রাসূলদেরকে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা এতো তাগিদ দিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমাদেরকে এ কথা জানতে হবে যে, কেনো এই রিসালাত ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীতা। কেনো মানুষের জন্য নবুয়্যাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ নবী ও রাসূল ব্যতীত মানুষ কোনোক্রমেই শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ এবং সত্য ও সঠিক পথ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়।

নবী করীম (সাঃ) কে দিয়েই নবুয়্যাতের সমাপ্তি

১. পৃথিবীতে বিশেষ কোনো জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নবী-রাসূল আসেননি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর শিক্ষাও তাদের কাছে পৌছেনি।

২. নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষা মানুষের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

৪. কোনো নবীর সাথে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন হয়।

এখন এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ওপরে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটিও আর বিশ্বনবী (সাঃ) এর পরে বিদ্যমান নেই। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সমগ্র পৃথিবীর জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ কথা বলে যে, তাঁর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর নবুয়্যাত সকল যুগে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পৌঁছতে পারে। এরপরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী প্রেরণের প্রয়োজন থাকে না। কুরআন-হাদীস ও সীরাতের সকল বর্ণনাও এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর শিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভুল, নির্ভেজাল এবং পরিপূর্ণ অবয়বে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি। তাঁর প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম-বেশি হয়নি। কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তা আজও আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। সুতরাং নবী আসার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

পবিত্র কুরআন এ কথা ঘোষণা করেছে, নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। সুতরাং দ্বীনের পূর্ণতার জন্যও কোনো নবী আসার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর কাজে সহযোগিতা করার জন্য যদি কোনো সাহায্যকারী নবীর প্রয়োজন হতো, তাহলে সেটা তাঁর জীবনকালেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরণ করতেন। এ ধরনের কোনো প্রয়োজন ছিল না বিধায় মহান আল্লাহ তা করেননি। বর্তমানে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, নবীকে পৃথিবীতে আসতেই হবে? কেউ যদি যুক্তি প্রদর্শন করে যে, মুসলিম জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এ কারণে তাদের সংস্কারের জন্য একজন নতুন নবীর প্রয়োজন।

এই যুক্তি যারা দিতে চায় তাদের কাছে ইসলামী চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসা, নিছক সংস্কারের জন্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কি কোনো নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আগমন ঘটলো? ওহী অবতীর্ণ করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা, নবীর কাছেই ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আর ওহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেয়ার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুরআন এবং নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং ওহীর সকল সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গিয়েছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই অবশিষ্ট রয়েছে– নতুন কোনো নবীর নয়।

যখন কোনো জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নিবে, তারা এক উম্মাতভুক্ত হবে এবং যারা তাকে স্বীকার করবে না তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মাতে শামিল হবে। এই দুই উম্মাতের মতবিরোধ কোনো আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর ওহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দু'টোকে তাদের আইনের উৎস হিসেবেই মেনে নিতে প্রথমত অস্বীকার করবে। সুতরাং এই দুই দলের মিলনে একটি সমাজ বা জাতি কোনোক্রমেই সৃষ্টি হতে পারে না। ইতিহাস বলে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে এমন কখনো হয়নি।

এই স্পষ্ট সত্য পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, খত্মে নবুয়্যাত মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বিনিময়েই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ বিষয়টি মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। সুতরাং যে ব্যক্তি নিবী করীম (সাঃ) কে হিদায়াত দানকারী এবং একমাত্র অনুসরণীয় নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোনো হিদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। নবুয়্যাতের দরোজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কারণ প্রত্যেক নবীর আগমনের পরে এই ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

সাধারণত স্থূলভাবে ভাবনা-চিন্তা করলেও মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও এ কথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়্যাতের দরোজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে এবং অপ্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমন উম্মাতের মধ্যে বার বার বিভেদ সৃষ্টি হবার সুযোগ থাকবে না।

নতুন নবুয়্যাতের দাবীদারদের ভাষায় নবী 'যিল্লী অর্থাৎ ছায়া নবী' হোক অথবা বুরুজী নবী হোক, উম্মাতওয়ালা হোক, শরীয়াতওয়ালা হোক বা কিতাবওয়ালা হোক, যে কোনো অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাকে যারা মেনে নিবে, তারা হবে

একটি উম্মাত, আর যারা মানবে না তারা কাফির বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকারের প্রয়োজন হয়েছিল, শুধুমাত্র তখনই এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, বর্তমানে হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও হবে না।

পক্ষান্তরে যখন কোনো নবী আগমনের প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহ তা'য়ালার হিকমাত এবং তাঁর রহমতের কাছে কোনোক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে শুধু শুধু কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মাতভুক্ত হবার সুযোগ দিবেন না। সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও সকল আলেম-উলামার ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে চিরকালের জন্য নবুয়্যাতের দরোজা বন্ধ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সর্বোপরি নবী করীম (সাঃ) কে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন, এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর পরে এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো নতুন নবী-রাসূলের প্রয়োজন নেই।

মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপান, তিনিই নবীদের সীল মোহর

নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ع

হে মানুষ (তোমরা জেনে রেখো), মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, তিনি তো হচ্ছেন আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল এবং নবীদের সিল (মোহর), আল্লাহ তা'য়ালা সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন। (সূরা আল আহযাব-৪০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে সর্বোচ্চ মর্যাদার পূর্ণ সোপানে উপনীত করেছেন বিধায় তাঁকেই নবী-রাসূলের সীল মোহর হিসাবে ঘোষণা করে নবুয়্যাতের সমাপ্তি করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমান পৃথিবীতে একটি জনগোষ্ঠী যারা কাদিয়ানী নামে পরিচিত, তারা খত্মে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করেছে ইসলাম বিদ্বেষী মহল মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত ও দুর্বল করার লক্ষ্যে কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা সূরা আহযাবের উল্লেখিত আয়াতের 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ করে থাকে 'নবীদের মোহর'। তারা বুঝাতে চায়, নবী করীম (সাঃ) এর পরে তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরো অনেক নবী পৃথিবীতে

আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুয়্যাত বিশ্বনবীর মোহরাঙ্কিত না হয় ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।

পক্ষান্তরে উল্লেখিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না। যারা উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছে, যদি সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা:) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব (রা:) এর সাথে নবী করীম (সা:) এর বিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানা ধরনের সংশয়-সন্দেহের উত্তর দিতে গিয়ে সূরা আহযাবের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় সহসা সে আয়াতের মাঝে বলে দেয়া হলো যে, 'মুহাম্মদ (সা:) হলেন নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে সংখ্যক নবী আগমন করবেন তারা সকলেই তাঁরই মোহরাঙ্কিত হবেন'।

হযরত যয়নব (রা:) এর ঘটনার মাঝখানে এ কথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে উক্ত বিয়ের বিরোধিদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিলো তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধিদের হাতে এক চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই নবী করীম (সা:) কে বলতে পারতো যে, 'আপনি যয়নবকে বিয়ে করে পালক পুত্রের প্রথা রহিত না-ও করতে পারতেন, এ প্রথা রহিত করতে গিয়ে আজ যে অপবাদের মোকাবেলা আপনাকে করতে হচ্ছে, এ থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতেন। কেননা এই অর্থহীন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রথাটা যদি একান্তই বাতিল করার প্রয়োজন হতো, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাঙ্কিত হয়ে যেসকল নবী আসবেন, তারাই তো এই প্রথাটি বাতিল করতে পারতেন'।

কিন্তু আরবী ভাষার অধিকারী আরববাসী এ ধরনের কোনো প্রশ্ন নবী করীম (সা:) এর সামনে উত্থাপন করেনি। 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ যদি বর্তমানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদারদের অনুরূপ হতো, তাহলে আরবের লোকজন নবী করীম (সা:) এর সম্মুখে তেমন কোনো প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করতো। আরবদের তুলনায় বর্তমানের কাদিয়ানী গোষ্ঠী কি আরবী ভাষায় অধিক দক্ষ? এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী কুরআনের উক্ত আয়াতের আরেকটি অর্থ করেছে যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন'–এর অর্থ হলো, 'আফজালুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ নবুয়্যাতের দরোজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুয়্যাত পূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মাদ (সা:) এর ওপর।

কিন্তু তাদের এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মূল ঘটনার অগ্রপশ্চাতের সাথে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যার সাদৃশ্য

নেই। বরং তাদের সে ব্যাখ্যা পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে। তদানীন্তন কালের কাফির ও মুনাফিকরা নবী করীম (সাঃ) কে বলতে পারতো, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনার তুলনায় কম মর্যাদা সম্পন্ন নবী যখন আপনার পরে আসতেই থাকবে, তখন এ পালক পুত্র রহিতকরণের বিষয়টি তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন, এই প্রথার ইতি যে আপনাকেই ঘটাতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা তো নেই'।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উপনীত করে নবী-রাসূলদের আগমনের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে যে 'খাতামুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, এ শব্দটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আরবী ভাষায় এই শব্দটি 'খাতাম'ও হয় আরার 'খাতিম'ও হতে পারে। এ শব্দটি ক্রিয়াবাচক হতে পারে আবার শেষ অর্থে নাম ও 'পদ'ও হতে পারে। যা দিয়ে শেষ করা হয় এ শব্দটি সে অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ এই শব্দ ব্যবহার করে নবুয়্যাতের দ্বার চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা আহযাবে ব্যবহৃত খাতাম শব্দটির মাত্র একটি অর্থই হতে পারে। সে অর্থ হলো, নবুয়্যাতের দ্বার চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর পরে কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই এবং অবকাশ নেই রিসালাতের। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত কুরআনের অভিধান, তাফসীর ও ইতিহাসের এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা। এ সম্পর্কে দুইজন গবেষকও দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

সকল অভিধান বিশারদ এবং মুফাস্সিরীনে কেরাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন, আখিরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'-এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি ডাকে দেয়া হয়, বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে বের হতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সমগ্র কুরআনে নবী করীম (সাঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদার যে চিত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্কন করেছেন, কাদিয়ানীরা কুরআনে বিবৃত 'খাতাম' শব্দের যে অর্থ প্রচার করে থাকে তা কুরআনে অঙ্কিত এ চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

নবী করীম (সাঃ) খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে বলেন, 'বনী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর রাসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোনো নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন (সেই শূন্যতা পূরণ করতেন)। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী হবে না, শুধু খলীফা'। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَآءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَ أَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ-

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তি একটি দালান নির্মাণ করলো এবং তা খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয়নি কেনো? বস্তুতঃ আমি সেই ইট এবং আমিই শেষনবী’। (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়্যাতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোনো শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য পুনরায় কোনো নবীর প্রয়োজন হবে।) (বুখারী)

এই একই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে কিছু অংশ বেশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘এরপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম’। হাদীসটি তিরমিজী শরীফে একই শব্দসহ কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাদলিন নাবী এবং কিতাবুল আদাবের বাবুল আমসালে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শেষের অংশ হলো ‘আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম হলো’।

মুসনাদে আহ্মাদে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে একই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা’ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহুম আজমাঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ‘ছয়টি ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দান করা হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদ (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামাজ কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে আদায় করা যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই

নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র পৃথিবীর জন্য আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে'। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'রিসালাত এবং নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো রাসূল এবং নবী আসবে না'। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)। আমি আহ্মাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফ্রকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না'। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِىْ خَمْسَةُ أَسْمَآءِ أَنَا مُحَمَّدُ وَ أَنَا الْمَاحِىَ الَّذِىْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِى الْكُفْرَ وَ أَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِىْ و أَنَا الْعَاقِبُ-

হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমদ। আমি আল মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কুফর নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল হাশির (কিয়ামতের দিনে সমবেতকারী) আমার পশ্চাতে মানব জাতিকে সমবেত করা হবে এবং আমি আল আকিব (শেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না) (বুখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে'। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে আ'স (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে এলেন। তিনি এভাবে এলেন যেন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। তারপর বললেন, আমার পর আর কোনো নবী নেই'। (মুসনাদে আহ্মাদ)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই। আছে সুসংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জানতে চাওয়া হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন, 'উত্তম স্বপ্ন–কল্যাণময় স্বপ্ন'। (অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ হবার এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই। খুব বেশি একথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে) (মুসনাদে আহ্মাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'আমার পরে যদি কোনো নবী হতো তাহলে উমার ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো'। (তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই'। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্মাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টো হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো, 'কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই'। আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহ্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে মদীনা নগরীর তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো'। অর্থাৎ তূর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা (আঃ) যেমন বনী ইসরাঈলীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর মনে এই একথাও জাগে যে, হযরত হারুনের সাথে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং পর মুহূর্তেই তিনি কথাটি স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, 'আমার পর আর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না'।

হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই'। (আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, 'আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোনো উম্মাত নেই'। (বাইহাকী, তাবারাণী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, 'আমি শেষনবী এবং আমার মাসজিদ' (অর্থাৎ মাসজিদে নববী শেষ মাসজিদ)। (মুসলিম)

অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ হাদীস থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে,' নবী করীম (সাঃ) যেমন তাঁর মাসজিদকে শেষ মাসজিদ বলেছেন অথচ এটিই শেষ মাসজিদ নয়, এরপরও পৃথিবীতে অগণিত মাসজিদ নির্মিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে তিনি শেষনবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবে। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষনবী এবং তাঁর মাসজিদ শেষ মাসজিদ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের বিকৃত অর্থই এ কথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের কথার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টাও করেনি। মুসলিম শরীফের এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্মুখে রাখলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহর রাসূল তাঁর মাসজিদকে শেষ মাসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন।

এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এবং হযরত মাইমুনা (রাঃ) এর যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মাত্র তিনটি মাসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মাসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সেখানে নামাজ আদায় করলে অন্যান্য মাসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি সওয়াব হয় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মাসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য ভ্রমণ করা জায়েজ। পৃথিবীর অবশিষ্ট মাসজিদগুলোর মধ্যে সকল মাসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মাসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়।

উক্ত তিনটি মাসজিদের মধ্যে মাসজিদুল হারাম হলো প্রথম মাসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো মাসজিদুল আক্সা, হযরত সুলাইমান (আঃ) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি হলো মদীনা নগরীর মাসজিদে নববী। এটি নির্মাণ করেন নবী করীম (সাঃ)। রাসূলের কথার অর্থ হলো, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, সেহেতু আমার মাসজিদের পর পৃথিবীর আর চতুর্থ এমন কোনো মাসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামাজ আদায় করার সওয়াব

অন্যান্য মাসজিদের তুলনায় বেশি হবে এবং সেখানে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ হবে।

আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বহু সংখ্যক সাহাবী এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভযোগ্য সনদসহ এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, তিনিই শেষনবী। তাঁর পর কোনো নবী আসবে না। নবুয়্যাতের ক্রমধারা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি রাসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল এবং মিথ্যুক। পবিত্র কুরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? রাসূলের বক্তব্যই এখানে বাস্তব সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন রাসূলের বক্তব্য কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চেয়ে অধিক আর কে কুরআন বুঝেছে এবং তাঁর চেয়ে অধিক কুরআনের ব্যাখ্যার অধিকার কোন্ ব্যক্তির রয়েছে? এমন কে আছে যে, খত্মে নবুয়্যাতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেও ইসলামের অনুসারীরা প্রস্তুত থাকবে?

খত্মে নবুয়্যাতে অবিশ্বাসী কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবী করীম (সাঃ) এর বক্তব্যের বিপরীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বলে কথিত একটি বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। সে বর্ণনা হলো, 'বলো নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, এ কথা বলো না যে তাঁর পর নবী নেই'।

এ হাদীসের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের কথা হলো, প্রথমত নবী করীম (সাঃ) এর সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশা নবী করীম (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দেয়া চরম ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বলে কথিত হাদীসটি মোটেই হাদীস নয়। এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের প্রামাণিক কোনো গ্রন্থেই হযরত আয়েশার বলে কথিত হাদীসটির উল্লেখ নেই। কোনো বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী হাদীস নামে বর্ণিত সে বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বর্ণনা বলে কথিত বর্ণনাটি শুধু 'দুররি মানসুর' নামক তাফসীরে এবং 'তাকমিলাহ্ মাজমা-উল-বাহার' নামক অপরিচিত সংকলন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এর উৎপত্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনোই ধারণা পাওয়া যায় না। নবী করীম (সাঃ) এর সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য

সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন অতি সতর্কতার সাথে, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার বলে কথিত একেবারেই দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস নামে কথিত বাক্য দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে যাওয়া চরমতম ধৃষ্টতা এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ওপরে মদীনার মুনাফিকদের ন্যায় কলঙ্ক আরোপের শামিল।

শেষনবী প্রসঙ্গ ও সাহাবায়ে কেরাম

মহাপবিত্র আল কুরআন ও হাদীসের প্রমাণের পর অবশিষ্ট থাকে সকল সাহাবায়ে কেরামের মতামত এবং সাহাবায়ে কেরামের মতামতই হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের মতামতের সামনে তাঁদের পরবর্তী কোনো মানুষের মতামতের কানাকড়ি মূল্যও নেই। সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়্যাতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়্যাত স্বীকার করে নেয়, তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা মিথ্যাবাদীর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এই লোকটি নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাত অস্বীকার করেনি, বরং সে দাবী করেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবুয়্যাতে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অংশীদার করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পূর্বে এই মিথ্যাবাদী মুসাইলামা আল্লাহর রাসূলের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেছিল তাতে সে উল্লেখ করেছিল, 'আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সমীপে। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়্যাতের কার্যক্রমে অংশীদার স্থাপন করা হয়েছে'।

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামা যে আযান প্রথার প্রচলন করেছিল তাতে 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-ও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফির ও মুসলিম উম্মাত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হুনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজেই তাকে তাঁর নবুয়্যাতের কাজে অংশীদার স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও আরেকটি কথা হলো, মদীনা থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হুনায়ফার কাছে গিয়ে সে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার প্রতি অবতীর্ণ আয়াত বলে বর্ণনা করেছিল। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর)

সাহাবায়ে কেরাম এই মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি বরং তার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোনো বিদ্রোহের অপরাধ ছিলো না বরং সে অপরাধ ছিলো এক ব্যক্তি নবী করীম (সা:) এর পরে নবুয়্যাতের দাবী করে এবং কিছু লোকজন তার প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই সাহাবায়ে কেরাম এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন হযরত আবু বকর (রা:) এবং সাহাবায়ে কেরামের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবী করীম (সা:) শেষনবী এবং তাঁর পরে কোনো ধরনের ছায়া নবী বা যে কোনো নবীর যে আসার আর অবকাশ নেই, সকল সাহাবায়ে কেরামের এই পদক্ষেপই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

ইসলামী আইনে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের পরে চতুর্থ পর্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী কালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ। বিষয়টি এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর, যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার ইসলামী চিন্তাবিদগণই সর্বদা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছেন যে, 'মুহাম্মাদ (সা:) এর পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না। তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবী মেনে নিবে বা সমর্থন দেবে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফির এবং ইসলামের সীমানায় তার স্থান নেই'। ইমাম আবু হানিফা (রাহ:) এর যুগে এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে বলেছিল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি যে নবী তা প্রমাণ করে দেবো এবং নবুয়্যাতের দলীল পেশ করবো'।

এ কথা শুনে খত্মে নবুয়্যাতের অতন্দ্র প্রহরী হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহ:) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'নবী করীম (সা:) এর পরে যারা নবুয়্যাতের দাবী করবে আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে নবী হওয়ার প্রমাণ দাবী করবে সে-ও কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) বলেছেন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই'।

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (রাহ:) (২২৪-৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'যে নবুয়্যাতকে খতম করে দেয়া হয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরোজা আর কারো জন্য খুলবে না'। (তাফসীরে ইবনে জারীর, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা নম্বর ১২)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা

একটি কথা সকলকেই স্মরণে রেখে সাহাবায়ে কেরাম বা অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী পাঠ করতে হবে যে, নবী করীম (সা:) এর জীবনী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম-নীতি, পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়নি। সুতরাং নবী করীম (সা:) ব্যতীত অন্য কারো জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য আড়াল হওয়া, কোনো ঘটনা উল্লেখ না হওয়া অথবা কোনো ঘটনা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা, বিদ্বেষপ্রসূত বর্ণনা বা অতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রঞ্জিত বর্ণনা, বর্ণনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, মানসিকতা কর্তৃক প্রভাবিত বর্ণনা দোষাশ্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ:) এর জীবনী গ্রন্থগুলোয় এমন সব ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যা পাঠ করলে মনে হবে যে, তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা আল্লাহর রাসূলের থেকেও অনেক অনেক বেশি ছিলো (নাউযুবিল্লাহ)। আসলে অতিভক্তির কারণেই এ ধরনের অতিরঞ্জিত ঘটনাবলীর জন্ম দেয়া হয়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস, তারও পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, বালাকোটের ইতিহাস, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং নিকট অতীতে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ জন্ম নেয়ার ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি-আদর্শ ও চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন, তিনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাস রচনা করেছেন। কোথাও প্রকৃত সত্যকে আড়াল করা হয়েছে, কোথাও ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে আবার কোথাও মন-মস্তিষ্কপ্রসূত কাহিনী সংযোজন করা হয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাস পক্ষপাত দোষাশ্রিত এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। সুতরাং দুই ধরনের বর্ণনা সম্বলিত রচিত ইতিহাস পাঠ করে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করা বড়ই কঠিন। এ জন্য সমগ্র ইতিহাস পাঠ করে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে হবে এবং মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সত্য আড়াল করা হয়েছে, তা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম শুধু মুসলিম উম্মাহরই নয়, সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এ ব্যাপারে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে–

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّا بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلُ هذه الأُمَّة أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَ أَعْمَقَهَا عِلْمًا وَّ أَقَلَّهَا تَكَلُّفًا إِخْتَارَ هُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلإِقَامَةِ دِيْنِه فَاعْرِفُوْا لَهُمْ

فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا هُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِ هِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে আগ্রহী, তার উচিত এমন ব্যক্তির সুন্নাত ধারণ করা যিনি ইন্তেকাল করেছেন। কারণ যে ব্যক্তি জীবিত সে যে ভবিষ্যতে ফিত্নায় নিপতিত হবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর সেই ইন্তেকাল করা লোকগুলো হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম চরিত্রবান লোক। তাঁদের হৃদয় ছিলো সমধিক পূণ্যময়-আলোক উজ্জ্বল এবং গভীরতম জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁদের মধ্যে কেনো কৃত্রিমতা ছিলো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে বাছাই করেছিলেন তাঁর নবীর সাহাবী হিসেবে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অতএব তোমরা তাঁদের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করো, স্বীকার করো, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের যতদূর সম্ভব তোমরা গ্রহণ করো। কারণ তাঁরা ছিলেন সঠিক ও সুদৃঢ় হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (মিশকাতুল মাসাবীহ্)

তাঁদেরকে অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবমণ্ডলী কৃতকার্যতা ও সফলতার পথে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যেমন তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁদেরকে যারা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের প্রতিও আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِه صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ-

আল্লাহ তা'য়ালা তাদেও (বেশি) পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই কওে, যেন তারা এক শীশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর। (সূরা আস্ সফ-৪)

আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনের এই আয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য ছিলো। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নিষ্ঠা, আস্থা ও ঐকান্তিকতা পূর্ণমাত্রায় ছিলো। নৈতিক চরিত্রের সর্বোন্নত মান তাঁদের সকলের মধ্যে সক্রিয় ছিলো এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের সকলের ঐকান্তিক অনুরাগ ছিলো। এভাবে তাঁরা ছিলেন শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ, ফলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে একটি যুগান্তকারী পৃথিবী কাঁপানো ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটানো। তাঁদের ঈমান-আকীদা, ঐক্য ও শক্তির সম্মুখে তাঁদের শত্রুরা প্রত্যক্ষ মোকাবিলায় নাস্তানাবুদ হতে বাধ্য হয়েছিলো। তাঁরা সংখ্যায় মাত্র তিন হাজার হয়েও এক লক্ষ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। একের পর এক এলাকা

বিজয় করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করে মজলুম জনতার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। শক্তিধর স্বৈরাচারীর তখ্তে তাউস ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়েছেন। তদানীন্তন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের শাসকদের গগনচুম্বী অহঙ্কার ভেঙে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র হাতে গড়া মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রার কারণে মানবতার দুশমন ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিকদের নিভু নিভু প্রদীপের শেষ আলোটুকুও নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং তাদের পায়ের নীচের মাটি সরে গিয়েছিলো। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার মধ্যে তারা নিজের মৃত্যুদূত দেখতে পেয়ে অন্ধকার কুঠুরীতে বসে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিলো। মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর ঘৃণ্য দায়িত্ব অর্পিত হলো আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক জনৈক ইয়াহুদীর প্রতি। এই কুচক্রী লোকটি তার সঙ্গী-সাথীসহ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:) এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রহসন করলো এবং মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সূচনা করলো। নবী করীম (সা:) যা বলেননি এই লোকটি সেসব কথা আল্লাহর রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা শুরু করলো। জাল হাদীস রচনা করার মূল হোতাই এই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক অভিশপ্ত লোকটি।

এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক– মুসলমানদের কলিজায় রক্তক্ষরণের ইতিহাস। জাল হাদীসের সূত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হলো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইরাকের বসরা, কুফা ও মিসরে ঘাঁটি গেড়ে মুসলিম জাহানের সকল স্থানে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিলো। তাদের ষড়যন্ত্রের কালোহাত ক্রমশ পবিত্র ভূমি মদীনার দিকে অগ্রসর হলো। মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নবী করীম (সা:) এর পবিত্র সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উপকৃত হওয়ার সুযোগ খুব কম হয়েছে। এরপরও ছিলো তোলাকা বংশের লোকজন, যারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। মক্কা বিজয়ের পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো বটে, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

রাসূলের ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর (রা:) এর খিলাফতের সময় মক্কা বিজয়ের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুসায়লামাহ্ নামক এক অভিশপ্ত লোক নিজেকে নবী হিসাবে দাবি করলো। এসব মুরতাদদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হলো এবং মুসায়লামাহ্ কাজ্জাবসহ তার দলের অনেকেই মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। অপরদিকে

ইয়াহুদীদের আদি আবাস ভূমি ছিলো মদীনা। আল্লাহর রাসূলের সাথে বার বার বিশ্বাঘতকতা করার কারণে মদীনা থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এই ইয়াহুদী গোষ্ঠী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাকে গোপনে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলো। এ ধরনের নানাবিধ বিষে মুসলিম সমাজ আক্রান্ত হয়েছিলো ফলে সমগ্র মুসলিম জাহান এক তরিৎ গতিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী রাজনৈতিক সুবিধাবাদিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকরা আঁতাত করে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ঘোলাটে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিলো। অবশেষে সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিষ্ফোরিত হলো হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতবরণের মাধ্যমে। বিশ্বাসঘাতকরা এভাবেই মুসলমানদেরকে ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে নিলো। তৃতীয় খলীফার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসঘাতকরা ষড়যন্ত্র নামক বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চন করতে থাকলো। পরিণতিতে মুসলমানদের আত্মকলহের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটলো জামাল ও সিফ্‌ফিন যুদ্ধের মাধ্যমে। ভাই কর্তৃক আরেক ভাইয়ের হাত রক্তে রঞ্জিত করে ছাড়লো ষড়যন্ত্রকারীর দল। মুসলিম জাহানে বিভেদ রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। ষড়যন্ত্রের আগুনে জ্বলতে থাকলো মুসলিম জাহান। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)ও শাহাদাতবরণ করলেন। মুসলমানদের পতনের যে সূচনা ঘটেছিলো, কারবালার লোমহর্ষক– করুণ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা যেনো পূর্ণতা লাভ করলো।

এরপর ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের দল ইসলামের দরদী সেজে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি দল ও উপদলের সূচনা করলো, কোনো কোনো দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈনসহ অপরাপর বহু সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে মিথ্যাশ্রিত তথ্য ও তত্ত্বে অবতারণা ঘটিয়ে তাঁদেরকে ঐতিহাসিকভাবে কলঙ্কিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলো।

এবার সামনে এলো ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনার পালা। কারবালার নিষ্ঠুর নিদারুণ ঘটনার মধ্য দিয়েই ষড়যন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটলো না। ষড়যন্ত্রকারীরা আল্লাহর রাসূলের পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস এমন সুচতুরভাবে কালিমা লিপ্ত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেনো মুসলিম মিল্লাত সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস নিয়ে আত্মকলহে লিপ্ত থাকে। মুসলিম মিল্লাত যেসব মর্যাদাবান বুযুর্গ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে মহাসত্যের পথে তথা কৃতকার্যতা ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে, সেসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা করলো।

যারা বদর, ওহুদ, খন্দক, ইয়ারমুক, হুনাইন ইত্যাদী রণক্ষেত্রে পরস্পরে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধিদের সাথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার নিয়তে একদিন যুদ্ধ করেছিলো, কালের আবর্তনে ষড়যন্ত্রকারীদের কূটকৌশলে তাঁরাই পরস্পরের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠলো। যাদের ষড়যন্ত্রে সাহাবায়ে কেরামের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ফাটল ধরলো, এক ভাইয়ের হাত অন্য ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হলো, তারাই আবার সাধু সেজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস রচনায় কোমর বেঁধে নেমে পড়লো। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে মহাসত্যের ধারক-বাহক, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সিপাহ্সালার, আমানতদার ও বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কেরামের সূর্য-উজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশে মসীলিপ্ত করলো। সত্যাশ্রয়ীকে বানালো মিথ্যাশ্রয়ী, আমানতদারকে বানালো খিয়ানতকারী, অহিংসকে বানালো হিংসুক, দয়ালুকে বানালো নিষ্ঠুর, পরস্বার্থ রক্ষাকারীকে বানালো পরস্বার্থ হরণকারী, জাগতিক সহায়-সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি মোহমুক্ত নির্লোভীকে বানালো ক্ষমতালোভী, সহজ-সরল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারীকে বানালো কূটকৌশলের অধিকারী ও সোজা পথের পথিককে বানালো বক্র পথের যাত্রী। এভাবে ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকরা এমন ইতিহাস রচনা করলো, যেনো পৃথিবীর অনাগত মানবমণ্ডলী সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে।

আরেক শ্রেণীর ঐতিহাসিক, নবী পরিবারের প্রতি অতিমাত্রায় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করলো যে, যা হয়ে পড়লো সম্পূর্ণ একপেশে। কেউ আবার আবেগ নির্ভর শব্দ সংযোজন করে ইতিহাস রচনা করে সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থটিই আবেগ নির্ভর করে তুললো। এভাবে কোনো সাহাবীর প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি, কোনো সাহাবীর প্রতি মনের কোণে বিদ্বেষ লালিত করে এমনভাবে ইতিহাস রচনা করা হলো যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া পরবর্তী লোকদের জন্য চরম কঠিন হয়ে পড়লো।

বর্তমানে একবিশং শতাব্দীর কয়েকটি ঘটনার দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। আমেরিকা আফগানিস্থান ও ইরাকে মুসলমানদের রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে দেশ দু'টো দখল করলো। এই দেশ দু'টো দখল করার পূর্বে তারা একটি হাস্যকর প্রেক্ষাপট রচনা করে দেশ দু'টোর উপরে হামলে পড়লো। কালের আবর্তনে একদিন আফগানিস্থান ও ইরাকের ইতিহাস রচিত হবে। এই দেশ দু'টো দখল করার ব্যাপারে আগ্রাসী আমেরিকার সমর্থক যারা– তারা লিখবে, 'এই দেশ দু'টোর শাসক গোষ্ঠী ছিলো সন্ত্রাসের সমর্থক। আল কায়েদা নামক সন্ত্রাসী দলকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করিয়েছে, বিশেষ করে ইরাকের শাসক ছিলো মানবতা ও গণতন্ত্রের দুশমন। ইরাকের শাসক গোষ্ঠী মানবতা বিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করে পৃথিবীকে বিপন্ন করে

তুলেছিলো। এ কারণে মানবতার বন্ধু আমেরিকা তার সমর্থকদের সহযোগিতায় দেশ দু'টোয় আক্রমণ করে সন্ত্রাসী দলকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে বিপদ মুক্ত করেছে'।

অপরদিকে আমেরিকা-বৃটেন ও ইসরাঈলের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিদের মধ্যে যারা আফগানিস্থান ও ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করবে- তারা লিখবে, 'একবিংশ শতাব্দীর জঘণ্যতম স্বৈরাচার, মানবতার দুশমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ- যে লোকটিই সর্বপ্রথম আমেরিকার ইতিহাসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে, তিনি অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করে তাদের তেল সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে নিজেরাই আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে স্বাধীন দু'টো মুসলিম দেশ আফগানিস্থান ও ইরাকে যুদ্ধের নামে ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়ে দেশ দু'টো দখল করে পরাধীনতার জিঞ্জির পরিয়ে দিয়েছে'।

উল্লেখিত এই দু'ধরনের ইতিহাস রচনা ব্যতীতও নানাজনে নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনা করবে এবং আগামী কয়েক শতাব্দী পরের লোকজন যখন এসব ইতিহাস পড়বে, তখন তাদের পক্ষে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এটাই যদি হয় বাস্তবতা এবং প্রকৃত সত্য, তাহলে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের কূটকৌশলের কারণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিলো এবং পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতকরাসহ নানাজনে এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করলো, সেসব ইতিহাস পাঠ করে কি করে একজন সাহাবী সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে?

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী রচনা ও তাঁদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তারপরেও হাদীস গবেষক ও বিশারদ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার সনদমূলক ইতিহাস যাচাই করতে গিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য ও স্পষ্ট যে, পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরাম নবী-রাসূলদের পর সর্বোত্তম সৃষ্ট মাখলুক ছিলেন- নবী-রাসূলদের পরেই তাঁরা ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। পক্ষান্তরে তাঁরা মানবীয় বৈশিষ্টের উর্ধ্বেও ছিলেন না।

নবী করীম (সাঃ) এর অনুপম সাহচর্য, আদর্শ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ও কৌশলের এ বিষয়ের স্বাভাবিক দাবী ছিলো এবং আল্লাহর রাসূলেরও একান্ত

আকাঙ্খা ছিলো যে, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিত্র থেকে অন্তত: একটি ভুলের চির অবসান হওয়া উচিত, সেই ভুলটি হলো– তাঁর কোনো সাহাবী যেনো ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ব্যাপারে কোনো মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত না করেন। অন্য কোনো ভুল-ভ্রান্তির প্রভাব তো এক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ভুল হাদীস বর্ণনার কারণে ইসলামের সমগ্র ইমারতই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিলো। এই আশঙ্কা রোধ করা ও অবসানের লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে'। (বুখারী-কিতাবুল ইল্‌ম)

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَنَسٌ اَنَّهُ لَيَمْنَعُنِى اَنْ اُحَدِّثُ كُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

হযরত আব্দুল আযীয (রাহ:) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা:) বলেন, আমাকে তোমাদের কাছে বেশি হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয় নবী করীম (সা:) এর একটি বাণী, যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে'। (বুখারী-কিতাবুল ইল্‌ম)

رِبْعِى بْنِ حَرَاشٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ–

হযরত রিবঈ ইবনে হারাশ (রা:) বলতেন যে, তিনি আলী (রা:) কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম (সা:) বলেছেন, তোমরা আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করো না, কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করতে হবে। (বুখারী- কিতাবুল ইলম)

عَبْدُ اللّٰه بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّى لاَ اَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ قَالَ اَمَا إِنِّى لَمْ اُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:) বলেন, আমি (নিজ পিতা) যুবাইরকে বললাম, অমুক অমুক লোক যেমন হাদীস বর্ণনা করে, আপনাকে তো আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে তেমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন, দেখো, আমি তাঁর (ঘনিষ্ঠতা) থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। (সুতরাং হাদীস তো আমি জানি) কিন্তু তাঁকে (রাসূল স. কে)

বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে তার আসন আগুনের বানাতে হবে। (বুখারী, কিতাবুল ইলম)

عَنْ سَلَمَةَ هُوَ إِبْنُ الأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلُ عَلَىَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ أْمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

দুই শতেরও অধিক সাহাবী আল্লাহর রাসূলের উল্লেখিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। এমনকি মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন যে, অন্য কোনো হাদীস এসব হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতার সীমায় পৌঁছতে পারেনি। নবী করীম (সাঃ) এর কোনো হাদীস বর্ণনা করার সময় অধিকাংশ সাহাবী এসব হাদীস শুনাতেন এবং সে সময় আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে তাঁদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো ও দেহ রোমাঞ্চিত হতো। কি জানি, হঠাৎ করে মুখ থেকে যদি কোনো ভুল কথা বের হয়ে যায়, এই ভয়ে অনেক সাহাবী অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতেন। মুহাদ্দিসগণও এসব হাদীস অধিক বর্ণনা করতেন এবং অনেকে এ হাদীসসমূহ দিয়েই তাঁদের বর্ণনাধারার সূচনা করতেন। এরপর অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেন–

اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-

'অথবা নবী করীম (সাঃ) যেমন বলেছেন'। যেনো অজ্ঞতার কারণে জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হতে না হয়।

এ ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি হাদীস নয়– বরং অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর কিতাবুল জানায়েয এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা অন্য কারো সম্পর্কে মিথ্যা বলা সমপর্যায়ের নয়। যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো সে যেনো জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়'। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমার প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করো না, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রটনার আশ্রয় গ্রহণ করবে, তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অধারিত'। (বুখারী-কিতাবুল ইল্ম)

কুরাইশে ওয়াসেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেন–

اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرِى اَنْ يَّقُوْلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ-

সবথেকে বড় মিথ্যা ও জঘণ্যতম রটনা হলো, নবী করীম (সাঃ) যা বলেননি সে কথা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা। (বুখারী-কিতাবুল মানাকেব)

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, 'আমাদের প্রতি নবী করীম (সাঃ) এর শেষ ওসিয়ত ছিলো, যারা আমার হাদীস ভালোবাসবে তাদের সাথে খুব শীঘ্রই তোমাদের পরিচয় ঘটবে। আমি বলিনি এমন কথা যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পৃক্ত করে প্রচার করবে আমার দিকে সম্বোধন করে বলবে তার ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নামে'। প্রায় হাদীস গ্রন্থসমূহেই এই বিষয়ের ওপরে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের এই ধরনের অসামান্য সতর্কতা ও কঠোর শাস্তিমূলক সতর্কবাণীর কারণে সাহাবায়ে কেরামদের হৃদয় থেকে আল্লাহর রাসূলের বলা কথার সাথে মাত্র একটি অক্ষরও নিজেদের পক্ষ থেকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা এমনভাবে দূরীভূত হয়েছিলো যে, সমগ্র সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন সাহাবীও আল্লাহর নবীর কথার সাথে নিজের পক্ষ থেকে একটি মাত্র কথাও সম্পৃক্ত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার শপথ! আল্লাহর রাসূলের প্রতি মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করা অপেক্ষা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার জন্য অধিকতর সহজ বিষয়'। (বুখারী)

হযরত ওয়াকী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হযরত আমাশের একটি কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকের অবস্থা এমন ছিলো যে, নবী করীম (সাঃ) এর কথায় ওয়া, আলিফ বা দাল ধরনের একটি অক্ষরও নিজেদের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করে দেয়ার থেকে আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাওয়াকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন'। যে মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ইতিহাসে নানা ধরনের আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, 'আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে হাদীসও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হতো এবং বলা হতো, হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তাঁকে সামান্যতম অভিযুক্তও করা যায় না'।

এ জন্য মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের বর্ণনা যখন বিশ্বস্ত সূত্রে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা বলে যথার্থ প্রমাণ পেয়েছেন, তখন সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণনা গ্রহণ করতে তাঁরা কোনো সন্দেহে জড়িয়ে পড়েননি। কারণ, গবেষক ও মুহাদ্দিসগণের মতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতবিরোধপূর্ণ সকল ইতিহাসের আলোকে সার্বিক বিবেচনায় এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) এর অথবা অন্য কোনো সাহাবীর ব্যাপারে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় এবং সে সকল বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত নয়। এ ধরনের ইতিহাস কোনোক্রমেই যেমন গ্রহণযোগ্য হতে পারে

না এবং এসব ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে সে সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সামান্যতম আপত্তিকর মন্তব্যও করা যেতে পারে না।

কারণ ইতিহাসে দেখা যায়, একই ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে জড়তা, স্থবিরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের অবতারণা ঘটেছে। আর এ কারণেই ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা বশত: কোনো কোনো উচ্চস্তরের জ্ঞানী-গুণী গবেষক, সমালোচক তথা পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গও ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে মোটেও দ্বিধা করার কারণ থাকতে পারে না যে, এ ধরনের ভুল যারাই করেছেন, তাঁদের ভুলকে শ্রদ্ধার সাথে ভুল বলেই স্বীকার করতে হবে। এ ধরনের ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ ইতিহাস যখন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখনী যন্ত্রে ফুটে ওঠে, তখন অন্যান্যদেরকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে যে, উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ লেখনী বা বর্ণনার ক্ষেত্রে তদানীন্তন কালের ঘটনাবলীর ইতিহাসকে সঠিক ইতিহাস বলে বুঝতে গিয়ে ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হয়েছেন– বিষয়টি এমনও হতে পারে।

পক্ষান্তরে এই ধরনের ঐতিহাসিক ভুল বুঝাবুঝি অথবা ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে নবী করীম (সা:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঈমানদার হিসাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক অদম্য আকর্ষণ জনিত স্পর্শকাতর প্রশ্নটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সিফ্ফিন যুদ্ধে হযরত আলী (রা:) এর খিলাফত বিভক্ত হওয়া, হযরত মুয়াবিয়া (রা:) কর্তৃক তাঁর সন্তান ইয়াযীদের ক্ষমতারোহণ, কারবালার মর্মস্পর্শী লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হওয়া, ইয়াযীদ কর্তৃক হার্‌রা-এর মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং তার প্রেরিত চার হাজার সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের ওপর নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা অধিকাংশ মুসলমানদের হৃদয়ের কোমল কোণে স্পর্শ করে হৃদয় জগতকে আলোড়িত করাই স্বাভাবিক। নবী করীম (সা:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক ভালোবাসার প্রশ্নে ইতিহাসের এই স্পর্শকাতর কালো অধ্যায়টিতে উপনীত হয়ে বহু উচ্চস্তরের গবেষক, আলোচক-সমালোচক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গও তাঁদের আলোচনা-সমালোচনা ও লেখনীতে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হননি।

আল্লাহর রাসূলের অবর্তমানে ইতিহাসের এই অধ্যায়ে উপনীত হয়ে কোনো একক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া এই স্পর্শকাতর ঐতিহাসিক অধ্যায়ে যে সকল উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভুলের শিকার হয়েছেন– তাঁরা যদিও ভুলের শিকার হয়েছেন, তবুও তাঁদের এই ভুল নবী করীম (সা:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার মতো প্রশংসনীয় ঈমানী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সুতরাং তাঁরা নবী করীম (সাঃ) ও নবী পরিবারের প্রতিপক্ষের ব্যাপারে আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও সমালোচনার ব্যাপারে যতটুকু ভুলের শিকার হয়েছেন, তাঁদের এই ভুলকে কোনো কোনো সাহাবীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ বা শত্রুতা হিসাবে গণ্য করলে তাঁদের প্রতি মোটেও সুবিচার করা হবে না। বরং তাঁদের ভুলকে নবী করীম (সাঃ) ও নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঈমানী ভালোবাসার কারণে 'ভারসাম্যহীনতা' বলে আখ্যায়িত করাই সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় বলে পরিগণিত করা যেতে পারে।

আমার উল্লেখিত এই কথাকে কেউ যদি ভুলকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ওকালতী হিসাবে গণ্য করেন, তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ এটা হলো মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার ফতোয়াগত একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতির ব্যাপার।

পক্ষান্তরে উল্লেখিত এই মূলনীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে– যে ক্ষেত্রে অভক্তি, বিদ্রোহ তথা ইলহাদের অনুপস্থিতির কারণে উল্লেখিত মূলনীতি অবলম্বন করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে মূল বিষয়টিতে যেহেতু উভয়পক্ষে সম্মানিত ও মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরাম যুক্ত রয়েছেন, সুতরাং তাঁদের আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনায় ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা শুধু নিরাপদই নয়– বরং এটাই হবে ইনসাফপূর্ণ নীতি।

অতএব আল্লাহর রাসূলের সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রচিত বিদ্বেষপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত জীবনী ও ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যাত বলেই সকলের বিবেচনা করা সর্বাধিক উত্তম এবং এর মধ্যেই মুসলমানদের ঈমানী নিরাপত্তা নিহিত– এর মধ্যেই কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা সুরক্ষিত। আর এই নীতি অবলম্বন করেই আমরা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করতে সক্ষম হচ্ছি যে, 'আমরা পৃথিবীর জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণকর জীবন বিধান ইসলামী শরীয়াত ও মৃত্যুর পরবর্তী জগতে নাজাতের ব্যবস্থাপত্র নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। এই পথ অবলম্বন করে জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা– উভয়টির মধ্যেই রয়েছে কৃতকার্যতা ও সার্থকতা। এই ধরনের সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং আমাদের ভেতরে আত্মতৃপ্তি যোগায়'।

আমি একটি বিষয় দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করতে চাই যে, কোনো বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হলে বিশেষ কোনো সাহাবীর প্রতি কটুক্তি, অভক্তি, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা অথবা উপহাস না করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত মতামতকে গ্রহণ করলেই যে কোনো দলাদলি, মতানৈক্য ও মতদ্বৈততার অবসান ঘটতে পারে। এ পথ অবলম্বন না করে কোনো বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়কে সামনে অগ্রসর করানোর পন্থা অবলম্বন করার অর্থই হলো,

ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের মারাত্মক ক্ষতিকর পন্থাই অবলম্বন করা। মুসলিম মিল্লাতের সলফে-সালেহীন, ওলামা-মাশায়েখ তথা আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এই ধরনের পবিত্র আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্ত াধারাই পোষণ করতেন। আল ফিক্‌হুল আকবর কিতাবের ১০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন–

لَانَذْكُرُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِخَيْرٍ–

নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে আমরা যাঁর আলোচনাই করবো তাতে উত্তম ও প্রশংসনীয় পন্থাই অবলম্বন করবো।

ইমাম তাহাবী (রাহঃ) এর আকীদাতুত্তাহাবী নামক কিতাবের ১৩৭ থেকে ১৪০ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–

وَ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لاَ نَفْرُطُ فِى حُبِّ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لاَ نَتَبرَأ مَنْ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَ نَبْغُضُ مَنْ يَّبْغُضُهُمْ وَ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرْهُمْ وَ لاَ نَذْكُرْهُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ وَ حُبُّهُمْ دِيْنِ وَ إِيْمَانِ وَ إِحْسَانِ وَ يَبْغُضُهُمْ وَ نِفَاقٌ وَ طُغْيَانِ–

(সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পন্থা হলো) আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসি। তবে তাঁদের মধ্য থেকে কোনো একজন সাহাবীর প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য কোনো সাহাবী সম্পর্কে শত্রুতা পোষণ করি না। যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদের ব্যাপারে অশোভন উক্তি করে আমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উত্তম ও প্রশংসনীয় আলোচনা করি। (আমরা বিশ্বাস করি) তাঁদেরকে ভালোবাসা দ্বীন, ঈমান ও কল্যাণের পাথেয়। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা কুফর, মুনাফেকী ও শরীয়াতের সীমা লংঘনের নামান্তর।

সাহাবায়ে কেরাম এর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

রাসূলের যুগে যেসব ব্যক্তিবর্গ নবী করীম (সাঃ) এর সংস্পর্শ লাভ করেছেন, তাঁর আনুগত্য করেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সেসব সম্মানীত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গই আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে দ্বীন গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমের রুহানী খোরাক নবী করীম (সাঃ) তাঁদের ভেতরে সরবরাহ করে ঈমানের

প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আল্লাহর নবী তাঁদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের ভয়-ভক্তি মিশ্রিত বিনয় শিখিয়েছেন এবং এসবের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো। সুতরাং তাঁদের ঈমান ও আমল পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় নিখুঁত ও উন্নত হবে এবং অনুসরণীয় হবে এটাই স্বাভাবিক।

নবী করীম (সা:) সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ঐ ধারণাই পোষণ করতেন যে ধারণা মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রিয় হাবীব সম্পর্কে পেশ করেছেন। অগণিত সাহাবীর মধ্যে এমন একজন সাহাবীর সন্ধানও পাওয়া যাবে না, যিনি আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক তাঁর রাসূলকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ মর্যাদার সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। অথচ এই সাহাবায়ে কেরামই নবী করীম (সা:) এর প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে জীবনের সকল কিছু ত্যাগ করে প্রয়োজনে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের অভাব ছিলো, কিন্তু কখনোই তাঁরা নবী করীম (সা:) এর কাছে এ দাবী করেননি যে, 'আপনি তো আল্লাহ তা'য়ালার নবী। আপনি ক্ষমতা বলে আমাকে ধনী বানিয়ে দিন'। তাঁরা অভাবের কথা শুধু মহান আল্লাহ তা'য়ালাকেই জানিয়েছেন।

বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নি:সন্তান ছিলেন, কেউ ছিলেন রোগগ্রস্ত আবার কেউ ছিলেন নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত। তাদের একজনও কখনো রাসূলের কাছে এ দাবী করেননি যে, 'আমাকে সন্তান দান করুন, আমাকে রোগ মুক্ত করুন বা বিপদ থেকে উদ্ধার করুন'। কারণ তাঁদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ছিলো যে, কোন্ বিষয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করতে হবে আর কোন্ বিষয় রাসূল (সা:) কে জানাতে হবে। মহান মালিক আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তাঁরা কখনোই নবী করীম (সা:) এর কাছে উত্থাপন করেননি। খুব বেশি হলে তাঁরা এ পর্যন্তই বলেছেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমার জন্য দোয়া করুন'।

সাহাবায়ে কেরামের সমষ্টিগত দলের ঈমান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করা বিশুদ্ধ ও সঠিক বলে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার অবতীর্ণ করা কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ لا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الانْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ط ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ–

যেসব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলো এবং যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিলো,

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলো। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সতত প্রবাহমান। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে, বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। (সূরা আত্ তাওবা-১০০)

কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ আনুগত্যকারী মুসলিম মিল্লাতের প্রথম স্তরের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ যারা মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিরগণ ও মদীনার ঐ সব লোকজন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো, সেসব আনসারগণ এবং পরবর্তীতে যারা অকপট চিত্তে ঈমান ও আমলে মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণ করলো, তারা সকলেই এমন নেক লোক, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যেসব জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহমান থাকবে। তাঁরা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর এটাই হলো সফলতার সর্বোচ্চ স্তর।

সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম আজমাঈন কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা সকলেই ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো কোনো সাহাবী মিথ্যা রাওয়ায়েত করেননি। হাদীস রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীর অসত্য বক্তব্য বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি এবং সাহাবীদের জীবন চরিত গবেষণা করে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সময়ে কতিপয় সাহাবা দুঃখজনকভাবে পারস্পরিক বিরোধ ও আত্মকলহে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জীবন চরিতও গবেষণা করে এ কথা প্রমাণীত হয়েছে যে, নবী করীম (সা:) যে কথা বলেননি, এমন কোনো কথাকে আল্লাহর রাসূলের উক্তি বলার ব্যাপারে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্তকতা অবলম্বন করেছেন। নিজেদের কোনো কথাকে আল্লাহর রাসূলের নামে চালিয়ে দেয়াকে তাঁরা সীমাহীন ধৃষ্টতা ও সাংঘাতিক গুনাহ্ হিসাবে বিবেচনা করতেন।

প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা:) যে কথা বলেননি এবং যার কোনো ভিত্তি নেই সেসব কথা সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিহার করে চলতেন। নবী করীম (সা:) বলেন–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ-

সাহাবায়ে কেরামের সকলেই সত্যবাদী।

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখেছেন। সার্বিকভাবে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নবী করীম (সা:) এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবায়ে কেরামদের সম্পূর্ণ সত্যবাদী পেয়েছেন। সুতরাং আহ্লে সুন্নাতের আকীদা

হলো, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আদেল বা ন্যায়বান। ১৩২১ হিজরী সনে আল আমীরা প্রেস-মিসর থেকে প্রকাশিত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ্' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২২৯ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ:) বলেছেন–

أَلصَّحَابَةُ ثِقَاةٌ صَادِقُوْنَ فِيْمَا يَخْبَرُوْنَ بِهِ عَنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَ أَصْحَابُ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللّٰهِ الْحَمْدُ مِنْ اَصْدَقُ النَّاسِ حَدِيْثًا عَنْهُ لاَ يَعْرِفُ مِنْهُمْ تَعَمَدَ عَلَيْهِ كَذِبًا مَعَ إِنَّهُ كَانَ يَقَعُ مَنْ اَحَدُهُمْ مِنَ الْهَنَاتِ مَا يَقْعُوْنَهُمْ ذُنُوْبِ وَ لَيْسُوْا مَعْصُوْمَيْنِ وَ مَعَ هذَا فَقَدْ جَرَبَ اَصْحَابُ النَّقْدِ وَالإِمْتِحَانِ أَحَادِيْثَهُمْ وَ اِعْتَبِرُوْهَا بِمَا تَعْتَبِرُ الأَحَادِيْثُ فَلَمْ يُوْجَدْ عَنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ تَعَمَّدَ كَذَبَةٌ–

সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী)। নবী করীম (সা:) এর কাছ তাঁরা যা কিছু বর্ণনা করেন, সে ব্যাপারে তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী– আল হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর রাসূল থেকে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। আল্লাহর রাসূলের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করেছেন, অনুসন্ধানে এমন একজন সাহাবীরও খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে ব্যক্তি বিশেষের কোনো দুর্বলতা যে প্রকাশ পায়নি এমনটি নয়। কারণ তাঁরা নিষ্পাপ মাসুম ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের কারো মধ্যে থেকে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে যাওয়া বিচিত্র অথবা অসম্ভব কিছু নয়। সর্বোপরি হাদীস যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ সাহাবায়ে কেরামদের বর্ণিত হাদীস সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য হাদীস বর্ণনা করার মতো একজন সাহাবীরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এ জন্য বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, 'সাহাবায়ে কেরাম কোনো গুনাহর কাজে জড়িত হন বা না হন তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। কোনো সাহাবী ইচ্ছা করে নবী করীম (সা:) এর পবিত্র সত্ত্বর সাথে মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করতে পারেন না'।

উপরে আলোচিত ইসলাম গ্রহণ ও বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে মুহাজির ও আনসারগণের প্রথম ও অগ্রগামী হওয়া সম্পর্কীয় সূরা তওবার ১০০ নম্বর যে আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বলেছেন, তা সর্বযুগের, সর্বকালের ও পৃথিবীর সকল স্থানে অবস্থানরত মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শিক দিক নির্দেশনামূলক একটি অতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বক্তব্য। এই বক্তব্যে দুই

শ্রেণীর উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সফলতা ও কৃতকার্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এই দুই শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা হাদীদে আলোচনা করেছেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহ্র নবীর সাহাবী হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, আর যারা হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পরে নবী করীম (সাঃ) এর মহান সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সম্মানীত সাহাবায়ে কেরামের এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দলটি সম্মান ও মর্যাদাগত দিক থেকে দ্বিতীয় দলটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সাহাবায়ে কেরাম এর উভয় দলের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করে তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

• لا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْم بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ط وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ط

তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করেছে এবং (ময়দানে) সংগ্রাম করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশি যারা বিজয় সাধিক হবার পর আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ্ তা'য়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা হাদীদ-১০)

অর্থাৎ বিপুল শুভফল, কল্যাণ ও সওয়াবের অধিকারী এই উভয় শ্রেণীর লোকই। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের তুলনায় সর্বাধিক। কারণ, তাঁরা অধিকতর কঠিন অবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য এমন সব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন যা অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের ভোগ করতে হয়নি। তাঁরা এমন কঠিন অবস্থায় নিজের সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত আল্লাহ তা'য়ালার বিধান প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্যয় করেছেন যখন দেশের পর দেশ, এলাকার পর এলাকা বিজয়ের ফলে এই ব্যয়ের প্রতিবিধান করার কোনো দূরতম সম্ভাবনাও দৃষ্টি গোচর ছিলো না। তাঁরা এমন কঠিন ও সঙ্কটময় পরিবেশে ইসলামের দুশমনদের সাথে সংগ্রাম-আন্দোলন, যুদ্ধ-জিহাদ করেছেন যখন দুশমনরা বিজয়ী হয়ে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী লোকদের সম্পূর্ণ উৎখাত করে ফেলবে বলে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিলো।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমাদেরকে বলেছিলেন, 'খুব শীঘ্রই এমনসব লোকজন আসবে যাদের আমল দেখে

তোমরা তোমাদের আমলকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নগণ্য ও সামান্য ধারণা করবে। কিন্তু সেসব লোকদের মধ্যে কারো কাছে যদি পর্বত সমতুল্যও স্বর্ণ থাকে এবং সে তার সমস্তই আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়, তাহলে তোমাদের দুই রতল (আমাদের দেশে প্রচলিত ওজনের প্রায় ৫০০ গ্রামের সমান হলো এক রতল) এমনকি এক রতল ব্যয় করারও সমান হতে পারবে না'। (ইবনে জরীর)

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ কৃতকার্যতা ও সফলতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত লাভ করবেন, এ কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে সূরা হাদীদের ১০ নম্বর আয়াতে। হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসারগণ প্রথম দিকের অর্থাৎ সাবিকুনাল আওয়ালীন– অগ্রগামী মুসলমান হওয়ার সম্মান ও মর্যাদার বিষয় উল্লেখিত আয়াতে ব্যক্ত করার পরেই বলা হয়েছে, 'যারা সাবিকুনাল আওয়ালীন' অর্থাৎ প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অনুসরণকারী বলে প্রমাণীত হবে, তারা সে সকল মর্যাদাবান লোকদের দলভুক্ত হবে, যাদের প্রতি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমান অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের একনিষ্ঠ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদের ব্যাপকতায় সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগেও মুহাজির ও আনসারদের অনুরূপ ঈমান-আকীদা ও আমল দ্বারা নিজেদেরকে তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী বলে প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা অনুধাবন করা গেলো যে, সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই নাজাতপ্রাপ্ত এবং তাঁরা জান্নাতী। আর তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও নাজাতের পথের পথিক। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী ভিত্তিক বা তাঁদেরকে কেন্দ্র করে ঐসব ইতিহাসমূলক গ্রন্থ কিছুতেই প্রামাণ্য গ্রন্থ হতে পারে না, যেসব গ্রন্থ তাঁদের দোষ-ত্রুটিকেই প্রাধান্য দিয়ে রচনা করা হয়েছে। সেই গবেষণা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, যা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা:) এর মর্যাদা: দায়িত্ব ও করণীয়

বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তির দূত শেষ নবী-রাসূল নবী করীম (সা:) এর যারা অনুসরণ করে তাঁরাই উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা:) নামে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধন ও মানুষের মুক্তির গুরুদায়িত্ব এই উম্মাতের প্রতি অর্পিত হয়েছে। পৃথিবী ও মানবতার জন্যে যা কিছুই অশুভ তার মূলোৎপাটন করে সত্য, ন্যায়-নীতি ও শান্তি স্থাপন করাই এই উম্মাতের প্রকৃত কাজ এবং এই মহান কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় সে প্রচেষ্টাকেই সংক্ষিপ্ত কথায় জিহাদ বলা হয়। ইসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণীর মানুষ ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে জিহাদ শব্দকে সন্ত্রাসের সাথে

একাকার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, ইসলামে জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শুভ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং এ কাজটিই সম্পাদন করাই উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা:) এর প্রধান দায়িত্ব। নবী করীম (সা:) তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্তটিও এই কাজেই ব্যয় করেছেন। তাঁর অবর্তমানে সকল সচেতন মুসলিমদের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক।

দায়িত্বের ধরনটি কেমন তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যাক। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই যান-বাহন চলাচলের সুনির্দিষ্ট পথ এবং নিয়ম-নীতি রয়েছে। যান-বাহন সুনির্দিষ্ট পথে চলছে কিনা এবং সঠিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করছে কিনা তা দেখার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক রয়েছে। এসব লোক যদি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অদক্ষতার পরিচয় দেয় তাহলে যান-বাহন দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে প্রাণহানীর ঘটনা যেমন ঘটবে তেমনি সম্পদেরও ক্ষতি হবে। ট্রাফিক পুলিশ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করলে পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা সচেতন মহল সহজেই অনুভব করতে পারে।

এ পৃথিবীর জাতিসমূহ পরিচালনায় উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা:) এর প্রতি ট্রাফিক পুলিশের ন্যায় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে শুভ ও কল্যাণের পথে পরিচালনার দায়িত্ব এই উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা:) তথা মুসলিম মিল্লাতের প্রতি অর্পণ করে মুসলিমদেরকে মর্যাদাবান উম্মাত বানানো হয়েছে। মুসলিম মিল্লাত নবী করীম (সা:) এর সীরাত অনুসরণে সমগ্র পৃথিবীকে শুভ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে এই দায়িত্বই এদের প্রতি অর্পণ করে এদেরকে পবিত্র কুরআনে 'উম্মাতে ওয়াসাত' বা মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে পরিচিতি দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের ওপর (হিদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো (এবং একইভাবে) রাসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন। (সূরা আল বাকারা-১৪৩)

উক্ত আয়াতে মুসলিমদেরকে 'উম্মাতে ওয়াসাত' বা মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মাতে ওয়াসাত শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থবোধক যে, আরবী ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় ব্যবহার করে উক্ত শব্দটির পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই শব্দ দিয়ে এমন এক সর্বোচ্চ, সর্বোন্নত ও উৎকৃষ্ট এবং সম্মানিত মানব দলকে বুঝায় যাঁরা শুভ, কল্যাণ, ন্যায়-নীতি, ইনসাফপূর্ণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মধ্যম পন্থানুসরণের

ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত; যারা সমগ্র বিশ্বেও মানব সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক, পরিচালক, নেতৃত্বদানকারী অগ্রনায়ক হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত, যাঁদের সাথে অশান্তি, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোকাবাজি, অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস ও মিথ্যাচার বা কুটকৌশলের দূরতম সম্পর্ক নেই।

পৃথিবীতে কোনো মানব সম্প্রদায়কে এভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাক্ষ্যদানের সম্মানিত পদে নিযুক্ত হবার বাস্তব অর্থই হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব ও পরিচালকের সর্বাধিক সম্মানজনক পদে অভিষিক্ত হওয়া- আর এটাই হলো পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাতের মর্যাদা। মহান আল্লাহপ্রদত্ত এই মর্যাদা একদিকে পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যেমন শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক তেমনি এটি এক বিরাট গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব কিভাবে কতটুকু মুসলিম মিল্লাত পালন করেছে কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সম্মুখে জবাবদিহী করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) যেভাবে আল্লাহভীরুতা, সততা, স্বচ্ছতা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যানুসরণ, ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার সকল মানদণ্ডে উন্নীত সমগ্র মানবতার জন্যে জীবন্ত আদর্শ, তেমনি মুসলিম উম্মাহকেও সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এক জীবন্ত আদর্শে পরিণত হতে হবে। মুসলিম মিল্লাতের সকল কথা শুনে ও কর্ম দেখে আল্লাহভীরুতা, সততা, স্বচ্ছতা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যানুসরণ, ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রকৃত তত্ত্ব বাস্তবে অনুধাবন করতে পারে।

মানুষের কাছে মহান আল্লাহর নাযিল করা মহাসত্য জীবনাদর্শ ইসলামকে পৌঁছানোর ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যে কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো, সে দায়িত্ব তিনি সুচারুপে পালন করেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে এ মহান দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি। নবী করীম (সাঃ) যদি এ মহান দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করতেন তাহলে তাঁকেও মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে জবাবদিহী করতে হতো। সে ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতকে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে জবাবদিহী করতে হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাতকে সম্মানিত পদ নেতৃত্বের পদ দান করা হয়েছে এবং এ পদটি অত্যন্ত মর্যাদাবান ও গৌরবের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বর্তমানে মুসলিম মিল্লাত নিজেদের পরিচয় জানে না, জানার চেষ্টাও করে না এবং নিজেদের মর্যাদাবোধও অনুধাবন করে না। আমরা কি ক্ষীণ কণ্ঠেও এ কথা বলতে পারি যে, মহান আল্লাহর যে বিধান আমাদের কাছে রয়েছে তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের কাছে আমরা পৌঁছে দিয়েছি?

যদি বলতে না পারি তাহলে হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর আদালতে পৃথিবীর অন্যান মানব সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে এবং আমরা আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াবো, ভয়ানক শাস্তি আমাদেরকে বরণ করতে হবে। মহান আল্লাহর দেয়া নেতৃত্বের সম্মানিত এই পদকে আমরা নিজেরাই কলুষিত করে নিজেদের জন্যে ধ্বংস ও অভিশাপের পদে পরিণত করেছি। পৃথিবীতে মুসলিম নামে আমরা টিকে রয়েছি, অথচ এ পৃথিবীতে বিভ্রান্তিকর চিন্তা ও কর্মের যে বিপর্যয়কর প্লাবন প্রবাহিত হচ্ছে, অশান্তির দাবানল সমগ্র পৃথিবীকে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেছে, এসবের জন্যে ধূর্ত নেতৃবৃন্দ, মানবরূপী শয়তান ও জ্বীন শয়তানদের পাশাপাশি আমাদেরকে কি দায়ি করা হবে না? অবশ্য অবশ্যই হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর আদালতে কঠিন তিরস্কারে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, 'সমগ্র পৃথিবীতে যখন অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ, ব্যভিচার, দলন- নিপীড়ন ও বিভ্রান্তির প্লাবন প্রবাহিত হচ্ছিলো, তখন তোমরা মুসলিম মিল্লাত কোথায় অবস্থান করছিলে'?

লক্ষ্য করুন এবং অনুধাবন করুন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও পরিচিতি কিভাবে দিয়েছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط

তোমরাই (হচ্ছো পৃথিবীতে) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের উত্থান, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা পৃথিবীর মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পরিপূর্ণ) ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরান-১১০)

মুসলিম মিল্লাতের পরিচয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন যে তারা পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সর্বোত্তম জাতি' এবং এই জাতির দায়িত্ব হলো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়কে তারা শুভ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দিবে এবং অশুভ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে। এটাই মুসলিম মিল্লাতের প্রতি অর্পিত গুরু দায়িত্ব। এই মর্যাদাপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পালন করেছেন নবী-রাসূলগণ। তাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط

(নবী করীম স.) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, যিনি তাদের জন্যে যাবতীয় পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করেন, তাদের ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা তিনি নামিয়ে দেন এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের গলার ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা তিনি খুলে ফেলেন। (সূরা আল আ'রাফ-১৫৭)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদে আসীন না হলে আদেশ- নিষেধের কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণে নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করার জন্যে এভাবে দোয়া করতে বলেছেন–

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا-

(হে রাসূল) আপনি বলুন, হে আমার মালিক, (যেখানেই আমাকে নিয়ে যাননা কেনো), আপনি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যান এবং (যেখান থেকেই আমাকে বের করুন না কেনো) সত্যের সাথেই বের করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করুন। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮০)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ কাজটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেবলমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)

নবী করীম (সাঃ) এর স্বর্ণালী যুগে স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম সকলেই সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে ইসলাম গ্রহণ করার পরে জীবনের অবশিষ্ট সময় এ গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর বিদায়ের পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলো হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ওপর। তিনি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করলেন হযরত উমার (রাঃ) এর প্রতি। ঐতিহাসিকগণ

উল্লেখ করেছেন, হযরত উমার (রা:) এক বছর প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করার পর দৃশ্যপট কেমন হলো, পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করুন–

فَمَكَثَ عَامًا كَاملاً وَلَمْ يَخْتَصِمْ إِلَيْه إِثْنَان فَقَالَ عُمَرُ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه) مَا حَاجَةَ بِىْ عِنْدَ قَوْمٍ مُومِنِيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم–

দীর্ঘ একটি বছর তিনি সেই পদে অবস্থান করলেন, কিন্তু একটি মামলা-মোকদ্দমাও তাঁর কাছে এলো না। তিনি খলীফার কাছে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ একটি বছর যাবৎ দেশের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন রয়েছি, অথচ একটি মামলাও আমার কাছে এলো না। হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! মুমীন লোকদের জন্য আমার মতো বিচারকের কোনো প্রয়োজন নেই'।

খলীফা জানতে চাইলেন, 'বিশাল একটি দেশের বিপুল সংখ্যক জনতার পক্ষ থেকে একজন নাগরিকও দীর্ঘ এক বছরেও কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করলো না, এর কারণ কি?'

খলীফার প্রশ্নের জবাবে হযরত উমার (রা:) বললেন–

دِيْنَهُمُ النَّصِيْحَةُ وَمَنْهَجُهُمُ الْقُرْآنُ وَ عَمَلُهُمُ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهِى عَنِ الْمُنْكَرِ كُلٌّ وَاحِد مِّنْهُمْ يَعْرِفُ حَدَّهُ فَيَقِفُ عِنْدَهُ وَ اذَا مَرِضَ اَحَدُ هُمْ عَادَوْهُ وَ اذَا افْتَقَرَ نَصَرُوْهُ وَ اذَا احْتَاجَ سَعَادُوْهُ فَفِيْمَا هُمْ يَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم؟

তাঁদের তথা দেশের জনগণের দ্বীন-ই হলো পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয়া, তাঁদের জীবন চলার নির্দেশক হলো আল-কুরআান এবং তাদের কাজ হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে তাদের নিজের চলার সীমা রেখা কোন্ পর্যন্ত এবং এজন্য তাঁরা নিজের সীমার কাছে থেমে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন অসুস্থ হলে তাঁরা তাঁর সেবা করে, কেউ বিপদে নিপতিত হলে তাকে সাহায্য করে এবং কেউ অভাবী হলে তাকে সহায়তা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁরা কোন্ প্রয়োজনে কেন আমার কাছে বিচারের জন্য আসবে?

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্যে এক দল মুসলিমকে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত এ কাজেই ব্যয় করতে হবে। এই দলটিকে হতে হবে সংঘবদ্ধ এবং এর সাংগনিক ভিত্তি হতে হবে

অত্যন্ত মজবুত। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দিবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (অতপর যারা এই দলে শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে। (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

মহান এ দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ط أُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে এক অপরের বন্ধু। এরা (অন্য মানুষকে) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের (বিধানের) অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'য়ালা অচিরেই তাঁর রহমত নাযিল করবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী। (সূরা আত্ তাওবা-৭১)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বাস্তবায়নের কাজটি শুধুমাত্র নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, রাষ্ট্র, দল বা কোনো সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ কাজটি প্রত্যেক সচেতন ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্যে অবশ্যই পালনীয়। যেমন হযরত লূকমান (আ:) এ দায়িত্ব পারিবারিকভাবে পালন করেছিলেন এবং বিষয়টি আল্লাহ্ তা'য়ালা এতই পছন্দ করলেন যে, তাঁর নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে চিরন্তন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সন্তানকে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিলো–

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ج

(লুকমান আরো বললো), হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মসিবত এসে পড়লে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো; (বিপদে ধৈর্য ধারণ করার) এ কাজ নি:সন্দেহে একটি বড় সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। (সূরা লূকমান-১৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার গুরুত্ব দিতে গিয়ে নবী করীম (সা:) কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْد ن الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ رَّأى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَالِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ– (رواه مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় অসৎ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করার জন্যে দু'হাত দিয়ে বাধা দাও, (শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দাও) যদি এটা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ জানাও, এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে এ অন্যায় অসৎ কাজের প্রতি হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করো, (অন্যায় অসৎ কাজ উৎখাত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করো) তবে এটি ঈমানের দূর্বলতার পরিচায়ক। (মুসলিম)

যে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ সৎ কাজের আদেশ দিবে না ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে না, তাদের ব্যাপারে নবী করীম (সা:) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَده لَتَأمُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ظَالِمًا لاَّ يُبَجِّلُ كَبِيْرَكُمْ وَ لاَيَرْحَمُ صَغِيْرَكُمْ وَ يَدْعُوْ عَلَيْهِ خِيَارَكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ وَ يَسْتَنْصِرُوْنَ فَلاَ يُنْصَرُوْنَ وَ تَسْتَغْفِرُوْنَ فَلاَ يَغْفِرَ لَكُمْ–

নবী করীম (সা:) তাঁর উম্মাতকে লক্ষ্য করে বলেছেন, সেই জাত পাকের শপথ, যাঁর হাতের মুষ্টিতে আমার জীবন, তোমাদেরকে অবশ্যই মানুষদের সৎ কাজের আদেশ করতেই হবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতেই হবে। তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকো তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমার ওপর জালিম শাসক চাপিয়ে দিবেন, তারা তোমাদের সম্মানিত লোকদের অপমান করবে এবং অসহায় লোকদের প্রতি নির্দয় হবে। এমতাবস্থায় তোমাদের নেককার লোকেরা যে দোয়া করবে তা মঞ্জুর হবে না, তোমরা সাহায্য কামনা করবে কিন্তু দেয়া হবে না, ক্ষমা

ভিক্ষা চাইবে কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমাও করবেন না। (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন না করছো)। (মিশকাত শরীফ)

এ দায়িত্ব যদি পালন করা না হয় তাহলে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিবে তা থেকে আলেম, ওলামা, পীর-মাশায়েখ, সৎ- অসৎ কোনো মানুষই মুক্ত থাকবে না। সর্বগ্রাসী আযাব সকলকেই গ্রাস করবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ–

তোমরা যদি সে কাজটি না করো, তাহলে (আল্লাহর এ) যমীনে ফিতনা- ফাসাদ ও বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج

তোমরা সেই ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার ভয়াবহ শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালিম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। (সূরা আনফাল-২৫)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِه ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَ لاَيُسْتَجَابُ لَكُمْ– (رواه الترمذى)

হযরত হুযায়ফাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যার হাতের মুষ্টিতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। সে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযী)

সুতরাং সময় আমরা অনেক অপচয় করেছি, গভীর নিদ্রায় বিভোর থেকেছি, দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছি বহু পূর্বেই, এরই ফলশ্রুতিতে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে বিপর্যয় ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্যে এখনই আমাদেরকে সংঘবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ মহান দায়িত্ব পালনে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকেই যারা এ দায়িত্ব সম্পর্কে সবথেকে বেশি সচেতন তথা আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ এবং ইসলাম সম্পর্কে সজাগ ব্যক্তিবর্গকে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম–ওলামা-মাশায়েখদের করণীয়

বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং হচ্ছেন, তারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক প্রভাবে প্রভাবিত। ফলে তারা নামে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও কেউ প্রকাশ্যে আবার কেউ সতর্কতার সাথে ইসলাম বিরোধী মতবাদ-মতাদর্শের অনুসরণ করে যাচ্ছেন। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। কেউ ভোগবাদী পূজিবাদী ব্যবস্থা, কেউ বা নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা কেউ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা আবার কেউ পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের অনুসৃত নীতি আদর্শই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, গবেষক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সর্বোপরি শাসক গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আইন কানুন প্রনয়ণে, কল-কারখানা শিল্পাঙ্গনে, শিক্ষাঙ্গনে, কবিতা-সাহিত্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, বক্তৃতা ও লেখনীতে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারী মাত্র গুটি কয়েক লোকজন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকার কারণে ইসলামের বিপরীত পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য করছে। এভাবে মুসলমানদের সমাজ ও মুসলিম মানস থেকে তাঁদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে সুকৌশলে অথবা কোথাও আইন প্রয়োগ করে বিদায় করছে, এই অবস্থায় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ধারক-বাহক ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামপন্থী লোকজন নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন, কেউ খান্‌কায় বসে পীর-মুরিদী কাজে ব্যস্ত থাকবেন, কেউ বা মাসজিদ মাদ্‌রাসার চার দেয়ালের মধ্যে নিজের কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখবেন, আবার কেউ ওয়াজের ময়দানে ওয়াজ করেই নিজের ইতিকর্তব্যের সমাপ্তি ঘটাবেন, এটা ইসলাম সমর্থন করে না।

অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহের শাসক গোষ্ঠী ও দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। এসব নামধারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ মৃত্তিকা পাথরে নির্মিত মূর্তির পূজা বাহ্যিকভাবে পরিহার করলেও এরা এদের হৃদয়ের কোণে স্বযত্নে এমন এক অদৃশ্য মূর্তির পূজা করে, যে মূর্তি কোথাও গণতন্ত্রের কোথাও বা রাজতন্ত্রের আবরণে আবৃত। মৃত্তিকা-পাথরে নির্মিত মূর্তি জড়পদার্থ, তাদের কোনো অনুভূতিই নেই। তাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজিত থাকলেও সেগুলো তারা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের যে অদৃশ্য মূর্তি, তা অধিকাংশ মানুষের রায় তথা মতামতকে গ্রহণ করে, অনুসরণ করে এবং আইন হিসাবে দেশের বুকে প্রয়োগ করে।

ভোগবাদী গণতন্ত্রের এই অদৃশ্য মূর্তি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, সাধুকে চোর, চোরকে সাধু, বৈধকে অবৈধ, অবৈধকে বৈধ বানানোর ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই অদৃশ্য মূর্তির অন্ধ পূজারীদের কাছে স্থায়ী কোনো মূল্যমান নেই– এদের কাছে সত্য আর মিথ্যা, ন্যায় আর অন্যায়ের চিরন্তন কোনো মানদণ্ড নেই। এদের মানদণ্ড হলো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায় বা মতামত। আবার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়ের যথাযথ প্রতিফলনের ব্যবস্থাও পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রে যেমন অনুপস্থিত– তেমনি সূক্ষ্ম কারচুপি, অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রকৃত জনরায়কে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার সুযোগ রয়েছে।

দেশের জনসমষ্টির মধ্যে যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ সত্যকে মিথ্যা বলে রায় দেয়, তাহলে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র সত্যকে মিথ্যা বলেই গ্রহণ করতে বাধ্য। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের রায় বা মতামতের মুকাবেলায় আল্লাহর নাযিল করা কুরআনও বড় সত্য নয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যে রায় বা মতামত দিলো, সেই জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, ন্যায়-নীতির বিচারবোধ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যোগ্যতা কোনোটিই ধর্তব্য নয়। অশিক্ষিত, বিবেক-বুদ্ধি, বিচারবোধ শূন্য, দেশ-সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই, এমন ধরনের ভোঁতা ও জড় বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একদিকে রায় বা মতামত দিলো, অপরদিকে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাধারা, মননশীলতা, রুচিবোধ, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সচেতন দেশ ও সমাজের সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আরেকদিকে রায় বা মতামত পেশ করলো, পাশ্চাত্যের এই ভোগবাদী গণতন্ত্র নামক মূর্তি সংখ্যা লঘিষ্ঠের সুচিন্তিত রায়কে পদদলিত করে অবিবেচনা প্রসূত অজ্ঞ জড়বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠের রায়কেই সমাদরে গ্রহণ করলো।

শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মতামতেরও মূল্য দেয় না। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের পক্ষে যদি রায় দেয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের সে রায়কে পদদলিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করে না। এর বাস্তব প্রমাণ আলজেরিয়া ও তুরস্ক। ১৯৯২ সনে আলজেরিয়ার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে ইসলামপন্থী দলকে নির্বাচনে বিজয়ী করলো। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা অস্ত্রের জোরে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়কে পদদলিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো। তুরস্ক ও মিসরের দিকে দৃষ্টি দিলেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। তুরস্কের সংখ্যা

গরিষ্ঠ জনগণ ইসলামপন্থীদের নির্বাচনে বিজয়ী করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পাঠায়, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা নির্বাচনে বিজয়ী দলকে– দলের আদর্শ ইসলামের বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেয় না। এমনকি ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, এ জন্য আইনের মোড়কে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে মিসর ও তুরস্কে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা তাদের ভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থাকে সহ্য করে না। বর্তমানে যদিও মিসরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু এ পরিবর্তন জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী ঘটবে কিনা তা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই মূর্তির কাছে মানুষের মেধা, যোগ্যতা, মননশীলতা, রুচিবোধ, উন্নত চিন্তাধারা, বিচার-বিবেচনাবোধ কোনো কিছুই বিবেচিত বিষয় নয়। বিবেচিত বিষয় শুধু সংখ্যাধিক্য। দেশ ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত আর তারই গৃহের অশিক্ষিত বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারবোধহীন পরিচারিকার মতামতের একই মূল্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক অদৃশ্য মূর্তির কাছে। অর্থাৎ উভয়ের মতামতের একই মূল্য। এই গণতন্ত্র শতকরা ৫১ জন মানুষের মতামত বা রায়ের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখে। পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এরা চিরন্তন মূলবোধ ও সত্যকে মুহূর্তে কবরস্থ করতে পারে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী এই গণতন্ত্র নামক অদৃশ্য মূর্তির পূজারীদের কাছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল শক্তির উৎস নয়– দেশের জনগণই সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

(হে নবী) আপনি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অনুসরণ করেন তাহলে আপনি আল্লাহর পথ থেকে (সত্য পথ থেকে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা আনআম-১১৬)

মুসলিম উম্মাহ্, দেশ ও জাতির এই অবস্থায় ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই, বরং রাজনৈতিক ময়দানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে হক-এর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার আওয়াজ উত্থাপন করা ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজে যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে, তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে, এটা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ। এটাই

খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত প্রতিষ্ঠিত নীতি। বর্তমানে মুসলিম দেশ ও সমাজে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনার অনুসারী লোকদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব নেতৃত্বের আনুগত্য করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلا تُطِيْعُوْا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ لا الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِىْ الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُوْنَ–

(সে সব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না, যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয় সৃষ্টি কওে এবং কখনো (সমাজের) সংশোধন করে না। (সূরা শু'আরা-১৫১-১৫২)

মহান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ, মুসলিম দেশ ও সমাজে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শের অনুসারী লোকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না, বরং দেশ ও সমাজে তাদের যাবতীয় কর্তৃত্ব হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী লোকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তাদের আনুগত্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللَّهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ط ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ع

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেসব লোকদেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে, (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা। (সূরা আন্ নিসা-৫৯)

মুসলিম জনগোষ্ঠী কোন্ শ্রেণীর লোকদের আনুগত্য করবে, তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট কি, এ ব্যাপারে মুসলমানরা যেনো তাদের যোগ্য নেতা নির্বাচনে ভুল না করে, এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের যোগ্য নেতার পরিচয়ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)

অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর যোগ্য নেতা তারাই, কেবলমাত্র তারাই নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করতে পারবে, যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন হলে ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হওয়ার পরিবর্তে নামাজ কায়েম করবে। দেশের মুসলিম জনতাকে নামাজের দিকে অগ্রসর করাবে। তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যয় করবে। দেশের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে অভাবীদের মধ্যে বন্টন করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যন্ত্রকে তারা সৎকাজ বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার কাজে প্রয়োগ করবে। আইনের মাধ্যমে তারা অসৎ কাজকে দেশ থেকে বিদূরিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা-সংগ্রাম করবে। মুসলিম জনতার নেতৃবৃন্দ ইসলাম বিরোধী কর্মসমূহের মূলোৎপাটন করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে আর ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রসার ঘটাবে।

অথচ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নেতৃত্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী, অপরাধ প্রবণ, নীতি-নৈতিকতাহীন, পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক, পরাশক্তির গোলাম ও দুনিয়া পূজারী নেতৃত্বই মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনসমূহ দখল করে রয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। এই ধরনের অপরাধ প্রবণ ও অযোগ্য নেতৃত্বের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সাবধান করে নবী করীম (সা:) ঘোষণা করেছেন–

اذَا ضَعيْتُ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ اضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ اذَا اُسْنِدَ الأَمْرُ الَى غَيْرِ اَهْلِه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ–

যখন আমানতসমূহ বিনষ্ট করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের গযব নাযিলের অপেক্ষা করবে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলো, আমানতসমূহ বিনষ্ট করা হয় কিভাবে? উত্তরে তিনি বললেন, অযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আমানত অর্পন করা আমানত বিনষ্ট করার নামান্তর। সুতরাং যখন অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অর্পিত হবে, তখন তুমি কিয়ামতের মহাবিপদের অপেক্ষা করো। (বুখারী)

এবার মুসলিম দেশসমূহে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের মূর্তির পূজা করা হচ্ছে। এই গণতন্ত্রের নামে এমন এক নির্বাচনী

ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যে, যেখানে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান হেতু এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সমাজের অসৎ, অপরাধ প্রবণ ও পরস্বার্থ হরণকারী হিংস্র প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন। তারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে অসচেতন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বোধহীন অভাবী লোকদের মধ্যে অর্থ বিলি-বন্টন করে নিজেদের পক্ষে রায় ক্রয় করছে। এ পথে নেতৃত্বের আসন লাভ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছে। নেতৃত্বের আসন লাভ করার যাবতীয় কূট-কৌশল ব্যর্থ হলে পেশী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নেতৃত্বের আসন দখল করছে।

এর অনিবার্য বিষময় ফল দেশ ও সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ প্রবণ, অসৎ প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, নোংরামী, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, খুন-রাহাজানী, হত্যা-ধর্ষন, শোষণ-নির্যাতন, শঠতা-প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও জুলুমের প্রত্যেকটি জ্বালা মুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সর্বপ্লাবী বন্যার বেগে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়েছে। কুরআন-সুন্নাহর মূল্যবোধ বিদায় করে দেয়া হয়েছে। নানা কৌশলে কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি মুসলিম জন-মানসে অভক্তি আর অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপরাধ প্রবণ জালিম নেতৃত্বের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী ঈমানী দুর্বলতার শিকার হয়েছে। ঠিক এই সুযোগে সিংহসম সাহসের অধিকারী মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিক নামক চির ভীরু শৃগালের গোষ্ঠী উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছে। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেন–

শের কি সার পে বিল্লি খেল রাহি, ক্যায়সা হ্যায় মুসলমাঁ কা বদ নসীব,

শাহাদাত্ কি তামান্না ভুল গ্যায়ি, তাছ্‌বি কি দাঁনু মেঁ, জান্নাত ঢুঁড় রাহী।

সিংহের মাথার ওপর আজ বিড়াল খেলা করছে। বড়ই দুর্ভাগ্য মুসলমানদের, তারা শাহাদাতের আকাংখা ভুলে গিয়ে তছ্‌বিহ্ দানার মধ্যে জান্নাত অনুসন্ধান করছে।

অপরাধ প্রবণ ভোগ-বিলাসে মত্ত নামধারী মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম জনতার ঈমানী দুর্বলতার সুযোগে মানবতার দুশমন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গনতন্ত্রের অনুসারীগণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সহযোগিরা দস্যু-তস্কর এবং নরখাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের রক্তস্রোত বইয়ে তাদের যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিজেদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে যে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রদান করেছেন, গুটি কয়েক শক্তিমান ও প্রভাবশালী মানুষ তা হরণ করেছে। অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষ সর্বত্র শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। ইনসাফ নামক শব্দটিকে কফিন আবৃত করে পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছে। কোথাও ন্যায় বিচার নেই, সর্বত্র মজলুম মানুষের হাহাকার। বঞ্চিত জনতার করুণ আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস বেদনা বিধূর হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের মানদণ্ড নিরুপণ করতে হবে। একদিকে যেমন নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে, অপরদিকে নেতৃত্বের যোগ্য কোন্ শ্রেণীর মানুষ, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার ভিত্তিতে নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে নেতা নির্বাচিত করার বা নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ এবং দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর।

নির্বাচনকালে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসমূহ যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে নমিনেশন প্রদান করে, এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আল্লাহভীরু সৎ মানুষের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, যখন নমিনেশন দেয়া হয় তখন প্রার্থী-নির্বাচনে সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম কিনা অথবা যে কোনো প্রকারে বিজয়ী হতে সক্ষম কিনা, সেদিকটিই দলের নীতি-নির্ধারকদের কাছে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। কারণ, দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যকে বিজয়ী করে আনার প্রতিই দলের লক্ষ্য থাকে নিবদ্ধ।

সুতরাং প্রার্থী আল্লাহভীরু-সৎ, চরিত্রবান কিনা, তার অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে অর্জিত কিনা, তিনি প্রকৃত অর্থেই জনগণের সেবা করবেন, না নেতৃত্বের পদ দখল করে যে কোনো উপায়ে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করবেন, অথবা নিজের নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন কিনা, প্রার্থী নিজের এলাকায় সর্বাধিক সৎ ও ভদ্র কিনা, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের, ক্ষমতা লিন্সু রাজনৈতিক দল এসব দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে অসৎ উপায়ে যারা ধন-সম্পদ অর্জন করেছে এবং পেশীশক্তি প্রয়োগ করে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, এই শ্রেণীর অসৎ লোকগুলোর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং এই পদ্ধতি পরিহার করে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐসব লোককেই স্ব-স্ব এলাকায় নমিনেশন দিতে হবে, যে লোক আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান। নির্বাচনে

অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার অর্থই হলো, তিনি জনগণের সেবা করতে চান। জনগণের সেবা করা সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ, কষ্ট, ত্যাগ ও পরিশ্রমের কাজ। তদুপরি এই কঠিন কাজের পেছনে অর্থাৎ জনগণের সেবা করার পেছনে নগদ স্বার্থ জড়িত থাকবে না, এই কাজ হতে হবে নিঃস্বার্থ। আর সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যে কাজ অত্যন্ত কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের-পরিশ্রমের ও ত্যাগের এবং যে কাজে নগদ প্রাপ্তি নেই, সে কাজ থেকে নিজেকে স্বযত্নে দূরে রেখে অন্যের ওপরে তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। নিজেকে দায়িত্বমুক্ত রাখতে চায়।

তাহলে যারা জনগণের সেবা করার নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার উদ্দেশ্যে দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভের জন্য রীতি মতো প্রতিযোগিতা করে, নমিনেশন লাভের পথ কন্টকমুক্ত করার জন্য প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হলে হত্যা করাতেও দ্বিধা করে না, দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভে ব্যর্থ হলে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, অঢেল অর্থ ব্যয় করাসহ যে কোনো উপায়ে নেতৃত্বের আসন দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। জনগণের সেবা করা ও নেতৃত্ব দেয়ার এই চরম কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের, ত্যাগের ও পরিশ্রমের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার পেছনে তাদের নিশ্চয়ই সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না– এ বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়।

ঠিক এ কারণেই নেতৃত্বের পদ চেয়ে নেয়া বা এই পদের ব্যাপারে অভিলাষ পোষণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। হযরত আবু মুসা (রা:) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, দুই জন লোক নবী করীম (সা:) এর কাছে উপস্থিত হলো এবং তাঁদের একজন আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে বিরাট দায়িত্ব-ক্ষমতা দান করেছেন তার কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ প্রার্থনা জানালো। তাঁদের কথা শুনে নবী করীম (সা:) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন– আল্লাহর শপথ, আমি এই কাজে এমন কাউকেও নিযুক্ত করবো না, যে এর জন্য প্রার্থনা করে এবং তা পাবার জন্য লোভ পোষণ করে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম (সা:) বলেছেন– নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য আগ্রহ পোষণ করো না। কারণ এই পদ যদি তুমি প্রার্থনা করে লাভ করো, তাহলে তোমাকে এই পদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর নেতৃত্বের পদ যদি প্রার্থনা ব্যতীতই পাওয়া যায়, তাহলে (সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

সুতরাং নেতৃত্বের পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ, এটা এমন কঠিন দায়িত্ব যে– কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এই পদের জন্য আগ্রহী হতে পারে না বা তা লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে নেতৃত্বের পদ লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে নেতৃত্বের পদের গুরুত্ব, তীব্রতা ও কঠোরতা অনুধাবন করতে পারেনি– অথবা সব কিছু জেনে বুঝে নিছক স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ-লালসার কারণেই সে নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এই ধরনের কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, তাকে এমন সুযোগ দেয়াও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

পক্ষান্তরে নেতৃত্বের পদ লাভের আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ব্যতীতই যার ওপরে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে রহমত ও সাহায্য নাযিল হবে। কারণ এই নেতৃত্বের পদ সে নিজে প্রার্থনা বা চেষ্টা করে লাভ করেনি, এ জন্য তার আগ্রহও ছিলো না। আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ও প্রার্থনা ব্যতীতই আল্লাহ তা'য়ালার মঞ্জুরীক্রমে জনগণের পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত হয়েছে। এ জন্য এই দায়িত্ব পালনে সে আল্লাহর রহমত ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করতে পারবে।

এ জন্য নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে আল্লাহভীরু সৎ লোক বাছাই করে নমিনেশন দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক এলাকায় অনুসন্ধান করে দেখবেন, সে এলাকায় কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে সবথেকে বেশি ভয় করেন, সৎ-চরিত্রবান, উত্তম জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, মেধাবী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, দক্ষ-যোগ্য, জনপ্রিয় ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী, তাকেই নির্বাচনে নমিনেশন দিতে হবে। অপরদিকে জনগণের মধ্যেও এই অনুভূতি শানিত করতে হবে যে, ভোট একটি আমানত। এই আমানত সম্পর্কে আদালতে আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য এই আমানতের খেয়ানত তথা অপব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যাবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, যার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় নেই, অসৎ-অযোগ্য। হতে পারে সে ব্যক্তি নিজের পিতা, ভাই বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণে নিষ্ঠাবান না হয়, অসৎ-অযোগ্য হয় তাহলে তাকে ভোট দেয়া যাবে না– এ ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করার সুযোগ জাতি লাভ করবে এবং সমাজ ও দেশ থেকে যাবতীয় অনাচার দূরিভূত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

নবী করীম (সাঃ) আমানত বিনষ্ট করা সম্পর্কে যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বর্তমানে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের বিধান এবং সাহাবায়ে কেরামদের অনুসৃত নীতি-আদর্শ প্রত্যেক পদে লংঘন ও অপমানিত করার এক নিষ্ঠুর রীতি মুসলিম সমাজের উচ্চপর্যায় থেকে চালু করা হয়েছে। ফলে সমাজে অশান্তি, অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব ও স্বকীয় আদর্শ রক্ষার স্বার্থেই মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজকে ইসলাম বিরোধী নীতি-পদ্ধতি ও আদর্শ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরকেই, যারা কুরআনের ধারক ও বাহক তথা আলিম-ওলামা, মাশায়েখ এবং ইসলামী চিন্তাবীদদেরকে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এটাই হলো আল্লাহর রাসূল ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি-আদর্শ। এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيْنَ–

'তোমরা আমার আদর্শ ও হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে অনুসরণ করে চলবে'। ইসলামী নেতৃত্ব তথা আল্লাহভীরু নেতৃত্ব ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণেই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَا كُمْ–

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে।

কুরআনে ঘোষিত এই মূলনীতি অনুসারে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির ময়দানে তৎপর হওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর 'ফিক্হে আকবর' নামক কিতাবে– আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রাহঃ) হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, আহ্লে হাদীসসহ বিশ্বের মুসলমানদের সর্বশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী, আলোচক-গবেষক ও চিন্তাবিদদের ঐকমত্যে গৃহিত সিদ্ধান্তটি উল্লেখপূর্বক লিখেছেন–রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সমাজে বসবাসকারী লোকদের ওপর ওয়াজিব।

কুরআন ও সুন্নাহর উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শরীআতের আইন-কানুন চালু করার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে রাজীনিত করা ওয়াজিব। কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এই রাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করা, ইচ্ছাকৃতভাবে এর

প্রতি অমনোযোগী থাকা বা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা অথবা এই রাজনীতির প্রতি বিরোধিতা করা কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতেই জঘন্য অপরাধ।

পক্ষান্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা প্রশংসিত যোগ্যতার অধিকারী কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে দুর্বল বা এই ময়দানে সক্রিয় হবার যোগ্যতা রাখেন না অথবা অন্য কোনো প্রকারের গ্রহণযোগ্য অপারগতার কারণে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় হতে পারেন না কিন্তু ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতির বিরোধিতাও করেন না– বরং মনে-প্রাণে এই রাজনীতিকে সমর্থন করেন এবং সাম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে তারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু অগ্রহণযোগ্য তথা ঠুনকো অজুহাতে কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এই ময়দান থেকে সরে দাঁড়ান অথবা জাগতিক কোনো স্বার্থ, ভয়-ভীতি বা ক্ষতির কারণে সক্রিয় না হন, তাহলে মুসলিম মিল্লাতই বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে বাধ্য। এ জন্য শরীআতের আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার অসীম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে জ্ঞানী-গুণী আলিম-ওলামা মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্ত াবিদদেরকে নিজেদের সমর্থক এবং কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে সুচিন্তিত ফলপ্রসূ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর ইসলামী রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় তৎপরতা পরিচালিত করতেই হবে। তাদের এই মহান কাজে দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামী নেতৃত্বকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবেন আর এটাই মুসলমানদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর দাবী।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, নেতৃত্বের পরিবর্তন, সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহ্ নির্দেশিত নিয়মতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা, অস্বচ্ছ কার্যক্রম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনভাবে বা কোনো প্রকারে সন্ত্রাসের আশ্রয়ও গ্রহণ করা যাবে না। এমন কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করা যাবে না, যে কারণে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে। মানুষকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানাতে হবে, তাদের ভেতরে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে এবং এই অনুভূতি তাদের ভেতরে শানিত করতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না করলে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশ ও সমাজে কাঙ্খিত শান্তি লাভ করা যাবে না।

এই অনুভূতি সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে ত্রুটিমুক্ত স্বচ্ছ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলে অবশ্য অবশ্যই দেশ ও সমাজে কুরআন-সুন্নাহর বিধান কায়েম করা যাবে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। এই

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যেই আলিম-ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্ত াবিদদেরকে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দিলে আদালতে আখিরাতে গ্রেফতার হয়ে আযাবের সম্মুখিন হতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শেষ কথা

নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোচ্চ মর্যাদার সোপানে উপনীত করেছেন এবং পৃথিবীতে সকল মানুষের হিদায়াতের উৎস হিসাবে একমাত্র তাঁকেই নির্বাচিত করেছেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের মাধ্যমে অন্যান্য সকল মতবাদ-মতাদর্শ ও মত-পথ বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। তাঁর আগমনের পরে যদি ভিন্ন কারো মতবাদ, মতাদর্শ ও প্রথাসমূহ পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হতো, তাহলে তা হতো নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক। মহান মালিক রাব্বুল আলামীন তা রাখেননি। হিদায়াতের সকল উৎস হিসাবে পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে তাঁকেই পেশ করেছেন।

সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে মুসলিম দাবীদার কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ববর্তী নবী-রাসূল বা দার্শনিক, রাজনীতিবিদ বা অন্য কোনো চিন্তানায়কের মত-পথ অনুসরণ করে তাহলে স্পষ্টতই সে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলো এবং নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করার অধিকার হারালো। তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর মানুষকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের অনুসরণের জন্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই জীবন বিধান অনুসরণ না করার অর্থই হলো নবী করীম (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা। আর কেউ যদি তা করে তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই সকল দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে। (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

এ ক্ষুদ্র পরিসরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সমগ্র মানব মণ্ডলীর মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদা, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাঁর পবিত্র শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে যৎসামান্য আলোচনা করা হলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, নবী করীম (সাঃ) ২৩ বছরের নবুয়্যাতের জীবনকালে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে ক্ষুধা ও দারিদ্রে নিষ্পেষিত হয়ে এমনকি পবিত্র দেহ

মুবারকের রক্ত ঝরিয়ে মানুষের কল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, যে আদর্শবান মুসলিম গড়েছিলেন, আমরা কি সেই জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে নিজেদের ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত অনুসরণ করছি? তিনি যে ধরনের মুসলিম গড়ার লক্ষ্যে আগমন করেছিলেন, সেই ধরনের মুসলিম হিসাবে নিজেদের গড়ার চেষ্টা করছি? আমরা মুখে দাবী করছি মুসলিম কিন্তু আমরা বাস্তব কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করছি যে, আমাদের অধিকাংশ কর্মই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ কথা মানব জাতির ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসারে এই পৃথিবীতে যে মানব গোষ্ঠীই জীবন পারিচালিত করেছে, তারাই শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানেই আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুসরণ করা হয়েছে, সেখানেই খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। রাষ্ট্র ও সমাজে যাবতীয় অনাচার, বিপর্যয়, অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে সুরক্ষিত থেকেছে। আর যেখানেই আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে, অমান্য বা বিরোধিতা করা হয়েছে, সেখানেই সার্বিকভাবে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় ধেয়ে এসেছে।

সুতরাং এ কথা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য যে, একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সফলতার একমাত্র গ্যারান্টি এবং মানব রচিত কোনো প্রকার মতবাদ-মতাদর্শ মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার শোচনীয় স্বাক্ষর রেখেছে। মানব জাতির প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের বাঁকেই আল্লাহর বিধান অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিকভাবে অনুভূত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। অতএব সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নেতৃত্ব আল্লাহভীরু জ্ঞানী-গুণী মুসলিম কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে। এই ধরনের রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও আল্লাহভীরু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পরামর্শ পরিষদ বা মাজলিশে শূরা বর্তমান থাকবে এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত হবে।

একমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজই দেশের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম। কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এই ধরনের ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে অবলম্বিত হওয়ার কারণেই খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি তথা যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলো। সর্বত্রই সততা আর ন্যায়-নীতির চিহ্ন ছিলো আকাশের প্রজ্জ্বল সূর্যের মতোই স্পষ্ট।

খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে আসীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর একটি বিধানও লংঘিত হয়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক স্তর ছিলো ইনসাফের মোড়কে আবৃত।

ফলে সেই রাষ্ট্র ও সমাজ একটি পরিপূর্ণ ইনসাফভিত্তিক সমাজের ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছিলো। পক্ষান্তরে একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র তথা বাদশাহী, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির কারণে দেশের জনগণকে হতে হয় নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত। প্রত্যেক পদে পদে তাদেরকে অন্যায় আর অবিচারের সম্মুখিন হতে হয়। শক্তিমান কর্তৃক দুর্বল লাঞ্ছিত হবে, এটাই হয় এসব পদ্ধতির অধীনে শাসিত রাষ্ট্রে। জনগণ থাকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব কারণেই ইসলামী শরীয়াত উল্লেখিত পদ্ধতির বিপরীতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শুরাঈ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص

এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত করে। (সূরা শূরা-৩৮)

বর্তমান কালেও পৃথিবীর যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ও সমাজে সার্বিক ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি তথা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে ঈমানদারদের মধ্য থেকে জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, যোগ্য, সচেতন ও আল্লাহভীরু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে শূরাঈ পদ্ধতি চালু করা একান্তই অপরিহার্য। কুরআন-সুন্নাহ্ ও খুলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক গৃহিত শরঈ সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষ কোনো কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়– সর্বকালের, যে কোনো স্থানের ও সর্বযুগের জন্য তা প্রযোজ্য ও অনুসরণযোগ্য এবং বিশেষ করে মুসলমানদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তা অনুসরণ করা একান্তই অপরিহার্য। পক্ষান্তরে অতীত যুগে ও বর্তমানে মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা প্রয়োগ করে যেসব নীতি-আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কার করেছে এবং অনাগত দিনে করবে, তা যদি কুরআন-সুন্নাহ্ ও খুলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক অনুসৃত নীতির পরিপন্থী হয়, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের মুসলমানদের জন্য তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা ফরজ তথা অপরিহার্য।

নবী করীম (সাঃ) এর যুগেও এক শ্রেণীর লোকজন ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে রাজনৈতিক ও পার্থিব সুবিধা আদায় করার লক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে এসে নিজেদের মুসলিম হবার দাবী জানাতো। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ط قُل لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط

এ (আরব) বেদুঈনরা বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি; আপনি বলে দিন- না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান আনোনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের

রাজনৈতিক) বশ্যতাই স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ, যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশই করেনি। (সূরা হুজুরাত- ১৪)

বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম ইসলামকে একান্তই ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে। ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো একটি ধর্ম আখ্যায়িত করে এর বিধি-বিধানকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:) কে পরিণত করেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্রে। মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি সন্দিহান এবং বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও দৃঢ়তার অভাব প্রকট। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত লোকজন ইসলামের বিধি-বিধান সঙ্কুচিত করার উপদেশ দিচ্ছে। আবার যারা ইসলামের কতিপয় বিধি-বিধান তাচ্ছিল্যভরে পালন করছে, তারাও সুবিধানুযায়ী পালন করছে। যে বিধানসমূহ পালন করলে শয়তানী শক্তি ক্ষিপ্ত হবে না, তা পালন করছে আর যে বিধি-বিধান পালন করলে ইসলাম বিরোধী শক্তি ক্ষিপ্ত হবে তা পালন করছে না। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط

তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো? (সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি বা) ব্যক্তি (ইসলামী জীবন বিধানের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনতে) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, তাদের পরকালেও কঠিনতম আযাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা আল বাকারা- ৮৫)

সুতরাং মুসলিম হিসাবে যারা দাবী করবে তাদের এ সুযোগ নেই যে, তারা নিজেদের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করবে অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন। ইসলাম একটি বিশাল মতাদর্শের নাম, এখানে জীবনের কোনো ভাগ নেই। সম্পূর্ণ জীবনেই ইসলামের বিধান অনুসরণ বাধ্যতামূলক। নবী করীম (সা:) ও সাহাবায়ে কেরাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেভাবে পবিত্র কুরআনের বিধান অনুসরণ করেছেন, অনুরূপভাবেই ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ–

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে (-র ছায়াতলে) এসে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই (অভিশপ্ত) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন! (সূরা আল বাকারা-২০৮)

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, ইসলামের বাইরে যেসকল আদর্শ বা মতবাদ রয়েছে তা সবই অভিশপ্ত। বর্তমান জগতের অধিকাংশ মুসলিম এই অভিশপ্ত পথ বেয়ে চলছে বিধায় এরা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত। সমগ্র দুনিয়া জুড়ে এরা প্রতি মুহূর্তে অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকার যে মূল্য রয়েছে, মুসলিম নামের লোকগুলোর সে মূল্য নেই। সর্বত্রই এরা অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত, অধিকার বঞ্চিত এবং নিজের সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সুযোগও এদের নেই। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক এরা দাসত্বের করুণ জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিম নামের এই লোকগুলো যখন এক আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব পরিত্যাগ করেছে, তখন অগণিত শক্তির দাসত্ব করতে এরা বাধ্য হচ্ছে।

মুসলিম নামের দাবীদার অধিকাংশ লোকগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করেছে। শুধু বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি, এরা ইসলামকে বানিয়েছে অনুগ্রহের পাত্র। ইসলামের নাম দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এবং এর বিপরীত আদর্শের নাম দিয়েছে প্রগতিবাদ। কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের নাম দিয়েছে জঙ্গী বই-পুস্তক।

পৃথিবীতে ভিন্ন কোনো জাতি নিজ ধর্ম, আদর্শ ও নীতিমালার এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে অশ্লীল অশালীন ভাষায় সমালোচনা করে, এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কিন্তু মুসলিম দাবীদার একশ্রেণীর লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বআদর্শ ও আদর্শিক ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এমন নোংরা ভাষায় সমালোচনা করে, এ পর্যন্ত কোনো অমুসলিম এ ধরনের সমালোচনা করেছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা দেখলে মনে পড়ে হ্যামিলনের সেই বংশী বাদকের কথা। কেউ একজন বংশী বাজিয়ে চলেছে আর তার বাঁশীর ঐন্দ্রজালিক সুরের মুর্ছনায় তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হবে এবং জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীতে সবথেকে কঠিন কাজ হচ্ছে মৃতপ্রায় জাতিকে প্রাণের স্পন্দনে উজ্জীবিত করা। কবির ভাষায়–

পানিমে আগ্ লাগানা মুশ্কিল হ্যায়,

বাহ্তী হু-ই দ্যরিয়া কো ফেরানা মুশ্কিল হ্যায়,

ম্যগার ইত্না নেহী কে জিত্না বিগ্ড়ি হু-ই

কওম কো ফেরলানা মুশ্কিল হ্যায়।

পানিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা বড়ই কঠিন, খরস্রোতা নদীর স্রোত ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। কিন্তু এর থেকেও কঠিন কাজ হলো পথভ্রষ্ট উদ্ভ্রান্তজাতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা।

وَ مَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ-

ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ

❀ ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা: একটি পর্যালোচনা? ❀ ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্কটের নেপথ্যে ❀ কুসংস্কারের সংস্কার কে করবে ❀ বিশ্বনবীর অমীয় বাণী ❀ জিয়ারতে বাইতুল্লাহ্ ❀ তা'লিমুল কুরআন-১ ❀ তা'লিমুল কুরআন-২ ❀ জীবন্ত ঈমানের স্বাদ ❀ সৎমানুষের সন্ধানে ❀ রিয়াদুল মু'মিনীন ❀ বেহেশতের চাবি ❀ পরকালের সাথী ❀ নাজাতের পথ ❀ যুগের দর্পন ❀ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে ❀ সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন-২ (প্রকাশিতব্য)

হেরার রাজ তোরণ, এখানেই সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ

هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

জান্নাতুল বাকী
যাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বত্র
পবিত্র কুরআনের স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়েছে সেই মহান
সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং
নবী পরিবারের অনেকেই
এই জান্নাতুল বাকীতেই ঘুমিয়ে আছেন।

সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী